তাফসীরুল
কুরআন
৩০তম পারা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তাফসীরুল কুরআন
(৩০তম পারা)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

মানবেতিহাসের সর্বাধিক পঠিত ধর্মগ্রন্থ হ’ল ‘কুরআন’। প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতী জীবনের দীর্ঘ ২৩টি বছরে থেমে থেমে নাযিল হওয়া এই মহাগ্রন্থই মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ হেদায়াতবাণী। মানবজাতির ইহকালীন সফলতা এবং পরকালীন মুক্তি এই গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও সৃষ্টিজগতের মধ্যে সেতুবন্ধনের জীবন্ত স্মারক এই মহাগ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বজনীন ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবেই অতি বিস্তৃত ও বহুমুখী। মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয় এমন কিছুই নেই, যা এই মহাগ্রন্থে বিবৃত হয়নি। জ্ঞানের সমস্ত দিক ও বিভাগের দুয়ার খুলে দিয়েছে এই গ্রন্থের প্রতিটি আয়াত ও শব্দ।

পবিত্র কুরআনের মর্মার্থ সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন তাঁদের তাফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। যার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থেকেছে পরবর্তী সকল যুগে ও সমাজে। তবে বাংলাভাষায় তাফসীর চর্চার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। তদুপরি যতটুকু হয়েছে, তার অধিকাংশই বিভিন্ন মাযহাব ও মতাদর্শগত ব্যাখ্যার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। সেকারণ বাংলাভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একটি বিশুদ্ধ তাফসীরের চাহিদা ছিল বহুদিনের। বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে এই প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে আরো তীব্রভাবে। যখন আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবাণীতে এদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত মাযহাব ও মতাদর্শগত বিভক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সহজ-সরল ও স্বচ্ছ বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণের চেতনা দিন দিন প্রসার লাভ করছে।

এমনি মুহূর্তে অনেক দেরীতে হলেও বহু প্রতীক্ষিত ‘তাফসীরুল কুরআন’ (৩০তম পারা) জাতির সামনে পেশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। সম্মানিত লেখক বগুড়া যেলা কারাগারে অবস্থানকালে অন্যান্য লেখনীর সাথে সূরা বাক্বারাহ্র অধিকাংশ এবং আম্মাপারার তাফসীর সম্পন্ন করেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে কঠিন সাংগঠনিক ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে মুহতারাম লেখকের হাতে যাচাই-বাছাই হওয়ার পর তাফসীরটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ’ল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রকাশনার ক্ষেত্রে ৩০তম পারাটি অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বাকি পারাগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা মাননীয় লেখকের জন্য আল্লাহ্র নিকট হায়াতে ত্বাইয়েবা প্রার্থনা করছি এবং আন্তরিকভাবে দো‘আ করছি যেন তিনি এই মহান খেদমতটি সফলভাবে সমাপ্ত করতে পারেন- আমীন!

বাংলাভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর মূলতঃ একটি কঠিন ও জটিল কাজ। সেই আয়াসসাধ্য ও ব্যাপক কাজটি সংক্ষেপে ও সহজ-সরল উপস্থাপনার মাধ্যমে মাননীয় লেখক পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দেয়ার যে কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তা সফল হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। পবিত্র কুরআনকে সমকালীন সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে লেখক মুসলিম সমাজের সামনে জ্ঞানের যে নব দিগন্ত উন্মোচন করতে চেয়েছেন, তা ফলপ্রসূ হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৩০ কোটি বাংলাভাষী মুসলমান এ থেকে প্রভূত কল্যাণ লাভে সমর্থ হবেন ইনশাআল্লাহ।

যারা এই প্রকাশনার কাজে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন- আমীন!

বর্তমান ২য় সংস্করণে মাননীয় লেখক সূরা ফাতিহার তাফসীরে সামান্য সংযোজন করেছেন এবং বাকীগুলিতে ছোট-খাট ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে। যথাসত্বর অত্র সংস্করণটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারায় আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি।

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ
সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم

بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে ছাত্রজীবন থেকে আমরা যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলাম, জীবনের পড়ন্ত বেলায় সরকারের যিন্দানখানায় এসে সেই দুই আলোকস্তম্ভের গভীরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করছি। ফাঁসির সেলের সংকীর্ণ নির্জন কক্ষে বসে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সামনে রেখে কুরআনে ডুবে যাওয়ার যে আলাদা তৃপ্তি রয়েছে, বাইরের জীবনে তা সহজে অনুভব করা যায় না। সে দিনের সেই লেখাগুলির একাংশ 'আম্মা পারা'র তাফসীর পরিমার্জিত হয়ে প্রেসে যাওয়ার এ মুহূর্তটি দীন লেখকের জন্য তাই সত্যিই স্মরণীয়। আমরা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি এই মহতী খেদমতটি আমাদের মাধ্যমে করিয়ে নিলেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। বাকী অংশগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

তাফসীরে গৃহীত নীতিমালা : (১) প্রথমে সমার্থবোধক কুরআনের অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতঃপর (২) ছহীহ হাদীছ দ্বারা। অতঃপর প্রয়োজনে (৩) আছারে ছাহাবা ও তাবেঈনের ব্যাখ্যা দ্বারা, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। (৪) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ ও তাঁদের গৃহীত নীতিমালার অনুপুঙ্খ অনুসরণের সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। যে বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক বহু মুফাসসিরের পদস্খলন ঘটেছে। (৫) মর্মগত ইখতেলাফের ক্ষেত্রে তাফসীরের সর্বস্বীকৃত মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং সর্বাগ্রগণ্য বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। (৬) তরজমার ক্ষেত্রে কুরআনের উদ্দিষ্ট মর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে তা সাধ্যমত স্পষ্ট করা হয়েছে। (৭) ক্ষেত্র বিশেষে আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। (৮) আয়াতের সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দিকগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (৯) তাফসীরের সর্বত্র চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী আক্বীদা সমূহের বিপরীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের মধ্যপন্থী আক্বীদা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। (১০) বিদ্বানগণের অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং প্রবৃত্তিপরায়ণদের স্বেচ্ছাকৃত ব্যাখ্যাসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে পাঠককে সতর্ক করা হয়েছে। (১১) আম্মাপারার সূরাসমূহের বিষয়বস্তু, গুরুত্ব, শানে নুযূল, ফযীলত ও সারকথা বর্ণিত হয়েছে।

'আম্মাপারা' কুরআনের সবচেয়ে কঠিন ও সারগর্ভ সূরা ও আয়াতসমূহের সমষ্টি। যেগুলির কলেবর অতীব সংক্ষিপ্ত, অথচ গভীর ভাব ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমৃদ্ধ এবং আখেরাতের দ্যোতনায় উদ্দীপ্ত। আম্মাপারার গভীরে যে ডুব দিবে, দুনিয়ার এই ক্ষুদ্র পরিসর ছেড়ে জান্নাতের গুলবাগিচায় পাড়ি দেওয়ার জন্য সে পাগলপারা হবে। হিংসা-হানাহানির এই কয়েদখানা ছেড়ে সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠবে। তাই কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও বর্ণকে আল্লাহ্র কালাম হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে পাঠ করা ও তার প্রতি সশ্রদ্ধ আমল করার আবেদন জানিয়ে 'তাফসীরুল কুরআন' পাঠের প্রতি আল্লাহভীরু পাঠকদের আহ্বান জানাচ্ছি।

নিঃস্বার্থ এ লেখনীকে আল্লাহ নাচীয লেখকের ও তার পরিবারের এবং তার মরহূম পিতা-মাতার জান্নাতের অসীলা হিসাবে কবুল করুন! অনিচ্ছাকৃত ভুল সমূহের জন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থী। পরিশেষে এ তাফসীরগ্রন্থ প্রকাশে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন! বিনীত

-লেখক

সূচীপত্র

(المحتويات)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ– رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ– (آل عمران ٧–٨)–

‘তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। যার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট অর্থবোধক। আর এগুলিই হ’ল কিতাবের মূল অংশ। আর কিছু রয়েছে অস্পষ্ট। অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছে পড়ে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা দেবার জন্য। অথচ এগুলির সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর সুগভীর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে, আমরা এগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। সবকিছুই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ’তে এসেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না’। ‘(তারা প্রার্থনা করে বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করো না। আর তুমি আমাদেরকে তোমার নিকট হ’তে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বাধিক দানকারী’ *(আলে ইমরান ৭-৮)*। অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের উপরে ঈমান রাখবে।

সূরা ফাতিহা (মুখবন্ধ)

মক্কায় অবতীর্ণ ১ম পূর্ণাঙ্গ সূরা

সূরা ১, আয়াত ৭, শব্দ ২৫, বর্ণ ১১৩।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।[১]

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾

(২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান।

مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾

(৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক।

اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾

(৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾

(৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর।

صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ ۙ﴿۶﴾

(৬) এমন ব্যক্তিদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।

غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ٪﴿۷﴾

(৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন! তুমি কবুল কর!)

সূরা (السُّوْرَةُ) অর্থ উঁচু স্থান, সীমানা প্রাচীর। আয়াত (الآيَةُ) অর্থ নিদর্শন। কুরআনের একাধিক আয়াত সম্বলিত একটি অংশকে 'সূরা' এবং অনেকগুলি আয়াত সম্বলিত এক একটি ভাগকে 'পারা' (اَلْجُزْءُ) বলা হয়। কুরআনের শব্দ ও বাক্যসমূহ আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে এগুলিকে আয়াত বা নিদর্শন বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ৩০টি পারা ও ১১৪টি সূরা রয়েছে। কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা হ'ল 'বাক্বারাহ' এবং ছোট সূরা হ'ল 'কাওছার'। প্রত্যেক সূরার শুরুকে *বিসমিল্লাহ* রয়েছে, কেবল সূরা তওবাহ ব্যতীত। পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২০৪ থেকে ৬২৩৬, শব্দ সংখ্যা ৭৭৪৩৯ এবং বর্ণ সংখ্যা ৩,৪০,৭৫০ *(কুরতুবী)*। ঈমানের সাথে কুরআনের প্রতিটি বর্ণ পাঠে ১০টি করে নেকী হয়'।[২] রামাযান মাসে এই নেকীর পরিমাণ ১০ থেকে কেবল ৭০০ গুণ হয় বরং এর কোন সংখ্যা-সীমা থাকে না। কেননা তখন আল্লাহ নিজ হাতে সীমাহীন নেকী দান করে থাকেন।[৩]

---

১. এটি সূরা নমলের ৩০ আয়াত। যা সূরা তওবা ব্যতীত প্রতিটি সূরার শুরুতে পার্থক্যকারী হিসাবে পঠিত হয়। এতে ৪টি শব্দ ও ১৯টি বর্ণ রয়েছে।

২. তিরমিযী হা/২৯১০, দারেমী; মিশকাত হা/২১৩৭ 'কুরআনের ফযীলতসমূহ' অধ্যায়।

৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯, 'ছওম' অধ্যায়।

'সূরাতুল ফাতিহাহ' অর্থ মুখবন্ধ বা ভূমিকার সূরা। ইমাম কুরতুবী বলেন, একে 'ফাতিহাহ' এজন্য বলা হয় যে, এই সূরার মাধ্যমে কুরআন পাঠ শুরু করা হয়। এই সূরার মাধ্যমে কুরআনের সংকলন কাজ শুরু হয়েছে এবং এই সূরার মাধ্যমে ছালাত শুরু করা হয়'।[৪] এটি মক্কায় অবতীর্ণ **১ম** ও পূর্ণাঙ্গ সূরা। এতে ৭টি আয়াত, ২৫টি কালেমা বা শব্দ এবং **১১৩**টি হরফ বা বর্ণ রয়েছে।[৫] সূরাটি কুরআনের মূল, কুরআনের ভূমিকা ও ছালাতের প্রতি রাক'আতে পঠিতব্য সাতটি আয়াতের সমষ্টি 'আস-সাব'উল মাছানী' নামে ছহীহ হাদীছে[৬] ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেন, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ 'আমরা তোমাকে প্রদান করেছি বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন' *(হিজর ১৫/৮৭)*।

১. নামকরণ :

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, সূরাটির নাম 'উম্মুল কিতাব' এজন্য রাখা হয়েছে যে, এই সূরার মাধ্যমেই পবিত্র কুরআনের সংকলন কার্য শুরু করা হয়েছে এবং এই সূরা পাঠের মাধ্যমে ছালাত শুরু করা হয়ে থাকে।[৭] আরবরা প্রত্যেক বস্তুর উৎস, সারগর্ভ বস্তু বা কোন কাজের অগ্রভাগ, যার অনুগামী শাখা-প্রশাখা সমূহ রয়েছে, তাকে 'উম্ম' (أُمٌّ) বলে। যেমন মক্কাকে উম্মুল ক্বোরা (أم القرى) বলা হয়, পৃথিবীর প্রথম ও শীর্ষ মর্যাদাবান নগরী হওয়ার কারণে এবং এটাই পৃথিবীর নাভিমূল ও এখান থেকেই পৃথিবী বিস্তৃতি লাভ করেছে' *(ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অতএব সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন (أم القرأن) এজন্য বলা হয়েছে যে, এটা দিয়েই কুরআন শুরু হয়েছে এবং এর মধ্যে কুরআনের সমস্ত ইল্ম শামিল রয়েছে' *(কুরতুবী)*।

সূরা ফাতিহার নাম সমূহ :

বিভিন্ন হাদীছ, আছার ও বিদ্বানগণের নামকরণের মাধ্যমে অন্যূন ৩০টি নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ছহীহ হাদীছসমূহে এসেছে ৮টি। যেমন : (১) উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল)। (২) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। (৩) আস-সাব'উল মাছানী

---

৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আনছারী আল-খাযরাজী আল-কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১ হিঃ/১২৭৩ খৃঃ), আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, ওরফে তাফসীরুল কুরতুবী, তাহকীক : আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী ১৪২৪/২০০৪ খৃঃ) ১/১৫০ পৃঃ।

৫. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন ওমর ইবনু কাছীর আল-কুরায়শী আদ-দিমাশক্বী (৭০১-৭৪ হিঃ/১৩০১-৭৩ খৃঃ), তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ওরফে তাফসীর ইবনু কাছীর (কায়রো : দারুল হাদীছ ১৪২৩ হিঃ/২০০২ খৃঃ), ১/৪৮ পৃঃ।

৬. যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত মরফূ হাদীছে এসেছে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ (বুখারী হা/৪৭০৪ 'তাফসীর' অধ্যায়, 'সূরা হিজর' অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/৯৭৮৭, সনদ ছহীহ)। অন্য বর্ণনায় এসেছে- وقال أيضا اَلْحَمْدُ لله أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِى (তিরমিযী হা/৩১২৪, আবুদাউদ হা/১৪৫৭, সনদ ছহীহ)।

৭. বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায়-৬৫, অনুচ্ছেদ-১ 'ফাতিহাতুল কিতাব'-এর শুরুতে।

(সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত)। (৪) আল-কুরআনুল 'আযীম (মহান কুরআন)।[৮] (৫) আল-হামদু (যাবতীয় প্রশংসা)। (৬) ছালাত।[৯] (৭) রুক্বিয়াহ (ফুঁকদান)।[১০] (৮) ফাতিহাতুল কিতাব (কুরআনের মুখবন্ধ)।[১১] এ নামে সকল বিদ্বান একমত। কারণ এ সূরা দিয়েই কুরআন পাঠ শুরু হয়। কুরআনুল কারীম লেখা শুরু হয় এবং এটা দিয়েই ছালাত শুরু হয় *(কুরতুবী)*।

এতদ্ব্যতীত অন্য নামগুলি যেমন : (৯) শিফা (আরোগ্য)[১২], (১০) আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ নামকরণ করেছেন *(ইবনু কাছীর)*। (১১) কাফিয়াহ (যথেষ্ট)। ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর এ নামকরণ করেছেন। কারণ এটুকুতেই ছালাত যথেষ্ট এবং এটি ব্যতীত ছালাত হয় না *(কুরতুবী)*। (১২) ওয়াফিয়াহ (পূর্ণ)। সুফিয়ান বিন উয়ায়না এ নামকরণ করেছেন। কারণ এ সূরাটি সর্বদা পূর্ণভাবে পড়তে হয়। আধাআধি করে দু'রাক'আতে পড়া যায় না *(কুরতুবী)*। (১৩) ওয়াক্বিয়াহ (হেফাযতকারী)। (১৪) কান্‌য (খনি)। এছাড়াও ফাতিহাতুল কুরআন, সূরাতুল হাম্‌দ, শুক্‌র, ফাতিহাহ, মিন্নাহ, দো'আ, সওয়াল, মুনাজাত, তাফভীয, মাসআলাহ, রা-ক্বিয়াহ, নূর, আল-হাম্‌দুলিল্লাহ, ইল্‌মুল ইয়াক্বীন, সূরাতুল হাম্‌দিল ঊলা, সূরাতুল হাম্‌দিল কুছরা'। এইভাবে নাম বৃদ্ধির ফলে সূরা ফাতিহার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৩]

প্রকাশ থাকে যে, পবিত্র কুরআনের সূরা সমূহের এক বা একাধিক নামকরণ, মাক্কী ও মাদানী সূরার আগে-পিছে সংযোজন ও আয়াত সমূহের বিন্যস্তকরণ সবকিছু 'তাওক্বীফী' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 'অহি' কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সন্নিবেশিত, যা অপরিবর্তনীয়।[১৪] এর মধ্যে গূঢ় তত্ত্বসমূহ নিহিত রয়েছে।

অবতরণকাল :

সর্বপ্রথম সূরা 'আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত মক্কায় নাযিল হয়।[১৫] অতঃপর কয়েক দিন অহি-র বিরতিকাল শেষে সূরা মুদ্দাছ্ছির-এর প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হয়।[১৬] অন্য বর্ণনায় ৭টি আয়াতের কথা এসেছে।[১৭] তারপরে সর্বপ্রথম পূর্ণাংগ সূরা হিসাবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।[১৮]

---

৮. হিজর ১৫/৮৭; বুখারী তা'লীক্ব হা/৪৭০৪; আহমাদ হা/৯৭৮৭, তিরমিযী হা/৩১২৪, আবুদাঊদ হা/১৪৫৭।
৯. মুসলিম হা/৩৯৫, নাসাঈ হা/৯০৯; মিশকাত হা/৮২৩।
১০. বুখারী হা/৫৭৩৬, মুসলিম হা/২২০১।
১১. বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪, ৮০৬; মিশকাত হা/৮২২, ২১২৪।
১২. দারেমী হা/৩৩৭০, মুহাক্কিক : হুসাইন আসাদ সালীম, সনদ মুরসাল ছহীহ; মিশকাত হা/২১৭০।
১৩. আব্দুস সাত্তার দেহলভী, তাফসীরে সূরায়ে ফাতিহা (করাচী : মাকতাবা আইয়ূবিয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৫/১৯৬৫), পৃঃ ৬৮-৯২। গৃহীত : 'খাযীনাতুল আসরার'; সুয়ূতী, 'আল-ইতক্বান'; ভুপালী, 'আদ-দীনুল খালিছ'।
১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৮-৯৯; বুখারী হা/৪৫৩৬; তাফসীর কুরতুবী ১/৬০।
১৫. ইবনু কাছীর ৪/৫৬৪।
১৬. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৩-এর ব্যাখ্যা, ১/৩৭; ঐ, হা/৪৯২৬ 'তাফসীর' অধ্যায়-৬৫, অনুচ্ছেদ-৫।
১৭. ইবনু কাছীর ৮/২৩৫। গৃহীত : ত্বাবারাণী, সনদ যঈফ, তাহকীক ইবনু কাছীর।
১৮. মান্না' আল-ক্বাত্ত্বান, মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহবাহ, ১৩শ সংস্করণ ২০০৪ খৃঃ) পৃঃ ৬৪।

বিষয়বস্তু :

সূরা ফাতিহার মূল বিষয়বস্তু হ'ল দো'আ বা প্রার্থনা। একারণেই এই সূরার অন্যতম নাম হ'ল 'সূরাতুদ দু'আ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لله 'শ্রেষ্ঠ যিক্র হ'ল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল 'আলহামদুলিল্লাহ' বা সূরা ফাতিহা'।[১৯] এর দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হ'তে ফায়েদা পেতে গেলে তাকে অবশ্যই উক্ত নিয়তে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করতে হবে। এই সূরাতে বর্ণিত মূল দো'আ হ'ল ৫ম আয়াত, إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর'! বস্তুতঃ সমস্ত কুরআনই উক্ত প্রার্থনার বিস্তারিত জওয়াব।

দো'আর আদব :

অত্র সূরাতে দো'আ করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ১ম হ'তে ৩য় আয়াত পর্যন্ত যার নিকটে প্রার্থনা করা হবে, সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রশংসা করা হয়েছে। অতঃপর ৪র্থ আয়াতে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে ও কেবলমাত্র তাঁর নিকট থেকেই সাহায্য কামনার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর ৫ম আয়াতে মূল দো'আর বিষয়বস্তু ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতদ্বয় মূলতঃ ৫ম আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে। এইভাবে প্রার্থনা নিবেদন শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটে 'আমীন' বলে দো'আ কবুলের আবেদন করতে বলেছেন। মোটকথা প্রথমে প্রশংসা ও আনুগত্য নিবেদন করার পরে দো'আ পেশ করা হয়েছে। একইভাবে ছালাতের বাইরে আল্লাহ্র জন্য হাম্দ ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পেশ করার পরে দো'আ করা হ'ল দো'আর সুন্নাতী তরীকা।[২০]

এই সূরাতে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এই হেদায়াত পাওয়ার উপরেই বান্দার ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে। সম্ভবতঃ একারণেই ছালাতের প্রতি রাক'আতের শুরুতে ইমাম ও মুক্তাদী সকল মুছল্লীর জন্য জেহরী ও সের্রী সকল ছালাতে এই সূরা পাঠ করা ফরয করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না'।[২১] সম্ভবতঃ একারণেই সূরায়ে ফাতিহার অন্যতম

১৯. তিরমিযী হা/৩৩৮৩, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬।
২০. আবুদাঊদ, তিরমিযী হা/৩৪৭৬, মিশকাত হা/৯৩০, ৯৩১।
২১. বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪, মিশকাত হা/৮২২, উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে।

নাম হ'ল 'ছালাত'। অর্থাৎ যা ব্যতীত 'ছালাত' সিদ্ধ হয় না। যদিও অনেক বিদ্বান ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করাকে অসিদ্ধ বলেন। অথচ এর পক্ষে ছহীহ হাদীছ থেকে কোন দলীল নেই। তাছাড়া ছালাতের শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসা বাদ দিয়ে কিভাবে উক্ত ছালাত ও ইবাদত কবুল হ'তে পারে?

ফাযায়েল :

(১) এই সূরা কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত সূরা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তাওরাত, যবূর, ইনজীল এবং কুরআনে এই সূরার তুলনীয় কোন সূরা নেই।[২২]

(২) এই সূরা এবং সূরায়ে বাক্বারাহ্র শেষ তিনটি আয়াত হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত বিশেষ নূর, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি।[২৩]

গুরুত্ব :

যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত অপূর্ণাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ (خِدَاجٌ)। আবু ওবায়েদ বলেন, 'খিদাজ' হ'ল গর্ভচ্যুত মৃত সন্তান যা কোন কাজে আসে না।[২৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথাটি তিনবার বলেন। রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যখন আমরা ইমামের পিছনে থাকি? জওয়াবে তিনি বলেন, إِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ 'তখন তুমি ওটা চুপে চুপে পড়'। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বলেন, قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ. 'ছালাতকে অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাই পাবে। যখন সে বলে, আলহামদুলিল্লাহ..' তখন আল্লাহ বলেন, حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে'। যখন সে বলে, 'আর রহমা-নির রহীম' তখন আল্লাহ বলেন, أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِىْ 'আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে'। যখন সে বলে, 'মা-লিকি....' তখন আল্লাহ বলেন, مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ 'বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে'। যখন সে বলে, ইইয়াকা না'বুদু.. তখন আল্লাহ বলেন, هَذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ 'এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত। আর আমার বান্দা

২২. বুখারী হা/৪৭০৩; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪২।
২৩. মুসলিম হা/৮০৬ অধ্যায়-৬, 'সূরা ফাতিহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৪৩, মিশকাত হা/২১২৪।
২৪. তুহফা হা/২৪৭-এর ভাষ্য।

যা চাইবে, তাই পাবে'। অতঃপর যখন সে বলে, 'ইহ্দিনাছ ছিরাত্বাল ... ওয়াল লায্ যা-ল্লীন' তখন আল্লাহ বলেন, هَذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ 'এটি সম্পূর্ণ আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে, তাই পাবে।[২৫] অত্র হাদীছে জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠের স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। অতএব জেহরী বা সের্রী সকল ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। ছাহাবীর ব্যাখ্যা পাওয়ার পরে অন্য কারু মতামতের প্রতি দৃকপাত করা ঠিক হবে না।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'এই সূরার নাম 'ছালাত' (الصلاة) বলা হয়েছে একারণে যে, ছালাতের জন্য এটি পাঠ করা সবচেয়ে বড় রুকন' *(ঐ, তাফসীর সূরা ফাতিহা)*। তিনি বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং যেসকল বিদ্বান ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয বলেন না, তাদের প্রধান দলীল হ'ল, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 'তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ হয়, ততটুকু পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। অথচ আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনায় জমহূর বিদ্বানগণের নিকট এখানে 'কুরআন' অর্থ ছালাত। অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু রাত্রি জাগরণ কর। কুরআন তেলাওয়াত যেহেতু ছালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেকারণে এখানে 'কুরআন' বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا 'নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন অর্থাৎ ছালাত (দিবস বা রাত্রির বদলী ফেরেশতাদ্বয়ের) একত্রিত হওয়ার সময়কাল' *(ইসরা ১৭/৭৮; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মুযযাম্মিল ২০)*।

(২) উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ *('লা ছালা-তা লিমান লাম ইয়াক্বরা' বিফা-তিহাতিল কিতা-ব')* 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না'।[২৬]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ছালাত সিদ্ধ নয়, যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না'...।[২৭]

(৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন ও তিনি

২৫. মুসলিম হা/৩৯৫, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২৩।

২৬. বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪, মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; কুতুবে সিত্তাহ সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

২৭. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৯০, ১/২৪৭-৪৮ পৃঃ সনদ ছহীহ। أجزأ الشيئ فلانا اي كفاه অর্থাৎ 'এটি তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে' ; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ১১৯-২০ পৃঃ।

সুস্থ হন...।[২৮] এজন্য এ সূরাকে রাসূল (ছাঃ) 'রুক্বইয়াহ' (الرُّقْيَةُ) বলেছেন।[২৯] কেননা এই সূরা পড়ে ফুঁক দিলে আল্লাহ্র হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

(৫) ইমাম কুরতুবী বলেন, সূরা ফাতিহাতে যে সকল 'ছিফাত' রয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই। এমনকি একেই 'আল-কুরআনুল আযীম' বা মহান কুরআন বলা হয়েছে (*হিজর ১৫/৮৭*)।

এই সূরার ২৫টি কলেমা কুরআনের যাবতীয় ইল্মকে শামিল করে। এই সূরার বিশেষ মর্যাদা এই যে, আল্লাহ এটিকে নিজের ও নিজের বান্দার মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। একে বাদ দিয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। সেজন্যই একে 'উম্মুল কুরআন' বা 'কুরআনের সারবস্তু' বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিভক্ত। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহত। সূরা ইখলাছে 'তাওহীদ' পূর্ণাঙ্গভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সূরা ফাতিহাতে তিনটি বিষয় একত্রে থাকার কারণে তা 'উম্মুল কুরআন' হওয়ার মহত্তম মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে।[৩০]

ফায়েদা :

সূরা ফাতিহাকে অনেকে বিদ'আতী কাজে ব্যবহার করেন, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন কবর যিয়ারতের সময় ফাতিহা পাঠ করা, বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপলক্ষে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, নির্দিষ্ট সংখ্যক বার ফাতিহা পাঠ করে দো'আ করা, খুৎবা, দো'আ বা ওয়ায-নছীহতের শুরু বা শেষে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, ফজরের আযানের পূর্বে বা পরে মাইকে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, সম্মিলিত দো'আর জন্য হাত উঠানোর পূর্বে সকলকে ফাতিহা পড়তে বলা, মজলিস শেষে ফাতিহা পাঠ, মৃতের পাশে বসে ফাতিহা পাঠ, কবরে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাক্বারাহ্র শুরুর অংশ পড়া, দাফনের সময় সূরা ফাতিহা, ক্বদর, কাফিরূন, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা বিশেষভাবে পাঠ করা, কবরের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ১ বার ও ইখলাছ ১১ বার অথবা সূরা ইয়াসীন ১ বার পাঠ করা ইত্যাদি। অথচ ছহীহ হাদীছসমূহে কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অনেকে জেহরী বা সের্রী ছালাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন না। মনে রাখা আবশ্যক যে, দো'আ হ'ল ইবাদত। যার নিয়ম-পদ্ধতি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। যা অপরিবর্তনীয়। এখানে খেয়াল-খুশীমত কোন কাজ করা যায় না। বড় কথা হ'ল এই যে, বিদ'আতের মাধ্যমে কোন ইবাদত কবুল হয় না।

---

২৮. বুখারী হা/৫৭৩৭ 'চিকিৎসা' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৯৮৫।
২৯. বুখারী হা/৫৭৩৬, মুসলিম হা/২২০১ 'সালাম' অধ্যায়; তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর।
৩০. তাফসীর কুরতুবী ১/১৪৮-৪৯।

তাফসীর :

আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ :

আল্লাহ বলেন, وَقُلْ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ 'তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হ'তে'। 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হ'তে' *(মুমিনূন ২৩/৯৭-৯৮)*। তিনি বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৩৬)*। তিনি বলেন, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করবে' *(নাহল ১৬/৯৮)*।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বিদ্বানগণ বলেন, ছালাতের মধ্যে বা বাইরে কুরআন পাঠের শুরুতে শয়তানের ধোঁকা হ'তে আল্লাহ্‌র নিকটে পানাহ চেয়ে 'আউযুবিল্লাহ....' পাঠ করা, অতঃপর আল্লাহ্‌র নামে ক্বিরাআত শুরু করার সংকল্প করে 'বিসমিল্লাহ...' পাঠ করা মুস্তাহাব।[৩১] ছালাতের শুরুতে ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতাহ পাঠ শেষে আউযুবিল্লাহ কেবল ১ম রাক'আতে পড়বে, বাকী রাক'আতগুলিতে নয়।[৩২] জেহরী ছালাতে 'বিসমিল্লাহ...' চুপে চুপে পড়ার দলীল অধিকতর স্পষ্ট ও মযবুত।[৩৩] তবে যে সকল বিদ্বান বিসমিল্লাহ-কে সূরায়ে ফাতিহার অন্যতম আয়াত মনে করেন, তাঁরা জেহরী ছালাতে অন্য আয়াতের ন্যায় এটিকেও জোরে পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৩৪] মূলতঃ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' মক্কায় অবতীর্ণ সূরা নমল-এর ৩০ আয়াতের অংশ বিশেষ, যা সাবা-র রাণী বিলক্বীস-এর নিকটে লিখিত পত্রের শুরুতে হযরত সুলায়মান (আঃ) লিখেছিলেন।[৩৫] এই আয়াত নাযিলের পূর্বে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখতেন। পরে 'বিসমিল্লাহ' লিখতে শুরু করেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরার মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য সূরা তওবা ব্যতীত অন্য সকল সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' লিখিত ও পঠিত হয়। অমনিভাবে বই ও চিঠি-পত্রের শুরুতে বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে 'বিসমিল্লাহ' লেখা সম্পর্কে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে।[৩৬]

---

৩১. তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৬০; কুরতুবী ১/১২১, ১৩৪।

৩২. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রো : দারুশ শাবাব, ১৩৯৮/১৯৭৮), ৩/৩৬-৩৯; সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : দারুল ফাত্হ, ৫ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২), ১/১১২; তাফসীর কুরতুবী ১/১২১।

৩৩. নায়লুল আওত্বার ৩/৪৬, ৫২; কুরতুবী ১/১২৮-১৩১।

৩৪. ইবনু খুযায়মাহ হা/৪৯৩; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৪৭৯; ইরওয়া হা/৩৪৩। নায়লুল আওত্বার ৩/৪৩-৪৫।

৩৫. নামল ২৭/২৯-৩০ (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّيْ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ، إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)

৩৬. কুরতুবী ১/১৩৩।

বিসমিল্লাহ্র শুরুতে إسم বা নাম কথাটি বৃদ্ধি করা হয়েছে আল্লাহ্র মর্যাদা আরও সমুন্নত করার জন্য এবং যাতে 'বিল্লাহ' শব্দ দ্বারা কসম বা শপথ না বুঝায়, সেজন্য। অধিক ব্যবহারের কারণে باسم থেকে আলিফ বিলুপ্ত করে بسم করা হয়েছে। اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ তে আলিফ মওজুদ আছে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহারের কারণে।

اَللهُ হ'ল বিশ্বপ্রভুর সত্তাগত নাম বা 'ইসমে আ'যম' (الإسم الأعظم)। বাকী নামসমূহ এর অনুগামী ও গুণবাচক নাম। বিশ্বপ্রভুর সত্তা ব্যতীত 'আল্লাহ' নাম অন্য কারু জন্য প্রযোজ্য নয়। আরবী বা অন্য কোন ভাষায় এই নামের কোন প্রতিশব্দ নেই। অতএব আল্লাহ-এর বদলে খোদা, ঈশ্বর, ভগবান, গড, উপরওয়ালা ইত্যাদি বলা যাবে না। 'আল্লাহ' নামের কোন স্ত্রীলিঙ্গ, দ্বিবচন বা বহুবচন নেই। উলূহিয়াতের সকল গুণাবলীর ধারক হ'লেন আল্লাহ। তিনিই একমাত্র মা'বূদ। তিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক।

أَلَهَ يَلَهُ إِلَهَةً أُلُوْهِيَّةً অর্থ উপাসনা করা। সেখান থেকে مَأْلُوْهٌ অর্থ مَعْبُوْدٌ উপাস্য। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে 'আল্লাহ' শব্দটি 'মুশতাক্ব', যা إِلاَهٌ মাদ্দাহ হ'তে উদ্গত। ওযন فِعَالٌ। إِلاَهٌ-এর উপরে اَلْ প্রবেশ করানোর পর (اَلْإِلَهُ) হালকা করার জন্য 'হামযাহ' ফেলে দিয়ে اَللهُ করা হয়েছে 'সম্মান' বুঝানোর জন্য। উক্ত اَلْ সর্বদা আবশ্যিক থাকবে। কখনোই পৃথক করা যাবে না। যাহহাক বলেন, إِنَّمَا سُمِّيَ اللهُ إِلَهًا لان الخلق يتأَلَّهُوْن إليه في حوائجهم 'আল্লাহ'-কে 'ইলাহ' এজন্য বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিকুল স্ব স্ব প্রয়োজনে হয়রান ও নিরাশ হয়ে তাঁর কাছেই উপনীত হয় *(কুরতুবী ১/১৩৯-৪০)*।

ফায়েদা :

আজকাল আরবীতে আল্লাহ (الله) লিখে তা বিভিন্ন মসজিদে, গাড়ীর মাথায়, বাড়ীতে ও বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ব্যবহার করা হচ্ছে। যা নিঃসন্দেহে বিদ'আত ও চরম বেআদবীও বটে। অনেকে একপাশে আরবীতে 'আল্লাহ' (الله) অন্যপাশে 'মুহাম্মাদ' (محمد) লিখেন। যার মাধ্যমে উভয়কে মর্যাদার দিক থেকে সমান গণ্য করা হয় এবং বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে এগুলি করা হয়। অথচ শরী'আতে এর কোন দলীল নেই। এগুলি শয়তানী ধোঁকা ব্যতীত কিছু নয়। এসব থেকে তওবা না করে মারা গেলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

رَحْمٰنٌ 'রহমান' ও 'রহীম' দু'টিই 'মুশতাক্ব' যা রহম (الرَّحْمَةُ) মাদ্দাহ হ'তে উদ্গত। অর্থ দয়া, অনুগ্রহ। 'রহমান' দ্বারা রহম বা অনুগ্রহের আধিক্য বুঝানো হয়েছে, যা সকল

ধরনের অনুগ্রহকে শামিল করে। এটি আল্লাহ্র জন্য খাছ। এই বিশেষণ অন্যের জন্য সিদ্ধ নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى 'তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর বা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, যে নামেই তোমরা ডাক, তাঁর সব নামই সুন্দর' *(ইসরা ১৭/১১০)*। এখানে 'রহমান'কে আল্লাহ নামের সমান গণ্য করা হয়েছে, যার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُوْنَ 'তোমার পূর্বে আমরা যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর আমরা কি 'রহমান' (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নির্ধারণ করেছিলাম, যাদের ইবাদত করা যায়? *(যুখরুফ ৪৩/৪৫)*। এখানে আল্লাহকে 'রহমান' বলা হয়েছে।

رَحِيْمٌ আল্লাহ ও বান্দা সবার জন্য বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিফাত হিসাবে পবিত্র কুরআনে رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ বিশেষণ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে *(তওবা ৯/১২৮)*। তাছাড়া আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহশীল বুঝানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়েছে, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا 'নিশ্চয়ই তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৪৩)*।

দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্র অনুগ্রহের ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য দু'টো একই গুণবাচক শব্দকে একই স্থানে একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র রহমত তাঁর ক্রোধকে পরাভূত করে[৩৭] إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ (متفق عليه) এবং তাঁর রহমত সকল কিছুতেই ব্যাপ্ত রয়েছে رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ *(আ'রাফ ৭/১৫৬)*।

বিভিন্ন শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে বহু হাদীছ এসেছে। 'বিসমিল্লাহ' হ'ল দুষ্ট জিন ও মানুষের লজ্জাস্থানের পর্দা স্বরূপ।[৩৮] গৃহে প্রবেশ করা ও বের হওয়া, বাড়ীর দরজা বন্ধ করা, বাতি নেভানো, পাত্র ঢাকা, বোতলের মুখ লাগানো, চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা, ওযূ-গোসল, খানা-পিনা, যবহ ইত্যাদি সকল শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার জন্য হাদীছে স্পষ্টভাবে নির্দেশ এসেছে। শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وآخِرَهُ বলতে হবে।[৩৯] কিন্তু যেসকল ইবাদতের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলার বিধান নেই, সেসবের শুরুতে তা বলা যাবে না। যেমন আযান, ইক্বামত, ছালাত প্রভৃতির শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা। ওছমান বিন আবুল 'আছ ইসলাম

৩৭. বুখারী হা/৭৪২২, মুসলিম হা/২৭৫১, মিশকাত হা/২৩৬৪।
৩৮. তিরমিযী হা/৬০৬, মিশকাত হা/৩৫৮, সনদ ছহীহ।
৩৯. তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭, মিশকাত হা/৪২০২।

গ্রহণের পর থেকে ব্যথার অসুখে আক্রান্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ব্যথার স্থানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলতে ও সাত বার أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং তাতে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন'।[৪০]

সকল শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার মধ্যে তাকদীরকে অস্বীকারকারী ভ্রান্ত ফিরকা 'ক্বাদারিয়া' ও তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা তাদের ধারণা মতে বান্দার কাজ তার নিজ ইচ্ছাধীন। এখানে আল্লাহ্র ইচ্ছার কোন প্রতিফলন নেই। অথচ আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল কাজের শুরুতে আল্লাহ্র সাহায্য ও তাওফীক কামনার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত বান্দার কোন ইচ্ছাই পূরণ হ'তে পারে না। তিনিই কর্মের স্রষ্টা ও বান্দা কর্মের বাস্তবায়নকারী মাত্র। তাছাড়া শুধুমাত্র আমল কাউকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না, যদি না আল্লাহ্র রহমত থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يُدْخِلُ أحدًا منكم عملُه الجنةَ وَلاَ يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللهِ 'কারু আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না কিংবা জাহান্নাম থেকে রেহাই দেবে না, এমনকি আমাকেও নয়, আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত'।[৪১] তাই শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পাঠের মাধ্যমে মূলতঃ আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ কামনা করা হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)'। এতে ৪টি শব্দ ও ১৯টি বর্ণ রয়েছে। বাক্যের প্রথমে اِبْتَــدَأْتُ অর্থাৎ 'আমি শুরু করছি' ক্রিয়াটি উহ্য রয়েছে। 'বিসমিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্র নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে ও তাঁর নামের বরকতে। *বিসমিল্লাহ* বলার সময় উহ্য ক্রিয়াটির নিয়ত করতে হবে। নইলে ওটা কেবল পাঠ করাই সার হবে। যেমন *বিসমিল্লাহি আক্বরাউ* (আল্লাহ্র নামে আমি পড়া শুরু করছি)। *বিসমিল্লাহি আ-কুলু* (আল্লাহ্র নামে আমি খেতে শুরু করছি) ইত্যাদি। আরবী বা বাংলায় মুখে নিয়ত পড়া বিদ'আত। বরং হৃদয়ে আল্লাহ্র নামে উক্ত শুভ কাজের সংকল্প করতে হবে।

এখানে ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখার কারণ হ'তে পারে দু'টি : (১) শুরুতেই আল্লাহ নামের বরকত হাছিল করা (২) অন্য কারু সাহায্যে নয়, কেবল আল্লাহ্র সাহায্যে আমি কর্ম শুরু করছি, সেটা বুঝানো। এটি সূরা নমলের ৩০ আয়াত। কিন্তু এ আয়াতটিকে পবিত্র কুরআনের সূরা সমূহের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে প্রত্যেক সূরার শুরুতে রাখা হয়েছে। কেবল সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' রাখা হয়নি। এর রহস্য আল্লাহ ভাল জানেন। যদিও ড. আহমাদ দীদাত (১৯১৮-২০০৫ খৃঃ) ও অনেকে এর মাধ্যমে ১৯ সংখ্যার

৪০. মুসলিম হা/২২০২, মিশকাত হা/১৫৩৩; কুরতুবী ১/৯৮।
৪১. মুসলিম হা/২৮১৭, মিশকাত হা/২৩৭২।

মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে চেয়েছেন। কারণ সেটা থাকলে সূরা নমলের ৩০ আয়াতের বিসমিল্লাহ সহ কুরআনে **১১৫**টি বিসমিল্লাহ হবে। যা **১৯** দিয়ে গুণ করলে মিলত না।

যুগে যুগে বিজ্ঞান যত এগিয়ে যাবে, কুরআনের বিভিন্ন অলৌকিক বিষয় তেমনি মানুষের সামনে খুলে যাবে। তবে সাবধান থাকতে হবে যেন এর দ্বারা কোন ভ্রান্ত আক্বীদা জন্ম না নেয়। যেমন ইরানের বাহাঈরা ইতিমধ্যে ১৯ তত্ত্বে বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, বাহাঈ ইরানের একটি কাফির ধর্মীয় সম্প্রদায়। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভাব হওয়ায় এরা ১৯ সংখ্যাকে পবিত্র মনে করে। এই ধর্মের মতে ১৯ দিনে মাস হয়, ১৯ মাসে বছর হয়। রামাযানের ছিয়াম ১৯ দিন রাখতে হয় এবং সম্পদের যাকাত ১৯ শতাংশ দিতে হয়। তালাক ১৯ বার দেওয়া যায়। তাদের ধর্মগ্রন্থ আল-বায়ানের (البيان العربى) অনুচ্ছেদ সংখ্যা ১৯। তারা এটিকে কুরআনের রহিতকারী (ناسخ) মনে করে। কুরআনকে বাহাঈ ধর্মের সত্যতার পক্ষে ব্যবহার করার জন্য কিছু লোক কুরআনের সূরা, আয়াত, শব্দ, বর্ণ সবকিছুকে ১৯ দিয়ে মিলাতে গলদঘর্ম হয়েছেন। অথচ এই গণনা ইতিমধ্যেই বাতিল প্রমাণিত হয়েছে। জনৈক মিসরীয় ড. রাশাদ খলীফা (১৯৩৫-১৯৯৩ খৃঃ) একাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে অবশেষে নাস্তিক হয়েছেন ও নিহত হয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'জাহান্নামের প্রহরী হ'ল ১৯ জন ফেরেশতা' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩০)*। এই আয়াতকে তারা তাদের ১৯ তত্ত্বের পক্ষে ব্যবহার করেছেন। অথচ পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে,

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِيْمَانًا وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً–

'আমরা ফেরেশতাদের এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কাফেরদের পরীক্ষা করার জন্য। যাতে কিতাবীরা (রাসূলের সত্যতার ব্যাপারে) দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে (মুনাফিকরা) ও কাফেররা বলে যে, এর (এই সংখ্যা) দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন'? *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*। সেযুগে বোকা আবু জাহল এর ব্যাখ্যা বুঝতে না পেরে ফেৎনায় পড়ে তার লোকদের বলেছিল, 'হে কুরায়েশ যুবকেরা! তোমাদের ১০ জনে কি জাহান্নামের ১ জন ফেরেশতাকে কাবু করতে পারবে না? *(ইবনু কাছীর)*। এ যুগের কাফের বাহাঈ ও তাদের যুক্তিতে বিমোহিত ব্যাধিগ্রস্ত ঈমানদাররাও এ আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝতে না পেরে ফিৎনায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, বিশুদ্ধ আক্বীদা কেবল সেটাই, যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল। তাঁদের যুগে যেটি 'দ্বীন' বলে গৃহীত ছিল না, এযুগেও সেটা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না।

আরবের মুশরিকরা সকল কাজের শুরুতে তাদের দেব-দেবীর নাম নিত। যেমন 'বিসমিল্লা-তে ওয়াল ওযযা' (লাত ও ওযযার নামে)। তার প্রতিবাদে কুরআনের প্রথম আয়াত নাযিল হয় *'ইক্বরা বিসমে রব্বিকাল্লাযী খালাক্বা'* বলে। অর্থাৎ 'তুমি পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। পরবর্তীতে সকল শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার সুন্নাত জারি হয় এবং আল্লাহ্র হুকুমে কুরআনের প্রত্যেক সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয়। তবে কুরআন পাঠ করার সময় প্রথমে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়ে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ করতে হয় *(নাহল ১৬/৯৮)*। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হয়। ছালাতের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের শুরুতে আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ এবং পরের রাক'আতগুলিতে স্রেফ বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। اَلرَّحْمَنُ নামটি আরবদের নিকটে নতুন ছিল। اَلرَّحْمَنُ ও اَلرَّحِيْمُ দু'টি শব্দের একই অর্থ হ'লেও রহমান-এর মধ্যে দয়াগুণের আধিক্য ও ব্যাপ্তি সর্বাধিক।

বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ কি-না :

একদল বিদ্বান একে সূরা ফাতিহার অংশ বলেন এবং জেহরী ছালাতে বিসমিল্লাহ সরবে পড়েন। আরেকদল বিদ্বান একে সূরা ফাতিহার অংশ বলেন না এবং জেহরী ছালাতে এটি নীরবে পাঠ করেন। শেষোক্ত বিদ্বানগণের বক্তব্যই সঠিক। কেননা বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। ইতিপূর্বে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ মুসলিম-এর হাদীছটিতে সূরা ফাতিহাকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যে ভাগ করা হয়েছে,[৪২] সেখানে বিসমিল্লাহ্র কোন উল্লেখ নেই। বস্তুতঃ কুরআনের সকল আয়াতই মুতাওয়াতির। কোন আয়াতেই কোন মতভেদ নেই। ইবনুল 'আরাবী বলেন, *বিসমিল্লাহ* সূরা ফাতিহার অংশ না হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এতে মতভেদ রয়েছে। অথচ কুরআনে কোন মতভেদ নেই'। বরং এটি সূরা নমলের একটি আয়াত মাত্র, যা দুই সূরার মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে পঠিত হয়।[৪৩]

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তাঁরা সর্বদা *আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন* দিয়েই ক্বিরাআত শুরু করতেন। ক্বিরাআতের শুরুতে বা শেষে তাঁদেরকে কখনো সরবে *বিসমিল্লাহ* পড়তে শুনিনি'।[৪৪] তাছাড়া সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত গণনা

---

৪২. মুসলিম হা/৩৯৫; মিশকাত হা/৮২৩।
৪৩. কুরতুবী ১/১২৯-১৩০; আলোচনা দ্রষ্টব্য ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ৮৬-৮৭।
৪৪. মুসলিম হা/৩৯৯, আহমাদ হা/১৩৩৬১।

করলে দেখা যায় যে, প্রথম *আলহামদু ...* আল্লাহ্‌র জন্য, দ্বিতীয় *আররহমান ...* আল্লাহ্‌র জন্য, তৃতীয় *মা-লিকি ...* আল্লাহ্‌র জন্য। চতুর্থ অর্থাৎ মাঝেরটি দু'ভাগ। প্রথম ভাগে *ইইয়াকা না'বুদু ...* আল্লাহ্‌র জন্য এবং দ্বিতীয় ভাগে ... *নাস্তাঈন* বান্দার জন্য। পঞ্চম *ইহদিনাছ ...* বান্দার জন্য। ষষ্ঠ *ছিরাত্বাল ...* বান্দার জন্য এবং সপ্তম *গায়রিল মাগযূবে* ... বান্দার জন্য। এভাবে প্রতিটি আয়াতের পরিধিও সমান সমান। লম্বা-ছোট নয়। প্রথম তিনটি আয়াত আল্লাহ্‌র জন্য। শেষের তিনটি আয়াত বান্দার জন্য এবং মাঝের চতুর্থ আয়াতটি আল্লাহ ও বান্দার জন্য। অতএব এটাই সঠিক কথা যে, *বিসমিল্লাহ* সূরা ফাতিহার অংশ নয়, যেমন তা অন্যান্য সূরার অংশ নয়।

(১) اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلْ অর্থ 'যাবতীয়' حَمْدُ 'প্রশংসা' لله 'আল্লাহ্‌র জন্য' رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'জগতসমূহের প্রতিপালক'। রঈসুল মুফাস্‌সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) اَلْحَمْدُ-এর অর্থ করেছেন الشُّكْرُ لله 'সকল কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র জন্য'। ইবনু জারীর ত্বাবারীও অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত করেছেন। যদিও 'হাম্‌দ' অর্থ মৌখিক প্রশংসা এবং 'শুক্‌র' অর্থ কোন কিছুর বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যা হবে ভালোবাসাপূর্ণ। কেননা ভালোবাসাহীন মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন মূল্য নেই। اَلْحَمْدُ لله সবকিছুকেই শামিল করে। কেননা اَلْ এখানে استغراق বা সামগ্রিক অর্থে এসেছে। যা দ্বারা সকল প্রকারের প্রশংসা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাকে বুঝানো হয় এবং যা الثناء الكامل বা পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা অর্থ প্রকাশ করে। এজন্যেই দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশীর সময় বলতেন, اَلْحَمْدُ لله الَّذِى بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যার অনুগ্রহে সকল শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে'। আবার কষ্টের সময় বলতেন اَلْحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ 'সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা'।[৪৫]

আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে যে অগণিত নে'মত দান করেছেন, তার বিনিময়ে পূর্ণ কৃতজ্ঞতাসহ যাবতীয় প্রশংসা নিবেদন করাই এর উদ্দেশ্য। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لله 'শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল *'আলহামদুলিল্লাহ'*।[৪৬] রব ও রহমান-এর পূর্বে 'আল্লাহ' নাম আনার মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'আল্লাহ' নামটিই হ'ল মূল। বাকী সব নামই তার অনুগামী।

---

৪৫. ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩; ছহীহাহ হা/২৬৫।
৪৬. তিরমিযী হা/৩৩৮৩, মিশকাত হা/২৩০৬।

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'রব' অর্থ প্রতিপালক, প্রভু, মনিব ইত্যাদি। আল্লাহ্র সকল গুণের মধ্যে প্রতিপালকের গুণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা 'সৃষ্টিকর্তা' হিসাবে তাঁকে প্রায় সকল মানুষ স্বীকার করলেও 'পালনকর্তা' হিসাবে অনেকে স্বীকার করতে চায় না। তাই মুমিন হওয়ার আবশ্যিক শর্ত হ'ল আল্লাহকে 'রব' হিসাবে স্বীকার করা। শুধুমাত্র 'খালেক্ব' বা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করা নয়। শুধু رَبٌّ বা الرَّبُّ বললে কেবলমাত্র আল্লাহকে বুঝাবে। অন্যের জন্য এই বিশেষণ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। তবে অন্যকিছুর দিকে সম্বন্ধ করলে সিদ্ধ হবে। যেমন رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ 'এই গৃহের মালিক' رَبَّةُ الْبَيْتِ 'গৃহকত্রী' ইত্যাদি।

عَالَمِيْنَ– عَالَمٌ শব্দের বহুবচন। এর দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত সকল অস্তিত্বশীল বস্তুকে বুঝানো হয়। عَالَمٌ নিজেই বহুবচন। এর কোন একবচন নেই। عَالَمِيْنَ বহুবচনের বহুবচন। এর দ্বারা মানুষের জানা-অজানা সকল সৃষ্টি জগতকে বুঝানো হয়েছে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, আল্লাহ পাকের আঠারো হাযার মাখলূক্বাত রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, চল্লিশ হাযার *(ইবনু কাছীর)*। মূলতঃ এর অর্থ অগণিত। পৃথিবী তার মধ্যে একটি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ আসমান ও যমীন এবং এ দুইয়ের মধ্যকার ও মধ্যবর্তী আমাদের জানা ও অজানা অগণিত জগতের প্রভু ও প্রতিপালক' *(ইবনু কাছীর ১/২৫)*। আধুনিক মহাকাশ গবেষণা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আমাদের নিকটে নভোমণ্ডলের নতুন নতুন বিস্ময়ের দুয়ার খুলে যাচ্ছে ও সূরা ফাতিহার এই বাণী কার্যকর হচ্ছে। সাথে সাথে আল্লাহ পাকের রুবূবিয়াতের ব্যাপকতর ধারণা মুসলিম-অমুসলিম সকলের মধ্যে ক্রমেই দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হচ্ছে।

বিগত যুগেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ– 'ফেরাঊন বলল, জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কে? জবাবে মূসা বলল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর যিনি প্রতিপালক। যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও' *(শো'আরা ২৬/২৩-২৪)*। গর্বোদ্ধত ফেরাঊন একথা মানেনি। কিন্তু প্রকাশ্যে মেনে নিয়ে জীবন দিয়েছিল তার জাদুকরগণ *(শো'আরা ২৬/৪৭-৪৮)*। একইভাবে মেনেছে যুগে যুগে প্রায় সকল মানুষ। সূরা ফাতিহার অত্র আয়াতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর একক পালনকর্তা হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর একত্ববাদ বা তাওহীদে রুবূবিয়াত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর উপরে আল্লাহ্র রুবূবিয়াতের ব্যাপকতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। عَالَمٌ শব্দটি উদ্গত হয়েছে 'আলামত' (عَلَامَةٌ) থেকে।

যার অর্থ 'নিদর্শন'। বস্তুতঃ বিশ্বজগতের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিদর্শন পরিস্ফূট রয়েছে। কবি আব্দুল্লাহ ইবনুল মু'তায (২৪৭-২৯৬ হিঃ) তাই বলেন,

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلٰهُ + أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ + تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ

'আশ্চর্যের কথা! কিভাবে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা হয়? অথবা কিভাবে অস্বীকারকারী তাঁকে অস্বীকার করে'? 'অথচ প্রত্যেক বস্তুতেই রয়েছে তাঁর নিদর্শন। যা প্রমাণ করে যে, তিনি এক'।

(২) الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 'যিনি করুণাময় কৃপানিধান'।

'রহমান ও রহীম' এর আলোচনা 'বিসমিল্লাহ্'র ব্যাখ্যায় ইতিপূর্বে করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, পূর্বের আয়াতে 'রব্বুল আলামীন' বলে আল্লাহ যে 'তারহীব' বা ভীতিকর বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, পরবর্তী আয়াতে 'রহমান ও রহীম' বলে স্বীয় 'দয়া' গুণের প্রকাশ ঘটিয়ে উভয় গুণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন ও মুমিনকে আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরাশ না হওয়ার জন্য 'তারগীব' বা উৎসাহ দান করেছেন। যেমন তারগীব ও তারহীব তিনি একই স্থানে ব্যক্ত করেছেন সূরা হিজ্র ৪৫-৫৯ আয়াতে ও সূরা মুমিন ৩ আয়াতে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ 'যদি মুমিন ব্যক্তি জানতো আল্লাহ্র নিকটে কত কঠোরতম শাস্তি রয়েছে, তাহ'লে কেউই জান্নাতের আকাংখী হ'ত না। অনুরূপভাবে যদি কোন কাফির জানতো আল্লাহ্র নিকটে কি অপার অনুগ্রহ রয়েছে, তাহ'লে কেউই জান্নাত হ'তে নিরাশ হ'ত না'।[৪৭] তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর নিকটে রক্ষিত রহমতের একশ ভাগের এক ভাগ দুনিয়াতে নাযিল করেছেন। যা তিনি জিন, ইনসান, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গ সবকিছুর মধ্যে বণ্টন করেছেন। যা থেকেই তারা পরস্পরকে ভালবাসে ও পরস্পরের প্রতি দয়া করে। আর সেখান থেকেই জীবজন্তু তাদের বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে। বাকী নিরানব্বই ভাগ রহমত আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, যা তিনি ক্বিয়ামতের দিন বিতরণ করবেন'।[৪৮] সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এই রহমত বিতরণের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন তাঁর রহমত পরিপূর্ণতা লাভ করবে'।[৪৯] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরেক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন

৪৭. তাফসীর কুরতুবী ১/১৩৯; বুখারী হা/৬৪৬৯; মুসলিম হা/২৭৫৫, মিশকাত হা/২৩৬৭।
৪৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৬৫ 'দো'আসমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ-৫।
৪৯. মুসলিম হা/৪৯৪৬, মিশকাত হা/২৩৬৬।

আল্লাহ সৃষ্টিকর্ম শেষ করেন, তখন আরশের উপর রক্ষিত কিতাবে তিনি লিখে দেন, إِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى 'নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করে'।[৫০] অত্র সূরায় নিজেকে 'রব্বুল আলামীন' বলার পরে 'রহমান ও রহীম' বলার মধ্যে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর এই রুবূবিয়াত বান্দার উপর প্রতিশোধের জন্য নয়, বরং রহমতের জন্য।

(৩) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 'যিনি বিচার দিবসের মালিক'।

অত্র আয়াতে مَالِكِ ও সূরা নাসে مَلِكِ বলা হয়েছে। مَالِكِ শব্দটির অর্থ অধিকতর ব্যাপক। مَلِكِ النَّاسِ বলে কেবল 'মানুষের অধিপতি' বলা হয়েছে। কিন্তু مَالِكِ বলে এখানে সৃষ্টিকুলের অধিপতি বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের আদি হ'তে অন্ত পর্যন্ত সকল কিছুর চিরন্তন মালিকানা তাঁর হাতে। শাসক যেমন অধীনস্তদের নিয়োগ দান করেন ও তাদেরকে শাসকের নিকটে দায়বদ্ধ থাকতে হয়, অমনিভাবে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে বান্দাকে তিনি বিশ্বপরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। বান্দার কর্মজীবনের ছোট-বড় সবকিছুই আল্লাহ্র গোচরে রয়েছে এবং ক্বিয়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত হিসাব তিনি গ্রহণ করবেন ও সে অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের পুরস্কার দান করবেন। তিনি ইচ্ছা করলে কোন বান্দাকে বিনা হিসাবেও জান্নাত দিতে পারেন। ফলতঃ বিচার দিবসের পূর্ণ মালিকানা ও একচ্ছত্র অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই হাতে। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারবে না। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

الدِّيْنِ-এর অনেকগুলি অর্থ রয়েছে। যেমন প্রতিদান, হিসাব, ফায়ছালা, আনুগত্য, রীতি, আচরণ ইত্যাদি। এখানে يَوْمِ الدِّيْنِ-এর অর্থ يَوْمُ الْجَزَاءِ অর্থাৎ প্রতিদান বা হিসাব-এর দিন। যেমন বলা হয়ে থাকে, كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ 'যেমন কর্ম তেমন ফল'।

মানুষের দুনিয়াবী জীবনের যাবতীয় আমলের হিসাব ও তার প্রতিদান ও প্রতিফল ঐদিন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে প্রদান করবেন। ২য় আয়াতে নিজেকে 'করুণাময় ও কৃপানিধান' ঘোষণা করার পরেই নিজেকে বিচার দিবস-এর মালিক ঘোষণা করে আল্লাহপাক এটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পাপীকে ক্ষমা করার মধ্যে কোন করুণা নেই। বরং প্রকৃত করুণা নিহিত রয়েছে ন্যায়বিচারের মধ্যে। অতএব সকলে যেন চূড়ান্ত হিসাব দানের পূর্বে নিজ নিজ কর্মকে সুন্দর করে নেয়। কেননা সামান্যতম নেকী ও বদীর হিসাব ঐদিন নেওয়া

৫০. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২৩৬৪।

হবে এবং সকলকে যথাযথভাবে প্রতিদান দেওয়া হবে। সেদিকে ইংগিত করে আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ 'যেদিন আল্লাহ তাদেরকে যথার্থ প্রতিদান পরিপূর্ণরূপে দান করবেন' (*নূর ২৪/২৫*)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ 'সেই দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে, যেদিন তোমাদের কোন গোপন বিষয় গোপন থাকবে না' (*আল-হাক্কাহ ৬৯/১৮*)। তিনি বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ 'তোমরা সেইদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তিত হবে আল্লাহ্র নিকটে। অতঃপর প্রত্যেকে পুরোপুরি বদলা পাবে যা তারা অর্জন করেছিল এবং তারা অত্যাচারিত হবে না' (*বাক্বারাহ ২/২৮১*)। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৭ অথবা ২১ দিন পূর্বে নাযিল হওয়া এটাই কুরআনের সর্বশেষ আয়াত।

(৪) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'।

এখানে ক্রিয়া-র পূর্বে 'কর্ম' (**مفعول به**) আনা হয়েছে বিষয়টিকে নির্দিষ্টকরণের জন্য (لإفادة الحصر)। আর **إِيَّاكَ** (**ضمير منصوب منفصل**) অর্থ 'তোমাকেই'। অর্থাৎ আমরা কেবল তোমাকেই ইবাদতের জন্য ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য খাছ করছি। তুমি ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত করি না এবং অন্য কারো নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি না। আভিধানিক অর্থে الْعِبَادَةُ فِى اللُّغَةِ غَايَةُ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوْعِ 'চরম আনুগত্য ও প্রণতি'কে ইবাদত বা উপাসনা বলা হয়। শারঈ পরিভাষায় وَفِى الشَّرْعِ الْعِبَادَةُ تَتَضَمَّنُ كَمَالَ الذُّلِّ بِكَمَالِ الْحُبِّ وَالْخَوْفِ للهِ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيْهِ 'আল্লাহ্র আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা, ভীতি ও আনুগত্য পোষণ করা'কে ইবাদত বলা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতের অর্থ إِيَّاكَ نُوَحِّدُ 'আমরা কেবল তোমারই একত্ব ঘোষণা করি' তোমাকেই মাত্র ভয় করি এবং তোমার আনুগত্য করার জন্যই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।

'তোমার ইবাদত করি' একথাটুকু বুঝানোর জন্য نَعْبُدُكَ বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু كَ কর্মপদের সর্বনামকে নিয়মমাফিক نَعْبُدُ ক্রিয়ার পরে না বসিয়ে পূর্বে বসানোর মূল কারণ হ'ল বক্তব্যের মধ্যে Emphasis বা জোর সৃষ্টি করা। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আগে বলাই আরবদের বাকরীতি। কেননা 'তোমার ইবাদত করি' বললে অন্যকেও ইবাদত

করার সম্ভাবনা বাকী থাকে। কিন্তু 'তোমারই ইবাদত করি' বললে সে সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। إِيَّاكَ সর্বনাম একই বাক্যে দু'বার অগ্রে বসানোর পিছনেও উদ্দেশ্য হ'ল একথা জোর দিয়ে বলা যে, আমাদের যাবতীয় ইবাদত ও ইস্তি'আনাত বা উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনাকে আমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য খাছ করছি। অন্য কারু জন্য আমাদের হৃদয়ে কোন স্থান নেই (تجريد العبادة لله وحده)।

বিগত যুগের জনৈক বিদ্বান (بعض السلف) বলেন, সমগ্র কুরআনের মূল (سر القرآن) নিহিত রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে এবং সূরা ফাতিহার মূল নিহিত রয়েছে এই আয়াতটির মধ্যে। এর প্রথম অংশে শিরক হ'তে মুক্তি ঘোষণা করা হয়েছে ও দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে কেবল তাঁর উপরেই ভরসা করা হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। এতদ্ব্যতীত **১ম** তিনটি আয়াতে **صيغه غائب** বা নাম পুরুষ ব্যবহার করে অত্র আয়াতে **صيغه حاضر** বা মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করে সরাসরি আল্লাহকে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর অধিকতর নিকটে পৌঁছে যাওয়ার ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। প্রেমাস্পদের নিকটে ভক্ত প্রেমিক তার ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল বাসনা সরাসরি নিবেদন করবে এটাই তো কাম্য। অত্র আয়াতের এই আলংকরিক দ্যোতনা মুমিন হৃদয়ে ভালবাসার ঢেউ তোলে। হাদীছে এসেছে, আল্লাহ বলেন যে, هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ 'এই আয়াতের অর্ধেক আমার জন্য ও অর্ধেক বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে।[৫১] আল্লাহ বলেন, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ 'অতএব তুমি তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর উপরেই নির্ভর কর। (মনে রেখো) তোমরা যা কিছু কর, তোমার প্রতিপালক তা থেকে অনবহিত নন' *(হূদ ১১/১২৩)*। এর মধ্যে একটি বিষয়ে আশার সঞ্চার হয় যে, ইবাদত ও তাওয়াক্কুল নিখাদ হ'লে আল্লাহ্র সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ হ'লে এবং তাওয়াক্কুলের মধ্যে খুলূছিয়াতের অভাব থাকলে বান্দার কামনা ও বাসনা পূরণ নাও হ'তে পারে। সাহায্য চাওয়ার পূর্বে ইবাদতের বিষয় উল্লেখ করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই।

বৈধ ও অবৈধ ইস্তি'আনত :

'ইস্তি'আনাত' বা সাহায্য চাওয়া ঐ সকল বিষয়ে যা মাখলূকের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এটা কোন দোষের কথা নয়। বরং প্রত্যেক নেকীর কাজে সাহায্য করার জন্য শরী'আতে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' (*মায়েদাহ ৫/২*)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ

---

৫১. মুসলিম হা/৩৯৫; মিশকাত হা/৮২৩।

করেন, وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ 'আল্লাহ তার বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[৫২] এগুলি হ'ল বৈধ ইস্তি'আনাত।

পক্ষান্তরে নিষিদ্ধ ইস্তি'আনাত হ'ল, যে সকল বিষয়ে মাখলূকের কোন ক্ষমতা নেই, সেই সকল বিষয়ে মাখলূকের নিকটে সাহায্য চাওয়া। এটি অবৈধ এবং প্রকাশ্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মৃত মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া, তার অসীলায় মুক্তি কামনা করা, তার আশ্রয় ভিক্ষা করা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না মৃতদের' *(নামল ২৭/৮০; রূম ৩০/৫২)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ 'তুমি কোন কবরবাসীকে শুনাতে পারো না' (*ফাত্বির ৩৫/২২*)। অমনিভাবে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, গাছ, পাথর, সাগর বা অনুরূপ সৃষ্টবস্তু যাদের কোন ক্ষমতা নেই। তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ 'তোমরা সূর্যকে সিজদা করোনা এবং চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৭)*। তিনি আরও বলেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ 'যদি আল্লাহ তোমার কোন অনিষ্ট করতে চান, তবে তিনি ব্যতীত কেউ নেই যে, তা দূর করে দেয়'... (*আন'আম ৬/১৭*)।

নবী, অলি প্রভৃতি নেককার মৃত মানুষের নিকটে সাহায্য কামনা করা ও তাদের অসীলায় মুক্তি চাওয়াই হ'ল পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচীন ও আদিম শিরক। তারা বলতো هَـؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ 'ওরা আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে সুফারিশকারী মাত্র' (*ইউনুস ১০/১৮*)।* হযরত নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল এই শিরকের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। আল্লাহ্র সত্যিকারের নেক বান্দারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবেন। অবশ্য সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, প্রভু

---

৫২. মুসলিম হা/২৬৯৯, মিশকাত হা/২০৪ 'ইল্ম' অধ্যায়।

* মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত ও সংক্ষেপায়িত এবং সঊদী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও বিনামূল্যে প্রচারিত করাচীর মুফতী মুহাম্মাদ শফীকৃত তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে 'কোন নবী বা কোন অলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা আয়াতের মর্ম বিরোধী নয়' বলা হয়েছে (ঐ, পৃঃ ৫)। একথা কেবলমাত্র জীবিত নবী বা নেককার বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'তে পারে, মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে হযরত ওমর (রাঃ) বৃষ্টি প্রার্থনার সময় বলেছিলেন, হে আল্লাহ আমরা ইতিপূর্বে আপনার নবীর দোহাই দিয়ে বৃষ্টি চাইতাম ও আপনি পানি দিতেন। এখন নবীর (জীবিত) চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর দোহাই দিয়ে বৃষ্টি চাইছি। অতএব আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন! ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়' *(বুখারী হা/১০১০, মিশকাত হা/১৫০৯)*।

ও প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ্র নিকটে বান্দা যে কোন সময়ে যে কোন সাহায্য চাইতে পারে। আল্লাহ বলেন, اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন/গাফের ৪০/৬০)*। আল্লাহ তাঁর কোন মাখলূককে দিয়ে এই সাহায্য করে থাকেন। কেননা সকল বনু আদমের অন্তঃকরণ আল্লাহ পাকের দুই আংগুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি ইচ্ছামত তা পরিচালিত করেন।[৫৩] অতএব সকল বিষয়ে আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য চাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অত্র আয়াতে দু'টি বিষয় একত্রে বলা হয়েছে। এক- আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মানার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ইবাদতকে খালেছ (إخلاص العبادة لله وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه) করা। দুই- সকল প্রকার অংশীবাদ থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য চাওয়াকে খালেছ (إخلاص الاستعانة بالله وحده باجتناب جميع الاشراك) করা।

আবু হাফছ আল-ফারগানী বলেন, যে ব্যক্তি অত্র আয়াতটি স্বীকার করে নিল, সে ব্যক্তি (فقد بَرِئَ من الْجَبْر وَالْقَدَر) জাবরিয়া (অদৃষ্টবাদী) ও ক্বাদারিয়া (তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী) আক্বীদা থেকে মুক্তি পেল' *(কুরতুবী)*।

(৫) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর'।

هَدَى يَهْدِى هَدْيًا هُدًى هِدَايَةً অর্থ রাস্তা দেখানো। এটি ভাল ও মন্দ দু'অর্থেই আসতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আর আমরা কি তাকে (ভাল ও মন্দ) দু'টি পথই দেখাই নি? *(বালাদ ৯০/১০)*। এখানে 'হেদায়াত' অর্থ সুপথ প্রদর্শন ও তার তাওফীক কামনা (الإرشاد والتوفيق)। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন করে থাক' *(শূরা ৪২/৫২)*। অনুরূপভাবে জান্নাতবাসীরা আল্লাহকে বলবে, الْحَمْدُ لله الَّذِيْ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে এর পথ প্রদর্শন করেছেন। আর আল্লাহ আমাদের হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হ'তাম না'... *(আ'রাফ ৭/৪৩)*।

অত্র আয়াতে لِلصِّرَاطَ বা اِهْدِنَا اِلَى الصِّرَاطَ না বলে 'হরফে জার' বিলুপ্ত করে সরাসরি اِهْدِنَا الصِّرَاطَ বলার মধ্যে কুরআনের উন্নত ভাষালংকার ফুটে উঠেছে। আর তা এই যে, এখানে হেদায়াত প্রার্থনাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

---

৫৩. মুসলিম হা/২৬৫৪, মিশকাত হা/৮৯।

হেদায়াতের প্রকারভেদ :

হেদায়াত দু'প্রকারের। একটি হ'ল ইলমের হেদায়াত। যেমন আল্লাহ কুরআনকে هُدًى لِلْمُتَّقِينَ 'মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত' *(বাক্বারাহ ২)* এবং هُدًى لِلنَّاسِ 'মানবজাতির জন্য হেদায়াত' *(বাক্বারাহ ১৮৫)* বলেছেন। সে বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ্র হেদায়াত প্রয়োজন। অন্যটি হ'ল ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক লাভের হেদায়াত। কারণ ইসলামই যে সরল পথ, তার জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা, দু'টির জন্যই আল্লাহ্র হেদায়াত প্রয়োজন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ 'অতঃপর ছামূদ জাতি। তাদেরকে আমরা পথ প্রদর্শন করেছিলাম। কিন্তু তারা সৎপথের বিপরীতে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ লাঞ্ছনাকর শাস্তি তাদের গ্রেফতার করে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৭)*। এমনিভাবে যুগে যুগে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসী লোকেরা করেছে ও করে চলেছে। আমরা যেন তা না করি, সেজন্য আল্লাহ্র নিকটে হেদায়াত প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে অত্র আয়াতে।

এখানে صِرَاط ও سِرَاط দু'টি ক্বিরাআত রয়েছে। দু'টিরই অর্থ 'প্রশস্ত রাস্তা'। তবে صِرَاط শব্দটিই চালু। অতএব সেটাই পড়া উত্তম। নইলে ফিৎনা সৃষ্টি হবে। مُسْتَقِيْمَ 'সরল' ও 'সুদৃঢ়' যাতে কোন আঁকা-বাঁকা নেই এবং যা ভঙ্গুর নয়।

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ অর্থ الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم 'ঐ শরী'আত যা নিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আগমন করেছেন'। আর তা হ'ল ইসলাম। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। তিনি বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না। আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন নিহিত তাঁর কসম করে বলছি, ইহুদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ

আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামী হবে'।[৫৪]

অতএব আয়াতের অর্থ হ'ল, 'তুমি আমাদেরকে ইসলামের সরল পথ প্রদর্শন কর'। ঐ পথ যা সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় এবং যা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে দেয়। যা আমাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, আমাদেরকে হক-এর পথ দেখায় ও হক অনুযায়ী আমল করতে শিখায়'। এই দো'আই হ'ল বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দো'আ। আর সম্ভবতঃ একারণেই ছালাতের প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকটে এই দো'আ করা বান্দার জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে' *(তাফসীরে সা'দী ১/৩৬ পৃঃ)*। আর ছিরাতে মুস্তাক্বীম সর্বদা সরল, সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়। যুগ বা সমাজ তাকে পরিবর্তন করে না। বরং সেই-ই সবকিছুকে পরিবর্তন করে দেয় ও মানুষকে তার পথে পরিচালিত করে।

হেদায়াত-এর স্তরসমূহ :

এখানে هداية কথাটি নবী, অলী ও সাধারণ উম্মত এমনকি সকল মাখলূকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা প্রত্যেকের জন্য স্তরবিশেষে হেদায়াতের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন (১) হেদায়াতের **১ম** স্তরে রয়েছে সমস্ত মাখলূক তথা জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব রয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ্‌র হেদায়াত অনুযায়ী স্ব স্ব নিয়মে আল্লাহ্‌র গুণগান করে থাকে। যেমন এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা কি জানো না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুই আল্লাহ্‌র গুণগান করে থাকে? বিশেষ করে পক্ষীকুল যারা সারিবদ্ধভাবে উড়ে বেড়ায়। প্রত্যেকই স্ব স্ব দো'আ ও তাসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(নূর ২৪/৪১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, الَّذِيْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 'যিনি প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর তার উপযোগী হেদায়াত প্রদান করেছেন' *(ত্বোয়াহা ২০/৫০)*। এজন্যেই পশু-পক্ষী প্রত্যেকে আল্লাহ প্রদত্ত বোধশক্তি অনুযায়ী চলাফেরা করে। আদৌ অবাধ্যতা করে না। পবিত্র কুরআনের এই বৈজ্ঞানিক আয়াত থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই ইবনুল মাসকাভী (৯৩২-১০৩০ খৃঃ) প্রমুখ মুসলিম বিজ্ঞানী বৃক্ষের জীবন ও অনুভূতি প্রমাণ করেন। এর বহু পরে ঢাকার খ্যাতিমান বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ খৃঃ) 'ক্রেসকোগ্রাফ' যন্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে তাতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখেন। বহুকাল পূর্বে হযরত সুলায়মান (আঃ) পক্ষীকুল এমনকি পিঁপড়ার ভাষা বুঝতেন *(নমল ২৭/১৮)*। আধুনিক বিজ্ঞান এখনো ততদূর এগোতে পারেনি।

(২) হেদায়াতের ২য় স্তরে রয়েছে জিন ও ইনসান জাতি, যারা অন্যান্য সৃষ্টির চাইতে তীক্ষ্ণধী ও উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন। আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নবীগণের মাধ্যমে এদের নিকটে

---

৫৪. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।

হেদায়াত পাঠানো হয়েছে। কেউ তা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। কেউ প্রত্যাখ্যান করে হতভাগা হয়েছে।

(৩) হেদায়াতের ৩য় স্তর হ'ল মুমিন-মুত্তাক্বীদের জন্য, যাতে তারা অধিকতর নেক বান্দা হওয়ার তাওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্‌র দেওয়া তাওফীক অনুযায়ী এই স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহপাক বলেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 'এই রাসূলগণ! আমরা তাদের একে অপরের উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারু সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারু মর্যাদা উচ্চতর করেছেন' (*বাক্বারাহ* ২/২৫৩)। এই তৃতীয় স্তরই মানুষের প্রকৃত উন্নতির ক্ষেত্র। এই স্তরের মানুষেরা অধিকতর হেদায়াত লাভের জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র রহমত ও তাওফীক লাভে সচেষ্ট থাকেন। প্রতিনিয়ত এই প্রচেষ্টাই মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। এমনকি এক সময় সে ফেরেশতাদের চাইতে উন্নত মর্যাদায় আসীন হয়। নবী-রাসূলগণ এই স্তরে আছেন। যেকারণে মে'রাজ রজনীতে জিব্রীলকে ছেড়ে রাসূল (ছাঃ) শেষ মুহূর্তে একাকী আল্লাহ্‌র দীদার লাভে সক্ষম হন। والله ولى التوفيق।[৫৫]

অতএব মানুষ যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র হেদায়াত সমূহ অনুসরণে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সরলপথ ধরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাবে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পানে জান্নাত লাভের বাসনা নিয়ে, এটাই হ'ল অত্র আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য।

হেদায়াত লাভের এই দো'আর মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উঁচু-নীচু সকল পর্যায়ের মানুষেরই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র হেদায়াত প্রয়োজন রয়েছে। 'নবী-অলীগণ হেদায়াত প্রাপ্ত। অতএব তাঁদের আর ইবাদত প্রয়োজন নেই' এই ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে। বরং একথাই সত্য যে, উপরে বর্ণিত সকল স্তরের ও সকল পর্যায়ের লোকের জন্য ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর হেদায়াত সকল সময় যরূরী। সর্বদা সেই হেদায়াত প্রার্থনার জন্য আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে অত্র আয়াতে শিক্ষা দিচ্ছেন।

এক্ষণে হেদায়াত লাভের পথ কি- সে বিষয়ে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا 'যারা আমার রাস্তায় সংগ্রাম করে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমার রাস্তাসমূহ দেখিয়ে থাকি' (*আনকাবূত* ২৯/৬৯)।

'জিহাদ' অর্থ 'সংগ্রাম' ও 'সর্বাত্মক প্রচেষ্টা'। যার চূড়ান্ত পর্যায় হ'ল ইসলাম ও কুফরের মধ্যেকার সশস্ত্র যুদ্ধ। অতএব যারা কথা, কলম ও সংগঠন-এর মাধ্যমে সর্বদা আল্লাহ্‌র

৫৫. হেদায়াত-এর ব্যাখ্যা আরও দেখুন সূরা আ'লা ২-৩ আয়াতের তাফসীরে।

রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শাহাদাত লাভের আকাংখা নিয়ে সর্বদা সমাজ সংস্কারে লিপ্ত থাকবে, আল্লাহপাক ঐ সকল মুজাহিদ বান্দাকে তাঁর হেদায়াতের রাস্তাসমূহ খুলে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

এখানে নবী-রাসূল ও আলেমগণের মাধ্যমে হেদায়াত লাভের বিষয়টি ছাড়াও আরেকটি বিষয় কুরআন ও হাদীছে এসেছে, সেটি হ'ল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত 'তিরস্কারকারী আত্মা' (اَلنَّفْسُ اللَّوَّامَةُ ; *ক্বিয়ামাহ ৭৫/২)* রয়েছে, যাকে হাদীছে وَاعِظُ اللهِ فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে অবস্থিত আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত উপদেশদানকারী' বলা হয়েছে। হাদীছের ভাষায় যা সর্বদা বিপথগামী মুমিনকে আল্লাহ্র পথে ডাকে ও অন্যায় পথে যেতে নিষেধ করে।[৫৬] বান্দাকে অন্যায় পথ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে নেওয়ার জন্য এটাও আল্লাহ প্রদত্ত একটি চিরন্তন হেদায়াত, যার ফলে মানবতা এখনো টিকে আছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের পালনকর্তা তাদের পথ প্রদর্শন করেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে' *(ইউনুস ১০/৯)*।

(৬) صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 'ঐ সকল ব্যক্তিদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ'।

صِرَاطَ (পথ), এখানে পূর্ববর্তী صِرَاطَ হ'তে بدل হয়েছে।

কাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন, এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ 'তারা হলেন নবীগণ, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল বান্দাগণ' (*নিসা ৪/৬৯*)।

(৭) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ 'তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে'। এখানে غير এবং لا একই অর্থে এসেছে।

অত্র আয়াতে বর্ণিত 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) এবং 'যা-ল্লীন' (পথভ্রষ্টগণ) কারা, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, هُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى 'তারা হ'ল ইয়াহূদ ও নাছারাগণ'।[৫৭] ইবনু আবী হাতেম বলেন যে, এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমি জানি না'।[৫৮] ইহুদীরা তাদের নবীদেরকে হত্যা করে এবং শেষনবী মুহাম্মাদ

৫৬. আহমাদ হা/১৭৬৭১, মিশকাত হা/১৯১ 'ঈমান' অধ্যায়; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৮৭।
৫৭. তিরমিযী হা/২৯৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৮২০২।
৫৮. কুরতুবী, ইবনু কাছীর।

(ছাঃ)-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অভিশপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে নাছারারা তাদের নবী ঈসা (আঃ)-কে অতিরঞ্জিত করে আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে এবং শেষনবী (ছাঃ)-কে চিনতে পেরেও না চেনার ভান করে ও তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

অতএব 'মাগযূব' হ'ল ইহুদীরা এবং যুগে যুগে ঐসব লোকেরা, যারা ইহুদীদের মত হক জেনেও তার উপর আমল করে না। 'যাল্লীন' হ'ল নাছারাগণ এবং যুগে যুগে ঐসব লোক, যারা নাছারাদের মত মূর্খতাবশে হক বিরোধী আমল করে। মানুষ হক প্রত্যাখ্যান করে মূলতঃ হঠকারিতা ও অজ্ঞতার কারণে। দু'টির মধ্যে কঠিনতর হ'ল হঠকারিতার দোষ। যে কারণে ইহুদীরা স্থায়ীভাবে অভিশপ্ত হয়েছে। অত্র আয়াতে সেজন্য তাদেরকে আগে আনা হয়েছে ও পরে নাছারাদের কথা এসেছে।

এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ইহুদী-নাছারাদের স্বভাব যেন মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ না করে এবং তারা যেন ঐ দুই জাতির হীন তৎপরতা ও তাদের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকে। কেননা তারা ইসলামের স্থায়ী শত্রু। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাছারাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না (*মায়েদাহ ৫/৫১*)। তবে দুনিয়াবী ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য কাফির-মুশরিকদের সাথে বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখার অনুমতি রয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে, لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً 'মুমিন ছাড়া কোন কাফিরকে মুমিনগণ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি কেউ এটা করে, তবে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি কি-না তোমরা তাদের থেকে কোনরূপ অনিষ্টের আশংকা কর (তবে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজ সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন। (মনে রেখ) সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' (*আলে ইমরান ৩/২৮*)। একারণে ইসলাম ও ইসলামী খেলাফতের মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্নকারী বিষয়সমূহ বাদে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী-বাকুরী ইত্যাদি বিষয়ে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই।

৫ম আয়াতে বর্ণিত ছিরাতে মুস্তাক্বীমের ব্যাখ্যা এসেছে ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতে। এখানে মোট তিন প্রকার মানুষের কথা বলা হয়েছে। এক- যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)। এখানে পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। দুই- যারা অভিশপ্ত হয়েছে (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)। এদের মধ্যে সেরা হ'ল ইহুদী জাতি। যারা যিদ ও অহংকার বশে অভিশপ্ত হয়েছে। তিন- যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে

(الضَّالِّيْنَ)। যারা মূর্খতা ও যিদ বশতঃ পথভ্রষ্ট হয়েছে। যাদের শীর্ষে রয়েছে নাছারাগণ। ফলে ইহুদী ও নাছারা উভয় জাতিই এক স্তরে চলে গেছে।

উক্ত তিন জাতির মধ্যে সর্বযুগে মুক্তিপ্রাপ্ত দল হ'ল তারাই, যারা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারী হয়েছে। আখেরী যামানায় তারা হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী দল।[৫৯] মুসলিম উম্মাহ ইহুদী-নাছারাদের মত পথভ্রষ্ট হবে এবং তারা ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। যার মধ্যেকার একটি দল মাত্র জান্নাতী হবে। যারা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের তরীকার উপর দৃঢ় থাকবে'।[৬০] তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে।[৬১] তাদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচিতি হবে 'আহলুল হাদীছ' হিসাবে।[৬২] আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'আর এটাই হ'ল আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর। এ পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা ঐসব পথ থেকে বেঁচে থাকতে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে ক্বাদারিয়া, মু'তাযিলা, ইমামিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত ফের্কার প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ নিজেই তার ভাল-মন্দ সকল কর্মের স্রষ্টা। অতএব সরল পথের জন্য আল্লাহ্র নিকটে হেদায়াত প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ এখানে যেমন সরল পথের হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে, তেমনি অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে না যাওয়ার জন্যও আল্লাহ্র হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। এজন্য আমরা প্রার্থনা করব, رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 'হে আমাদের প্রতিপালক! হেদায়াত দানের পর আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র করে দিয়ো না। আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা' *(আলে ইমরান ৩/৮)*।

آمين অর্থ اَللَّهُمَّ اسْتَجِبْ 'হে আল্লাহ তুমি কবুল কর'। এটি إسم فعل অর্থাৎ বাহ্যতঃ ইস্ম (বিশেষ্য) আকারে হলেও তা ফে'ল অর্থাৎ ক্রিয়াপদের অর্থ দেয়। آمِين আলিফ-

৫৯. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬।
৬০. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭১।
৬১. মুসলিম হা/১৯২০।
৬২. তিরমিযী হা/২১৯২; ছহীহুল জামে' হা/৭০২; ছহীহাহ হা/২৭০; মিশকাত হা/৬২৮৩।

এর উপরে 'মাদ্দ' يَاسِيْن-এর ওযনে অথবা 'যবর' يَمِيْن -এর ওযনে দু'ভাবেই পড়া জায়েয আছে।[৬৩]

সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলা সুন্নাত। যৎসামান্য বিরতি দিয়ে এটা বলবে। যাতে সূরার সাথে মিলে না যায়। জেহরী ছালাতে সরবে ও সের্রী ছালাতে নীরবে 'আমীন' বলবে। ইমামের পিছনে জেহরী ছালাতে মুক্তাদী সরবে 'আমীন' বলবে, না নীরবে বলবে এ বিষয়ে কিছু বিদ্বান মতভেদ করেছেন। তবে ছহীহ মরফূ হাদীছকে অগ্রাধিকার দিলে জেহরী ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সকলকে নিঃসন্দেহে 'আমীন' সরবে বলতে হবে।[৬৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন ইমাম 'ওয়ালায্ যা-ল্লীন' পাঠ শেষ করে কিংবা 'আমীন' বলে, তখন তোমরা সকলে 'আমীন' বল। কেননা যার 'আমীন' আসমানে ফেরেশতাদের 'আমীন'-এর সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে'।[৬৫]

অতএব হাদীছে বর্ণিত জেহরী ছালাতে সশব্দে 'আমীন' বলার বিশুদ্ধ সুন্নাতের উপরে আমল করাই নিরপেক্ষ মুমিনের কর্তব্য। তাছাড়া ইমামের সশব্দে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম'-এর হেদায়াত প্রার্থনার সাথে মুক্তাদীগণের নীরবে সমর্থন দান কিছুটা বিসদৃশ বৈ-কি!

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَإِنَّهُمْ لاَ يَحْسُدُوْنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُوْنَا عَلَى السَّلاَمِ وَعَلَى آمِيْنَ. 'ইহুদীরা হিংসুক জাতি। তারা আমাদেরকে বেশী হিংসা করে আমাদের পারস্পরিক 'সালাম' বিনিময়ের কারণে এবং (সূরা ফাতিহা শেষে) 'আমীন' বলার কারণে'।[৬৬] কারণ ইহুদী ও নাছারাদের পথে না গিয়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর হেদায়াত চেয়ে সূরা ফাতিহার শেষে যে দো'আ করা হয় এবং ইমাম ও মুক্তাদী সকলে সমস্বরে 'আমীন' বলে আল্লাহ্র নিকটে যে সমবেত প্রার্থনা করা হয়, এটা তারা বরদাশ্ত করতে পারে না।

উপসংহার :

সূরা ফাতিহা হ'ল পবিত্র 'কুরআনের সারনির্যাস'। এর মধ্যে সমগ্র কুরআনের মূল বিষয়বস্তু সমূহ নিহিত রয়েছে। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহতের ত্রিবিধ সমাহার আছে এ সূরাতে। তাওহীদে রুবূবিয়াত যেমন ফুটে উঠেছে ১ম আয়াতের মধ্যে, তাওহীদে আসমা ও ছিফাত তেমনি ফুঠে উঠেছে ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে। যারা নিরেট একত্ব প্রমাণ

---

৬৩. তাফসীর কুরতুবী ১/১৭১; ইবনু কাছীর ১/৯৭।

৬৪. দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সংশ্লিষ্ট অধ্যায়; নায়লুল আওত্বার ৩/৭১-৭৫।

৬৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; মুওয়াত্ত্বা (মুলতান, পাকিস্তান ১৪০৭/১৯৮৬) হা/৪৬ 'ছালাত' অধ্যায়, পৃঃ ৫২।

৬৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৫৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬।

করতে গিয়ে আল্লাহকে গুণহীন সত্তা মনে করেন, তাদের সেই ভুল ধারণার প্রতিবাদ রয়েছে এই আয়াতগুলিতে। ৪র্থ আয়াতে তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াতের বিষয়ে যেমন সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে, তেমনি ‘আব্দ ও মা‘বূদ-এর পার্থক্য এবং ‘আব্দ-এর করণীয় সম্পর্কেও বলা হয়েছে। অর্থাৎ ‘আব্দ কেবল ইবাদত করবে ও সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং মা‘বূদ উক্ত ইবাদত কবুল করবেন ও সাহায্য প্রদান করবেন। অত্র আয়াতে সৃষ্টি স্রষ্টার অংশ হওয়া (যেমন বলা হয় ‘যত কল্লা তত আল্লা’) এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির একই সত্তায় লীন (ফানা ফিল্লাহ) হওয়ার অদ্বৈতবাদী দর্শনের তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে। অতঃপর ৫ম আয়াতটি হ’ল এই সূরার প্রাণ। যেখানে বান্দার পক্ষ হ’তে আল্লাহ্র নিকটে ‘ছিরাতে মুস্তাক্বীম’-এর হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। সমস্ত কুরআন যার জওয়াব হিসাবে এসেছে।

দ্বীনের আরকান-আহকামের উপরে আমল ব্যতীত শুধুমাত্র দো‘আ ও প্রার্থনা দিয়ে কোন কাজ হবে না, যা অদৃষ্টবাদী জাবরিয়া দর্শনের প্রতিবাদ করে। অনুরূপভাবে শুধু আমল দিয়েও কাজ হবে না, যদি না সেখানে আল্লাহ্র রহমত থাকে। সেজন্য আল্লাহ্র নিকটে হেদায়াত প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যা ক্বাদারিয়া, মু‘তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করে। কেননা তারা মানুষকেই তার ভাল-মন্দ কর্মের স্রষ্টা মনে করে। ৬ষ্ঠ আয়াতে পুরস্কারপ্রাপ্ত সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে ৭ম আয়াতে ইহুদীদের মত অভিশপ্ত ও নাছারাদের মত পথভ্রষ্ট না হওয়ার জন্য মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করে সূরা ফাতিহার উপসংহার টানা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদেরকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে পরিচালিত করুন -আমীন!

সারকথা :

মানবতার প্রকৃত রূপ বিকশিত হওয়ার জন্য সরল পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে অত্র সূরায়।

সূরা নাবা (সংবাদ)

সূরা মা‘আরেজ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৭৮, আয়াত ৪০, শব্দ ১৭৪, বর্ণ ৭৬৬।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١
(২) মহা সংবাদ সম্পর্কে,	عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢
(৩) যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে ।	الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣
(৪) কখনোই না, শীঘ্র তারা জানতে পারবে।	كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤
(৫) অতঃপর কখনোই না, শীঘ্র তারা জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥
(৬) আমরা কি যমীনকে বিছানাস্বরূপ করিনি?	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦
(৭) এবং পাহাড় সমূহকে পেরেকস্বরূপ?	وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧
(৮) আর আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়,	وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨
(৯) এবং তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী।	وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩
(১০) আমরা রাত্রিকে করেছি আবরণ	وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠
(১১) এবং দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণকাল।	وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١
(১২) আমরা তোমাদের মাথার উপরে নির্মাণ করেছি কঠিন সপ্ত আকাশ	وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢
(১৩) এবং তন্মধ্যে স্থাপন করেছি কিরণময় প্রদীপ।	وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٣
(১৪) আমরা পানিপূর্ণ মেঘমালা হ’তে প্রচুর বারিপাত করি।	وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤
(১৫) যাতে তদ্বারা উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ	لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٥
(১৬) এবং ঘনপল্লবিত উদ্যানসমূহ।	وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦
(১৭) নিশ্চয়ই বিচার দিবস সুনির্ধারিত।	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

(১৮) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে সমাগত হবে

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾

(১৯) আর আকাশ খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর তা বহু দরজা বিশিষ্ট হবে

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

(২০) আর পর্বতমালা চালিত হবে। অতঃপর তা মরীচিকা হয়ে যাবে।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

(২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে।

لِلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾

(২২) সীমালংঘনকারীদের ঠিকানা রূপে।

لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

(২৩) সেখানে তারা অবস্থান করবে যুগ যুগ ধরে।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

(২৪) সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শীতলতা কিংবা পানীয়।

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

(২৫) কেবল ফুটন্ত পানি ও দেহনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত।

جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾

(২৬) যথার্থ কর্মফল হিসাবে।

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

(২৭) নিশ্চয়ই তারা (আখেরাতে) জওয়াবদিহিতার আশা করত না

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

(২৮) এবং আমাদের আয়াতসমূহে তারা পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾

(২৯) আর আমরা তাদের সকল কর্ম গণে গণে লিপিবদ্ধ করেছি।

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

(৩০) অতএব তোমরা স্বাদ আস্বাদন কর। আর আমরা এখন তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি করব না কেবল শাস্তি ব্যতীত।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

(৩১) নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে সফলতা।

حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾

(৩২) রয়েছে উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরসমূহ

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

(৩৩) আর সমবয়সী কুমারীগণ।

وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

(৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾

(৩৫) তারা সেখানে কোনরূপ অনর্থক ও মিথ্যা কথা শুনবে না।

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ﴿٣٦﴾

(৩৬) এটা তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যথোচিত প্রতিদান।

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

(৩৭) যিনি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়। কেউ তাঁর সাথে কথা বলার ক্ষমতা রাখে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

(৩৮) যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

(৩৯) সে দিবস সুনিশ্চিত। অতঃপর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তার পালনকর্তার প্রতি ঠিকানা নির্ধারণ করুক।

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

(৪০) আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে অগ্রিম প্রেরণ করেছে এবং অবিশ্বাসী ব্যক্তি বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম!!

সূরার বিষয়বস্তু :

সূরাটিতে চারটি বিষয়বস্তু রয়েছে। ১- ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা *(১-৩)*। ২- মূর্খদের ধমক প্রদান *(৪-৫)*। ৩- জ্ঞানীদের জন্য ক্বিয়ামতের প্রমাণ উপস্থাপন *(৬-১৬)*। ৪- ক্বিয়ামতের পর চূড়ান্ত শাস্তি *(১৭-৩০)* অথবা সুখের বর্ণনা *(৩১-৪০)*।

১ম বিষয়বস্তু : ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা (১-৩) :

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ– عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ– الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ–

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?

(২) মহা সংবাদ সম্পর্কে,

(৩) যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে'।

সকল যুগের নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের ন্যায় মক্কার মুশরিকদের ধারণা ছিল মানুষের পরিণতি দুনিয়াতেই শেষ। অন্যান্য বস্তু যেমন পচে-গলে মাটিতে মিশে যায়, মানুষও তেমনি মাটি হয়ে শেষ হয়ে যাবে। অতএব খাও-দাও ফুর্তি করো। শক্তি ও সাধ্যমত অন্যের উপর যুলুম করো। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করো। তাদের এই বস্তুগত চিন্তাধারার বিপরীতে আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*

যখন তাদেরকে ক্বিয়ামত ও আখেরাতে জওয়াবদিহিতার ভয় প্রদর্শন করলেন, মুশরিক নেতাদের মধ্যে তখন বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ অবিশ্বাস করল। 'আছ বিন ওয়ায়েল একটা জীর্ণ হাড় এনে রাসূলের সামনে গুঁড়া করে বলল, আল্লাহ কি এই হাড়টাকেও জীবিত করবেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি তোমাকে মৃত্যু দান করবেন। অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন।[৬৭] মুশরিক নেতাদের যখন এই অবস্থা, তখন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে সৃষ্টিসেরা মানবজাতির উদ্দেশ্যে সরাসরি আসমানী বার্তা চলে এল।-

(১) عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ 'তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে'? এখানে عَمَّ প্রশ্নবোধক অব্যয়। যা আসলে ছিল عَنْ مَا। অর্থ, 'কি বিষয়ে'? নূন ও মীম সংযুক্ত করে এবং মীম-এর আলিফ ফেলে দিয়ে عَمَّ করা হয়েছে সহজে উচ্চারণ করার জন্য। যেমন প্রশ্নবোধক অন্যান্য অব্যয় فِيْمَ ও مِمَّ প্রভৃতিতে করা হয়েছে। এখানে عَمَّ অর্থ فِيْمَ হ'তে পারে। দু'টির অর্থ একই।

يَتَسَاءَلُوْنَ ক্রিয়ার শব্দমূল হ'ল سَوَالٌ অর্থ 'প্রশ্ন' বা জিজ্ঞাসা। সেখান থেকে تَسَاءُلٌ মাছদারের অর্থ 'পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করা'। আয়াতে বর্ণিত ক্রিয়াপদের কর্তা হ'ল 'কুরায়েশ নেতাগণ'। অত্র আয়াতে আল্লাহ অবিশ্বাসী নেতাদের পারস্পরিক বিতর্ক সুন্দর বাণীচিত্রের মাধ্যমে আমাদের নিকট তুলে ধরেছেন এটা বুঝানোর জন্য যে, সকল যুগের সকল অবিশ্বাসীর চিন্তাধারা একই রূপ।

(২) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ 'মহা সংবাদ সম্পর্কে'।

দুনিয়াতে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হ'ল জন্মগ্রহণ করা ও বেঁচে থাকা। পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ হ'ল মৃত্যুবরণ করা ও বিলীন হওয়া। এ দুনিয়াতে কেউ মরতে চায় না। বিলীন হ'তে চায় না। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, যে মানুষের জন্য লক্ষ-কোটি বছর ধরে আসমান-যমীন ও এর মধ্যকার সবকিছুর সৃষ্টি, সেই মানুষের গড় আয়ু একশ' বছরেরও কম। সেরা সৃষ্টি মানুষ কি এতই অন্তঃসারশূন্য যে, পৃথিবীতে সে মাত্র কিছুদিনের জন্য আবির্ভূত হয়েই নিঃশেষে হারিয়ে যাবে? অথচ এখানে তার কামনা-বাসনার সবকিছু সে পায় না। বরং বলা চলে যে, অনেক কিছুই সে পায় না। তাই এ অস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ জগৎ থেকে তাকে চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ আরেকটি জগতে হিজরত করতে হয়, যেখানে সে তার চাহিদামত সবকিছুই পাবে পরিপূর্ণভাবে। অতএব ইহজাগতিক মৃত্যুর পরেই তার জন্য সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হ'ল পরজগতের জন্য পুনরুত্থান ও পুনর্জন্মলাভ করা। অত্র আয়াতে আল্লাহ মানুষকে সেই সুসংবাদটিই

৬৭. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩৬০৬; ইবনে কাছীর, সূরা ইয়াসীন ৭৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

শুনিয়েছেন। আর তা হ'ল মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান যা ক্বিয়ামতের দিন ঘটবে। কিছু মানুষ পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু তা এই দুনিয়াতেই। যার কোন ভিত্তি নেই বা যৌক্তিকতা নেই। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান দিবসের এই ঘটনাকেই আল্লাহ النَّبَا الْعَظِيْمِ বা 'মহাসংবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ. 'হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর বিষয়' *(হজ্জ ২২/১)*।

(৩) الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ 'যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে'।

মতভেদ কেন হ'ল? কারণ সসীম জ্ঞানের মানুষ কেবল নগদটাই দেখে, বাকীটা বোঝে না। সে যা দেখে না তা বুঝতে চায় না। অথচ তার দেখার বাইরে লুকিয়ে আছে অকাট্য সত্যের অসীম জগৎ। আমরা নিয়মিত দেখি যালেম তার শক্তি ও বুদ্ধির জোরে অসহায় ও দুর্বলের উপর যুলুম করে যাচ্ছে। এরপরেও সে দুনিয়াতে খ্যাতি ও প্রশংসা কুড়াচ্ছে। অন্যদিকে সৎ ও নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও মযলূম মার খাচ্ছে ও বদনাম কুড়াচ্ছে। এভাবে যালেম ও মযলূম উভয়ে এক সময়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে। বাস্তব জীবনের এ অবস্থা নিশ্চিতভাবে দাবী করে যে, জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য এমন একটি জগৎ অপরিহার্য, যেখানে যালেম যথার্থ শাস্তি পাবে এবং মযলূম তার যথার্থ পুরস্কার পাবে। যেখানে প্রত্যেকেই যথাযথ 'স্থান' ও 'মর্যাদা' পাবে। আর সে জগতটাই হ'ল পরজগৎ। মৃত্যুর পরেই যার শুরু এবং ক্বিয়ামতের দিন হবে যার পূর্ণতা। যদি এটা না থাকে, তাহ'লে Survival of the fittest 'যোগ্যতমের বেঁচে থাকার' মতবাদ অনুযায়ী সবল ও দুর্বলের পরস্পরের হানাহানিতে মানবসমাজ হবে অগ্নিগর্ভ। এক সময় দেখা যাবে যে, যালেমদের সর্বাধুনিক বোমার হামলায় সমগ্র পৃথিবীতে ধ্বংসলীলা ঘটে গেছে। প্রাচীন যুগের ন্যায় আধুনিক যুগের নাস্তিক ও বস্তুবাদীরাও কেবল বর্তমান নিয়ে ভাবেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাই তারা দ্বিধাহীনচিত্তে বলেন, 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতা শূন্য থাক'। এদের কারণেই পৃথিবী হয়ে উঠেছে অশান্তিময়। বস্তুতঃ আখেরাতে জওয়াবদিহিতা ও শাস্তির ভয় মানুষকে ইহকালে নিয়ন্ত্রিত জীবনে উদ্বুদ্ধ করে। যার অবর্তমানে সে হয় শয়তানের প্রতিমূর্তি। তাই ইবলীসের শিখণ্ডী এই সব জ্ঞানপাপীদেরকে আল্লাহ পরবর্তী দু'আয়াতে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছেন।

২য় বিষয়বস্তু : মূর্খদের ধমক প্রদান (৪-৫ আয়াত)।

(৪-৫) كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ- ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ 'কখনোই না। শীঘ্র তারা জানতে পারবে'। 'অতঃপর কখনোই না। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে'।

অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কে তারা যে অবিশ্বাস পোষণ করছে এবং ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করছে, তা কখনোই সত্য নয়। বরং তাদের এ দাবী অসার মাত্র। যে ক্বিয়ামত সম্পর্কে

তারা মতভেদ করছে, নিশ্চিতভাবে তা আসবেই। তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারু নেই। সত্বর তারা জানতে পারবে। সত্বর তারা তাদের মিথ্যাচারের পরিণতি ভোগ করবে।

এখানে কখনোই না, অতঃপর কখনোই না, পরপর দু'বার বলার অর্থ হ'ল ধমকের পর ধমক দেওয়া। সাধারণ মূর্খরা সহজে কথা শোনে। কিন্তু জ্ঞানী মূর্খরা সহজে হার মানতে চায় না। তাই তাদের জন্য এই ব্যবস্থা।

৩য় বিষয়বস্তু : জ্ঞানীদের জন্য ক্বিয়ামতের প্রমাণ উপস্থাপন (৬-১৬)।

(৬-১৬) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ..... وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

অত্র **১১**টি আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলিকে আল্লাহপাক ক্বিয়ামতের প্রমাণস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। কেননা এইসব বিশাল ও বিস্ময়কর সৃষ্টি যিনি প্রথমবার অস্তিত্বে এনেছেন কেবল একটা হুকুম 'কুন ফাইয়াকূন' (হও, অতএব হয়ে গেল)-এর মাধ্যমে, তাঁর পক্ষে মানুষের মত একটা ক্ষুদ্র জীবকে পুনরায় সৃষ্টি করা ও পুনরুত্থান ঘটানো কোন ব্যাপারই নয় *(ইয়াসীন ৩৬/৮২-৮৩, রূম ৩০/২৭)*। যেমন আল্লাহ মানবজাতির প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، بَنَاهَا 'তোমাদের সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন, না আসমান সৃষ্টি করা? (অথচ) তিনি তাকে নির্মাণ করেছেন' *(নাযে'আত ৭৯/২৭)*। অতঃপর প্রথম প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ বলেন,

(৬) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا 'আমরা কি যমীনকে বিছানাস্বরূপ করিনি'?

অন্য আয়াতে فِرَاشًا (বিছানা) শব্দ এসেছে *(বাক্বারাহ ২/২২)*। এখানে 'বিছানা' বলতে এমন আশ্রয়স্থলকে বুঝানো হয়েছে, যা সৃষ্টিজগতের জন্য অনুকূল, মযবুত এবং নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্র। অন্যত্র পৃথিবীর বিশেষণ হিসাবে ذَلُوْلاً (অনুগত) বলা হয়েছে *(মুল্ক ৬৭/১৫)*। এজন্যেই তো ভূ-পৃষ্ঠে কর্ষণ ও চাষাবাদ এমনকি আধুনিক ফেরাঊনদের বারংবার বোমা বিস্ফোরণ ও ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা সত্ত্বেও পৃথিবী সামান্য নড়াচড়াও করে না। কেননা আল্লাহ্র হুকুমে তা রয়েছে বিছানার ন্যায় ধীরস্থির ও বান্দার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এজন্য আল্লাহপাক এর মধ্যে দান করেছেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি। যার কারণে পৃথিবী সূর্য থেকে ঝুলে থাকে এবং তার পৃষ্ঠে বিচরণকারী সৃষ্টিকুলকে সর্বদা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ধরে রাখে। সেই সাথে রয়েছে বায়ুর চাপ। যে কারণে কিছু উপরে ছুঁড়ে মারলে তা আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। ঠিক বিছানা বা দোলনা যেভাবে শিশুকে আকর্ষণ করে এবং সেখানেই সে আরাম বোধ করে ও ঘুমিয়ে যায়। পৃথিবীর এই আকর্ষণী ক্ষমতা যদি আল্লাহ না দিতেন, তাহ'লে ভূপৃষ্ঠে প্রাণীকুল যেকোন সময় পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যেত। অন্য আয়াতে এসেছে مَهْدًا

(ত্বোয়াহা ২০/৫৩; যুখরুখ ৪৩/১০) যার অর্থ দোলনা, যা বাচ্চাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। দোলনা ও বিছানা একই মর্ম বহন করে। আল্লাহ বলেন, وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ 'আমরা পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি। অতএব আমরা কতই না সুন্দর বিস্তৃতকারী? *(যারিয়াত ৫১/৪৮)*। এভাবে পৃথিবীকে যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি কি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরায় অস্তিত্বে আনতে পারেন না?

(৭) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا 'এবং পাহাড় সমূহকে পেরেকস্বরূপ?'

এটি ক্বিয়ামতের দ্বিতীয় প্রমাণ। এখানে পাহাড়কে 'পেরেক' বলা হয়েছে এজন্য যে, পাহাড় ভূগর্ভ থেকে উঠে আসে এবং পৃথিবীকে শক্তভাবে চেপে রাখে। যাতে হেলতে না পারে। যেমনভাবে ঘরের চালে পেরেকসমূহ বাঁশ বা কাঠের কাঠামোকে পরস্পরে মযবুতভাবে বেঁধে রাখে, যাতে তা বিচ্ছিন্ন বা এলোমেলো না হয়ে যায়। পৃথিবীর বুকে পাহাড় মানবদেহে হাঁড়ের ন্যায়। যা ব্যতীত মানুষ দাঁড়াতে বা চলতে পারে না। অনুরূপভাবে পাহাড় পৃথিবীকে শক্তভাবে ধরে না রাখলে সে মহাশূন্যে উল্টে-পাল্টে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এতদ্ব্যতীত পাহাড় আমাদের জন্য তার বুকে পানি ও মাথায় বরফ সঞ্চয় করে রাখে। যা ঝর্ণা ও নদী আকারে প্রবাহিত হয়। পাহাড় পানিভরা মেঘকে আটকে দিয়ে তার পাদদেশের অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টি বর্ষণে সাহায্য করে। পাহাড়ের দেহ ঘিরে থাকে অসংখ্য ভেষজ, ফলজ ও বনজ বৃক্ষরাজি, যা বান্দার মঙ্গলের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এছাড়াও পাহাড় মানুষের নানাবিধ কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। তবে তার সবচেয়ে বড় অবদান হ'ল এই যে, সে পেরেক স্বরূপ পৃথিবীকে মযবুতভাবে ধরে রাখে, যাতে পৃথিবী নড়াচড়া করতে না পারে। যেটা খুবই সম্ভব ছিল। কেননা ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশে মানব বসতি বেশী, কোন অংশে কম। কোন অংশে পানির ভাগ বেশী, কোন অংশে কম। ফলে ওযনের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ওযনের এই তারতম্যে পৃথিবীর ভারসাম্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না পাহাড়ের কারণে। যা আল্লাহ প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপন করেছেন। অন্য আয়াতে رَوَاسِيَ শব্দ এসেছে *(রা'দ ১৩/৩, মুরসালাত ৭৭/২৭ প্রভৃতি)*, যার অর্থ পাহাড়, যা পৃথিবীর দৃঢ়তা রক্ষাকারী (ثوابت)।

(৮) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً 'আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়'।

এটি ক্বিয়ামতের তৃতীয় প্রমাণ। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীরূপে। যাতে পরস্পরের মিলনে মানুষের বংশধারা অব্যাহত থাকে। এই জোড়া পরস্পরে বিপরীতধর্মী এবং পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণশীল। জোড়া কেবল মানুষের মধ্যে নয়; বরং প্রাণী ও জড় জগতের সর্বত্র বিরাজমান। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় পজেটিভ বা প্রোটন এবং নেগেটিভ বা ইলেকট্রন। শুধু এগুলিতেই নয়; বরং আমাদের জানা-অজানা সকল

ক্ষেত্রেই জোড়ার অস্তিত্ব রয়েছে, যা পরস্পরের বিপরীতধর্মী। যেমন রংয়ের মধ্যে সাদা ও কালো, গুণের মধ্যে ভাল ও মন্দ, উজ্জ্বলতার মধ্যে আলো ও আঁধার, প্রশস্ততার মধ্যে চওড়া ও সরু ইত্যাদি। এবিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন বিস্তৃতভাবে। যেমন তিনি বলেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ 'মহাপবিত্র তিনি, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন সবকিছুকে, যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজিকে এবং মানুষকে ও তাদের অজানা সব বস্তুকে' *(ইয়াসীন ৩৬/৩৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ 'আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার' *(যারিয়াত ৫১/৪৯)*। অত্র বিষয়টি বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসমূল হিসাবে গণ্য।

ভাল-র পাশাপাশি মন্দ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল যাতে গুণীরা গুণহীনদের দেখে সতর্ক হয় এবং নিজেদের উচ্চগুণ ও বড়ত্ব লাভের জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। সাথে সাথে গুণহীনরা ধৈর্যধারণ করে এবং গুণবানদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করে। এভাবে সকল ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে এটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জগত সংসার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উভয়টির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষা করা আবশ্যক। তা না হ'লে পৃথিবী অচল হয়ে পড়বে। এর মধ্যে একথারও ইঙ্গিত রয়েছে, যিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন, যখন সে কিছুই ছিল না *(দাহর ৭৬/১)*। অতঃপর তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন *(নিসা ৪/১)*। একইভাবে আদম সন্তানের মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যাবার পর তাকে ক্বিয়ামতের দিন আবার সৃষ্টি করবেন। এছাড়া একথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিজগত সবই জোড়ায় জোড়ায়। বেজোড় কেবল একজন। তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি বলেন, *'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'* (তুমি বল, তিনি আল্লাহ এক)।

(৯) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا 'এবং তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী'। এটি ক্বিয়ামতের চতুর্থ প্রমাণ।

মানুষসহ সকল প্রাণীর জন্য নিদ্রা হ'ল আল্লাহ্র একটি বিশেষ অনুগ্রহ। নিন্দ্রা না থাকলে মানুষ কোন কাজেই উদ্যম ও আগ্রহ খুঁজে পেত না। অন্য আয়াতে নিদ্রাকে আল্লাহ্র অস্তিত্বের অন্যতম নিদর্শন (آية) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ 'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল রাত্রি ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয়ই এর মধ্যে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী নিহিত রয়েছে' *(রূম ৩০/২৩)*। নিদ্রার সবচেয়ে বড় সুফল হিসাবে বলা হয়েছে, سُبَاتًا বা ক্লান্তি দূরকারী। এই ক্লান্তি দৈহিক ও মানসিক উভয়টিই হ'তে পারে। ব্যথাতুর ব্যক্তি ঘুমিয়ে

গেলে ব্যথা ভুলে যায়। শোকাতুর ব্যক্তি নিদ্রা গেলে শোক ভুলে যায়। ঘুম থেকে উঠলে তার দেহ-মন তরতাযা হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, কমপক্ষে ছয় মিনিট গভীর ঘুম হ'লে ক্লান্তি দূর হয়ে নবজীবন লাভ হয়। ঘুম তাই আল্লাহ প্রদত্ত এক অমূল্য মহৌষধ। যা দেহ ও মনে স্বস্তি ও শান্তি দানকারী *(রূম ৩০/২৩)*।

سُبَاتًا অর্থ শান্তি (راحة)। আর সেখান থেকেই এসেছে يوم السبت শান্তি বা ছুটির দিন। যাকে বাংলায় আমরা 'শনিবার' বলে থাকি। এইদিন আল্লাহ কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই ইহুদীদের জন্য এটা সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন হিসাবে ছুটির দিন (weekly holiday)। ঘুম আসাটাও যেমন আল্লাহ্র বিশেষ রহমত, ঘুম থেকে জেগে ওঠাও তেমনি আল্লাহ্র বিশেষ রহমত। ঘুমকে হাদীছে 'মৃত্যু' বলা হয়েছে। সেজন্য ঘুমাতে যাওয়ার সময় দো'আ পড়তে হয় *'বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া'* 'তোমার নামেই হে আল্লাহ আমি মরি ও বাঁচি'। অনুরূপভাবে ঘুম থেকে উঠেই বলতে হয় *'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়া-না বা'দামা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'* 'যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দান করার পর জীবন দান করেন এবং তাঁর নিকটেই হবে পুনরুত্থান'।[৬৮]

বস্তুতঃ ঘুমিয়ে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার মধ্যে রয়েছে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বাস্তব উদাহরণ। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ক্বিয়ামতের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এই দো'আ পাঠের মাধ্যমে মানুষকে সর্বদা মৃত্যুর কথা এবং তার প্রভুর নিকটে ফিরে যাবার কথা স্মরণ করানো হয়। যা তাকে দুনিয়াপূজা থেকে ও শয়তানের তাবেদারী করা হ'তে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। ঘুম ও তা থেকে জেগে ওঠা কোনটারই এখতিয়ার মানুষের হাতে নেই। এই নিদ্রা তার জন্য চিরনিদ্রা হ'তে পারত। যেমন আল্লাহ্র হুকুমে আছহাবে কাহফের যুবকেরা তাদের কুকুরসহ এক পাহাড়ী গুহায় ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে ছিল' *(কাহফ ১৮/২৫)*। পরে আল্লাহ্র হুকুমে জেগে উঠে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদে বলল, আমরা একদিন বা তার কিছু অংশ ঘুমিয়েছিলাম *(কাহফ ১৮/১৯)*। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, নিদ্রা যাওয়া ও নিদ্রা থেকে জেগে ওঠার মাধ্যমে দৈনিক আমাদের মৃত্যু ও ক্বিয়ামত হচ্ছে। অতএব ঘুম থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে এবং মানুষের অসহায়ত্ব ও আল্লাহ্র একচ্ছত্র ক্ষমতা সম্পর্কে। বহুপূর্বে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির এনাটমীর প্রফেসর Devid Fresher মানবদেহের অত্যাশ্চর্য শৈলী দেখে অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠেছিলেন, Our minds are overwhelmed by immensity and majesty of nature. 'প্রকৃতির বিশালতা ও রাজকীয় ক্রিয়াকর্ম আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে'।

(১০) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا 'আমরা রাত্রিকে করেছি আবরণ'।

'লেবাস' অর্থ পোষাক যা লজ্জা নিবারণ করে। এখানে রাত্রিকে পোষাক বলা হয়েছে এজন্য যে, রাত্রি তার অন্ধকার দ্বারা দিবসের আলোর সামনে পর্দা টাঙিয়ে দেয়, যাতে

৬৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৮২, ২৩৮৪; বুখারী হা/৬৩২৪।

মানুষসহ জীবজগত নিরিবিলি পরিবেশে সুস্থিরভাবে নিদ্রা যেতে পারে। আবার শেষরাতে উঠে শান্ত-সমাহিত চিত্তে আল্লাহ্র ইবাদতে রত হ'তে পারে। এছাড়া আল্লাহ্র এই সৃষ্টিজগতের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য চিন্তাশীল, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের জন্য রাতের নিরিবিলি সময়ের চাইতে উত্তম পরিবেশ আর কখন আছে? Tennyson কি রাতের নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে হৃদয় দিয়ে তাকিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেননি? What a marvellous imagination God Almighty has? 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনারই না অধিকারী'? আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে করেছেন ক্লান্তি দূরকারী এবং দিবসকে করেছেন উত্থান সময়' *(ফুরক্বান ২৫/৪৭)*।

(১১) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا 'এবং দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণকাল'।

এখানে مَعَاشًا অর্থ وقت معاش 'জীবিকা অন্বেষণকাল'। রাতের নিদ্রাশেষে দিনের আলোয় মানুষ ও পশুপক্ষী স্ব স্ব রূযীর তালাশে বেরিয়ে যাবে। এটাই হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা। ভূপৃষ্ঠে, ভূগর্ভে, পানিরাশিতে ও সৌরলোকের সর্বত্র আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহরাজি ছড়িয়ে রেখেছেন। একমাত্র জ্ঞানবান সৃষ্টি মানুষকে এসব তালাশ করে এনে তা ভোগ করার জন্য এবং বেশী বেশী আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁর শুকরিয়া আদায়ের জন্য তিনি জোরালো ভাষায় তাকীদ দিয়েছেন *(জুম'আ ৬২/১০, বাক্বারাহ ২/১৭২)*। আল্লাহ আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত প্রকাশ্য ও গোপন নে'মত সম্ভারকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন *(লোকমান ৩১/২০)*। মানুষকে অবশ্যই সেসব নে'মত সন্ধানের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

দিবসের সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল সূর্য। সূর্যের কিরণ যদি পৃথিবীতে না আসত, তাহ'লে মানুষ, পশু, উদ্ভিদজগৎ কারু মধ্যে শক্তি-সামর্থ্য সৃষ্টি হ'ত না। সূর্য জীবদেহে শক্তির যোগান দেয়। তাই আমরা শক্তিশালী হই, উদ্ভিদজগৎ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের খাদ্য চাউল ও গম ইত্যাদি স্ব স্ব গাছের শিষে শুকিয়ে শক্ত হয়। অতঃপর তা আমাদের জন্য খাবার উপযুক্ত হয়। যদি দিবসের সূর্য না থাকত, তাহ'লে আমরা কখনোই উঠে দাঁড়াবার শক্তি পেতাম না। সূর্য হ'ল জ্বালানীর উৎস। যদি মানুষ সেখান থেকে জ্বালানী গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তাহ'লে পৃথিবীতে জ্বালানীর কোন অভাব থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহের শিল্প কারখানাসমূহ হ'তে মাত্রাতিরিক্ত হারে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে উষ্ণায়নের সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্য সূর্যের তাপ আটকে থাকছে ভূপৃষ্ঠে। আর এর প্রতিক্রিয়ায়- যাকে 'গ্রীন হাউস ইফেক্ট' (Green house effect) বলা হচ্ছে, বায়ুমণ্ডলের ওযোন (Ozone) স্তর ছিদ্র হয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে ঘন ঘন ঝড়-প্লাবন, সিডর-সাইক্লোন ইত্যাদি হচ্ছে। তাছাড়া এই উষ্ণায়নের

ফলে উত্তর মেরু থেকে শুরু করে বরফাচ্ছাদিত মহাদেশ এন্টার্কটিকার বরফ গলে যাচ্ছে। দ্রুত গলে যাচ্ছে চিলির আন্দিজ পর্বতমালার বিশাল বরফ স্তূপ ও হিমালয়ের হিমবাহ সমূহ। সেই সাথে বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রে পানির উচ্চতা। ফলে বাংলাদেশসহ সমুদ্রোপকূলের বহু দেশের নিম্নাঞ্চল হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তলিয়ে যাবে এবং আশ্রয়হারা হবে লাখ লাখ বনু আদম। ভোগবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ বিশ্বব্যাপী এই ধ্বংসলীলা ও ব্যাপক গণহত্যার জন্য দায়ী। তাই সোলার সেল-এর ব্যবহার সর্বত্র শুরু হ'লে এবং পেট্রোল-ডিজেল ও কয়লা পোড়ানো বন্ধ হ'লে পৃথিবী গ্রীন হাউস ইফেক্ট থেকে মুক্ত হবে। সেই সাথে মানবজাতি বেঁচে যাবে তাদের নিজ হাতে সৃষ্ট আসন্ন ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে। রাত্রি ও দিবসের উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে মানুষের জন্য যেমন কর্মকালের সময় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, তেমনি আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্যও সময় ভাগ করে দিয়েছেন।

(১২) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً 'আমরা তোমাদের মাথার উপর নির্মাণ করেছি কঠিন সপ্ত আকাশ'।

سَبْعًا شِدَادًا অর্থ سبع سموات محكمات 'সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ'। পৃথিবী সৃষ্টির পর আল্লাহ সাত আসমান সৃষ্টি করেন। যেমন তিনি বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ভূমণ্ডলের সবকিছু। অতঃপর মনোসংযোগ করেছেন নভোমণ্ডলের দিকে। অতঃপর তাকে বিন্যস্ত করেছেন সপ্ত আকাশে। বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। আল্লাহ বলেন, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ 'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। যা ছিল ধূম্র বিশেষ। অতঃপর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম অনুগত হ'য়ে'। 'অতঃপর তিনি তাকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান প্রত্যাদেশ করলেন। আর আমরা দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দিয়ে এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত। এটি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১১-১২)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন রবি ও সোম দু'দিনে। সেখানে খাদ্য-শস্য সৃষ্টি করেছেন মঙ্গল ও বুধ দু'দিনে। আকাশ সৃষ্টি করেছেন বৃহস্পতি ও শুক্র দু'দিনে। অতঃপর শুক্রবারের শেষ দিকে আদমকে সৃষ্টি করেন। আর এদিনেই ক্বিয়ামত হবে'

(কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত)। ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে পাঁচটি স্তরে প্রায় সাড়ে এগারো শত কিঃ মিঃ ব্যাপী বায়ুমণ্ডল রয়েছে যা পৃথিবীর জন্য নিরাপত্তা প্রাচীর হিসাবে বিরাজ করছে। যার মধ্যে একটি স্তর হ'ল ওযোন (Ozone) স্তর। প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ ব্যাপী ওযোন গ্যাসের এই স্তরকে বলা হয় পৃথিবীর জন্য 'প্রোটেকশন শিল্ড' (Protection shield) বা রক্ষাব্যূহ। যা সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে এবং পৃথিবীতে জীবজগতের বাসোপযোগী আবহাওয়াগত উষ্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার পিছনে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। এতদ্ব্যতীত মহাকাশ থেকে অবিরতভাবে অগ্নিময় যে বিরাট বিরাট উল্কাপিণ্ড সেকেণ্ডে ৬ হ'তে ৪০ মাইল বেগে প্রতিদিন গড়ে দুই কোটির উপরে শূন্যলোকে নিক্ষিপ্ত হয়, তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে পৃথিবী সাক্ষাৎ ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। বায়ুমণ্ডল তাই আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র এক অপার অনুগ্রহ। বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে উপরে গেলে শুরু হয় বায়ুশূন্য ইথার জগত। যেখানে রয়েছে নীহারিকাপুঞ্জ ও অসংখ্য গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি। সেসব নক্ষত্র এত বড় যে, আমাদের বিশাল সূর্য ঐসবের কাছে বিন্দুতুল্য। প্রাপ্ত হিসাব মতে সবচাইতে দূরবর্তী নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে ১৩০০ কোটি (১৩ বিলিয়ন) আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাযার মাইল বা তিন লক্ষ কিলোমিটার। সে হিসাবে এক বছরকে এক আলোকবর্ষ বলা হয়। এক্ষণে তা ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ হ'লে কত দূরে হয়, তা চিন্তার বিষয়। এরপরেও আইনস্টাইনের ধারণা মতে মহাবিশ্বের আয়তন (محيط الكون) প্রায় দু'হাযার মিলিয়ন আলোকবর্ষের মতো *(তানতাভী)*। *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বেহামদিহী...।*

পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে থাকায় আমরা এগুলির মিটিমিটি আলো দেখতে পাই। বহু নক্ষত্রের আলো আজও আমাদের দৃষ্টিপথে আসেনি। নভোমণ্ডলের বিভিন্ন রহস্য মানব জাতির কাছে এখনো অজানা রয়েছে। তাই সাত আসমানের স্তর পরিচিতি এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত। মনুষ্যকুলের মধ্যে একমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই সব স্তর ভেদ করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ এড়িয়ে মি'রাজে গিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র হুকুমে। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ও নির্দেশ ব্যতীত আসমান ও যমীনের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত। আল্লাহ বলেন, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَ تَنْفُذُوْنَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ 'হে জিন ও মনুষ্যজাতি! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান ও যমীনের সীমানা পার হবার, তাহ'লে বের হয়ে যাও। কিন্তু তোমরা তা পারবে না আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত' *(রহমান ৫৫/৩৩)*।

আলোচ্য আয়াতে সপ্ত আকাশকে شِدَادٌ বা 'কঠিন' বলার মধ্যে বিজ্ঞানীদের জন্য ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব আসমানের গঠন প্রকৃতি এমন, যা ভেদ করা কঠিন ও দুরূহ। অন্য আয়াতে আসমানকে سَقْفًا مَحْفُوْظًا বা 'সুরক্ষিত ছাদ' বলা হয়েছে *(আম্বিয়া ২১/৩২)*। বায়ুমণ্ডল

আমাদের জন্য সেই সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে কাজ করছে। এতদ্ব্যতীত নক্ষত্ররাজি রাতের অন্ধকারে আলো দিয়ে ও দিক নির্দেশনা দিয়ে এবং বহু অজানা সেবা দিয়ে প্রতিনিয়ত জীবজগতকে লালন করে যাচ্ছে। যা আল্লাহ্র 'রব' বা পালনকর্তা হওয়ার বড় প্রমাণ।

(১৩) وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَّهَّاجًا 'এবং তন্মধ্যে স্থাপন করেছি কিরণময় প্রদীপ'।

এখানে 'প্রদীপ' অর্থ সূর্য। وَهَّاجًا অর্থ وَقَّادًا 'জ্বলন্ত'। মাত্র একটি শব্দে সূর্যের এই পরিচয় দানের মধ্যে বিজ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত চিন্তার খোরাক। পৃথিবী থেকে অন্যূন ৩ লক্ষ ৩০ হাযার গুণ ভারী সূর্য নিঃসন্দেহে একটি বিশাল জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড। যার উপরিভাগের তাপমাত্রা প্রায় ৫৬০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। যার ২০০ কোটি ভাগের একভাগ পৃথিবীর উপর পড়ে। তাতেই আমরা সূর্য কিরণে জ্বালা অনুভব করি। আসমানের বুকে সূর্যকে আল্লাহ বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিসেরা মানুষের সেবাদানের জন্য। মানুষের আশ্রয়স্থল পৃথিবীকে সূর্য থেকে এমন দূরে ও এমন কোণে স্থাপন করা হয়েছে, যেখান থেকে সূর্য সামান্য এগিয়ে এলে পৃথিবী জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আবার সামান্য পিছিয়ে গেলে তা ঠাণ্ডা ও বরফাবৃত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত। তাছাড়া পৃথিবীর কক্ষপথ এবং আহ্নিকগতি ও বার্ষিকগতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখান থেকে সামান্যতম নড়চড় হবার অবকাশ দেওয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ 'আল্লাহই রাত্রি ও দিবসের হিসাব নির্ধারণ করেন' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী নির্ধারিত দূরত্বে এমনভাবে ঝুলে রয়েছে, যেমন দাড়িপাল্লা রশিতে ঝুলে থাকে। ঝুল কমবেশী হ'লে যেমন পাল্লার ওযনে কমবেশী হয়ে যায়, পৃথিবীর অবস্থিতি তেমনি বিনষ্ট হয়ে যাবে। ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার চৌম্বিক আকর্ষণ আল্লাহ্র হুকুমে ছিন্ন হবে অথবা তারতম্য ঘটবে ইস্রাফীলের ফুৎকারের মাধ্যমে। আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ও আকাশরাজির বর্তমান অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে আল্লাহ্র হুকুমে নতুন পৃথিবীর রূপ ধারণ করবে *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*।

সূর্যের অবদানেই পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ, অবস্থিতি ও তৎপরতা সম্ভবপর হচ্ছে। সূর্যের এই অতুলনীয় খেদমতের জন্য কিছু মানুষ সূর্যকে দেবতা বলে পূজা করে। অথচ তারা সূর্যের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহকে ভুলে যায়। তাই আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ- 'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য বা চন্দ্রকে সিজদা করো না। বরং তোমরা আল্লাহকে সিজদা করো, যিনি এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন, যদি নাকি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৭)*।

সূর্যের আলো এবং চন্দ্রের আলোর মধ্যকার পার্থক্য অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যথাক্রমে ضِيَاءٌ ও نُوْرٌ বলে *(ইউনুস ১০/৫)*। যার অর্থ কিরণ ও জ্যোতি। এর মধ্যেই বিজ্ঞানের একটি বড় উৎস লুকিয়ে আছে যে, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। সে সূর্যের আলোয় আলোকিত। দু'টির প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন। সূর্যের কিরণে দেহে জ্বালা ধরায় ও শক্তি বাড়ায়। চন্দ্রের জ্যোতিতে জ্বালা নেই, আছে পেলব পরশ। ফলে দু'টির ফলাফল ও কল্যাণকারিতাও ভিন্ন। বস্তুতঃ 'আসমান ও যমীন দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ্র হুকুমে। অতঃপর যখন তিনি ডাক দিবেন, তখন সবকিছুর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আমরা স্ব স্ব কবর থেকে বেরিয়ে আল্লাহ্র নিকটে সমবেত হব' *(রূম ৩০/২৫)*।

(১৪) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً 'আমরা পানিপূর্ণ মেঘমালা হ'তে প্রচুর বারিপাত করি'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, الْمُعْصِرَاتِ অর্থ 'বায়ু'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, السحاب অর্থাৎ 'মেঘ'। ثَجَّاجاً অর্থ كَثِيْرًا 'প্রচুর' বা مُتَتَابِعًا 'মুষলধারে'। এখানে অর্থ দাঁড়াচ্ছে وأنزلنا من ذوات الرياح المعصرات ماء متتابعا 'আমরা বর্ষণ করি মেঘময় বায়ুর মাধ্যমে মুষলধারে বৃষ্টি'।

'সূর্যের' বর্ণনার পরেই 'বৃষ্টি'র বর্ণনা এসেছে। যা ইঙ্গিত বহন করে যে, সূর্যকিরণ হ'ল মেঘ সৃষ্টি ও বৃষ্টিপাতের প্রধানতম কারণ। সাগরের লবণাক্ত পানি সূর্যতাপে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়। অতঃপর তা পরিচ্ছন্ন হয়ে মেঘ ও বৃষ্টিতে পরিণত হয়। অতঃপর বায়ু প্রবাহ তাকে বহন করে আল্লাহ্র হুকুম মত প্রয়োজনীয় স্থানে বর্ষণ করে *(ফুরক্বান ২৫/৪৮)*। বৃষ্টি একসাথে পড়লে মাটি ধুয়ে চলে যেত ও ব্যাপক ভূমিক্ষয় হ'ত। তাই তাকে সরু ও সূক্ষ্ম ধারায় বর্ষণ করা হয়। যাতে ভূমিক্ষয় না হয় বা কচি চারা ও অংকুরসমূহ ভেঙ্গে নষ্ট না হয়। বৃষ্টির সঙ্গে পাঠানো হয় বিদ্যুৎ *(রূম ৩০/২৪)*। যার মধ্যে থাকে নাইট্রোজেন। এক হিসাবে জানা যায় যে, বছরে পৃথিবীতে যে বিদ্যুৎ চমকায় বা বজ্রপাত হয়, তাতে প্রায় এক কোটি টন নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সার বৃষ্টির মাধ্যমে মাটির সাথে মিশে যায়। যা ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। এইভাবে প্রাকৃতিক নিয়মেই আল্লাহ বান্দার রূযীর জন্য ভূমিকে উর্বর ও সমৃদ্ধ করে রাখেন। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক। অতঃপর যখন আমরা তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সেটি আন্দোলিত হয় ও স্ফীত হয়। বস্তুতঃ যিনি একে জীবিত করেন, তিনিই মৃতকে জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৯)*।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, সাগরের লবণাক্ত ও বিষাক্ত পানি *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৬৮-৭০)* আকাশে কোন্ ফ্যাক্টরী বা রিফাইনারীতে পরিশোধন করা হয় এবং শতকরা **১১.১** ভাগ হাইড্রোজেন ও ৮৮.৯ ভাগ অক্সিজেন সমপরিমাণে মিশিয়ে মহাশূন্যে কে পানি তৈরী করেন। কে সেটাকে দূষণমুক্ত ও রিফাইন করেন? অতঃপর সেই লক্ষ-কোটি গ্যালন বিশুদ্ধ পানি আকাশে কোথায় কিভাবে মওজুদ থাকে? কে তাকে মৌসুম মত বহন করে এনে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত ধারায় জমিতে বর্ষণ করে? বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদীদের কাছে এসবের কোন জবাব আছে কি?

হ্যাঁ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যথাক্রমে শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানের নানামুখী আবিষ্কারে হতচকিত হয়ে সাময়িকভাবে অনেক বিজ্ঞানী বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং সবকিছু Amusement of Nature 'প্রকৃতির লীলাখেলা' মনে করতেন। কিন্তু এখন তাদের অধিকাংশের হুঁশ ফিরেছে এবং আলফ্রেড হোয়াইট হেড (১৮৬১-১৯৪৭), আর্থার এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪), জেম্স জীনস (১৮৭৭-১৯৪৬) সহ বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, Nature is alive. 'প্রকৃতি এক জীবন্ত সত্তা'। ডব্লিউ, এন, সুলিভানের ভাষায় বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের সার নির্যাস হ'ল 'The ultimate nature of the universe is mental' 'বিশ্বলোকের চূড়ান্ত প্রকৃতি হ'ল মানসিক'। অর্থাৎ বিশ্বলোক আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি বা এটা কোন বিগব্যাঙ (Big Bang) বা মহা বিস্ফোরণের ফসল নয় বা অন্ধ-বোবা-বধির কোন ন্যাচার বা প্রকৃতি নয়, বরং একজন মহাজ্ঞানী ও কুশলী সৃষ্টিকর্তার মহা পরিকল্পনার ফসল এবং তিনিই হচ্ছেন 'আল্লাহ', যিনি বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। যাঁর পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনায় সবকিছু চলছে *(ইউনুস ১০/৩,৩১, রা'দ ১৩/২, সাজদাহ ৩২/৫)*।

(১) যদি কেউ দ্রুতগতি সম্পন্ন ও দীর্ঘদেহী রেলগাড়ীকে রেল লাইনের উপর দৌড়াতে দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, পেট্রোল ও লোহার ঘর্ষণে আগুন ও বাষ্পের জোরে ওটা আপনা-আপনি চলছে, এর কোন চালক বা আবিষ্কারক নেই, তাহ'লে তাকে কি বলা হবে? যদি সে বলে যে, আমি দূর থেকে চালককে দেখছি না বা আবিষ্কারককে দেখিনি, অতএব আমি এসবে বিশ্বাস করি না। তাহ'লে তাকে কি বলা হবে? (২) বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী কোন ছেলে যদি বলে যে, এককালে এদেশে মোঘল, তুর্কী, বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসন ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না, যেহেতু আমি তা দেখিনি, তাহ'লে তাকে কি বলা যাবে? অনুরূপভাবে যদি কেউ বিশ্বলোক ও সৌরজগত সম্পর্কে ধারণা করে যে, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র সবই এক্সিডেন্টের সৃষ্টি এবং এসব চলছে আপনা-আপনি প্রাকৃতিক নিয়মে, এসবের কোন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা বা বিধানদাতা কখনো ছিল না, এখনো নেই। কারণ তাকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই না। তাহ'লে তাকে কেবল হস্তীমূর্খ ছাড়া আর কি বলা যাবে? (৩) যদি কেউ বলে যে, অমুক প্রেসে বিস্ফোরণ ঘটার ফলে সেখান থেকে আপনা-আপনি বড় বড় অভিধান ও গবেষণা গ্রন্থসমূহ সৃষ্টি হয়েছে ও বের হয়েছে, তাহ'লে সেকথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? (৪) হে

অবিশ্বাসী! তোমার দেহ যে অক্সিজেন, কার্বণ, হাইড্রোজেন প্রভৃতি ৬০ প্রকার প্রাণহীন পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি, ঐ অণুতে জীবনের উষ্ণতা আসে কোত্থেকে? তুমি বা তোমার বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত কি সেই এটম বা অণু দেখতে পেয়েছে? না কেবল অনুমিতি ও ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজ্ঞান তাহ'লে কিভাবে ঐ নিষ্প্রাণ গায়েবী এটমের উপর ঈমান আনলো? পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং চুম্বকের যে প্রবল আকর্ষণী শক্তি, তা কি কেউ কখনো স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছে? নাকি কেবল অনুভূতি ও অনুমিতির মাধ্যমে অমোঘ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে? তাই তো দেখি, প্রায় সকল বিজ্ঞানী একথা বলেন যে, Science gives us but a partial knowledge of reality 'বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়'। তারা স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে থাকেন। তারা বলেন, আমরা কতিপয় বাহ্য প্রকাশকে দেখি মাত্র, মূল বস্তুতে দেখিনা'। ভূগর্ভে ও নভোমণ্ডলে পরিচালিত সকল প্রকারের বিজ্ঞান গবেষণা মূলতঃ অনুমানভিত্তিক।

মুশকিল হ'ল নাস্তিক্যবাদীরা যতই নিজেদেরকে প্রগতিবাদী দাবী করুক না কেন, তারা মূলতঃ বিদ্বেষবশত ধর্মের বিরুদ্ধে ও আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এসব অযৌক্তিক কথা বলেন। তাদের অবিমৃষ্যকারিতায় বিরক্ত হ'য়ে বিজ্ঞানী ড. এ.ভি. হিলি (A.V. Hili) বলেন, I should be the last to claim that we, scientific men, are less liable to prejudice than other educated men. অর্থাৎ 'আমরা বিজ্ঞানীরা অন্যান্য শিক্ষিত লোকদের চাইতে কম বিদ্বেষপরায়ণ- এই দাবী করতে আমি অপারগ'। অথচ বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খৃঃ) বলেছেন, Religion without science is blind and Science without religion is lame. 'বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান পঙ্গু'। আর আখেরী যামানায় সেই ধর্ম হ'ল আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন 'ইসলাম'। অন্য কিছুই নয়।

ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বেচ্ছাচারী জীবনের প্রতি আসক্ত এইসব দুনিয়াপূজারী তথাকথিত আধুনিকতাবাদীরা স্রেফ যিদ ও হঠকারিতাবশত আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত এলাহী বিধান ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। নইলে চূড়ান্ত বিচারে ইচ্ছায় হৌক অনিচ্ছায় হৌক ইসলামের কাছেই সকলকে মাথা নত করতে হচ্ছে এবং হবে। যেমন করে যাচ্ছে আসমান ও যমীনের সবকিছু *(আলে ইমরান ৩/৮৩)*। এমনকি ধর্মদ্রোহী বস্তুবাদীর ঐ মোটা মগযটা শয়তানের তাবেদারী করলেও তার দেহটা ঠিকই আল্লাহ্র আনুগত্য করে। ফলে সে তার বার্ধক্য-জ্বরা ও মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। এ যুগের আইনস্টাইন বলে খ্যাত লণ্ডনের পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (জন্ম : ১৯৪২ খৃঃ) কি এর বড় দৃষ্টান্ত নন? ১৯৬৩ সাল থেকে যার কেবল মাথা ব্যতীত সারা দেহ অবশ হয়ে এযাবত পঙ্গু হয়ে রয়েছে? মেঘমালা সৃষ্টি ও তা থেকে বৃষ্টিবর্ষণ, অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত যমীনকে জীবিত করণের মধ্যেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্বলন্ত প্রমাণ।

(১৫-১৬) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا- وَّجَنَّاتٍ أَلْفَافًا 'যাতে তদ্দারা উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ'। 'এবং ঘনপল্লবিত উদ্যানসমূহ'।

বৃষ্টি বর্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে আল্লাহ বলেন, তার দ্বারা আমি বান্দার জন্য শস্য, উদ্ভিদ ও উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করি। এখানে মানুষ ও গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে প্রধান তিনটি জাতের উৎপন্ন দ্রব্যের নাম করা হয়েছে। যার প্রত্যেকটি স্ব স্ব জাতের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন حَبًّا বা শস্যদানা বলতে চাউল, গম, যব ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। نَبَاتًا বা উদ্ভিদ বলতে নানাবিধ সবজি, ঘাস ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে যা কাঁচা অবস্থায় খেতে হয়। অতঃপর جَنَّاتٍ বা উদ্যান বলতে খেজুর, আঙ্গুর, কলা, আম ইত্যাদি বাগিচাকে বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা আল্লাহ্র এক অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল যে, একই বৃষ্টি দিয়ে তিনি বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন স্বাদের ফল ও ফসল উৎপন্ন করেন। যার মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে *(রা'দ ১৩/৪)*।

উপরে বর্ণিত ৬ হ'তে ১৬ পর্যন্ত ১১টি আয়াত আল্লাহ যমীন ও আসমান এবং তন্মধ্যকার সৃষ্টিকুল বিষয়ে বর্ণনা করেছেন পুনরুত্থান বা ক্বিয়ামতের প্রমাণ হিসাবে। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, মানুষ ছাড়াও এইসব বিশাল সৃষ্টিকে যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন *(বাক্বারাহ ২/১১৭; দাহর ৭৬/১)* এবং কোনরূপ নমুনা বা পূর্বদৃষ্টান্ত ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন *(আম্বিয়া ২১/১০৪)*, তাঁর পক্ষে এটা খুবই সহজ এগুলিকে ধ্বংস করে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা *(রূম ৩০/২৭)*। অতএব মানুষের মত একটা সামান্য প্রাণীর মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটানো তাঁর জন্য খুবই সহজ কাজ। যদিও অবিশ্বাসীরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করে *(ক্বাফ ৫০/২-৩)*। আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ- قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ-

'মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্য ঝগড়াটে'। 'সে আমাদের বিষয়ে নানাবিধ কথা বলে, অথচ নিজের সৃষ্টির কথা সে ভুলে যায়। সে বলে, কে এই সব হাড়-হাড্ডি জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে'? 'তুমি বলে দাও, যিনি প্রথমবার এগুলিকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই এগুলিকে জীবিত করবেন। তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৯)*। উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব এবং আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল ও জীবজগতের লালন-পালন প্রক্রিয়া জানার জন্য মুসলমান শিক্ষার্থীকে সৌরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতে দক্ষতা লাভ করতে হবে। তাতে তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে সে অধিকতর জ্ঞান লাভ করবে। আর দুনিয়াতে সত্যিকারের আল্লাহ প্রেমিক

তিনিই, যিনি স্বীয় প্রেমাস্পদের গুণাবলী সম্পর্কে যথাযথভাবে ওয়াকিফহাল। এজন্যই আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই মাত্র আল্লাহ্কে ভয় করে' *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। এখানে 'জ্ঞানী' বলতে কেবল শরী'আতের জ্ঞান নয়, বরং বিজ্ঞানের জ্ঞানও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বিজ্ঞানকে আরবীতে 'ইলম' (العلم) বলা হয়। তাই আল্লাহভীরু বিজ্ঞানীই হ'তে পারেন আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয়।

৪র্থ বিষয়বস্তু : ক্বিয়ামতের পর চূড়ান্ত শাস্তি ও সুখের বর্ণনা (১৭-৪০)।

(ক) ক্বিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা (১৭-২০ *আয়াত*) :

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتاً، يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجاً، وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً-

'নিশ্চয়ই বিচার দিবস সুনির্ধারিত'। 'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে সমাগত হবে'। 'আর আকাশ খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর তা বহু দরজা বিশিষ্ট হবে'। 'আর পর্বতমালা চালিত হবে। অতঃপর তা মরীচিকা হয়ে যাবে'।

ব্যাখ্যা : সূরা শুরু করা হয়েছে 'মহাসংবাদ' দিয়ে, এক্ষণে তা সংঘটিত হওয়ার সময়কার অবস্থা কেমন হবে, সে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। সৃষ্টি ও লালন-পালন শেষে অতঃপর পৃথিবীর ধ্বংস ও প্রলয়কাল প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, এটা অবশ্যই হবে এবং সুনির্ধারিত তারিখেই হবে। আর সেই তারিখ কেবল আল্লাহ্র ইলমেই রয়েছে *(মুল্ক ৬৭/২৬)*। যদিও বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, আগামী ৫০০ কোটি বছর পর সূর্য দীপ্তিহীন হয়ে যাবে এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক গবেষক গ্রেগরি ল্যাফলিক জানিয়েছেন, আগামী ৫০০ কোটি বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে কক্ষপথ বদলাবে। ফলে এসময় বুধ বা মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। আর তাতেই লুপ্ত হয়ে যাবে প্রাণের অস্তিত্ব। আর তাতে ঘটতে পারে মহাপ্রলয় বা ডুম্সডে (Dooms day)। অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ পেয়েছেন যে, কোন নক্ষত্রের মৃত্যুর সময় সে তার পার্শ্ববর্তী গ্রহকে গিলে ফেলছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যালেক্স উলজজান বলেন, একই ভাগ্য আমাদের পৃথিবীর জন্যও অপেক্ষা করছে। সূর্য তখন 'লোহিত দানবে' পরিণত হবে এবং পৃথিবীকে গিলে ফেলবে। যদিও সেই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটতে এখনো পাঁচশ' কোটি বছর সময় লাগবে'।

আমরা বলব, ক্বিয়ামতের ইল্ম স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে। অন্যের কাছে নয়। বরং তা আসবে আকস্মিকভাবে আল্লাহ্র হুকুমে। যেমন তিনি বলেন, وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ 'আর যারা কুফরী করে তারা (ইসলামে) সন্দেহ করা হ'তে বিরত হবে না, যতক্ষণ না তাদের নিকটে ক্বিয়ামত

এসে পড়বে আকস্মিকভাবে অথবা এসে পড়বে সেই বন্ধ্যা দিনের শাস্তি (যাতে সামান্যতম স্বস্তি নেই)। *(হজ্জ ২২/৫৫)*।

(১৭) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا 'নিশ্চয়ই বিচার দিবস সুনির্ধারিত'। يَوْمَ الْفَصْلِ অর্থ 'ফায়ছালার দিন'। আর তা হ'ল ক্বিয়ামতের দিন। কেননা ঐদিন আল্লাহ বান্দার ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের বিচার-ফায়ছালা করবেন। كَانَ مِيْقَاتًا অর্থ موقتا لأجل معدود গণিত সময়সীমা যা নির্ধারিত, যেখান থেকে কোনরূপ কমবেশী হবে না। আল্লাহ বলেন, وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَعْدُوْدٍ 'আর আমরা ক্বিয়ামতের দিনটাকে কিছুকালের জন্য স্থগিত রেখেছি মাত্র' *(হূদ ১১/১০৪)*। এখানে সরাসরি يَوْمَ الْقِيَامَةِ বা 'ক্বিয়ামতের দিন' না বলে يَوْمَ الْفَصْلِ বা 'বিচারের দিন' বলার মাধ্যমে ক্বিয়ামতের মূল উদ্দেশ্যকেই সামনে আনা হয়েছে এবং বান্দাকে পরকালীন জওয়াবদিহিতার বিষয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। যাতে সে দুনিয়াতে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

(১৮) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجاً 'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে সমাগত হবে'। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন।

অন্য আয়াতে দু'বার ফুঁক দেয়ার কথা এসেছে *(ইয়াসীন, ৩৬/৪৯,৫১; যুমার ৩৯/৬৮)*। প্রথম ফুঁকের আওয়াজে সবার মৃত্যু হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁকের আওয়াজে সবাই জীবিত হবে ও কবর থেকে বেরিয়ে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র নিকটে জমা হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, উভয় ফুঁকের মধ্যবর্তী সময়কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, চল্লিশ। কিন্তু এই চল্লিশ দিন, মাস, না বছর তা বলতে তিনি অস্বীকার করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, আল্লাহ ঐ সময় এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার স্পর্শে মরা-সড়া নিশ্চিহ্ন মানুষ সব বেঁচে উঠবে স্ব স্ব মেরুদণ্ডের নিম্নদেশের অস্থিখণ্ড (عَجْبُ الذَّنْبِ) অবলম্বন করে। কেননা মানুষের অস্থিসমূহের ঐ অংশটুকু বিনষ্ট হবে না'।[৬৯] যদি কেউ বলেন, আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করার পর তার দেহের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সে অবস্থায় কিসের অবলম্বনে সেদিন মানুষের দেহ গঠিত হবে? জওয়াব এই যে, এটি স্বাভাবিক কবরের লাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এক্ষণে পুড়িয়ে ভস্ম করার অস্বাভাবিক অবস্থার সময়কার জবাব এই যে, মানবদেহের সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তার মূল অণুবীজ, কখনো নিশ্চিহ্ন হয় না। তাকে অবলম্বন করে দেহ গঠিত হ'তে পারে। যেমন দুনিয়াতে মায়ের গর্ভে পিতার শুক্রাণুকে ঘিরে দেহ গঠিত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্র জন্য তো কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না।

---

৬৯. বুখারী হা/৪৯৩৫, মুসলিম হা/২৯৫৫, মিশকাত হা/৫৫২১।

(১৯) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا 'আর আকাশ খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর তা বহু দরজা বিশিষ্ট হবে'।

আসমান অত্যন্ত সুরক্ষিত। যা ভেদ করে যে কেউ উপরে উঠতে পারে না। প্রত্যেক আসমানে রয়েছে দরজাসমূহ এবং রয়েছে দাররক্ষী ফেরেশতাগণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে মে'রাজে গমনের সময় জিব্রীল (আঃ) সপ্ত আকাশের প্রত্যেক দরজায় প্রবেশের পূর্বে দাররক্ষী ফেরেশতার অনুমতি নিয়েছিলেন।[৭০] ক্বিয়ামতের দিন যখন আসমান বিদীর্ণ হবে, তখন দরজাসমূহ দিয়ে ফেরেশতাদের দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হবে *(ফুরক্বান ২৫/২৫)*। এই বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ দরজা সমূহ খুলে দেওয়া। দ্বিতীয় ফুঁকদানের পর আসমান ও যমীন পুনরায় বহাল হয়ে যাবে এবং নতুন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হবে ও সকল মানুষ মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। নতুন সেই পৃথিবী সমতল হবে। তাতে কোনরূপ বক্রতা বা উঁচু-নীচু থাকবে না *(ত্বোয়াহা ২০/১০৬-১০৭)*।

(২০) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا 'আর পর্বতমালা চালিত হবে। অতঃপর তা মরীচিকা হয়ে যাবে'।

বিশাল ও সুদৃঢ় পর্বতমালা ঐদিন মরীচিকার ন্যায় অস্তিত্বহীন বস্তুতে পরিণত হবে, যা ধূনিত তুলার ন্যায় হয়ে যাবে *(ক্বারে'আহ ১০১/৫)* এবং সমূলে উৎপাটিত হয়ে মেঘখণ্ড সমূহের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে চালিত হবে *(ত্বোয়াহা ২০/২০৫; নমল ২৭/৮৮)*।

মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ বলেন,

أَلاَ كُلُّ شَيْئٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلٌ + وَكُلُّ نَعِيْمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِلٌ

'মনে রেখ আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুই বাতিল। আর প্রত্যেক নে'মত অবশ্যই ধ্বংসশীল'। তবে শেষের অংশটি হাদীছে নেই এবং এটি লাবীদের কি-না সেবিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কবিতাংশটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট খুবই প্রিয়। তিনি বলেন,

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٌ : أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ

'কবিরা যত কবিতা বলেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথা হ'ল লাবীদের কথা : আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই বাতিল'।[৭১]

উল্লেখ্য যে, লাবীদ পরে ইসলাম কবুল করেন ও কবিতা ছেড়ে দেন। ৪১ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উপরের চারটি আয়াতে ক্বিয়ামত সংঘটনকালের ভয়ংকর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর বিচার শেষে জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বলেন,

---

৭০. বুখারী হা/৩৪৯, মুসলিম হা/১৬৩, মিশকাত হা/৫৮৬৪।
৭১. বুখারী হা/৩৮৪১, মুসলিম হা/২২৫৬, মিশকাত হা/৪৭৮৬ 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ।

৪ (খ) ক্বিয়ামতের পর জাহান্নামীদের শাস্তি (২১-৩০) :

(২১-২২) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، لِّلْطَّاغِيْنَ مَآباً 'নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে'। 'সীমালংঘনকারীদের ঠিকানা রূপে'।

مِرْصَادٌ অর্থ ঘাঁটি, যেখানে বসে কারু অপেক্ষা করা হয়। জাহান্নাম হবে ঘাঁটি কাফির-মুশরিক ও সীমালংঘনকারী ফাসিক-মুনাফিকদের জন্য। আল্লাহ বলেন, وَإِن مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً 'আর তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (অর্থাৎ পুলছিরাত) অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত' *(মারিয়াম ১৯/৭১)*। হাসান বছরী ও ক্বাতাদাহ বলেন, إن على النار رَصَدًا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه، فمن جاء بجواز جاز، ومن لم يجئ بجواز حبس– 'জাহান্নামের উপরে সেতু রয়েছে। সেটা অতিক্রম না করে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এখানে যে ব্যক্তি পার হওয়ার অনুমতিসহ আসবে, সে ব্যক্তি অতিক্রম করবে। আর যে ব্যক্তি সেটা নিয়ে আসতে পারবে না, সে আটকে যাবে' *(কুরতুবী)*। বস্তুতঃ জাহান্নামের উপরের এই পুলকেই বলা হয় الصِّرَاطُ বা 'পুলছেরাত'। যা অতীব সূক্ষ্ম ও অতীব ধারালো। জাহান্নামী ব্যক্তি তা পার হ'তে গিয়ে আটকে যাবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। পক্ষান্তরে জান্নাতীগণ স্বচ্ছন্দে চোখের পলকে পার হয়ে যাবে এবং তারা কোনরূপ অগ্নিতাপ অনুভব করবে না।[৭২] আল্লাহ আমাদেরকে পুলছেরাত পার হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন! উল্লেখ্য যে, ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে রোমকদের বিরুদ্ধে মুতার যুদ্ধে রওয়ানার সময় সম্ভাব্য শহীদ সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা উক্ত আয়াত পাঠ করে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন ও সবার নিকটে দো'আ চেয়েছিলেন যেন তিনি ওটা পার হ'তে পারেন।

(২৩) لاَبِثِيْنَ فِيْهَا أَحْقَابًا 'সেখানে তারা অবস্থান করবে যুগ যুগ ধরে'।

অর্থাৎ কাফির-মুশরিকগণ জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।[৭৩] আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন *(নিসা ৪/১৪০)* বরং মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তারা কোনরূপ সাহায্য পাবে না *(নিসা ৪/১৪৫)*। আর এই চরম শাস্তির একমাত্র কারণ হ'ল তাদের কপটতাপূর্ণ আচরণ এবং সীমালংঘন ও হঠকারিতা, যা তারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ও আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের বিরুদ্ধে দুনিয়াতে করেছিল।

---

৭২. বুখারী হা/৭৪৩৯, মুসলিম হা/১৮৩, মিশকাত হা/৫৫৭৯ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ-৪।
৭৩. আহযাব ৩৩/৬৪; যুমার ৩৯/৭১-৭২; তাগাবুন ৬৪/১০; নিসা ৪/৪৮, ১১৬; মায়েদাহ ৫/৭২।

أَحْقَابًا বহুবচন। অর্থ دهورا متتابعة غير نهاية 'পরপর সীমাহীন যুগসমূহ'। একবচনে حُقُبٌ অর্থ 'যুগ' বা দীর্ঘ সময়কাল। এখানে دهور না বলে أحقاب বলার কারণ এই যে, আরবদের নিকটে حُقُبٌ শব্দটাই 'দূরতম সময়কাল' বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হ'ত। বহুবচন ব্যবহারের উদ্দেশ্য হ'ল- যখন একটা যুগ শেষ হবে তখন আরেকটা যুগ শুরু হবে। এইভাবে চিরকাল তারা জাহান্নামে থাকবে। হাসান বছরী বলেন, এর অর্থ হ'ল خلود বা 'চিরকাল'। 'যার কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই'। এক হুক্ববার (حقبة) সময়কাল দুনিয়ার হিসাবে ২ কোটি ৮৮ বছর বা তার কম ও বেশী মর্মে যতগুলি বর্ণনা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, সবগুলিই হয় 'বানোয়াট' (موضوع), অথবা 'অত্যন্ত দুর্বল' (ضعيف جدًا) সূত্রে বর্ণিত। অতএব হুক্ববার সঠিক অর্থ সেটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কুরতুবী, ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী, তানতাভী সকলে একই অর্থ বর্ণনা করেছেন।

(২৪) لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْداً وَّلاَ شَرَاباً 'যেখানে তারা আস্বাদন করবে না শীতলতা কিংবা পানীয়'।

অর্থাৎ জাহান্নামে তারা শীতলকারী কোন বায়ু বা দেহ পুষ্টকারী কোন পানীয় পাবে না। اَلْبَرْدُ অর্থ الرَّوح والراحة 'ঠাণ্ডা বাতাস ও শান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রা'। সব অর্থই পরস্পরের পরিপূরক। এ কারণেই বলা হয় منع البردُ البردَ 'শীত ঘুম নষ্ট করেছে'।

(২৫) إِلاَّ حَمِيْماً وَّغَسَّاقاً 'কেবল ফুটন্ত পানি ও দেহনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত'। পূর্বের বাক্য থেকে استثناء منقطع অথবা بدل হয়েছে। অর্থাৎ শীতল বায়ু ও উত্তম পানীয়ের বদলে তারা পাবে ফুটন্ত পানি ও দেহনিঃসৃত পুঁজ। الغَسَّاق অর্থ صديدُ أهلِ النار وقَيْحُهم 'জাহান্নামীদের দেহনিঃসৃত ঘাম ও পুঁজ-রক্ত সমূহ'।

(২৬) جَزَاءً وِّفَاقاً 'যথার্থ কর্মফল হিসাবে'।

এখানে جَزَاءً যবরযুক্ত হয়েছে مصدر হিসাবে। অর্থাৎ جزاء موافقة أعمالهم فى الدنيا 'দুনিয়াতে তাদের কর্ম অনুযায়ী যথাযথ প্রতিফল'। মুক্বাতিল বলেন,

وَافَقَ الْعَذَابُ الذَّنْبَ فَلاَ ذَنْبَ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ وَلاَ عَذَابَ أَعْظَمُ مِنَ النَّارِ–

'শাস্তি হবে পাপ অনুযায়ী। আর শিরকের চাইতে বড় পাপ আর নেই এবং জাহান্নামের চাইতে বড় শাস্তি আর নেই'। أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه 'আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে ও করুণায় আমাদেরকে উক্ত শাস্তি থেকে রেহাই দিন'- আমীন!

(২৭-২৮) إِنَّهُمْ كَانُوْا لاَ يَرْجُوْنَ حِسَاباً، وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً 'নিশ্চয়ই তারা (আখেরাতে) জওয়াবদিহিতার আশা করত না'। 'এবং তারা আমাদের আয়াতসমূহে পুরাপুরি মিথ্যারোপ করত'।

এখানে لاَ يَرْجُوْنَ অর্থ لا يخافون অথবা لا يعتقدون 'তারা ভয় করত না বা ধারণা করত না'। দু'টির অর্থ একই। حِسَاباً অর্থ مُحَاسَبَةً عَلَى أَعْمَالِهِمْ 'তাদের আমলের হিসাব-নিকাশ বা জওয়াবদিহিতা'। শুধু তাই নয়, তারা আখেরাতকে পুরোপুরি মিথ্যা মনে করত। অতএব وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ 'দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য' *(মুরসালাত ৭৭/১৫)*।

শাস্তির কারণ :

জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনার পর এক্ষণে আল্লাহ তাদের শাস্তির কারণ ব্যাখ্যা করছেন। আর তা হ'ল তাদের অবিশ্বাস ও মিথ্যারোপ। মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রধান দু'টি শক্তি দান করেছেন। ধারণাশক্তি ও কর্মশক্তি। ধারণাশক্তি দ্বারাই কর্মশক্তি পরিচালিত হয়। ধারণা বা আক্বীদা সুন্দর হ'লে কর্ম সুন্দর হয়। নইলে তার বিপরীত হয়। আক্বীদা ও আমল দু'টিই যাতে আল্লাহমুখী হয়, সেজন্য ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করেছেন, رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(শো'আরা ২৬/৮৩)*। একইভাবে সুলায়মান (আঃ) নিজের জন্য দো'আ করেছেন, رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম সমূহ করতে পারি। আর তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নমল ২৭/১৯)*।

এই ধারণা বা চিন্তাশক্তিকে শয়তানী জ্ঞান অথবা ইলাহী জ্ঞান দু'টির যেকোন একটির দ্বারা সজ্জিত করার স্বাধীনতা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন *(দাহর ৭৬/৩)*। যা তিনি অন্য কোন প্রাণীকে দেননি। আর এই স্বাধীনতা দেওয়ার কারণ হ'ল মানুষকে পরীক্ষা করা যে কে দুনিয়াতে সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদন করে *(মুল্ক ৬৭/২)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ দু'দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। প্রথমতঃ তাদের ধারণায় একথা আসেনি যে, মৃত্যুর পরে তাদের পুনরুত্থান হবে এবং আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের সকল কর্মের হিসাব দিতে হবে। শয়তানের তাবেদারী করতে গিয়ে তারা এই বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। ফলে তাদের সমস্ত কাজকর্ম হয়েছিল স্বেচ্ছাচারমূলক। যদিও তারা

এগুলিকেই উত্তম কাজ মনে করত *(কাহফ ১৮/১০৩-০৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ كَانَ فِيْ هَـــذِه أَعْمَى فَهُوَ فِيْ الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيْلاً– ‘যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে অন্ধ, সে ব্যক্তি আখেরাতেও অন্ধ এবং সর্বাধিক পথভ্রষ্ট’ *(ইসরা ১৭/৭২)*। অর্থাৎ হঠকারী ও জ্ঞানান্ধ হওয়ার কারণে সে দুনিয়াতে সঠিক পথ খুঁজে পায়নি। ফলে আখেরাতেও সে অন্ধ হয়ে উঠবে *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)* এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে *(ঐ, ১২৬)*।

(২৮) وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا অর্থ وكذبوا بآياتنا تكذيباً ‘তারা আমাদের আয়াত সমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করেছিল’। আল্লাহ প্রেরিত কিতাব এবং নবীদের হেদায়াতসমূহকে তারা অগ্রাহ্য করেছিল।

آيات অর্থ কুরআনের আয়াতসমূহ এবং আল্লাহ্র সৃষ্টি ও নিদর্শনসমূহ- যা সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ হিসাবে মানুষের সামনে মওজুদ রয়েছে। মনের চোখ দিয়ে দেখলে যেকোন জ্ঞানী ব্যক্তি যেকোন সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ দেখতে পাবেন। যেমন শিল্পের মধ্যে শিল্পীর নিদর্শন ফুটে ওঠে। কিন্তু বস্তুবাদী মানুষ অন্যায় যিদ ও হঠকারিতা বশে আল্লাহ ও আখেরাতকে সর্বদা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করে থাকে।

শয়তানী প্ররোচনায় মানুষ একসময় আল্লাহকে অস্বীকার করে বসে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَأْتِى الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ– ‘শয়তান তোমাদের কারু কাছে এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? অবশেষে সে বলে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন শয়তান এ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন সে যেন আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চায় এবং ঐ ব্যক্তির সাথে তর্ক করা থেকে বিরত হয়’। অন্য বর্ণনায় এসেছে সে যেন বলে, ‘আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।[৭৪]

ওছমান বিন আবুল ‘আছ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, মনের মধ্যে শয়তানের খটকা বুঝতে পারলে সাথে সাথে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করে *আ‘ঊযুবিল্লাহ* পড়বে ও বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। তাতে শয়তান চলে যাবে’।[৭৫] সকল যুগের নাস্তিক ও বস্তুবাদীরা মানবরূপী শয়তান হিসাবে অন্য মানুষকে আল্লাহ ও আখেরাত থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নানারূপ তর্ক ও ধোঁকার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে থাকে। এদের বক্তব্য ও লেখনী থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ।

(২৯) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً ‘আর আমরা তাদের সকল কর্ম গণে গণে লিপিবদ্ধ করেছি’।

৭৪. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬৫-৬৬ ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘মনের খটকা’ অনুচ্ছেদ।
৭৫. মুসলিম হা/২২০৩, মিশকাত হা/৭৭।

এখানে كُلَّ যবরযুক্ত হয়েছে উহ্য ক্রিয়ার কর্ম হিসাবে। اَلْحَصٰي অর্থ 'কংকর'। সেখান থেকে أَحْصٰي يُحْصِيْ إِحْصَاءً 'গণনা করা'। যেমন أَحْصَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ 'আমরা সবকিছু গণনা করেছি'। এক্ষণে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে كَتَبْنَاهُ كِتَابًا 'আমরা কিতাবে অর্থাৎ আমলনামায় সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছি'। প্রত্যেক বান্দার জন্য লেখক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। যারা সর্বাবস্থায় বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করে থাকে' *(ইনফিত্বার ৮২/১০-১১)*। আর আল্লাহ কোন অবস্থায় বান্দা থেকে গাফেল থাকেন না *(বাক্বারাহ ২/৭৪, ৮৫ প্রভৃতি)*। তিনি বলেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ- 'স্মরণ রেখ, দু'জন ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করে'। 'মানুষ যে কথাই মুখে উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই সদা প্রস্তুত রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)*।

(৩০) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا 'অতএব তোমরা স্বাদ আস্বাদন কর। আর আমরা এখন তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি করব না কেবল শাস্তি ব্যতীত'।

জাহান্নামীদের শাস্তিদান বিষয়ে এটি কুরআনের সম্ভবতঃ সর্বাধিক ভীতিকর আয়াত। কেননা এখানে বলা হয়েছে যে, আমরা জাহান্নামীদের কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করব। তাদের প্রতি কখনোই কোনরূপ দয়া বা শিথিলতা প্রদর্শন করব না। তাদের আযাব কেমন হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, إِذِ الْأَغْلاَلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ، فِيْ الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِيْ النَّارِ يُسْجَرُوْنَ- 'যখন বেড়ী ও শৃংখল তাদের গলদেশে পরিয়ে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে'। 'ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে' *(মুমিন ৪০/৭১-৭২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْداً غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا-

'যারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, সত্বর আমরা তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। যেখানে তাদের দেহের চামড়াগুলো যখনই জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হবে, তখনই অন্য চামড়া দিয়ে তা বদলে দেব। যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' (*নিসা ৪/৫৬*)। এভাবেই চলতে থাকবে চিরকাল। এগুলো হবে স্রেফ তাদের অবাধ্যতা ও দুষ্কর্মের মর্মান্তিক প্রতিফল।

২৭ ও ২৮ আয়াতে জাহান্নামীদের নষ্ট আক্বীদার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং ২৯ ও ৩০ আয়াতে তাদের অন্যায় কর্মের মন্দ ফলাফল বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ 'তোমরা কি ভেবেছ যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না'? *(মুমিনূন ২৩/১১৫)*।

আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং জীবনের সকল হিসাব পেশ করতে হবে। অতএব জ্ঞানীগণ সাবধান! যেন ক্বিয়ামতের দিন আমাদের লজ্জিত হ'তে না হয়। আল্লাহ বলেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِيْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً- يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً- لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلاً- وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا-

'যেদিন যালেম ব্যক্তি নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি আমি (দুনিয়াতে) রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম'! 'হায় দুর্ভোগ! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকটে উপদেশ (কুরআন) আসার পরে। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক'। 'রাসূল সেদিন বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/২৭-৩০)*।

৪ (গ) ক্বিয়ামতের পর জান্নাতীদের পুরস্কার ***(৩১-৪০)*** **:**

২১-৩০ পর্যন্ত ১০টি আয়াতে জাহান্নামীদের শাস্তি বর্ণনা শেষে ৩১ থেকে ৪০ পর্যন্ত সূরার শেষ ১০টি আয়াতে জান্নাতীদের পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা রীতির অন্যতম হ'ল তার مَثَانِىْ রীতি অর্থাৎ পরপর বিপরীতমুখী বর্ণনা। ফলে যেখানেই ঈমানের বর্ণনা, তার পরেই আসে কুফরের বর্ণনা। যেখানেই জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা, তার পরেই আসে জান্নাতের পুরস্কারের বর্ণনা। এখানে সেই রীতিই অনুসৃত হয়েছে, যা কুরআনের শুরু থেকেই রয়েছে। বান্দা দুনিয়াতে যেসব বস্তুকে দেখে এবং যেগুলিকে সর্বাধিক আনন্দদায়ক মনে করে, সেগুলিকেই নমুনাস্বরূপ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে তারা সেদিকে আকৃষ্ট হয়। নইলে দুনিয়ার সর্বাধিক আকর্ষণীয় বস্তুও জান্নাতের কোন বস্তুর সাথে তুলনীয় নয়। জান্নাতের বস্তুসমূহ সম্পর্কে হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَىَ قَلْبِ بَشَرٍ- 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) প্রস্তুত করে রেখেছি এমন সব আনন্দদায়ক বস্তু, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের কল্পনায় যা কখনো আসেনি'।[৭৬] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- 'কোন (ঈমানদার) ব্যক্তি জানে না তার সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে কি ধরনের চক্ষুশীতলকারী প্রতিদান সমূহ (আমার নিকটে) লুক্কায়িত রয়েছে' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।

---

৭৬. বুখারী হা/৪৭৭৯, মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হা/৫৬১২ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়-২৮ 'জান্নাত ও তার অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-৫।

দুনিয়াতে শাস্তি ও পুরস্কার দু'ধরনের হয়ে থাকে। মনোগত ও বস্তুগত। আখেরাতেও অনুরূপ হবে। আলোচ্য সূরার শেষাংশে **৩১** হ'তে ৩৬ পর্যন্ত ৬টি আয়াতে পরকালে নেককার বান্দাদের জন্য বস্তুগত পুরস্কারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

(৩১) إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازاً 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে সফলতা'।

আল্লাহভীরু সৎকর্মশীল বান্দাগণ চোখের পলকে পুলছেরাত পার হ'তে সক্ষম হবেন। আর এটা হবে দুনিয়াতে তাদের আল্লাহ্র অবাধ্যতা হ'তে বিরত থাকার এবং তাঁর দেওয়া বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার অনন্য পুরস্কার। مَفَازٌ অর্থ موضع فوزٍ ونجاةٍ وخلاصٍ مما فيه اهلُ النار 'সফলতা, মুক্তি ও দোযখবাসীদের শাস্তি সমূহ হ'তে মুক্ত স্থান'। এজন্য পানিশূন্য ময়দানকে مَفَازَةٌ বলা হয় *(কুরতুবী)*।

اَلتَّقْوَى অর্থ التوقى مما يكره 'অপসন্দনীয় বস্তু থেকে বিরত থাকা'। এর মূল ধাতু হ'ল وَقْوَى، وِقَايَةٌ، تُقَاةٌ যার অর্থ 'বিরত থাকা'। واو-কে تاء করে تقوى করা হয়েছে। শারঈ অর্থে 'ইসলাম' বিরোধী কর্ম থেকে বিরত থাকা'। رَجُلٌ تَقِيٌّ অর্থ ভীরু ব্যক্তি। পারিভাষিক অর্থে 'আল্লাহভীরু ব্যক্তি'। মুমিনের চাইতে মুত্তাক্বী এক দর্জা উপরে, যিনি নিজের সৎকর্ম সমূহের মাধ্যমে ও খালেছ দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন *(কুরতুবী)*। মুত্তাক্বী ব্যক্তি লাগামবদ্ধ প্রাণীর ন্যায় নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেন। তিনি যা খুশী বলতে বা করতে পারেন না। তিনি সর্বদা অন্যায় ও অপসন্দনীয় কর্ম হ'তে বিরত থাকেন। কথিত আছে যে, একবার ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আপনি কি কখনো কাঁটা বিছানো পথে চলেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চলেছি। উবাই (রাঃ) বললেন, কিভাবে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বললেন, খুব সাবধানে কষ্টের সাথে চলেছি। উবাই (রাঃ) বললেন, فذلك التقوى 'ওটাই হ'ল তাক্বওয়া' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(৩২) حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً 'রয়েছে উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুর সমূহ'।

অর্থাৎ তাদের সফলতার প্রতিদান স্বরূপ রয়েছে খেজুর-আঙ্গুর ইত্যাদি ফল-ফলাদির বাগিচাসমূহ। এখানে আঙ্গুরসমূহ অর্থ আঙ্গুর বাগিচাসমূহ।

(৩৩) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا 'আর সমবয়সী কুমারীগণ'।

كَوَاعِبَ বহুবচন। একবচনে كَاعِبٌ অর্থ নবোদ্ভিন্ন তরুণী। الأتراب অর্থ الأقران فى السن 'সমবয়সী'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন পুরুষ ও নারী সকলের বয়স ৩০ বা ৩৩ বছরের হবে।[৭৭] হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ

৭৭. তিরমিযী হা/২৫৪৫ 'জান্নাত বাসীদের বয়স' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৬৩৯।

(ছাঃ) গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার নিকটে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? আমি বললাম, উনি সম্পর্কে আমার খালা হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَجُوْزٌ 'কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। একথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগল। আয়েশা (রাঃ) এই খবর গিয়ে জানালে রাসূল (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, ঐ সময় সকল নর-নারী যৌবনপ্রাপ্ত হবে।[৭৮] এর মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর বাক্যরসের প্রমাণ পাওয়া যায়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আয়াত পাঠ করলেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً 'আমরা জান্নাতী রমণীদের সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে'। 'আমরা তাদেরকে তৈরী করেছি কুমারী হিসাবে'।[৭৯]

অন্য আয়াতে এই নারীদের 'হূর' (حُوْرٌ) বলা হয়েছে *(রহমান ৫৫/৭২; ওয়াকি'আহ ৫৬/২২)*।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, কুরআনে পুরুষদের জন্য হূর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নারীদের জন্য কি দেওয়া হবে, তা বলা হয়নি, এর কারণ কি? উত্তর এই যে, পুরুষেরা নারীদের প্রতি অধিক আসক্ত (Active) বিধায় তাদের কথাটাই বলা হয়েছে গুরুত্ব দিয়ে। নইলে পুরুষ ও নারী প্রত্যেকে তাদের চাহিদামতে সবকিছু জান্নাতে পাবে *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩১)*।

(৩৪) وَكَأْساً دِهَاقاً 'এবং পূর্ণ পানপাত্র'।

كَأْسًا অর্থ পেয়ালা যা জান্নাতী শরাবের জন্য তৈরীকৃত। دِهَاقًا অর্থ পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ, যা বারবার ঝালিয়ে পরিছন্ন করা হয়। أدهقتُ الكأسَ أى ملأتُها অর্থ 'আমি পেয়ালা ভালভাবে পূর্ণ করেছি'। এক্ষণে كَأْساً دِهَاقاً অর্থ كأس خمر ذات دهاق 'শরাবপাত্র, যা পরিপূর্ণ'। নিঃসন্দেহে সেই শরাবের স্বাদ-গন্ধ ও কার্যকারিতা দুনিয়ার শরাবের মত হবে না। বরং তা জান্নাতী ব্যক্তিকে নিষ্কাম আনন্দে উদ্বুদ্ধ করবে।

(৩৫) لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْواً وَّلاَ كِذَّاباً 'তারা সেখানে কোনরূপ অনর্থক ও মিথ্যা কথা শুনবে না'।

অর্থাৎ জান্নাতী শরাব পান করার ফলে তাদের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিতে কোন তারতম্য হবে না এবং তারা কোনরূপ বাজে ও অনর্থক কথা বলবে না। যেরূপ দুনিয়াতে শরাব পানের ফলে হয়ে থাকে। তারা সেখানে পরস্পরে মিথ্যারোপ করবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, لاَ لَغْوٌ فِيْهَا وَلاَ تَأْثِيْمٌ 'সেখানে কোন বেফায়দা কথা নেই বা (মিথ্যাচারের) পাপ নেই' *(তূর ৫২/২৩)*। বরং জান্নাত হ'ল 'দারুস সালাম' বা 'শান্তির নীড়'। আল্লাহ বলেন,

---

৭৮. তিরমিযী হা/২৫৩৯।

৭৯. ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৩৬-৩৭; শামায়েলে তিরমিযী হা/২০৫; সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৮৭; রাযীন, মিশকাত হা/৪৮৮৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-২৫ 'রসিকতা' অনুচ্ছেদ-১২।

لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ 'তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে শান্তির গৃহ। আর তিনিই তাদের অভিভাবক তাদের সৎকর্মের কারণে' *(আন'আম ৬/১২৭)*। সেখানে সকল কথা ও কাজ হবে ত্রুটিমুক্ত। তিনি বলেন, لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيْماً، إِلاَّ قِيْلاً سَلاَماً سَلاَماً 'সেখানে কেউ কোন অনর্থক ও পাপের কথা শুনবে না'। 'কেবলই শুনবে সালাম আর সালাম (শান্তি আর শান্তি)'। *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২৫-২৬)*।

(৩৬) جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً 'এটা তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যথোচিত প্রতিদান'। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত পুরস্কারসমূহ তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে তার নেক বান্দাদের জন্য সৎকর্মের বস্তুগত প্রতিদান। আয়াতে বর্ণিত عَطَاءً ও حِسَاباً একই অর্থ বদলা ও দান।

حِسَابًا অর্থ كثيرًا বহু বা পরিপূর্ণ। যেমন আরবগণ বলে থাকেন, أعْطانى فأحسبنى 'তিনি আমাকে দান করলেন, অতঃপর পরিপূর্ণ করে দিলেন'। أحسبت فلانا অর্থ كثَّرت له العطاءَ 'আমি তাকে বেশী করে দান করলাম'। حَسْبِيَ اللهُ অর্থ اللهُ كَافِىٌّ لِيْ 'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট'।

বাক্যের শুরুতে جَزَاءً উহ্য ক্রিয়ার মাছদার হওয়ায় যবরযুক্ত হয়েছে। এক্ষণে আয়াতে বর্ণিত বাক্যের পূর্ণ রূপ হ'ল- جزاهم جزاءً من ربك جزاءً حسابًا أى كَافِيًا وَافِرًا 'তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে তাদের বদলা দেওয়া হবে বেশী করে পরিপূর্ণরূপে'। এই পুরস্কার কত হবে সে বিষয়ে কুরআনে প্রতিটি নেক আমলের জন্য ১০ গুণ *(আন'আম ৬/১৬০)*, ৭০০ গুণ *(বাক্বারাহ ২/২৬১)* এমনকি কারু কারু ক্ষেত্রে 'বেহিসাব' *(যুমার ৩৯/১০)* নেকীর কথা বলা হয়েছে। এটা সৎকর্মের মান হিসাবে (حسب أعمالهم) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন বিষয়। তাঁকে বাধ্য করার কেউ নেই এবং তিনি কোন নিয়মের বাধ্য নন। 'তিনি যাকে যত খুশী পুরস্কার দিয়ে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*।

(৩৭) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحْمَنِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَاباً 'যিনি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়। কেউ তাঁর সাথে কথা বলার ক্ষমতা রাখে না'।

অত্র আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্য মানসিক আযাবের খবর দেওয়া হয়েছে। মুমিনগণ আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর সাথে কথা বলতে পারবেন *(হূদ ১১/১০৫)* কিংবা কারু জন্য সুফারিশ করতে পারবেন *(বাক্বারাহ ২/২৫৫; ত্বোয়াহা ২০/১০৯)*। কিন্তু কাফির-মুশরিক ও

মুনাফিকদের এই সুযোগ দেওয়া হবে না। এমনকি তাদের চোখ অন্ধ করে দেওয়া হবে *(ইসরা ১৭/৭২; ত্বোয়াহা ২০/১২৪)* এবং তারা আল্লাহকে সামনা-সামনি দেখার মহা সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذ لَمَحْجُوْبُوْنَ 'কখনোই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক হ'তে পর্দার অন্তরালে থাকবে' *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/১৫)*। আল্লাহ্কে দেখার মত সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হওয়া ও তাঁকে সামনে পেয়েও কথা বলার ও নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ থেকে মাহরূম হওয়া এবং তার জন্য কারু কোন সুফারিশ করার এখতিয়ার না থাকার চাইতে মর্মান্তিক কোন মানসিক শাস্তি আর হ'তে পারে কি? আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

(৩৮) يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفاًّ لاَّ يَتَكَلَّمُوْنَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً

'যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে'।

এখানে 'কথা বলতে পারবে না' অর্থ সুফারিশ করতে পারবে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه 'কে আছে যে আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত'? *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। অতঃপর وَقَالَ صَوَابًا 'সে সঠিক কথা বলবে' অর্থ *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলবে। অর্থাৎ ঐদিন সুফারিশ হবে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খাঁটি মনে তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছে।

অত্র আয়াতের শেষাংশে ঐ সকল লোকদের জন্য মানসিক প্রশান্তি ও বিশেষ অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে, إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ 'যাদেরকে আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিবেন'। নিঃসন্দেহে তারা হবেন ঐ সকল ভাগ্যবান ঈমানদার ব্যক্তি, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র উপরে সর্বাবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন। এটা হবে তাদের জন্য জান্নাতে প্রদত্ত বস্তুগত পুরস্কারের বাইরে বাড়তি মানসিক প্রশান্তির পুরস্কার।

আয়াতে বর্ণিত 'রূহ' (اَلرُّوْحُ) শব্দের ব্যাখায় বিদ্বানগণের পক্ষ হ'তে আট প্রকারের বক্তব্য এসেছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বনু আদমের রূহসমূহ। শা'বী, যাহহাক প্রমুখ বলেছেন, জিব্রীল। কেউ বলেছেন, কুরআন। কিন্তু ইবনু জারীর ত্বাবারী কোনটিতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারেননি। ইবনু কাছীর বলেন, والأشبه- والله أعلم- أنهم بنوآدم 'সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ হ'ল- বনু আদম। তবে আল্লাহ ভাল জানেন' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ ঐদিন ফেরেশতা ও ঈমানদার আদম সন্তানগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে আল্লাহ্র সম্মুখে।

(৩৯) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ‘সে দিবস সুনিশ্চিত। অতঃপর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার প্রতি ঠিকানা নির্ধারণ করুক’।

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ অর্থ الكائن الواقع لامحالة ‘যা অবশ্যই সংঘটিত হবে, যে দিবসে কোনরূপ সন্দেহ নেই’। ‘অতঃপর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তার নেক আমলের মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর কাছে ঠিকানা নির্ধারণ করুক’। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ– ‘তোমরা ভয় কর সেইদিনকে, যেদিন তোমরা ফিরে যাবে আল্লাহ্র কাছে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমল অনুযায়ী যথাযথ বদলা পাবে এবং তাদের উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না’ *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

‘জান্নাতে’ ঠিকানা নির্ধারণের কথা না বলে ‘তার পালনকর্তার প্রতি ঠিকানা নির্ধারণ করুক’ বলার মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই হ’ল প্রধান কাম্য। জান্নাত হ’ল তার ফলাফল মাত্র। অতএব বান্দাকে সর্বদা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে। কেননা শুধুমাত্র আমলের মাধ্যমে কেউ জান্নাত পাবে না আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত।[৮০]

(৪০) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيْباً يوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا ‘আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে অগ্রিম প্রেরণ করেছে এবং অবিশ্বাসী ব্যক্তি বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হ’তাম!

এখানে عَذَاباً قَرِيْباً ‘আসন্ন আযাব’ বলার কারণ ক্বিয়ামত নিশ্চিতভাবেই আসবে সেটা বুঝানো। কেননা যেটা নিশ্চিত, অথচ সেটা কখন কোন মুহূর্তে হবে সেটা অনিশ্চিত, এমন বিষয়কে আসন্ন হিসাবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। অতএব ‘আসন্ন আযাব’ অর্থ ‘আখেরাতের আযাব’। আর তা হ’ল মৃত্যু ও ক্বিয়ামত। কেননা من مات فقد قامت قيامته ‘যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, তার ক্বিয়ামত শুরু হয়ে গেল’। মৃত্যুর পরেই তার চোখের পর্দা খুলে যায় এবং আখেরাতের দৃশ্যাবলী তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় *(ক্বাফ ৫০/২২)*। এ কারণেই মৃত্যুকে ‘ক্বিয়ামতে ছুগরা’ (القيامة الصغرى) বা ছোট ক্বিয়ামত বলা হয়। অত্র আয়াতে পুনরুত্থান বিষয়ে কাফেরদের অবিশ্বাসের কঠোর প্রতিবাদ করা হয়েছে।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার ভাল-মন্দ ছোট-বড় সব আমল তার সামনে উপস্থিত দেখবে এবং আগে-পিছের সবকিছুই সামনে প্রত্যক্ষ করবে *(কাহফ ১৮/৪৯; ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৩)*।

---

৮০. মুসলিম হা/২৮১৬ ‘মুনাফিকদের বিবরণ’ অধ্যায়-৫০, অনুচ্ছেদ-১৭; মিশকাত হা/২৩৭২।

وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا অর্থাৎ কাফেররা বলবে হায়! যদি আমরা দুনিয়াতে মাটি হয়ে থাকতাম এবং মানুষ হিসাবে সৃষ্ট না হ'তাম। আখেরাতে আল্লাহ্‌র সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার দেখে এবং অবিশ্বাসীদের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে এসব কথা বলবে। দুনিয়াতে থাকতে তারা পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেনি। তাই যা খুশী তাই করেছে। কিন্তু এখন তাদের হুঁশ ফিরবে। যদিও তখন তা কোন কাজে আসবে না। ফলে আফসোস ব্যতীত তাদের আর কিছুই করার থাকবে না। আল্লাহ বলেন, قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِيْمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ 'বিচার দিবসে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস স্থাপন কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে কোনরূপ অবকাশ দেওয়া হবে না' *(সাজদাহ ৩২/২৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ 'আর তারা জাহান্নাম থেকে বের হ'তে পারবেনা'। *(বাক্বারাহ ২/১৬৭)*।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, ক্বিয়ামতের দিন পশু-পক্ষী সবকিছুকে পুনর্জীবিত করা হবে। অতঃপর তাদের পারস্পরিক অধিকার আদায় ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলের উপর শিংওয়ালা ছাগলের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এভাবে বিচার সমাপ্ত হ'লে আল্লাহ বলবেন, كُوْنِي تُرَابًا 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও'। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এ দৃশ্য দেখে কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে, يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا 'হায় যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম? তাহলে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে বেঁচে যেতাম'।[৮১] পশু-পক্ষীর বিচারের বিষয়টি কাফেরদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রতীকী বিচার হতে পারে। কেননা তাদের জন্য শারঈ বিধান মান্য করার কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই।

এক্ষণে আয়াতের মর্মার্থ হ'তে পারে তিন প্রকারের। ১. দুনিয়াতে মাটি হয়েই থাকতাম এবং মানুষ হয়ে সৃষ্টি না হ'তাম! ২. মাটি হয়ে কবরেই থাকতাম। পুনরুত্থিত না হতাম! ৩. ক্বিয়ামতের দিন পশু-পক্ষীর বিচার শেষে মাটি হয়ে যাবার ন্যায় আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন- আমীন!

সারকথা :

আত্মভোলা মানুষকে পুনরুত্থান ও বিচার দিবস সম্পর্কে সতর্ক করা। অতএব اَلنَّبَأُ الْعَظِيْمُ বা মহা সংবাদ হ'ল ক্বিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান দিবসের সংবাদ। আর এই 'মহা সংবাদ'-এর ঘোষণা এবং হুঁশিয়ারী দিয়েই কুরআনের ৩০তম পারা সূরা 'আম্মা' দিয়ে তার যাত্রা শুরু করল।

---

৮১. মুসলিম হা/২৫৮২, মিশকাত হা/৫১২৮; হাকেম হা/৩২৩১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৬৬।

সূরা নাযে‘আত

(উৎপাটনকারীগণ)

সূরা নাবা-র পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৭৯, আয়াত ৪৬, শব্দ ১৭৯, বর্ণ ৭৬২।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে (কাফেরের) আত্মা টেনে বের করে আনে। وَالنّٰزِعٰتِ غَرۡقًا ۙ﴿۱﴾

(২) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা মৃদুভাবে (মুমিনের) আত্মার বাঁধন খুলে দেয়। وَّالنّٰشِطٰتِ نَشۡطًا ۙ﴿۲﴾

(৩) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা দ্রুতগতিতে সন্তরণ করে । وَّالسّٰبِحٰتِ سَبۡحًا ۙ﴿۳﴾

(৪) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা প্রতিযোগিতায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়। فَالسّٰبِقٰتِ سَبۡقًا ۙ﴿۴﴾

(৫) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা সকল কার্য নির্বাহ করে। فَالۡمُدَبِّرٰتِ اَمۡرًا ۘ﴿۵﴾

(৬) (ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে।) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী। یَوۡمَ تَرۡجُفُ الرَّاجِفَۃُ ۙ﴿۶﴾

(৭) যার পিছে পিছে আসবে আরেকটি নিনাদ। تَتۡبَعُهَا الرَّادِفَۃُ ؕ﴿۷﴾

(৮) যেদিন হৃদয়সমূহ হবে ভীত-বিহ্বল। قُلُوۡبٌ یَّوۡمَئِذٍ وَّاجِفَۃٌ ۙ﴿۸﴾

(৯) তাদের দৃষ্টিসমূহ হবে অবনমিত। اَبۡصَارُهَا خَاشِعَۃٌ ۘ﴿۹﴾

(১০) (অবিশ্বাসীরা) বলে আমরা কি (মৃত্যুর পরে আবার) পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবই? یَقُوۡلُوۡنَ ءَاِنَّا لَمَرۡدُوۡدُوۡنَ فِی الۡحَافِرَۃِ ؕ﴿۱۰﴾

(১১) আমরা গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরেও? ءَاِذَا کُنَّا عِظَامًا نَّخِرَۃً ؕ﴿۱۱﴾

(১২) তারা বলে, সেটা হ’লে তা হবে ধ্বংসকর প্রত্যাবর্তন। قَالُوۡا تِلۡکَ اِذًا کَرَّۃٌ خَاسِرَۃٌ ۘ﴿۱۲﴾

(১৩) সেটি তো একটি মহা নিনাদ মাত্র। فَاِنَّمَا هِیَ زَجۡرَۃٌ وَّاحِدَۃٌ ۙ﴿۱۳﴾

(১৪) অতঃপর সবাই ময়দানে আবির্ভূত হবে। فَاِذَا هُمۡ بِالسَّاهِرَۃِ ؕ﴿۱۴﴾

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾

(১৫) তোমার নিকটে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?

اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

(১৬) যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾

(১৭) (এবং বলেছিলেন) ফেরাঊনের কাছে যাও। কেননা সে সীমালংঘন করেছে।

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾

(১৮) অতঃপর তাকে বল, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি?

وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾

(১৯) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর।

فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾

(২০) অতঃপর সে (মূসা) তাকে মহানিদর্শন দেখাল।

فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾

(২১) কিন্তু সে (ফেরাঊন) মিথ্যারোপ করল এবং অবাধ্য হ’ল।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾

(২২) অতঃপর সে পিছন ফিরে গেল দ্রুতপায়ে।

فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾

(২৩) অতঃপর সে লোক জমা করল এবং উঁচু স্বরে আহ্বান করল।

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾

(২৪) অতঃপর বলল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক।

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

(২৫) ফলে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন পরকালের ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দ্বারা।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

(২৬) নিশ্চয়ই এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে (আল্লাহ্‌র শাস্তির) ভয় করে।

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾

(২৭) তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি নির্মাণ করেছেন।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾

(২৮) তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন। অতঃপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾

(২৯) তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এর রাত্রিকে এবং প্রকাশিত করেছেন এর সকালকে।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾

(৩০) পৃথিবীকে এর পরে তিনি বিস্তৃত করেছেন।

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾

(৩১) সেখান থেকে তিনি নির্গত করেছেন পানি ও উদ্ভিদরাজি

وَالْجِبَالَ أَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾

(৩২) আর পাহাড়সমূহকে তিনি স্থাপন করেছেন দৃঢ়ভাবে;

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

(৩৩) তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশু সমূহের ভোগ্যবস্তু হিসাবে।

فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾

(৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾

(৩৫) সেদিন মানুষ তার কৃতকর্মসমূহ স্মরণ করবে

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾

(৩৬) এবং দর্শকের জন্য জাহান্নামকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾

(৩৭) তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

(৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٣٩﴾

(৩৯) জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

(৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামী হ'তে বিরত রেখেছে,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٤١﴾

(৪১) জান্নাত তার ঠিকানা হবে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿٤٢﴾

(৪২) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, ক্বিয়ামত কখন হবে?

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾

(৪৩) এ বিষয়ে বলার জন্য তুমি কে?

إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾

(৪৪) এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো তোমার প্রভুর নিকটে।

إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾

(৪৫) তুমি তো কেবল সতর্ককারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে ক্বিয়ামতকে ভয় করে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

(৪৬) যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে ছিল একটি সন্ধ্যা বা একটি সকাল।

বিষয়বস্তু :

পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় অত্র সূরাটিরও প্রধান বিষয়বস্তু হ'ল ক্বিয়ামত বা পুনরুত্থান। সূরাটির বিষয়বস্তু সমূহকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন-

(১) মৃত্যুর ফেরেশতাগণের শপথ ও তাদের কার্য সমূহ বর্ণনা *(১-৫ আয়াত)*। (২) ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের বর্ণনা *(৬-৭)*। (৩) অবিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণনা *(৮-১২)*।

(৪) অবিশ্বাসীদের কথার জবাব *(১৩-১৪)*। (৫) মূসা ও ফেরাঊনের বর্ণনা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা প্রদান *(১৫-২৬)*। (৬) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা *(২৭-৩৩)*। (৭) বিচার দিবসে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের কৃতকর্ম স্মরণ ও দুনিয়াতে তাদের প্রধান দু'টি করে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা *(৩৪-৪১)*। (৮) ক্বিয়ামত কবে হবে তার জওয়াব এবং সে সময় লোকদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা *(৪২-৪৬)*।

তাফসীর :

(১) وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে (কাফেরের) আত্মা টেনে বের করে আনে'।

'ডুব দিয়ে আত্মা টেনে বের করা' অর্থ 'সকল শক্তি প্রয়োগ করে টেনে-হিঁচড়ে নির্মমভাবে আত্মা বের করে আনা'। সেটা কাফির-মুনাফিকদের বেলায় করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ এখানে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলেছেন যে, ক্বিয়ামত সত্য এবং তা যথা সময়ে সংঘটিত হবেই। উল্লেখ্য যে, মানুষ কেবল আল্লাহ্র নামে শপথ করতে পারে, অন্য কারু নামে নয়। যেমন বজ্রশপথ, অগ্নিশপথ, মাটির শপথ, সূর্য-চন্দ্র বা নবী-রাসূলের শপথ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির নামে শপথ করতে পারেন। যেমন এখানে ফেরেশতাগণের নামে শপথ করা হয়েছে। সূরা 'মুরসালাতে' প্রবহমান বায়ুর শপথ করা হয়েছে। সূরা 'নাজমে' নক্ষত্রের শপথ এবং সূরা 'তূরে' তূর পাহাড়ের শপথ করা হয়েছে ইত্যাদি। ঈমানদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র কথাই যথেষ্ট। তাঁর জন্য শপথ করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শপথ করে কথা বলেছেন মূলতঃ অবিশ্বাসীদের অন্তরে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য। এতে বান্দার প্রতি তাঁর দয়াগুণের প্রকাশ পেয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নাযে'আত হ'ল ঐ সকল ফেরেশতা, যারা অবিশ্বাসী কাফেরের আত্মাকে নির্মমভাবে টেনে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে'। কারণ কাফেররা পরকালে বিশ্বাস করে না। তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে চিরকাল মত্ত থাকতে চায় এবং দুনিয়া ছাড়তে চায় না। আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতেরও তারা আকাংখী নয় *(ইউনুস ১০/৭)*। তাই মৃত্যু তাদের জন্য সবচেয়ে কষ্টদায়ক বিষয়। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মালাকুল মঊত যখন কাফেরের আত্মা টেনে বের করে, তখন তা যেন তার প্রতিটি চুলের ও নখের গোড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে লোহার করাতের ন্যায়' *(কুরতুবী)*। এটা কেবল মৃত ব্যক্তিই বুঝতে পারে, বাইরের লোকেরা নয়।

نَزَعَ يَنْزِعُ نَزْعًا 'উপড়ে ফেলা'। نزع بشدة 'কঠিনভাবে টানা'। সেখান থেকে اسم فاعل مؤنث বহুবচন وَالنَّازِعَاتِ অর্থ الملائكة التى تنزع أرواح الكفار 'ঐ সকল ফেরেশতা যারা কাফেরদের রূহ টেনে-হিঁচড়ে বের করে'।

غَرْقًا অর্থ ডুব দিয়ে। অর্থাৎ চূড়ান্ত কষ্ট দিয়ে। যেমন বলা হয় أغرق النازغ فى القوس حتى ينتهى الى النصل 'তীর নিক্ষেপকারী ধনুকের মধ্যে ডুব দিল। এমনকি তীরের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল'। উল্লেখ্য যে, বাক্যের শুরুতে 'ওয়াও' (و) হ'ল শপথসূচক অব্যয়, যা বাক্যের মাঝখানে সাধারণতঃ 'এবং' অর্থে আসে।

(২) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের যারা মৃদুভাবে (মুমিনের) আত্মার বাঁধন খুলে দেয়'।

نَشَطَ يَنْشِطُ نَشْطًا অর্থ عقدة يسهل انحلالها ফাঁস গিরা, যা সহজে খোলা যায় *(কুরতুবী)*। এখানে অর্থ হ'ল দেহ থেকে আত্মার বাঁধন সহজে খুলে যাওয়া। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, اي الملائكة تنشط نفس المؤمن এর দ্বারা ঐসব ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে, যারা মুমিনের রূহ কবয করে মৃদুভাবে। যেমন উটের লাগাম (عِقال) খসে পড়ে অতি সহজে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কলসী কাত করলে পানি যেভাবে সহজে বেরিয়ে যায়, সৎকর্মশীল মুমিনের রূহ মৃত্যুর সময় সেভাবে সহজে বের হয়ে যায়'।[৮২]

মুমিনদের এই রূহগুলিই ক্বিয়ামতের ময়দানে ফেরেশতাদের সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, যা পূর্ববর্তী সূরায় বলা হয়েছে। যারা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর সাথে কথা বলবে *(নাবা ৭৮/৩৮)।*

(৩) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً 'শপথ ঐ ফেরেশতাগণের, যারা দ্রুতগতিতে সন্তরণ করে'।

سَبَحَ يَسْبَحُ سَبْحًا سِبَاحَةً অর্থ 'সাঁতার কাটা'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ 'আকাশে সবকিছুই সন্তরণশীল' *(আম্বিয়া ২১/৩৩; ইয়াসীন ৩৬/৪০)*। অত্র আয়াতের অর্থ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঐ সকল ফেরেশতা, যারা মুমিনের রূহ নিয়ে সাঁতার দেয়' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে আল্লাহ্র নিকটে চলে যায়। এটা আকাশে সাঁতার দেওয়ার ন্যায়, যেমন নদীর বুকে নৌকা সাঁতরে যায়।

(৪) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা প্রতিযোগিতায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়'।

سَبَقَ يَسْبِقُ سَبْقًا وَمُسَابَقَةً অর্থ আগে বেড়ে যাওয়া, প্রতিযোগিতা করা। মুক্বাতিল বলেন, এরা হ'লেন ঐ সকল ফেরেশতা যারা মুমিনের রূহ নিয়ে অতি দ্রুত জান্নাতে চলে যায়'। আর একাজে প্রতিযোগিতায় তারা একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়।

---

৮২. আহমাদ হা/১৮৫৫৭, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/১৬৩০, ১৬২৭ সনদ ছহীহ।

(৫) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা সকল কার্য নির্বাহ করে'।

دَبَّرَ يُدَبِّرُ تَدْبِيْرًا অর্থ গবেষণা করা, পরিণাম চিন্তা করা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এখানে مُدَبِّرَاتِ অর্থ 'কার্যনির্বাহী ফেরেশতাগণ'।

হযরত আলী, মুজাহিদ, হাসান বছরী প্রমুখ বলেন, এরা হ'ল ঐসকল ফেরেশতা যারা আল্লাহ্র হুকুমে আসমান ও যমীনের বিভিন্ন বিষয়াদি পরিচালনা করে'। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, ফেরেশতাদের কার্যক্রম দু'ধরনের হয়ে থাকে। একদল আকাশজগতে সৌরলোক ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির উদয়-অস্ত ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত থাকে। অন্যদল বিশ্বলোক ও পৃথিবীর জীবজগতের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে এবং আল্লাহ্র হুকুমে বিভিন্ন সময় অবস্থাদির পরিবর্তন ঘটায়। যেমন আল্লাহ্র নিকট থেকে অহী নিয়ে নবীগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করেন ফেরেশতাগণের নেতা জিব্রীল (আঃ) *(বাক্বারাহ ২/৯৭; শো'আরা ২৬/১৯৩)।* মীকাঈল (আঃ) বৃষ্টি বর্ষণ ও শস্য উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত। মালাকুল মঊত জান কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত। ইসরাফীল ক্বিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত রয়েছেন *(কুরতুবী)*। এমনিভাবে হাযার হাযার ফেরেশতা আল্লাহ্র হুকুমে মানুষের ও জীবজগতের সেবায় ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ 'তোমার প্রভুর সেনাবাহিনীর খবর তিনি ব্যতীত আর কেউ রাখে না' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*।

মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পৃক্ত ফেরেশতামণ্ডলীর শপথ করে আল্লাহ এবারে ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিচ্ছেন *(৬-৭ আয়াত)*।-

(৬-৭) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ '(ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে।) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী'। 'যার পিছে পিছে আসবে আরেকটি নিনাদ'।

পূর্ববর্তী পাঁচটি আয়াতে পঞ্চবিধ কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাগণের শপথ করেছেন আল্লাহ জোরালোভাবে এ বক্তব্য পেশ করার জন্য যে, ক্বিয়ামত আসবেই। তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে এবং অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হবে *(কুরতুবী)*। আর এটাই হ'ল পূর্ববর্তী শপথগুলির জওয়াব। যা উহ্য রয়েছে।

এখানে يَوْمَ যবরযুক্ত হয়েছে। কারণ এর পূর্বে أُذْكُرْ ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে এবং يَوْمَ তার কর্ম (ظرف زمان) হয়েছে। এক্ষণে বাক্য দাঁড়াবে أذكر يوم ترجف الراجفة 'তুমি স্মরণ

কর ঐ দিবসের, যেদিন প্রকম্পিত করবে কম্পিতকারী'। الرجفة অর্থ الحركة বা কম্পন। কিন্তু এখানে অর্থ হবে 'শব্দসহ কম্পন' বা নিনাদ *(কুরতুবী)*। الرَّادِفَةُ অর্থ 'সওয়ারীর পিছনে বসা ব্যক্তি'। এখানে অর্থ হবে الصيحة التابعة 'পশ্চাদগামী নিনাদ'।

ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান বছরী, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বলেন যে, এর অর্থ পরপর দু'টি নিনাদ (الصيحتان)। প্রথম নিনাদে সব মারা যাবে আল্লাহ্র হুকুমে এবং দ্বিতীয় নিনাদে সবাই জীবিত হবে আল্লাহ্র হুকুমে। উভয় ফুৎকারের মাঝে ব্যবধান চল্লিশ। এটি চল্লিশ দিন, মাস না বছর সে বিষয় কিছু বলতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অস্বীকার করেন।[৮৩] যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَآءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ 'আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে সবাই অজ্ঞান হয়ে মরে পড়ে থাকবে, কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন তারা সবাই জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে ও পরস্পরে তাকাতে থাকবে' *(যুমার ৩৯/৬৮)*।

ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের বর্ণনা শেষে এবারে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের অবস্থা কেমন হবে তার বর্ণনা দিচ্ছেন (৮-১২ আয়াত)।-

(৮-৯) قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ، أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ 'যেদিন হৃদয়সমূহ হবে ভীত-বিহ্বল'। 'তাদের দৃষ্টিসমূহ হবে অবনমিত'।

এখানে قُلُوْبٌ অনির্দিষ্টবাচক (نكرة) আনাতে বুঝা যায় যে, সেদিন এদের বিপরীত আরেকটি দল থাকবে (وقلوب على عكس ذلك) যারা হবে মুমিন।

প্রথম বাক্যটি 'মুবতাদা' এবং দ্বিতীয় বাক্যটি 'খবর'। কেননা অন্তর ভীত হ'লে চক্ষু আপনা থেকেই অবনমিত হয়ে যায়। ক্বিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা দেখে অবিশ্বাসীদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে ও ভীত-বিহ্বল হয়ে চক্ষু নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে। أَبْصَارُهَا 'হৃদয়সমূহের চোখ' অর্থ أبصار أصحابها 'হৃদয়ের মালিক অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের চোখ'। একথাটাই অন্যত্র এসেছে এভাবে, خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ 'তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত, তারা হবে হীনতাগ্রস্ত' *(ক্বলম ৬৮/৪৩; মা'আরেজ ৭০/৪৪)*।

৮৩. বুখারী হা/৩৯৩৫, মুসলিম হা/২৯৫৫; মিশকাত হা/৫৫২১।

(১০-১২) يَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَة، أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً، قَالُوْا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (১০) '(অবিশ্বাসীরা) বলে, আমরা কি (মৃত্যুর পরে আবার) পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবই? (১১) আমরা গলিত-অস্থি হয়ে যাওয়ার পরেও? (১২) তারা বলে, সেটা হ'লে তা হবে ধ্বংসকর প্রত্যাবর্তন'।

উপরের বক্তব্যগুলি ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের। তারা বিস্ময়ভরে দুনিয়াতে এসব কথা বলত। কেননা তাদের স্থূলবুদ্ধিতে পরকালের কথা আসে না। তাদের এসব কথাগুলি কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নভাবে এসেছে। যেমন *(বনী ইসরাঈল ১৭/৪৯, ৯৮; ক্বাফ ৫০/৩; ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৪৭-৪৮ প্রভৃতি)*।

أَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِيْ الْحَافِرَةِ 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবই'? حَافِرَةٌ অর্থ 'পশুর পায়ের ক্ষুর'। فِي الْحَافِرَةِ অর্থ رجع فلان فى حافرته، أوعلى حافرته অর্থাৎ رجع من حيث جاء 'যেখান থেকে এসেছে, সেখানে ফিরে যাওয়া'। এখানে অর্থ মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবনে ফিরে যাওয়া।

عِظَاماً نَّخِرَةً 'পচা-গলা হাড়'। অন্য আয়াতে এসেছে, وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا 'তারা বলে, যখন আমরা অস্থিতে পরিণত হব ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব। তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৪৯,৯৮)*।

كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ অর্থ رجعة خائبة 'নৈরাশ্যকর প্রত্যাবর্তন'। কেননা অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাদের পরিণাম জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই হবে না। সেকারণে তারা পুনর্জীবিত হ'তে চায় না। অথচ আল্লাহ্র হুকুমে তারা পুনর্জীবিত হবেই এবং তারা তাদের অবিশ্বাসের ফল ভোগ করবেই। অতএব সেটা তাদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন ব্যতীত কিছুই নয়। অবিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণনা শেষে এবারে আল্লাহ তাদের কথার জবাব দিচ্ছেন *(১৩-১৪ আয়াত)*।-

(১৩) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ 'সেটি তো একটি মহা নিনাদ মাত্র'।

زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ 'একটি মাত্র নিনাদ'। তাদের যুক্তির বহর ও অহংকারের আগুন দপ করে নিভে যাবে একটি মাত্র বজ্র নিনাদে। যারা উপদেশ মানেনা, হক কথা শুনতে চায় না, তাদের জন্য এটাই একমাত্র প্রতিফল। আল্লাহ্র নিকটে ক্বিয়ামত যে কত সহজ ব্যাপার, সেটা বুঝানোর জন্যই এখানে এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামত সংঘটন স্রেফ একটা মহা শব্দের ব্যাপার। আর তাতেই সবকিছু নিমিষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর নতুন এক জগতের জন্ম হবে। এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্র একটি নির্দেশ মাত্র, 'কুন' হও। তখুনি হয়ে যাবে *(মারিয়াম ১৯/৩৫; ইয়াসীন ৩৬/৮২)*। আল্লাহ বলেন, وَمَا أَمْرُ

السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ 'ক্বিয়ামতের বিষয়টি তো চোখের এক পলকের ব্যাপার ভিন্ন নয়, বরং তার চাইতে কম' *(নাহ্ল ১৬/৭৭; ক্বামার ৫৪/৫০)*। তিনি বলেন, إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ 'ওটা হবে শুধুমাত্র একটি বিকট শব্দ। আর তখনই তাদের সকলকে আমাদের সম্মুখে হাযির করা হবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৩)*।

(১৪) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ 'অতঃপর সবাই ময়দানে আবির্ভূত হবে'। السَّاهِرَةُ অর্থ ময়দান বা ভূপৃষ্ঠ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই ময়দান হবে সারা বিশ্বব্যাপী সমতল। কারণ ঐ সময় কোন উঁচু-নীচু, সাগর-পাহাড় কিছুই থাকবে না। ভূপৃষ্ঠ সমতল হবে। সেই ভূপৃষ্ঠের চেহারা হবে বর্তমান ভূপৃষ্ঠের বদলে সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবী। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং পরিবর্তিত হবে আকাশমণ্ডলী। আর সকলে উপস্থিত হবে আল্লাহ্র সম্মুখে, যিনি এক ও পরাক্রান্ত' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁকে বাধ্য করার শক্তি কারোর নেই। যেমন তিনি বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا 'আল্লাহ এমন নন যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(ফাত্বির ৩৫/৪৪)*।

ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের ভয়ংকর অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের কথার জবাব দান শেষে এবারে আল্লাহ মূসা ও ফেরাঊনের ঘটনা বর্ণনার মধ্যমে স্বীয় রাসূলকে এবং ঈমানদারগণকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন *(১৫-২৬ আয়াত)*।-

(১৫) هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى 'তোমার নিকটে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?'

১৫-২৬ আয়াত পর্যন্ত ১২টি আয়াতে আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলকে বিগত নবী মূসা (আঃ) ও অবিশ্বাসী সম্রাট ফেরাঊনের মধ্যকার ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, মূসার মধ্যে মিসরীয় জাতিকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনার দরদভরা মন ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ফেরাঊন ও তার কওমের নেতৃবৃন্দ মূসাকে অমান্য করেছিল এবং তাঁকে ও তার কওম বনু ইস্রাঈলকে বর্বরতম নির্যাতনের সম্মুখীন করেছিল। এতদসত্ত্বেও মূসা (আঃ) অসীম ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। অবশেষে অহংকারী ফেরাঊন ও তার সহযোগীদের উপরে আল্লাহ্র এমন গযব নেমে এসেছিল, যার তুলনা নেই। অতএব মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেন মক্কার মুশরিক নেতাদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রে অধৈর্য না হয়ে পড়েন। সবকিছু আল্লাহ্র চোখের সামনে ঘটছে। তিনিই সময়মত ব্যবস্থা নেবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নবীকে সান্ত্বনা

স্বরূপ মূসা ও ফেরাঊনের বিগত ঘটনাবলী শুনিয়ে বলছেন, هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوسَى 'তোমার নিকটে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি'?

هَلْ প্রশ্নবোধক অব্যয়। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের দিকে শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ও সেদিকে তার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য আরবী বাক্যের এটি একটি সুন্দর আলংকরিক ব্যবহার।

حَدِيْثٌ অর্থ বাণী, বর্ণনা, খবর, বৃত্তান্ত ইত্যাদি। এখানে খবর বা বৃত্তান্ত অর্থে এসেছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তুমি ধৈর্য হারাবে না। তুমি কি বিগত নবী মূসার অবস্থা জানো? তার শত্রুরা তোমার শত্রুদের চাইতে শতগুণ শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর ছিল। কিন্তু হঠকারিতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেলে আমি তাদের পাকড়াও করেছিলাম। তোমার শত্রুদের অবস্থাও তাই হবে। অতএব ধৈর্য ধারণ কর এবং অপেক্ষা কর।

অনেকে هل অর্থ ما نافية বলেছেন। অর্থাৎ ما أتاك حديث موسى ولكن أُخبِرتَ به 'তোমার কাছে মূসার খবর পৌঁছেনি। কিন্তু তা তোমাকে জানানো হচ্ছে'। এখানে বক্তব্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি হ'লেও উদ্দেশ্য সকল মানুষ। সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। যেখানে মূসা (আঃ)-এর অনুসারী কোন ইহুদী ছিলনা। তাহ'লে তাঁর খবর শুনানোর কারণ কি? এর মধ্যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-কে আগামীতে মদীনায় হিজরত করতে হবে ও সেখানে তাদের কপটতা ও ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করতে হবে। যেমন ষড়যন্ত্র তারা তাদের নবী মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে করেছিল। দ্বিতীয়তঃ একারণে যে, কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত নবী হ'লেন মূসা (আঃ)। আর তিনিই ছিলেন স্বীয় উম্মত কর্তৃক সর্বাধিক অবাধ্যতার শিকার। তাই হিজরতের আগেই রাসূল (ছাঃ)-কে তাদের ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল।

(১৬) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى 'যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন'।

এই আহ্বান ছিল সরাসরি, কোন ফেরেশতার মাধ্যমে নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا 'আর আমরা তাকে (মূসাকে) আহ্বান করেছিলাম তার ডাইনে তূর পাহাড়ের দিক থেকে এবং আমরা তাকে গোপনালাপের জন্য নিকটবর্তী করেছিলাম' *(মারিয়াম ১৯/৫২)*।

نَادَاهُ 'তাকে ডাকলেন' অর্থ كَلَّمهُ نداءً 'ডেকে কথা বললেন'। طُوًى একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনে তূর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। শ্বশুরবাড়ী মাদইয়ান থেকে

স্ত্রী-পরিবার নিয়ে জন্মভূমি মিসর যাবার পথে এখানে মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁকে নবুঅত প্রদান করেন। এই স্থানটিকে আল্লাহ اَلْمُقَدَّسِ অর্থাৎ 'পবিত্র' বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ এই মাটিতেই আল্লাহ প্রথম ও শেষ কোন মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। طُوًى তিনভাবে পঠিত হয়েছে طُوَى ,طُوًى ও طِوَى প্রথমোক্ত ক্বিরাআত কূফীদের, দ্বিতীয় ক্বিরাআত বাকী সকলের এবং তৃতীয় কিরাআত হাসান বছরী ও ইকরিমার *(কুরতুবী)*।

(১৭) إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى '(এবং বলেছিলেন) ফেরাঊনের কাছে যাও। কেননা সে সীমালংঘন করেছে'।

অর্থাৎ আল্লাহ মূসাকে ডাকলেন ও বললেন, তুমি ফেরাঊনের কাছে যাও। কেননা সে সীমালংঘনের চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করেছে।

ফেরাঊনের সীমালংঘন প্রক্রিয়াটি কেমন ছিল? আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ 'নিশ্চয়ই ফেরাঊন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে সে হীনবল করেছিল। তাদের পুত্র সন্তানদের সে হত্যা করত এবং কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(ক্বাছাছ ২৮/৪)*। এযুগের দলীয় গণতন্ত্র ফেলে আসা ফেরাঊনী যুলুমতন্ত্রের নব্য সংস্করণ নয় কি?

(১৮) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى 'অতঃপর তাকে বল, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি?'

অর্থাৎ তুমি কি আল্লাহ্র অবাধ্যতার পথ ছেড়ে আনুগত্যের পথে ফিরে আসতে চাও, যা তোমাকে পবিত্র করবে? এখানে تَزَكَّى ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। যা মূলতঃ 'তাযকিয়ায়ে নফস' বা হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়। একজন বাদশাহ হিসাবে ফেরাঊন দৈহিকভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু তার হৃদয়জগত ছিল অবিশ্বাস ও কুফরীর কালিমায় আচ্ছন্ন। যার জন্য সে হয়ে উঠেছিল হঠকারী ও অহংকারী। অতএব তার হৃদয় জগতকে কুফরীর কলুষ ও অন্ধকার থেকে পরিচ্ছন্ন করে তাওহীদের আলোকোজ্জ্বল পথে আহ্বান জানানোর কথা মূসাকে বলা হ'ল। যেমন অন্যত্র মূসা ও হারূণকে আল্লাহ বলেন, فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى 'তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বল। হয়তবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৪)*।

(১৯) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى 'আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর'।

অর্থাৎ আমি তোমাকে আল্লাহ্র ইবাদতের পথ দেখাব, যাতে তোমার অন্তর ভীত হয় ও অনুগত হয়, যা এখন রয়েছে অত্যন্ত কঠোর, অবাধ্য ও যাবতীয় কল্যাণ হ'তে মুক্ত।

এখানে আল্লাহ্র গুণ হিসাবে خالق বা সৃষ্টিকর্তা না বলে رب বা পালনকর্তা বলার কারণ এই যে, ফেরাঊন ভালভাবেই জানত যে, সে সৃষ্টিকর্তা নয়। সে যুগের ও এ যুগের তাবৎ নাস্তিক ও ফেরাঊন গোষ্ঠী এটা বিশ্বাস করে এবং একথা একবাক্যে স্বীকার করে যে, আসমান-যমীন ও এর মধ্যকার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ' *(লোকমান ৩১/২৫)*। কিন্তু যখন মানুষ নিজেকে পরমুখাপেক্ষীহীন মনে করে এবং জনবলে ও শক্তিবলে বেপরোয়া হয়ে যায়, তখন সে সীমালংঘন করে *('আলাক্ব ৯৬/৬-৭)* এবং পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহকে অস্বীকার করে। এমনকি যে পিতা-মাতার লালন-পালন ক্রিয়া সে স্বচক্ষে দেখেছে এবং যাদের স্নেহপরশ না পেলে সে দুনিয়ায় এক পা হাঁটতে পারত না, অহংকার বশে তাদেরকেও সে অমান্য করে। পিতা-মাতার লালন-পালন ক্রিয়া যে কেউ দেখতে ও বুঝতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্র লালন-পালন ক্রিয়া জ্ঞানীরা ব্যতীত বোকারা বুঝতে পারে না। আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, পানি দিয়ে যে আল্লাহ বিরতিহীনভাবে মানুষ ও তামাম জীবজগতকে প্রতিপালন করে চলেছেন, অহংকারী মানুষেরা তাকে এক পর্যায়ে অস্বীকার করে বসে। ফেরাঊন সেই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সে আল্লাহকে 'রব' বা পালনকর্তা হিসাবে অস্বীকার করেছিল। কেননা সরকার রেশন দিয়ে ও অন্যান্যভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রজাপালন করে থাকে। সে হিসাবে ফেরাঊন স্থূল অর্থে নিজেকে 'রব' দাবী করতেই পারে। আর সেটাই সে করেছিল। যা ছিল তার বোকামী ও হঠকারিতা মাত্র। তাই ফেরাঊনের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে নবুঅত দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, আল্লাহ তো ভালোভাবেই জানতেন যে, ফেরাঊন হেদায়াত পাবে না। তাহ'লে কেন তার কাছে মূসাকে পাঠালেন? এর জওয়াব এই যে, হেদায়াতের পথ বাৎলে না দিয়ে আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেন না *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৫; ক্বাছাছ ২৮/৫৯)*। এছাড়াও তার নিকটের যারা, তারাও যাতে হেদায়াতের রাস্তা খুঁজে পায়। যেমন তার জাদুকররা হেদায়াত পেয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ কাউকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ চান তার জন্য প্রমাণ উপস্থিত করতে। তাই মূসাকে পাঠিয়ে এলাহী হেদায়াত পেশ করার পরও যখন সে ফিরে আসেনি, তখন সেটাই তার চূড়ান্ত শাস্তির কারণ ও প্রমাণ হিসাবে গণ্য হয়।

তৃতীয়তঃ এর দ্বারা আল্লাহপাক আমাদেরকে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কারু হেদায়াত পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে। এটা মানুষের জানার কথা নয়।

অতএব যত অবাধ্য হৌক সকলের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছানো হ'ল বান্দার দায়িত্ব। মূসাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে মাত্র।

(২০) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى 'অতঃপর সে (মূসা) তাকে মহা নিদর্শন দেখাল'।

সেই মহা নিদর্শন হ'ল লাঠি ও জ্যোতি বিকীরণকারী হস্ততালু, যা নবুঅত প্রদানকালে তূর পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহ মূসাকে দিয়েছিলেন। এ দু'টি ছিল মু'জেযা, যাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কারুরই ছিল না। সে যুগে মিসর ছিল জাদুবিদ্যার কেন্দ্রভূমি। সেকারণ আল্লাহ মূসাকে এরূপ মু'জেযা দান করেছিলেন। যা দেশের সেরা জাদুকরদের হতবাক করে দিয়েছিল এবং পরাস্ত হয়ে তারা সবাই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল *(শো'আরা ২৬/৪৭-৪৮)*। যদিও ফেরাঊন তাদের সবাইকে হত্যা করেছিল *(শো'আরা ২৬/৪৯-৫১)*। তবে ফেরাঊন এমন ভীত হয়েছিল যে, কখনোই মূসা ও হারূণের ক্ষতি করার সাহস করেনি। বস্তুতঃ এই দু'টি মু'জেযাই ছিল ফেরাঊনের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সেফগার্ড বা রক্ষাকবচ স্বরূপ। এ দু'টি প্রধান মু'জেযা ছাড়াও অন্যান্য সকল নিদর্শন, জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ও যুক্তিতর্ক সবই মূসা ও হারূণ পেশ করেন।

(২১) فَكَذَّبَ وَعَصَى 'কিন্তু সে (ফেরাঊন) মিথ্যারোপ করল ও অবাধ্য হ'ল'।

অর্থাৎ অন্তরে সে মূসাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল এবং বাহ্যিক কর্মে তার অবাধ্যতা করল। এভাবে ফেরাঊন ভিতরে-বাইরে মূসার দাওয়াতকে অমান্য করল। সে মুনাফিক ছিল না। বরং বিশ্বাসে ও কর্মে সর্বাত্মকভাবে সে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। كَذَّبَ ক্রিয়ার মাধ্যমে ফেরাঊনের হৃদয়ের অবিশ্বাসী অবস্থা এবং عَصَى ক্রিয়ার মাধ্যমে তার বাইরের অবাধ্যতাপূর্ণ কর্মের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

(২২) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى 'অতঃপর সে পিছন ফিরে গেল দ্রুতপায়ে'।

অর্থাৎ মূসাকে মুকাবিলা করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তার সভাসদগণের নিকটে দ্রুত ফিরে গেল।

(২৩) فَحَشَرَ فَنَادَى 'অতঃপর সে লোক জমা করল এবং উঁচু স্বরে আহ্বান করল'।

অর্থাৎ ফেরাঊন তার সভাসদবৃন্দ এবং সেনাবাহিনী ও সমাজনেতাদের জমা করে জোরালো এক ভাষণ দিল। সে বলল, مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ 'এসব অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এসব কথা শুনিনি' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*। সে তার জনগণকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য বলল, ذَرُوْنِي أَقْتُلْ

مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ‘তোমরা আমাকে ছাড় আমি মূসাকে হত্যা করব। কেননা আমার ভয় হয় সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে অথবা সে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে’ *(মুমিন/গাফির ৪০/২৬)*। অতঃপর সে বলল, إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ‘আসলে তোমাদের প্রতি প্রেরিত এ রাসূলটি একটা আস্ত পাগল মাত্র’ *(শো‘আরা ২৬/২৭)*। সেযুগের ফেরাঊনের ন্যায় এযুগের ফেরাঊনরাও ধর্মকে তাদের কপট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। অথচ আল্লাহ প্রেরিত প্রকৃত দ্বীনকে তারা মানতে চায় না।

(২৪) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ‘অতঃপর বলল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক’।

عَلاَ يَعْلُو عُلُوًّا অর্থ উঁচু হওয়া। সেখান থেকে اسم تفضيل হয়েছে। অর্থ ‘সর্বোচ্চ’। অর্থাৎ لاَ رَبَّ فَوْقِيْ ‘আমার উপরে কোন রব বা পালনকর্তা নেই’। একথার পূর্বে সে বলেছিল مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ ‘তোমাদের জন্য আমি ব্যতীত কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*।

রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে দেশের জনগণের ভালমন্দ দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করার কারণেই সে স্থূল অর্থে নিজেকে ‘সবচেয়ে বড় পালনকর্তা’ বলেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلاَ تُبْصِرُونَ– ‘ফেরাঊন তার জনগণকে ডেকে একথা বলেছিল যে, মিসরের বাদশাহী কি আমার নয়? এই নদীগুলি আমার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত। তোমরা কি দেখো না’? *(যুখরুফ ৪৩/৫১)*। আর সেকারণেই জনগণের উপাস্য হবার দাবী করেছিল। অন্ধ-কালা-বোবা মূর্তিগুলো যদি মানুষের উপাস্য হ’তে পারে, তবে দেশের রাজা হিসাবে ফেরাঊন কেন জনগণের উপাস্য হ’তে পারবে না? যদিও এরূপ দাবী কেউ কখনো করেনি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তার অত্যন্ত গর্হিত ও হঠকারী দাবী।[৮৪] এটুকু বলেই সে ক্ষান্ত হয়নি। সে মূসা (আঃ)-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কটূক্তি ও তাঁর দরিদ্রতাকেও তাচ্ছিল্য করেছিল। কেননা মূসার যবানে কিছুটা তোতলামি ছিল। যেমন ফেরাঊন বলেছিল, أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِيْنُ– فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ– فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ– ‘আমি তো শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি হ’তে যে নিকৃষ্ট। এমনকি যে স্পষ্টভাবে কথা বলতেও অক্ষম’। ‘(যদি সে নবী হ’ত) তাহ’লে কেন তাকে দেয়া হলো না সোনার বালা সমূহ এবং কেন তার সাথে

৮৪. দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী, মূসা ও হারূণ (আঃ) ২/৩৬-৩৮।

আসলো না দলবদ্ধভাবে ফেরেশতারা'? 'এভাবে সে তার কওমকে হতবুদ্ধি করে ফেলল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। বস্তুতঃ তারা তো ছিল সব অবাধ্য সম্প্রদায়' *(যুখরুফ ৪৩/৫২-৫৪)*।

(২৫) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى 'ফলে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন পরকাল ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দ্বারা'।

ফেরাঊনের সীমালংঘন চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করে যাবার পর আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন। দুনিয়াতে তার পাকড়াও ছিল সসৈন্যে সলিল সমাধি *(বাক্বারাহ ২/৫০; ইউনুস ১০/৯০-৯২)*। আর পরকালের পাকড়াও হ'ল জাহান্নামের সর্বোচ্চ ও মর্মান্তিক শাস্তি। এটা ছিল তার সীমালংঘনের প্রতিফল।

نَكَالَ অর্থ تنكيل যেমন سلام অর্থ تسليم। فَأَخَذَهُ اللهُ অর্থ نكّله الله تنكيل الدارين بالعذابين بالإغراق والإحراق 'আল্লাহ তাকে ইহকালে ও পরকালে দু'ধরনের শাস্তি দিয়ে বদলা নেন, ডুবানো ও পোড়ানোর মাধ্যমে' *(তানতাভী)*। النكل অর্থ القيد পাকড়াও করা, কয়েদ করা *(কুরতুবী)*।

(২৬) إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشَى 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে (আল্লাহ্র শাস্তির) ভয় করে'।

ফেরাঊনের উক্ত পরিণতির কথা বর্ণনার পর আল্লাহপাক ইঙ্গিত দিলেন যে, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য এর মধ্যে যেমন উপদেশ রয়েছে, আল্লাহদ্রোহী লোকদের জন্য তেমনি হুঁশিয়ারি রয়েছে। যেন ফেরাঊনী আচরণ করে কেউ নিজেকে শাস্তির ঊর্ধ্বে মনে না করে। যারা শয়তানের পূজা করে এবং মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, তাদের পরিণতিও যুগে যুগে ফেরাঊনের মতই হবে। ইহকাল ও পরকালে তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না *(ক্বাছাছ ২৮/৪১)*। এর মাধ্যমে মক্কার কাফের নেতাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করেন, যেমন মূসা (আঃ) ফেরাঊনের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, ফেরাঊনের পরিণতির মধ্যে উপদেশ রয়েছে সকল যুগের আল্লাহভীরুদের জন্য।

১৫-২৬ পর্যন্ত **১২**টি আয়াতে মূসা ও ফেরাঊনের বর্ণনা দ্বারা স্বীয় রাসূলকে সান্ত্বনা দেওয়ার পর এক্ষণে আল্লাহপাক আকাশমণ্ডল ও বিশ্বলোকের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করছেন, যাতে মানুষ ঐসব বড় বড় সৃষ্টির তুলনায় নিজেদের তুচ্ছতা বুঝতে পারে এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে *(২৭-৩৩ আয়াত)*।-

(২৭) أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ؟ بَنَاهَا 'তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি নির্মাণ করেছেন'।

ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, তোমাদের সৃষ্টির চাইতে কি আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অধিক বড় নয়? অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ- 'আসমান ও যমীন সৃষ্টি অবশ্যই মানব সৃষ্টির চাইতে অনেক বড় বিষয়' *(মুমিন ৪০/৫৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ- 'আসমান ও যমীন যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ (অর্থাৎ মানুষ) সৃষ্টি করতে সক্ষম নন'? *(ইয়াসীন ৩৬/৮১)*। একইভাবে আসমানকেও গুটিয়ে নিয়ে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ-

'সেদিন আমরা আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটিয়ে নেওয়া হয় লিখিত দফতর। যেভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমাদের ওয়াদা সুনিশ্চিত। আমরা অবশ্যই তা করব' *(আম্বিয়া ২১/১০৪)*। অতএব মানুষকে মৃত্যুদানের পর তার পুনরুত্থান ঘটানো আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ ব্যাপার এবং একটি মাত্র নির্দেশ 'কুন' (হও) বললেই হয়ে যাবে *(ইয়াসীন ৩৬/৮২)*।

بَنَاهَا 'তিনি তাকে নির্মাণ করেছেন' অর্থাৎ رفعها فوقكم كالبناء 'আকাশকে তোমাদের মাথার উপর উচ্চ করেছেন নির্মাণ কাঠামোর ন্যায়'। এখান থেকে নতুন বাক্য শুরু হয়েছে।

(২৮) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا 'তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন। অতঃপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন'। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে উপরে হওয়া। আল্লাহ বলেন, اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا 'আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত। যা তোমরা দেখে থাক' *(রা'দ ১৩/২; লোকমান ৩১/১০)*।

رَفَعَ سَمْكَهَا অর্থ أعلى سقفها فى الهواء 'মহাশূন্যে তার ছাদকে উচ্চ করেছেন'। এখানে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ১- ছাদ ২- উচ্চ করা ৩- সুবিন্যস্ত করা।

(১) আকাশ হ'ল পৃথিবীর জন্য ছাদের মত। গৃহের উপরকার নিরাপত্তা কাঠামোকে ছাদ বলা হয়। আকাশ তেমনি পৃথিবী ও এখানকার জীব জগতের জন্য নিরাপত্তা কাঠামো হিসাবে কাজ করে। মহাশূন্য হ'তে নিপতিত উল্কাপিণ্ড, সূর্য হ'তে বিকীরিত অতি বেগুনী রশ্মি ইত্যাদি যা জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর, তা থেকে আকাশের বায়ু মণ্ডল আমাদের রক্ষা করে। এছাড়াও অজানা বহু ক্ষতি থেকে আকাশ আমাদের নিরাপদ রাখে। সে হিসাবে আকাশ পৃথিবীর জন্য ছাদ হিসাবে কাজ করে।

(২) 'ছাদকে সুউচ্চ করেছেন'। সাধারণতঃ ছাদ উঁচুই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে 'উঁচু করা হয়েছে' বলার অর্থ আকাশরূপী ছাদকে বিশেষভাবে উঁচু করা হয়েছে বান্দার বিশেষ কল্যাণের জন্য। আকাশ কত উঁচু, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত হিসাব থেকে।

রাতের আকাশে আমরা যে অসংখ্য তারকারাজি দেখি, তার মধ্যে যেটাকে আমরা যত ছোট দেখি, সেটা তত বড় এবং তত দূরে অবস্থিত। আরও বহু তারকা রয়েছে, যা আজও মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং যা দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়েনি। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রটি হ'ল সূর্য। যা পৃথিবী হ'তে আয়তনে ১০৯ গুণ এবং ওযনে ৩ লক্ষ ৩৩ হাযার গুণ বড়। অন্যান্য নক্ষত্রগুলির কোন কোনটি সূর্যের চেয়ে দশ হাযার গুণ বড়। অথচ দেখা যায় ছোট বিন্দুর মত। এতেই বুঝা যায় পৃথিবী থেকে আকাশ কত উচ্চে অবস্থিত।

(৩) 'তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন'। অর্থাৎ সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সজ্জিত করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে। তাতে কোন ফাটল বা ছিদ্র নেই *(মুল্ক ৬৭/৩-৪)*। এক্ষণে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী কোটি কোটি বছর পূর্বে মহাশূন্যে সংঘটিত বিগব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে যদি আকাশ ও বিশ্বলোকের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তথাপি একথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলো সব সুনির্দিষ্ট দূরত্বে পতিত হবে এবং সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে সুনির্দিষ্ট গতিবেগে লক্ষ কোটি বছর ধরে একই নিয়মে সন্তরণশীল থাকবে। অকল্পনীয় গতিবেগে আবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও কোন নক্ষত্রের সাথে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের কখনোই কোন এক্সিডেন্ট বা সংঘর্ষ হয় না। এটা কিভাবে সম্ভব হ'ল? এরপরেও অন্য গ্রহ-নক্ষত্র বাদ দিয়ে কেবলমাত্র পৃথিবী কিভাবে জীবজগতের বসবাসের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠলো? পৃথিবী সূর্য থেকে কিভাবে সুনির্দিষ্ট দূরে ২৩.৫ ডিগ্রী কোণে অবস্থিত হ'ল? পৃথিবীর আকাশ প্রায় ১১৫০ কিলোমিটার বায়ুমণ্ডল দিয়ে কিভাবে নিরাপদ করা হ'ল? নির্দিষ্ট দূরত্বে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি দিয়ে আকাশমণ্ডলকে কিভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হ'ল? তার মধ্যে আবার নিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে কিভাবে সুসজ্জিত করা হ'ল? *(মুল্ক ৬৭/৫)*। এগুলি কি লক্ষ-কোটি বছর পূর্বেকার হঠাৎ বিস্ফোরিত বিগব্যাঙ-এর অপরিকল্পিত ফসল? তাই যদি হবে, তাহ'লে আর কেন বিগব্যাঙ হয় না? নাকি এগুলি কোন মহা পরিকল্পকের সুনির্দিষ্ট

পরিকল্পনার সুবিন্যস্ত রূপ? বস্তুতঃ এসব কোন প্রকৃতির লীলাখেলা নয় বা অন্ধ-কালা-বোবা কোন ন্যাচারের হুঁশ-বুদ্ধিহীন কর্মকাণ্ড নয়। বরং সবকিছু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত সুন্দরতম পরিকল্পনার ফসল। তিনিই আকাশমণ্ডলকে পৃথিবীর জীবকুলের কল্যাণে সুসজ্জিত করেছেন। নিঃসন্দেহে আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত। আল্লাহ্র এই সৃষ্টির এবং এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না *(রূম ৩০/৩০; ফাত্বির ৩৫/৪৩)*। *সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী*।

এক মিসরীয় কৃষকের গল্প :

শায়খ তানতাভী জাওহারী (১৮৫৯-১৯৪০ খৃঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, একদিন এক কৃষক এসে আমাকে বলল যে, শয়তান একদা আমাকে প্ররোচিত করল যাতে আমি নালার পানি ছেড়ে দেই এবং আমার শত্রুর কৃষিজমি ডুবিয়ে দিয়ে তার ফসল নষ্ট করি। আমি পানি ছেড়ে দেয়ার জন্য নালায় নামতেই দেখি যে, সেখানে আকাশের তারাগুলো সুন্দরভাবে খেলছে। এতে আমার মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হ'ল। আমি মনে মনে বললাম, এমন সুন্দর সৃষ্টি যার, যিনি আমাকে পানির মধ্যে তার অপরূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন করছেন, আমি কিভাবে তার অবাধ্যতা করব? না না এটা কখনোই সম্ভব নয়- বলেই আমি নালা থেকে উঠে এলাম'।

নালার পানিতে খেলতে থাকা তারকারাজির চেহারা দেখে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে মিসরীয় কৃষক যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে দূরে যেতে পারে, তাহ'লে বাংলাদেশের মাছচাষীর বহু কষ্টের পুকুরে বা ঘেরের পানিতে বিষ ঢেলে দেবার সময় কি এদেশের মানুষ আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হবে না? বহু কোটি মাইল উঁচুতে থাকা তারকার ছবি যদি তোমার পুকুরে দেখা যায়, তাহ'লে সাত আসমানের উপরে আরশে অবস্থানকারী আল্লাহ্র সামনে কি তোমার অপকর্মের ছবি ভেসে ওঠে না? অতএব হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর।

হে বিজ্ঞ পাঠক! আপনি দেখছেন যে, ঐ তারাগুলি কত লক্ষ-কোটি মাইল উপরে মহাকাশে বিচরণ করছে আল্লাহ্র হুকুমে। অত দূরে থেকে আকাশ আপনাকে আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, বৃষ্টি দিয়ে লালন করে চলেছে ঘরের ছাদের মত। আর এটাই হ'ল رَفَعَ سَمْكَهَا 'তার ছাদকে উচ্চ করেছেন'-এর প্রকৃত মর্ম।

(২৯) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا 'তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এর রাত্রিকে এবং প্রকাশিত করেছেন এর সকালকে'। অর্থাৎ اظلم ليلها وأنار نهارها 'আকাশের রাত্রিকে অন্ধকারময় এবং দিবসকে আলোকময় করেছেন'। ها সর্বনাম দ্বারা السماء অর্থাৎ আকাশকে বুঝানো হয়েছে।

রাত্রি ও দিনের আবর্তন-বিবর্তন ঘটে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে। পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপরে সেকেণ্ডে ১৮ মাইল গতিবেগে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। এটাই হ'ল

তার 'আহ্নিক গতি'। যেমন ঘূর্ণায়মান লাটিম নিজ দণ্ডের উপর ঘুরে থাকে। এই আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে পড়ে সেই অংশে দিন হয় ও অপরাংশে রাত হয়। যেমন বাংলাদেশে যখন রাত হয়, আমেরিকায় তখন দিন হয়। অনুরূপভাবে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে লাগে কাছাকাছি ৩৬৫ দিন। একে তার 'বার্ষিক গতি' বলে। এই গতিবেগের কোন কম-বেশী হয় না। পৃথিবীর এই আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির মধ্যে রয়েছে জীবজগতের লালন-পালনের এক নিখুঁত পরিকল্পনা। যার মধ্যে আল্লাহ্র রুবূবিয়াতের ও রহমানিয়াতের অর্থাৎ পালনগুণ ও দয়াগুণ প্রকাশিত হয়েছে। অতএব যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বচরাচরের প্রতিপালকের জন্য, যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।

(৩০) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 'পৃথিবীকে এর পরে তিনি বিস্তৃত করেছেন'।

دَحَاهَا অর্থ পৃথিবীতে বিভিন্ন বস্তু উদ্গাত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা ও বিস্তৃত করা। যেমন পানি, ঘাস-পাতা, নদী-নালা, পাহাড়-জঙ্গল ইত্যাদি। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশ সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। যা হা-মীম সাজদাহ ৯-১২ আয়াতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তবে পৃথিবীকে বিস্তৃত এবং গাছ-পালা, সাগর-নদী, পাহাড়-জঙ্গল ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে মনুষ্য বাসোপযোগী করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পরে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছাড়াও একাধিক বিদ্বান একথা বলেছেন এবং ইবনু জারীর এটাকেই গ্রহণ করেছেন *(ইবনু কাছীর)*। বাক্যের শুরুতে والأرضَ যবরযুক্ত হওয়ার কারণ হ'ল এর পূর্বে دحا ক্রিয়া উহ্য রয়েছে অর্থাৎ دَحَا الْأَرْضَ *(কুরতুবী)*।

'পৃথিবীকে এরপরে বিস্তৃত করা হয়েছে'- এ বাক্যের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির গুঢ় রহস্য সমূহ নিহিত রয়েছে, যা বিজ্ঞানীদের জন্য এক বিরাট গবেষণার দুয়ার খুলে দেয়। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবী বর্তমান অবস্থায় আসতে লক্ষ-কোটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে গোলাকার এই পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ কমলার খোসার ন্যায়, যার পুরুত্ব কমবেশী সাগরের নীচে গড়ে ৬ কি.মি এবং স্থলভাগে ৩০-৫০ কি.মি. *(উইকিপিডিয়া)*। তবে সঠিক কথা আল্লাহ জানেন। বস্তুতঃ ভূপৃষ্ঠের উপরেই সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-জঙ্গল, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী সবকিছু নিয়ে আমরা বসবাস করি। মহান আল্লাহ্র অসীম কুদরতের ফলেই এই মহাসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অতএব তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

(৩১-৩৩) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

(৩১) 'সেখান থেকে তিনি নির্গত করেছেন পানি ও উদ্ভিদরাজি (৩২) আর পাহাড়সমূহকে তিনি স্থাপন করেছেন দৃঢ়ভাবে (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশু সমূহের ভোগ্যবস্তু হিসাবে।'

أَرْسَاهَا অর্থ قررها وأثبتها وأكّدها في أماكنها 'পাহাড়কে স্থির করা, সুস্থাপিত করা এবং যথাস্থানে সুদৃঢ় করা'।

অর্থাৎ পাহাড়কে ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করা হয়েছে, যাতে তা সুদৃঢ় থাকে এবং ঝড়-বন্যায় নড়াচড়া না করে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ 'আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন। যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়'... *(নাহল ১৬/১৫; আম্বিয়া ২১/৩১; লোকমান ৩১/১০)*।

বর্ণিত আয়াত তিনটি পূর্ববর্তী ৩০ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ। অর্থাৎ তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং সেখান থেকে নদী-নালা, গাছ-পালা উদ্গত করেছেন ও পাহাড়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর কল্যাণার্থে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীকে এবং আকাশমণ্ডলকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র মানুষের সেবা ও মঙ্গলের জন্য।

مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ 'তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশু সমূহের কল্যাণের জন্য'। এখানে গবাদিপশুকে একই বাক্যে বর্ণনার মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গবাদিপশুকে আল্লাহ মানুষের সেবার জন্য ও তা থেকে উপকার লাভের জন্য বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ- 'তোমাদের জন্য গবাদিপশু সমূহের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে পান করিয়ে থাকি তাদের উদরস্থিত বস্তু (দুধ) থেকে। এদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা এবং তোমরা এদের কতককে ভক্ষণ কর'। 'তোমরা এদের পিঠে ও নৌযানে আরোহণ করে থাক' *(মুমিনূন ২৩/২১-২২)*। শুধু তাই নয়, শক্তিশালী এইসব পশুকে আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগত ও তাদের জন্য খাদ্যের উপযোগী করে দিয়েছেন *(হজ্জ ২২/৩৬; ইয়াসীন ৩৬/৭২)* যাতে মানুষ এদের থেকে সহজে উপকার লাভ করতে পারে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পশু-পক্ষী মানুষের জন্য ভোগ্যবস্তু। কোন পূজার বস্তু নয়। বরং এগুলি মানুষের কল্যাণ লাভের ও প্রাণীজ খাদ্যের উৎস মাত্র। অথচ হতভাগা মানুষ গাভী, সাপ ইত্যাদির পূজা করে থাকে। অতএব 'জীব হত্যা মহাপাপ' 'সর্বজীবে দয়া' ইত্যাদি নীতিবাক্য স্রেফ অসার ও মনগড়া মাত্র।

আকাশমণ্ডল ও বিশ্বলোকের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা শেষে এক্ষণে আল্লাহ বিচার দিবসে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের কৃতকর্ম স্মরণ ও দুনিয়াতে তাদের প্রধান দু'টি করে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন *(৩৪-৪১ আয়াত)*।-

(৩৪) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى 'অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে'।

الطَّامَّةُ الْكُبْرَى অর্থ الداهية العظمى 'সবচেয়ে ভয়ংকর বিপর্যয়'। الطَّامَّةُ অর্থ مَا تَطِمُّ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ 'যা সবকিছুর উপর ছেয়ে যায়'। এর দ্বারা ইস্রাফীলের দ্বিতীয় ফুৎকার (النفخة الثانية) বুঝানো হয়েছে, যার ফলে ক্বিয়ামত হবে। একে نَفْخَةُ الْبَعْثِ বা 'পুনরুত্থানের ফুৎকার' বলা হয়। আর প্রথম ফুৎকারকে نَفْخَةُ الصَّعْقِ বা 'কম্পনের ফুৎকার' বলা হয় *(যুমার ৩৯/৬৮)*। যার ফলে সকল প্রাণী মারা পড়বে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতকে الطامَّةُ الكبرى এজন্য বলা হয়েছে যে, لأنها تَطُمُّ على كل أمرٍ هائل مفظع 'এটি সকল ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ বস্তুর উপরে জয়লাভ করে *(ইবনু কাছীর)*। কেননা এর চেয়ে ভয়ংকর আর কিছুই নেই। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ 'ক্বিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তিক্ততর' *(ক্বামার ৫৪/৪৬)*।

(৩৫-৩৬) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرَى 'যেদিন মানুষ তার কৃতকর্মসমূহ স্মরণ করবে'। 'এবং দর্শকের জন্য জাহান্নামকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে'। অর্থাৎ যেদিন প্রত্যেকে নিজের আমলনামা দেখবে এবং নিজের কৃতকর্মের রেকর্ড তার সামনে ভেসে উঠবে, তখন অবিশ্বাসী ও দুষ্কর্মপরায়ণ লোকেরা অনুতাপে ও অনুশোচনায় পুড়তে থাকবে। আল্লাহ বলবেন, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,– يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى 'সেদিন মানুষ (তার কৃতকর্ম) স্মরণ করবে। কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে?' *(ফজর ৮৯/২৩)*।

বাক্যের শুরুতে يَوْمَ 'বদল' হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের إِذَا থেকে। অর্থাৎ যখন বা যেদিন।

مَا سَعَى 'যা সে করেছিল (দুনিয়াতে)'। অর্থাৎ ভাল ও মন্দ কর্মের উপরেই বান্দার জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভর করছে। এর মধ্যে অদৃষ্টবাদী জাবরিয়া দর্শনের প্রতিবাদ রয়েছে। এর মধ্যে আরেকটি বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষ অনেক কিছু ভুলে গেলেও আখেরাতে সবকিছু তার স্মরণে আসবে। কেননা ঐ সময় প্রত্যেক মানুষ যেমন বয়সে যুবক হবে, তার স্মৃতিপট তেমনি তাযা হবে আল্লাহ্র হুকুমে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرَى 'জাহান্নাম উন্মুক্ত হবে দর্শকের জন্য'। بُرِّزَتِ অর্থ ظهرت বা كشفت 'গোপন অবস্থা থেকে যা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় এবং যা চক্ষুষ্মান সকলে

দেখতে পায়'। এখানে দর্শক মুমিন ও কাফের দুই-ই হ'তে পারে। মুমিন হ'লে তার অর্থ হবে জাহান্নামের আযাব দেখে তা থেকে উপদেশ হাছিল করা এবং জান্নাতের অতুলনীয় নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা। আর কাফের হ'লে তার অর্থ হবে জাহান্নামে প্রবেশ করা ও সেখানকার নানাবিধ শাস্তি ভোগ করা।

এটি فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى 'অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে'- বাক্যের জওয়াব হ'তে পারে। অর্থাৎ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى دَخَلَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ 'যখন মহাবিপর্যয় এসে যাবে, তখন জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(কুরতুবী)*।

(৩৭-৩৯) فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى 'তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে' 'এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে'; 'জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে'।

মক্কার ধনকুবের কাফের নেতাদের সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হ'লেও এর উদ্দেশ্য সকল যুগের কাফের ও অবিশ্বাসী সমাজ।

অত্র আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে জাহান্নামী ও জান্নাতী প্রত্যেকের দু'টি করে প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। জাহান্নামী যারা হবে দুনিয়াতে তাদের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য হবে 'সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা'। সীমাহীন প্রবৃত্তিপরায়ণতার কারণে তারা আখেরাতকে ভুলে যাবে এবং নিজেদের কাজে-কর্মে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিবে।

এখানে আলিফ ও লামসহ الْمَأْوَى বলার অর্থ হ'ল 'একমাত্র ঠিকানা'। জাহান্নাম ব্যতীত অন্যত্র তাদের কোন ঠিকানা নেই *(তানতাভী)*। অবশ্য যদি মৃত্যুকালে তার তাওহীদ বিশ্বাস ঠিক থাকে এবং শিরক না করে থাকে, তাহ'লে 'ফাসেক মুমিন' হিসাবে সে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত পাবে এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্র বিশেষ ক্ষমা পেয়ে জান্নাতে যাবে।[৮৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের কিছু লোক আমার শাফা'আতের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবে। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে বলা হবে 'জাহান্নামী'।[৮৬] তবে কাফেরের জন্য জাহান্নাম হবে একমাত্র এবং চিরস্থায়ী ঠিকানা। তারা কখনোই সেখান থেকে বের হবে না।

এখানে وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 'এবং দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিবে' অর্থাৎ إنهمك في أمور الدنيا 'দুনিয়াবী কাজে ডুবে থাকবে'। আল্লাহ্র দ্বীন শিক্ষা এবং আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে

৮৫. তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৫৫৯৮-৫৬০০, সনদ ছহীহ।
৮৬. বুখারী হা/৬৫৬৬, মিশকাত হা/৫৫৮৫ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়-২৮ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ-৪।

চিন্তা-গবেষণার জন্য সে তার সময় ও শ্রম ব্যয় করবে না। দুনিয়াতে সে যেমন মূর্খতায় ও ভোগসর্বস্বতায় ডুবে থাকবে, আখেরাতেও তেমনি জাহান্নামের আগুনে ডুবে থাকবে।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى **(৪০-৪১)**

'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামী হ'তে বিরত রেখেছে'; 'জান্নাত তার ঠিকানা হবে'।

অত্র আয়াতে জান্নাতী বান্দাদের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এক- সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতি বজায় রাখা এবং দুই- নিজেকে নফ্সের পূজা হ'তে বিরত রাখা। দুনিয়াতে যারা উক্ত দু'টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধের সম্মুখে নিজেকে সমর্পণ করে দিবে, আখেরাতে সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে। অর্থাৎ শুরু থেকেই সে জান্নাতী হবে এবং জান্নাতই তার একমাত্র ঠিকানা হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

أَنْتُمْ فِي زَمَانٍ يَقُودُ الْحَقُّ الْهَوَى، وَسَيَأْتِي زَمَانٌ يَقُودُ الْهَوَى الْحَقَّ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ-

'তোমরা এমন একটি যামানায় আছ, যখন হক নফসকে পরিচালনা করছে। সত্বর এমন একটি যামানা আসবে, যখন নফস হককে পরিচালনা করবে। সেই যামানা থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকটে পানাহ চাই' *(কুরতুবী)*।

বস্তুতঃ নিজের নফসকে শয়তানের আনুগত্য থেকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ফিরিয়ে নেয়া এবং সেখানে সর্বদা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখা সবচাইতে কঠিন কাজ। একাজে যিনি সফল হন, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হন এবং জান্নাত তার একমাত্র ঠিকানা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, 'নফস' তিন প্রকার : ১- নফসে আম্মারাহ (প্রবৃত্তি পরায়ণ নফস; *ইউসুফ ১২/৫৩*)। ২- নফসে লাউয়ামাহ (তিরষ্কারকারী নফস; *ক্বিয়ামাহ ৭৫/১-২*)। ৩- নফসে মুত্বমাইন্নাহ (প্রশান্ত হৃদয়; *ফজর ৮৯/২৭-৩০*)। মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে সর্বদা এ তিনটি নফসের উপস্থিতি বুঝতে পারে। সর্বদা নফসে আম্মারাহকে দমিত রাখাই তার কর্তব্য।

জাহান্নামী ও জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা শেষে অতঃপর ক্বিয়ামত কবে হবে তার জওয়াব এবং সে সময় লোকদের মানসিক অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়টি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন *(৪২-৪৬ আয়াত)*।

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا- **(৪২-৪৪)**
'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, ক্বিয়ামত কখন হবে?'। 'এ বিষয়ে বলার জন্য তুমি কে'? 'এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো তোমার প্রভুর নিকটে'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কার মুশরিকরা রাসূল (ছাঃ)-কে ঠাট্টাচ্ছলে এ প্রশ্ন করেছিল। তার জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়। مُرْسَاهَا অর্থ قيامها 'সংঘটিত হওয়া'।

فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا অর্থ فيم أنت من ذلك حتى يسألونك بيانه ولست ممن يعلمه 'এ ব্যাপারে তুমি কে যে তারা এ বিষয়ে বলার জন্য তোমাকে প্রশ্ন করে? অথচ এ বিষয়ে তোমার জানার কথা নয়'। ذِكْرَى অর্থ ذكر অর্থাৎ বলা। মুশরিকদের বারবার প্রশ্নের বিরুদ্ধে এটি আল্লাহ্র তাচ্ছিল্যভরা জওয়াব। আল্লাহ বলেন, إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا অর্থ منتهى علمها عند ربك فلا يوجد عند غيره 'উক্ত বিষয়ের চূড়ান্ত জ্ঞান তোমার পালনকর্তার নিকটে রয়েছে। অতএব তা অন্যের কাছে পাওয়া যাবে না'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ- 'তুমি বল, এর জ্ঞান কেবলমাত্র আমার পালনকর্তার নিকটে রয়েছে। যা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়কালটি কেবল তিনিই প্রকাশ করবেন' *(আ'রাফ ৭/১৮৭)*। পাঁচটি বিষয়ের ইলম কেবলমাত্র আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। তার প্রথমটি হ'ল ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের সময়কাল *(লোকমান ৩১/৩৪)*। অতএব এ বিষয়ে রাসূলকে প্রশ্ন করা বৃথা।

রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের এক মজলিসে জিব্রীল (আঃ) মানুষের বেশে উপস্থিত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ 'এবিষয়ে যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তিনি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবগত নন'।[৮৭]

ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের পর লোকদের মানসিক অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়ে অতঃপর আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشَاهَا، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَ- **(৪৫-৪৬)**
'তুমি তো কেবল সতর্ককারী ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ক্বিয়ামতকে ভয় করে'। 'যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে ছিল একটি সন্ধ্যা অথবা একটি সকাল'।

---

৮৭. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।

عَشِيَّةً অর্থ অপরাহ্নে সূর্য ঢলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত'। ضُحَى অর্থ সূর্যোদয় থেকে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়া পর্যন্ত'। এখানে সংক্ষিপ্ত সময়কাল বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, কাফেরদের অহেতুক প্রশ্নে বিব্রত হবে না। কেননা তুমি প্রেরিত হয়েছ মানুষকে ক্বিয়ামত হ'তে এবং আল্লাহ্র আযাব ও গযব হ'তে ভয় প্রদর্শনের জন্য। অতএব যারা ক্বিয়ামতকে ভয় করে, তুমি কেবল তাদেরই ভয় দেখাবে। যাতে তারা উপকৃত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হয়। আর যারা এসবের পরোয়া করে না, তাদের জন্য তোমার কোন মাথাব্যথা নেই। কেননা إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْراً وَّنَذِيْراً وَّلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ– 'আমরা তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। আর জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১১৯)*। যদিও শেষনবী হিসাবে তিনি সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন *(সাবা ৩৪/২৮)*। আল্লাহ্র উপরোক্ত কথার মধ্যে অবিশ্বাসীদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও শ্লেষ মিশ্রিত রয়েছে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا.... অর্থাৎ মানুষ যখন স্ব স্ব কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে, তখন ঘুম থেকে ওঠা ব্যক্তির ন্যায় তারা তাদের পূর্ববর্তী জীবনকে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করবে এবং ভাববে যে, সেটা ছিল একটি সন্ধ্যা বা একটি সকাল মাত্র। অন্য আয়াতে এসেছে, إِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ 'দিনের একটি মুহূর্তকাল' *(ইউনুস ১০/৪৫)*। ক্বিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা দেখে মানুষ প্রচণ্ড ভীত হয়ে এরূপ মনে করবে।

'সুখের দিন সংক্ষিপ্ত হয় এবং দুঃখের দিন লম্বা হয়'। সে হিসাবে যারা জান্নাতী হবে, হাদীছের ভাষায় কবরে তারা বাসর ঘরে নতুন বরের মত শান্তির ঘুমে বিভোর হয়ে যাবে।[৮৮] তাদের জন্য অবশ্য দুনিয়ার জীবন ও কবরের জীবন উভয়টাই সংক্ষিপ্ত মনে হবে। কিন্তু যারা জাহান্নামী হবে, তাদের নিকট দুনিয়াবী জীবন সংক্ষিপ্ত মনে হ'লেও প্রচণ্ড আযাবের কারণে কবরের জীবন সংক্ষিপ্ত মনে হবার কথা নয়। কিন্তু ক্বিয়ামতের ভয়ংকর দিনে তাদের নিকট কবরের আযাব নিঃসন্দেহে কম মনে হবে।

সার-সংক্ষেপ :

(১) মূসা (আঃ) ফেরাঊনকে বলেছিলেন, وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى 'আমি তোমাকে তোমার প্রভুর পথ দেখাব। যাতে তুমি তাকে ভয় কর'। সূরার শেষে আল্লাহ তার শেষনবীকে বলছেন, إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَّخْشَاهَا 'তুমি কেবল ভয় দেখাবে সেই ব্যক্তিকে যে ক্বিয়ামতকে ভয় করে'। দুই মহান নবীর দুই কথার মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে,

৮৮. তিরমিযী হা/১০৭১; মিশকাত হা/১৭০, সনদ হাসান।

ভয় কেবল তাকেই দেখানো যায়, যে ভয় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হঠকারী ও অহংকারী, আখেরাতের ভয় প্রদর্শন তার কোন কাজে আসবে না। তার পরিণাম ফেরাঊনের মত হবে এবং সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) এখানে ফেরাঊনের উদাহরণ দেয়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে সকল যুগের যালেম শাসক ও শোষকদের প্রতি। আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সকল মানুষ সমান এবং তাঁর দেওয়া নে'মত সমূহ ভোগের অধিকার সবার সমান। অথচ যালেমরা মযলূমের রক্ত শোষণ করে গর্ববোধ করে। এদের অবস্থা ফেরাঊনের মতই হবে। তবে সবাইকে আল্লাহ্র ভয় দেখানো ও তার প্রতি আহ্বান করা সকল মুমিনের কর্তব্য।

(৩) সূরার মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষণীয় ইঙ্গিত রয়েছে মানুষকে তার নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আকাশ-পৃথিবী, উদ্ভিদ-পাহাড় ও গবাদিপশু প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জানা ও তা থেকে কল্যাণ লাভে উদ্বুদ্ধ করার প্রতি। যাতে মানুষ এ সবের সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পায় এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ও অনুগত হয়। সাথে সাথে ক্বিয়ামত ও আখেরাতে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সতর্ক হয়।

সারকথা :

হঠকারী ব্যক্তিরা যতই বলুক ক্বিয়ামত হবেই এবং সকলকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবেই। সূরার শুরু ও শেষে ক্বিয়ামতের বর্ণনার মাধ্যমে মানুষকে সেবিষয়ে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে।

وفقنا الله لما يحب ويرضاه وأعاذنا الله من غضبه وقهره

সূরা 'আবাসা (ভ্রুকুঞ্চিত করল)

সূরা নাজমের পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮০, আয়াত ৪২, শব্দ ১৩৩, বর্ণ ৫৩৮।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

عَبَسَ وَتَوَلّٰۤى ۙ١

(১) ভ্রুকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ؕ٢

(২) এজন্য যে, তার নিকটে একজন অন্ধ লোক এসেছে।

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى ۙ٣

(৩) তুমি কি জানো সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ'ত।

اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ؕ٤

(৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো। অতঃপর সে উপদেশ তার উপকারে আসতো।

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ٥

(৫) অথচ যে ব্যক্তি বেপরওয়া

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ؕ٦

(৬) তুমি তাকে নিয়েই ব্যস্ত আছো।

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ؕ٧

(৭) অথচ ঐ ব্যক্তি পরিশুদ্ধ না হ'লে তাতে তোমার কোন দোষ নেই।

وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۙ٨

(৮) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার নিকটে দৌড়ে এল,

وَهُوَ يَخْشٰى ۙ٩

(৯) এমন অবস্থায় যে সে (আল্লাহকে) ভয় করে,

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ١٠

(১০) অথচ তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে।

كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ١١

(১১) কখনই না। এটা তো উপদেশবাণী মাত্র।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۘ١٢

(১২) অতএব যে চায় উপদেশ গ্রহণ করুক।

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ١٣

(১৩) (এটা তো লিপিবদ্ধ আছে) সম্মানিত ফলক সমূহে

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۙ١٤

(১৪) যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র।

بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۙ١٥

(১৫) (যা লিখিত হয়েছে) লিপিকার ফেরেশতাগণের হাতে।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ؕ١٦

(১৬) যারা উচ্চ সম্মানিত, পূত-চরিত্র।

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَاۤ اَكْفَرَهٗ ؕ١٧

(১৭) ধ্বংস হৌক মানুষ! সে কতই না অকৃতজ্ঞ।

(১৮) (সে কি ভেবে দেখে না) কি বস্তু হ'তে (আল্লাহ) তাকে সৃষ্টি করেছেন?

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾

(১৯) শুক্রবিন্দু হ'তে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন।

مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾

(২০) অতঃপর তার (ভূমিষ্ঠ হওয়ার) রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন।

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾

(২১) অতঃপর তিনি তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾

(২২) অতঃপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পুনর্জীবিত করবেন।

ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾

(২৩) কখনই না। সে পূর্ণ করেনি, যা তাকে (আল্লাহ) আদেশ করেছেন।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾

(২৪) অতএব মানুষ একবার লক্ষ্য করুক তার খাদ্যের দিকে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ ﴿٢٤﴾

(২৫) আমরা (কিভাবে তাদের জন্য) বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকি

اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

(২৬) অতঃপর ভূমিকে ভালভাবে বিদীর্ণ করি

ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

(২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করি খাদ্য-শস্য

فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

(২৮) আঙ্গুর ও শাক-সবজি

وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾

(২৯) যায়তূন ও খর্জুর

وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾

(৩০) ঘন পল্লবিত উদ্যানরাজি

وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

(৩১) এবং ফল-মূল ও ঘাস-পাতা।

وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾

(৩২) তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগ্যবস্তু হিসাবে।

مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

(৩৩) অতঃপর যেদিন সেই নিনাদ আসবে

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾

(৩৪) সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾

(৩৫) তার মা ও বাপ থেকে

وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾

(৩৬) এবং তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে।

وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾

(৩৭) প্রত্যেক মানুষের সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, সে নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকবে। لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيهِ

(৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ

(৩৯) সহাস্য, প্রফুল্ল। ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

(৪০) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

(৪১) কালিমালিপ্ত। تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ

(৪২) তারা হ'ল অবিশ্বাসী, পাপিষ্ঠ। أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

বিষয়বস্তু :

সূরাটিতে চারটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। **এক-** সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জনৈক অন্ধ ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে জনৈক অহংকারী ও ধনশালী সমাজনেতার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ)-কে তিরস্কার (১-১০ *আয়াত*)। **দুই-** কুরআনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা *(১১-১৬ আয়াত)*। **তিন-** অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দিয়ে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার প্রতিপালনের ইতিহাস বর্ণনা *(১৭-৩২)*। **চার-** অবশেষে তাদের পরিণতি হিসাবে পুনরুত্থান দিবসে কারু প্রফুল্ল বদন ও কারু মসীলিপ্ত চেহারা বর্ণনা *(৩৩-৪২)*।

শানে নুযূল :

মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, অত্র সূরাটি অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম সম্পর্কে (মক্কায়) নাযিল হয়। তিনি কোন একটি বিষয় জানার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক মুশরিক নেতার সাথে কথা বলছিলেন। এভাবে কথার মধ্যে কথা বলায় (অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনে উম্মে মাকতূম পীড়াপীড়ি করায়) রাসূল (ছাঃ) বিরক্ত হন এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঐ নেতার প্রতি মনোনিবেশ করেন, যাতে তিনি হেদায়াত প্রাপ্ত হন। তখন অত্র আয়াতসমূহ নাযিল হয়।[৮৯]

উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের কারণে তিরস্কারমূলক এই স্মরণীয় আয়াতগুলি নাযিল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে খুবই সমাদর করতেন।[৯০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধে গমনকালে তাকে প্রায়ই মদীনার প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে যেতেন। জীবনীকারগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদর, ওহোদ, হামরাউল আসাদ ও বিদায় হজ্জ

---

৮৯. মুওয়াত্ত্বা হা/৬৯৩, তিরমিযী হা/৩৩৩১ সনদ 'ছহীহ'। তিরমিযী অত্র বর্ণনাটিকে 'গরীব' বলেছেন। তবে এর অনেকগুলি 'শাওয়াহেদ' বা সমার্থক বর্ণনা রয়েছে বিধায় তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য। সম্ভবতঃ সেকারণে আলবানী একে 'ছহীহ' বলেছেন। এ বিষয়ে অন্য কোন বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়।

৯০. মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৩১২৩, হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে।

সহ মোট ১৩ বার মদীনা ত্যাগকালে তাকে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে যান।[৯১] বেলাল তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান দিতেন এবং তিনি ফজরের আযান দিতেন।[৯২] মূলতঃ এ সবই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে তাকে বিশেষ মর্যাদা দানের ফল। আর এই মর্যাদা দানের কারণ ছিল তার উপলক্ষে সূরার প্রথম আয়াতগুলি নাযিল হওয়া। নিঃসন্দেহে এটি ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। যতদিন দুনিয়া থাকবে ও কুরআনের পাঠক থাকবে, ততদিন মানুষ অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের নাম স্মরণ করবে। এই সৌভাগ্য হযরত আবুবকর (*তওবা ৯/৪০*), আয়েশা *(নূর ২৪/১১-২৬)* ও যায়েদ বিন হারেছাহ *(আহযাব ৩৩/৩৭)* ব্যতীত আর কারো হয়নি।

এ ধরনের তিরস্কারমূলক আয়াত আরও কয়েকটি নাযিল হয়েছে বিভিন্ন উপলক্ষে। যেমন- (১) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, সূরা আন'আম ৫২ আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-এর ছয়জন দরিদ্র ছাহাবী সম্পর্কে নাযিল হয়। যারা সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটবর্তী থাকতেন। তারা হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, বেলাল, ছোহায়েব, আম্মার, খাব্বাব ও রাবী নিজে। এতে কুরায়েশ নেতারা বলল, أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أفنحن نكون تبعا لهؤلاء হে মুহাম্মাদ! এ লোকগুলিকেই কি আল্লাহ বেছে নিয়ে আপনার উপর অনুগ্রহ করেছেন? আর আমরা এদের অনুগত হব? এদের সরিয়ে দিন। তাহ'লে আমরা আপনার অনুসারী হ'তে পারি। তখন সূরা আন'আমের ৫২-৫৩ আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূল (ছাঃ)-কে একাজে নিষেধ করে বলা হয় যে,

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ- وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُوْلُوْا أَهَؤُلاَءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ، (الأنعام ٥٢-٥٣)-

'তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের ইবাদত করে তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। তাদের কোনকিছুর হিসাব নেবার দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোনকিছুর হিসাব নেবার দায়িত্ব তাদের নয়। এরপরেও যদি তুমি তাদের সরিয়ে দাও, তাহ'লে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। 'এমনিভাবে আমরা একজনের দ্বারা অপরজনকে পরীক্ষায় নিপতিত করি, যাতে তারা বলে, এদেরকেই কি আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে অনুগ্রহ করেছেন? অথচ আল্লাহ কি তার কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত নন'?[৯৩]

---

৯১. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৫৭৫৯, 'আমর ইবনু উম্মে মাকতূম, (কায়রো : ১৩৯৭/১৯৭৭) ৭/৮৩ পৃঃ।
৯২. বুখারী হা/৬১৭, মুসলিম হা/১০৯২, মিশকাত হা/৬৮০; নায়ল ২/১২০, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে।
৯৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৯৩; হাকেম হা/৫৩৯৩, ৩/৩১৯ পৃঃ; ইবনু জারীর হা/১৩২৫৫; আহমাদ, ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/৩২৯৭।

(২) ইবনু কাছীর বলেন, একই ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ সূরা কাহফের ২৮-২৯ আয়াত নাযিল করেন। যেখানে বলা হয়, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... 'তুমি নিজেকে তাদের সাথে ধরে রাখো যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তুমি তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে না পার্থিব জীবনের জৌলুস কামনায়....'।

(৩) মুশরিক নেতাদের মিথ্যারোপ ও নানাবিধ যুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ রাসূল (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম ফল লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়ে আল্লাহ সূরা 'ক্বলম' ৪৮ আয়াতটি নাযিল করেন। যাতে বলা হয়, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ- 'তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছওয়ালা (ইউনুসের) মত হয়ো না। যখন সে দুঃখভরা মনে প্রার্থনা করেছিল' *(ক্বলম ৬৮/৪৮)*। এখানে ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রাসূল (ছাঃ)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ ইউনুস (আঃ) নিজ কওমকে বারবার দাওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হন। অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে তিন দিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র গযব আসার ভয় দেখান এবং সম্ভবতঃ নিজ সিদ্ধান্তে এলাকা ছেড়ে চলে যান *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*। এতে আল্লাহ নাখোশ হন এবং তাকে মাছের পেটে কিছু সময়ের জন্য রাখা হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র হুকুমে মাছ তাকে তার এলাকার নিকটবর্তী নদীর কিনারে উগরে দেয়। তিনি সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে দেখেন যে, তারা সবাই তওবা করেছে এবং তার অপেক্ষায় উদ্বেগাকুল হয়ে আছে। ইউনুস (আঃ) তখন নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

বলা বাহুল্য, রাসূল (ছাঃ)-কে এইভাবে তিরস্কার ও উপদেশ দানের মধ্যে সমাজ সংস্কারক ঈমানদার নেতৃবৃন্দের জন্য মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে।

তাফসীর :

(১) عَبَسَ وَتَوَلَّى 'ভ্রুকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল'।

عَبَسَ يَعْبِسُ عَبَسًا وَعُبُوْسًا অর্থ كلح بوجهه 'মুখ বেযার করা'। تَوَلَّى অর্থ أعرض بوجهه 'মুখ ফিরিয়ে নেয়া' *(কুরতুবী)*। এখানে 'মুখ ফিরিয়ে নিল' বলতে রাসূল (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু عَبَسْتَ ও تَوَلَّيْتَ 'মধ্যম পুরুষ' ব্যবহার না করে ক্রিয়া দু'টিতে নাম পুরুষ (صيغة غائب) ব্যবহার করা হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদার প্রতি খেয়াল রেখে। কেননা কোন সম্মানী ব্যক্তির ত্রুটি নির্দেশ করার জন্য তাকে সরাসরি না বলে ইঙ্গিতে বলাটাই ভদ্র পন্থা।

(২) أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمَى 'এজন্য যে, তার নিকটে একজন অন্ধ লোক এসেছে'।

অর্থ لِأَنْ جَآءَهُ الْأَعْمَى (এজন্য যে, তার নিকটে একজন অন্ধ লোক এসেছে)। এটি বাক্যে مفعول له হয়েছে।

এই অন্ধ লোকটি হলেন প্রসিদ্ধ মুওয়াযযিন ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)। অনেকে তাঁর নাম আমর (عمرو) বলেছেন। পিতার নাম ক্বায়েস বিন যায়েদাহ। তবে মায়ের বেটা হিসাবেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর মামাতো ভাই এবং প্রথম দিকে ইসলাম কবুলকারী মুহাজিরগণের অন্যতম।

(৩) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى 'তুমি কি জানো? সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ'ত'।

وَمَا يُدْرِيْكَ অর্থ وَمَا يُعْلِمُكَ 'কে তোমাকে জানালো'? وَمَا يُدْرِيْكَ 'অজানা' অর্থে এবং وَمَا اَدْرَاكَ 'নিশ্চিতভাবে জানা' অর্থে আসে। যেমন, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ 'তুমি কি জানো করাঘাতকারী কে'? অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে সেটি ক্বিয়ামত। পক্ষান্তরে وَمَا يُدْرِيْكَ লَعَلَّهُ يَزَّكَّى অর্থ لعله يتطهر من الجهل والذنوب 'হয়তো সে অজ্ঞতা ও পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হ'ত'। বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

এখানে 'সে' অর্থ অন্ধব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম। 'পরিশুদ্ধ হওয়া' বলতে দ্বীনের আলোকে হৃদয় পরিশুদ্ধ হওয়া বুঝানো হয়েছে। আর হৃদয় পরিশুদ্ধ হ'লে মানুষ গোনাহ থেকে পরিশুদ্ধ হ'তে উদ্বুদ্ধ হয়। পূর্বের আয়াতে নামপুরুষ ব্যবহার করা হয়েছিল সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। অতঃপর বর্তমান আয়াতে সরাসরি মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে। এটা না করে নামবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করলে তাঁকে উপেক্ষা করা বুঝাতো। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মনঃকষ্টের কারণ হ'ত।

(৪) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى 'অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো। অতঃপর সে উপদেশ তার উপকারে আসতো'।

يَذَّكَّرُ অর্থ يتعظ بما تقول 'তোমার বক্তব্য থেকে সে উপদেশ গ্রহণ করতো'। الذِّكْرَى অর্থ العظَةُ 'উপদেশ বা ওয়ায'। যা মানুষকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং দুনিয়ার সংঘাতবিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থা থেকে সাময়িকভাবে হ'লেও মুক্তি দেয়। এর ফলে মানুষ আল্লাহ্র বিধানসমূহ মানতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং হারাম সমূহ থেকে বিরত হয়। এ কারণেই বলা হয়েছে فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى 'অতঃপর সে উপদেশ তার উপকার করত'। অবশ্য হৃদয়ে সিলমোহর করা হঠকারী লোকদের কথা স্বতন্ত্র।

অত্র আয়াতদ্বয়ে প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন না। তিনি কেবল অতটুকুই জানতে পারতেন, যতটুকু তাঁকে 'অহি' মারফত জানানো হ'ত। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়েরও প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি 'অহি' থেকে কোন কিছুই লুকাতেন না। কেননা যদি তিনি উম্মতের নিকটে অহি-র কোন অংশ গোপন করতেন, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট থেকে লজ্জা পাওয়ার এই আয়াতগুলি তিনি প্রকাশ করতেন না। ইবনু যায়েদ বলেন, একথা বলা হয়ে থাকে যে, لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئًا من الوحي كتم هذا عن نفسه 'যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' থেকে কিছু লুকাতেন, তাহ'লে এ বিষয়টি নিজে থেকে লুকিয়ে রাখতেন' *(ক্বাসেমী)*।

তৃতীয়তঃ ইমাম রাযী বলেন, নবীগণের নিষ্পাপত্বের বিরোধী যারা, তারা এই ঘটনা থেকে দলীল নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে গোনাহগার বানাতে চায়। অথচ এটি আদৌ কোন গোনাহ ছিল না। কেননা অন্ধ ব্যক্তিটি ছিল আগে থেকেই মুসলিম। কথার জবাব পরে দিলেও চলতো। কিন্তু অন্য ব্যক্তিটি ছিল একজন মুশরিক নেতা। তিনি হেদায়াত পেলে তার মাধ্যমে বহু লোক ইসলাম কবুল করবে, এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। এটাতে দোষের কিছুই ছিল না। বরং এর মধ্যেই দ্বীনের কল্যাণ বেশী ছিল। কিন্তু আল্লাহ এটা পসন্দ করেননি। কারণ হেদায়াত কেবল তাঁরই হাতে নিবদ্ধ *(ক্বাসেমী)*।

চতুর্থতঃ এর মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, শী'আদের দাবী ডাহা মিথ্যা। কেননা তারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে যে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাকে 'মুছহাফে ফাতেমা' বলা হয়, তা এই কুরআনের চাইতে তিনগুণ বড় এবং বর্তমান কুরআনের একটি হরফও সেখানে নেই'।[৯৪]

পঞ্চমতঃ অত্র আয়াতদ্বয়ে 'অন্তর পরিশুদ্ধ' (يَزَّكَّى)-কে 'উপদেশ দানের' (يَذَّكَّرُ) পূর্বে আনা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উপদেশদাতার সঙ্গলাভ আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য অধিক আবশ্যক। কেননা উপদেশদাতার নিজস্ব আচরণ ও তার চরিত্রমাধুর্য উপদেশ গ্রহিতার হৃদয়ে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে।

(৫) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى 'অথচ যে ব্যক্তি বেপরওয়া'।

اسْتَغْنَى অর্থ اسْتَغْنَى بماله وقوته عن سماع القرآن والهداية 'শক্তি ও ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি কুরআন শ্রবণ ও হেদায়াত লাভ থেকে বেপরওয়া' *(ক্বাসেমী)*। যে সমাজনেতার সঙ্গে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অতি মনোযোগ দিয়ে কথা বলছিলেন এবং যার কারণে অন্ধ আগন্তুকের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন,

৯৪. ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আহ ওয়াস সুন্নাহ (লাহোর ২৪শ সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৮০-৮১।

সেই ধনী অহংকারী ব্যক্তিটি কে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেছেন অলীদ বিন মুগীরাহ। কেউ বলেছেন উমাইয়া বিন খালাফ, কেউ বলেছেন উবাই ইবনে খালাফ, কেউ বলেছেন উৎবা, শায়বাহ প্রমুখ একাধিক কুরায়েশ নেতা *(কুরতুবী)*।

(৬) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى 'তুমি তাকে নিয়েই ব্যস্ত আছো'।

التَصَدِّى অর্থ الإصغاء 'মনোযোগ দেয়া'। এর মাদ্দাহ হ'ল الصَّدَى অর্থ العطش 'পিপাসা'। এখানে অর্থ দাঁড়াল- أَمَّا الْغَنِىُّ فَأَنْتَ تَتَعَرَّضُ لَهُ لَعَلَّهُ يَهْتَدِىْ كَمَا يَتَعَرَّضُ العَطْشَانُ لِلْمَاءِ 'ধনী ব্যক্তিটি যাতে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, সেজন্য তুমি তার প্রতি গভীর মনোযোগী হয়েছ, যেমনভাবে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানির প্রতি কাতর হয়'।

(৭) وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى 'বস্তুতঃ ঐ ব্যক্তি পরিশুদ্ধ না হ'লে তাতে তোমার কোন দোষ নেই'।

কেননা হেদায়াতের মালিক তুমি নও *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*। তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেয়া *(শূরা ৪২/৪৮)*। এরপর যদি কেউ পরিশুদ্ধ না হয় ও দ্বীন কবুল না করে, তাতে তোমার কোন দোষ হবে না। একথার মধ্যে আলেমগণের জন্য বিশেষ উপদেশ রয়েছে। তারা যেন শাসক ও ধনিক শ্রেণীর প্রতি অধিক মনোযোগী না হন। কেননা এই দু'টি শ্রেণী সাধারণত তাদের দুনিয়াবী স্বার্থের বাইরে কিছুই চিন্তা করতে পারে না। মানুষ এদের আনুগত্য করে কেবল দুনিয়াবী স্বার্থে। পক্ষান্তরে আখেরাতের পথপ্রদর্শক হিসাবে আলেমগণের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাবোধ থাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে। দুনিয়াদাররা সর্বদা চায় আলেমগণকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগাতে। আলেমরাও চান তাদেরকে হেদায়াত করতে। এটা স্রেফ আহ্বান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। তার বেশী নয়। তাদের প্রতি অধিক মনোযোগী হ'লে শয়তানী খপপরে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ফলে ঐ আলেম তার দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারাবেন। দুনিয়া বলতে আমরা সম্মান ও মর্যাদাকে বুঝিয়েছি। যা আলেমদের প্রধান সম্বল। কেননা টাকা-পয়সা সাধারণতঃ জাহিলদের বেশী থাকে। পক্ষান্তরে কোন মুত্তাক্বী আলেম দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত হারাতে পারেন না।

(৮-৯) وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى، وَهُوَ يَخْشَى 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার নিকটে দৌড়ে এল'। 'এমন অবস্থায় যে সে (আল্লাহকে) ভয় করে'।

যে ব্যক্তি বলতে অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে বুঝানো হয়েছে। যিনি দ্বীন শেখার তীব্র ক্ষুধা নিয়ে এবং পূর্ণ আল্লাহভীতি সহকারে দৌড়ে এসেছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে।

(১০) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى 'অথচ তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে'।

تَلَهَّى অর্থ تُعْرِضُ عَنْهُ بِوَجْهِكَ وَتَشْتَغِلُ بِغَيْرِهِ 'তুমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং অন্যের দিকে লিপ্ত হলে'। অর্থাৎ আল্লাহ চান দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে। ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু কোন ভেদাভেদ করা যাবে না। সকলকে সমভাবে দাওয়াত দেওয়ার পর আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল করতে হবে। তিনি যাকে খুশী হেদায়াতের আলোকে আলোকিত করবেন ও যাকে খুশী হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করবেন।

অত্র আয়াতগুলিকে গরীবদের প্রতি দাওয়াতের ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হওয়ার ও তাদেরকে দাওয়াতের মজলিসে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ধনী-গরীব সকলের প্রতি সমান ব্যবহারের ইসলামী আদব বিধৃত হয়েছে ।

সকলের প্রতি সমভাবে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে তা'লীম দেওয়ার পর এবার কুরআনের প্রকৃত মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরে আল্লাহ বলেন *(১১-১৬ আয়াত)*।-

(১১) كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ 'কখনই না! এটা তো উপদেশবাণী মাত্র'।

كَلاَّ 'কখনই না'। এটি حرف ردع وزجر অর্থাৎ অস্বীকারকারী ও ধমকি দানকারী অব্যয়। এখানে এর অর্থ لاَ تَفْعَلْ هَكَذَا بَعْدَ الْيَوْمِ 'আজকের পরে আর কখনো এরূপ করবে না' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, ছোট-বড় কোন বৈষম্য করবে না। কেননা إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ 'এটি উপদেশবাণী মাত্র'। এখানে 'এটি' বলতে উক্ত তা'লীম বা এই সূরা অথবা পুরা কুরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে। تَذْكِرَةٌ স্ত্রীলিঙ্গ এবং কুরআন পুংলিঙ্গ হ'লেও تَذْكِرَة অন্যত্র 'কুরআন' অর্থে এসেছে। যেমন كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ *(মুদ্দাছছির ৭৪/৫৪)*। কেননা কুরআন সর্বদা মানুষকে তার কল্যাণ বিষয়ে নির্দেশনা দেয় ও অকল্যাণ থেকে সাবধান করে।

(১২) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ 'অতএব যে চায় উপদেশ গ্রহণ করুক'।

ذَكَرَه অর্থ اتعظ بـــالقران 'কুরআন দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করুক' *(কুরতুবী)*। ইবনু কাছীর বলেন, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى فِيْ جَمِيْعِ أُمُـــوْرِهِ 'যে ব্যক্তি চায় তার সকল কাজকর্মে আল্লাহকে স্মরণ করুক'। আর আল্লাহকে স্মরণ করা মানেই তাকে ভয় করা, তাঁর বিধান মান্য করা ও অন্যায় থেকে বিরত হওয়া। যে ব্যক্তি মুখে কেবল 'আল্লাহ' শব্দে যিকর করে অথবা বিশাল তসবীহ ছড়া হাতে নিয়ে গণনা করে। অথচ অন্তরে আল্লাহকে ভয়

করে না, বাস্তবে তাঁর বিধান মানে না ও অন্যায় থেকে বিরত হয় না, সে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না। অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, মানুষ তার কর্মে স্বাধীন। সে ইচ্ছা করলে কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, ইচ্ছা করলে না-ও পারে। এর মধ্যে অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, 'তাসবীহমালায় গণনাকারী ব্যক্তি কতই না সুন্দর' (نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةَ) মর্মে বর্ণিত মরফূ হাদীছটি মওযূ বা জাল।[৯৫] অতএব প্রচলিত তাসবীহমালায় বা অন্য কিছু দ্বারা তাসবীহ গণনা করা সুন্নাত বিরোধী আমল। তাছাড়া এতে 'রিয়া' অর্থাৎ লোক দেখানোর সম্ভাবনা বেশী থাকে। আর 'রিয়া' হ'ল ছোট শিরক'।[৯৬] ফলে তাসবীহ পাঠের সকল নেকী বরবাদ হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। অতএব এগুলি পরিত্যাজ্য।

তাসবীহ দু'হাতে বা বাম হাতে নয়। বরং ডান হাতে গণনা করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খানাপিনাসহ সকল শুভ ও পবিত্র কাজ ডান হাতে করতেন এবং পায়খানা-পেশাব ও অন্যান্য কাজ বামহাতে করতেন।[৯৭] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।[৯৮] আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, ডান হাতের গণনা কড়ে আঙ্গুল দিয়ে শুরু করতে হয়, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে নয়। কেননা ডান হাতের ডান পাশ কড়ে আঙ্গুল দিয়েই শুরু হয়েছে এবং এ আঙ্গুল দিয়ে গণনা শুরু করাটাই সহজ ও স্বভাবগত।

(১৩-১৪) فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ، مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ '(এটা তো লিপিবদ্ধ আছে) সম্মানিত ফলকসমূহে'। 'যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র'।

অন্যত্র এসেছে, بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ، فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ- 'বরং সেটি হ'ল মর্যাদাপূর্ণ কুরআন'। 'যা সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ' *(বুরূজ ৮৫/২১-২২)*। এতে বুঝা যায় যে, কুরআন বহু পূর্বেই লিখিত। যা বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। উদ্দেশ্য যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া এবং বিষয়বস্তুকে শ্রোতার নিকটে যুক্তিসিদ্ধ করা ও তার হৃদয়ে গ্রথিত করা। আর মানুষের স্বভাব যেহেতু সকল যুগে সমান, সেহেতু কুরআনী সমাধান সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য।

(১৫-১৬) بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ '(যা লিখিত হয়েছে) লিপিকার ফেরেশতাগণের হাতে'। 'যারা উচ্চ সম্মানিত, পূত-চরিত্র'।

---

৯৫. মুসনাদে দায়লামী ৪/৯৮; যঈফাহ হা/৮৩।
৯৬. আহমাদ, মিশকাত হা/৫৩৩৪ ' 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, 'লোক দেখানো ও শুনানো' অনুচ্ছেদ-৫; ছহীহাহ হা/৯৫১।
৯৭. আবুদাঊদ হা/৩২-৩৩; ঐ, মিশকাত হা/৩৪৮, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩।
৯৮. বায়হাক্বী ২/১৮৭; আবুদাঊদ হা/১৫০২ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৩৫৯।

'লিপিকার' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে ইবনু জারীর বলেন, الصحيح أن السفرة الملائكة– 'সঠিক কথা এই যে, লিপিকারগণ হ'লেন ফেরেশতামণ্ডলী'। ইমাম বুখারীও তাই বলেন। ইবনু আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, اَلسَّفَرَةُ أى الْكَتَبَةُ وهُمُ الْمَلاَئِكَةُ الْكِرَامُ الْكَاتِبُوْنَ لِأَعْمَالِ الْعِبَادِ فِى الْأَسْفَارِ الَّتِىْ هِىَ الْكُتُبُ এখানে اَلسَّفَرَةُ অর্থ লেখকগণ। তারা হলেন ঐ সকল সম্মানিত ফেরেশতা, যারা বান্দার আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। একবচনে سفير ও سافر মাদ্দাহ السَّفْر السِّفْر দু'টিই হ'তে পারে। সীন যেরযুক্ত হ'লে অর্থ হবে, লেখকগণ। আর যবরযুক্ত হ'লে অর্থ হবে, সফরকারীগণ। অর্থাৎ ঐ সকল ফেরেশতা যারা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যাতায়াত করেন আল্লাহ্র হুকুম নিয়ে এবং বান্দাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকেন। এখানে লেখক ফেরেশতামণ্ডলী অর্থ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত, যা ইবনু জারীর বলেছেন।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ একবচনে كَرِيْمٌ 'সম্মানিত' এবং بَرَرَةٌ একবচনে بَارٌّ 'বিশ্বস্ত'। এক্ষণে كِرَامٌ অর্থ كِرَامٌ عَلَى رَبِّهِمْ وَ صَادِقُوْنَ لِلّٰهِ فِىْ أَعْمَالِهِمْ 'তারা পালনকর্তার নিকটে সম্মানিত এবং কর্মে আল্লাহ্র নিকটে বিশ্বস্ত'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ وَ فِىْ رِوَايَةٍ : وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ... متفق عليه 'কুরআন অধ্যয়নকারী হাফেয ও দক্ষ (এবং এর উপর সনিষ্ঠ আমলকারী) মুমিন ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) সম্মানিত ও পূত-পবিত্র ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে'।[৯৯]

কুরআনের মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনা শেষে অতঃপর আল্লাহ কুরআনে অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দিচ্ছেন এবং মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিপালনের ইতিহাস এবং পুনরুত্থান দিবসে কারু প্রফুল্ল বদন ও কারু মসীলিপ্ত চেহারা বর্ণনা করছেন *(১৭-৪২)*।-

(১৭) قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ 'ধ্বংস হৌক মানুষ! সে কতই না অকৃতজ্ঞ।

কুরআন ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী মানুষকে ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ বলেন, قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ অর্থ لُعِنَ الْإِنْسَانُ مَا أَشَدُّ كُفْرَهُ 'মানুষের উপরে লা'নত! কতই না বড় তার কুফরী'! বিস্ময়কর কিছু বলার সময় আরবরা এভাবে বলে থাকে। যেমন أَخْزَاهُ اللّٰهُ مَا أَظْلَمَهُ 'আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন! কতই না বড় যালেম সে'!

৯৯. বুখারী হা/৪৯৩৭, মুসলিম হা/৭৯৮ 'মুসাফিরগণ' অধ্যায়, 'হাফেযে কুরআনের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২১১২।

ইবনু জারীর বলেন, এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, أَيُّ شَيْئٍ جَعَلَهُ كَافِرًا ؟ 'কোন বস্তু তাকে কাফের বানালো'? অর্থাৎ কোন জিনিস তাকে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী হতে প্ররোচিত করলো'? এখানে مَا أَكْفَرَهُ এর মধ্যেকার مَا অব্যয়টি استفهام توبيخ وتعجب 'ধিক্কার ও বিস্ময়বোধক প্রশ্ন' অর্থে এসেছে। কেননা প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনো পুনরুত্থান ও পরকালকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করতে পারে না। বস্তুতঃ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভকারী মানুষের সত্তাই *(দাহর ৭৬/১)* তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বড় সাক্ষী।

(১৮-১৯) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ '(সে কি ভেবে দেখে না) কি বস্তু হ'তে (আল্লাহ) তাকে সৃষ্টি করেছেন? 'শুক্রবিন্দু হ'তে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন'।

অত্র আয়াতগুলিতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, যাতে অবিশ্বাসীরা তা স্মরণ করে ফিরে আসে এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগত হয়। আল্লাহ বলেন, অবিশ্বাসীরা কি একথা ভেবে দেখে না যে, কি বস্তু হ'তে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন? বলেই আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন- শুক্রবিন্দু হ'তে।

এখানে قَدَّرَهُ দু'টি অর্থ হ'তে পারে। একটি হ'ল سَوَّاهُ 'তাকে পরিমিত করেছেন'। অর্থাৎ সুন্দর ও সুঠাম দৈহিক অবয়ব দান করেছেন। আরেকটি হ'ল, তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে ১২০ দিন থাকার পর ফেরেশতা এসে তার কপালে চারটি বস্তু লিখে দেন। তার আয়ুষ্কাল, কর্মকাণ্ড, রিযিক এবং জান্নাতী না জাহান্নামী'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ জান্নাতবাসীর ন্যায় আমল করবে, অতঃপর তার নিকটে পৌঁছতে এক হাত বাকী থাকবে, এমন সময় তার উপর তাক্বদীর বিজয়ী হবে এবং সে জাহান্নামবাসীর কর্ম সম্পাদন করবে ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অন্যজন জাহান্নামের কর্ম করবে তার নিকটে পৌঁছতে এক হাত বাকী থাকবে। এমন সময় তার উপর তাক্বদীর বিজয়ী হবে এবং সে জান্নাতবাসীর আমল করবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১০০] অত্র হাদীছে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদ রয়েছে।

মানবশিশুর জন্ম ইতিহাস :

প্রথম মানুষ আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন মাটির সারাংশ (سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ) থেকে *(মুমিনূন ২৩/১২)*। অতঃপর আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর মিলনে পৃথিবীতে মানুষের বংশধারা অব্যাহত রয়েছে *(নিসা ৪/১)*। সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়াটা পুরুষের শুক্রাণুর উপর নির্ভরশীল। এতে স্ত্রীর কোন ভূমিকা নেই। আল্লাহ বলেন, وَأَنَّهُ خَلَقَ

১০০. বুখারী হা/৩২০৮, মুসলিম হা/২৬৪৩, মিশকাত হা/৮২।

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى- مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى 'তিনি পুরুষ ও নারী জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেন (পুরুষের) বীর্য থেকে যখন তা (স্ত্রীর জরায়ুতে) নিক্ষেপিত হয়' *(নাজম ৫৩/৪৫-৪৬)*। অতএব অধিক কন্যাসন্তান হ'লে স্ত্রীকে দায়ী করার মানসিকতা স্রেফ মূর্খতাসুলভ আচরণ মাত্র। ছেলে হৌক বা মেয়ে হৌক, তাতে স্বামী-স্ত্রীর কিছুই করার নেই। যদিও স্বামীর শুক্রাণু থেকেই সন্তানের বংশ নির্ধারিত হয়ে থাকে। পুরুষের একবারের স্খলিত বীর্যে কয়েক কোটি শুক্রাণু থাকে। যার পরিমাণ প্রতি মিলিলিটারে ২০ থেকে ৪০ মিলিয়ন। যার একটি মাত্র অণু স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হ'লেই আল্লাহ্‌র হুকুমে সন্তানের ভ্রুণ সৃষ্টি হয়। ঐ শুক্রাণুটি x জাতের হ'লে তাতে কন্যাসন্তান হয়, আর y জাতের হ'লে তাতে পুত্রসন্তান হয়। স্বামীর শুক্রাণু স্ত্রীর জারায়ুতে প্রবেশ করে স্ত্রীডিম্বের সাথে মিলিত হওয়ার পরপরই জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে স্বামীর ২৩টি ও স্ত্রীর ২৩টি ক্রোমোজম মিলিত হয়ে 'সংমিশ্রিত বীর্য' (نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ) প্রস্তুত হয় *(দাহর ৭৬/২)*। যা প্রথম ছয়দিন বুদ্বুদ (Hollow-ball) আকারে থাকে। অতঃপর অবয়ব প্রাপ্ত হয়ে প্রথমে শুক্রবিন্দু, অতঃপর জমাট রক্তবিন্দু, তারপর গোশতপিণ্ড, তারপর অস্থি-মজ্জা ও গোশত-চর্মসহ নতুন আকারে মানব শিশুর রূপ ধারণ করে (*মুমিনূন* ২৩/১৩-১৪)। অতঃপর চার মাস বয়সে আল্লাহ তাতে রূহ প্রেরণ করেন। এ সময় ফেরেশতা পাঠিয়ে তার কপালে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয়, যা হ'ল তার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে পূর্ব নির্ধারিত তাক্বদীর।[১০১] বাংলায় যাকে আমরা 'ভাগ্য' বলে থাকি।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মানবশিশু তার মায়ের গর্ভে রূহ প্রাপ্তির সাথে সাথে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ণ রূপরেখা প্রাপ্ত হয়। যেমন ঔষধের প্রস্তুতকারক প্যাকেটের উপর ঔষধের মেয়াদকাল, তার ক্রিয়া ও ফলাফল লিখে দিয়ে থাকেন। ঔষধ প্রস্তুত হয় ফ্যাক্টরীতে বিজ্ঞানীর হাতে। আর মানবশিশু সৃষ্টি হয় মায়ের গর্ভে আল্লাহ্‌র সরাসরি নির্দেশনায় 'একটির পর একটি স্তরে তিনটি কঠিন পর্দার অন্তরালে' *(যুমার ৩৯/৬)*। আর সেখানেই লিখে দেয়া হয় তার জীবনের মেয়াদকাল, তার ভাল-মন্দ ক্রিয়া ও ফলাফল। একারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ 'তোমরা কাজ করে যাও। কেননা প্রত্যেকে ঐ কাজ সহজে করবে, যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।[১০২] বিস্ময়কর এই সৃষ্টি কৌশল এখানে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন মাত্র দু'টি শব্দে مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ 'শুক্রবিন্দু হ'তে তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন'। আল্লাহ মানব সৃষ্টির উৎস বলে দিলেন। এখন তাঁর দেয়া জ্ঞানশক্তি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা যত বেশী গভীরে ডুব দিবেন, তত বেশী বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্যাদি জানতে পারবেন। যা তাদেরকে আরও বেশী আল্লাহভীরু ঈমানদার হতে উদ্বুদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ।

---

১০১. বুখারী হা/৭৪৫৪, মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২।

১০২. বুখারী হা/৪৯৪৮, মুসলিম হা/২৬৪৭; মিশকাত হা/৮৫ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

(২০) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ 'অতঃপর তার (ভূমিষ্ঠ হওয়ার) রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন'।

এখানে 'রাস্তা' অর্থ মায়ের গর্ভ থেকে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার রাস্তা বুঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইকরিমা, ক্বাতাদাহ, সুদ্দী, ইবনু জারীর সকলে একথা বলেন। বস্তুতঃ এ এক অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল। মাতৃগর্ভে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে ব্যথা সঞ্চারের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে গর্ভ থেকে ঠেলে বের করে দেন। আমরা সন্তান পেয়ে খুশী হই। কিন্তু যিনি গর্ভ সঞ্চার করালেন। অতঃপর অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বণ, আয়রণ ইত্যাদি পদার্থসহ এ যাবৎ আবিষ্কৃত মোট ৬০ প্রকার পদার্থ সহযোগে মাতৃগর্ভে শিশুর অবয়ব সৃষ্টি করলেন। অতঃপর মাতৃগর্ভে ৯ মাস ১০ দিন যাবৎ নাভীস্থিত ধমনীর মাধ্যমে মাতৃরক্তের নির্যাস দিয়ে শিশুকে পুষ্ট করলেন। তাকে রঙে-রূপে-স্বাস্থ্যে সুঠাম ও বুদ্ধি-জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন বাপ-মায়ের কোলের শান্তিরূপে ও তাদের চোখের পুত্তলীরূপে, অলক্ষ্যে থাকা সেই মহান আল্লাহ্‌র কথা কি আমরা কখনো স্মরণ করি? *সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম* (মহা পবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। মহা পবিত্র আল্লাহ, যিনি মহান)।[১০৩] অতএব তাঁর জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা।

হাসান ইবনু যায়েদ প্রমুখ বিদ্বান 'রাস্তা' বলতে দুনিয়ায় ভাল-মন্দ বেছে চলার রাস্তা সহজ করার কথা বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا 'আমরা তার জন্য পথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে হয় সে কৃতজ্ঞ হৌক, নয় সে অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহর ৭৬/৩)*। অর্থাৎ যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই কাজ তার জন্য আমরা সহজ করে দিয়েছি। ইবনু কাছীর এই ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(ইবনু কাছীর)*।

(২১) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ 'অতঃপর তিনি তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন'। এখানে مَاتَ 'মৃত্যু হয়' না বলে أَمَاتَهُ 'তার মৃত্যু ঘটান' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের মৃত্যু আল্লাহ্‌র হুকুমে হয়ে থাকে। তবে খুনী মানুষ খুন করে, তার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ খুন করেছেন। বরং তার অর্থ এই যে, আল্লাহ খুনীকে বাধা দেননি বা তার হাত অবশ করে দেননি। এর দ্বারা তিনি খুনীর জ্ঞানের পরীক্ষা নিয়েছেন যে, সে আল্লাহ্‌র বাধ্য না অবাধ্য। যেহেতু সে অবাধ্যতা করেছে, তাই তাকে ইহকালে এবং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অবশ্য ইহকালে সে তওবা করলে এবং ইসলামী আদালত কর্তৃক যথাযথভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত হ'লে আল্লাহ তার পরকালের শাস্তি মওকুফ করতে পারেন।[১০৪] এভাবে আল্লাহ দুনিয়াতে যালেম ও মযলূম উভয়ের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

---

১০৩. বুখারী হা/৬৬৮২, ৭৫৬৩, সর্বশেষ হাদীছ।
১০৪. বুখারী হা/৭২১৩, মুসলিম হা/১৭০৯, মিশকাত হা/১৮ 'ঈমান' অধ্যায়; যুমার ৩৯/৫৩।

মযলূমের পরীক্ষা এভাবে হয় যে, যুলুমের ফলে সে আল্লাহকে দায়ী করে তার অবাধ্য হয় কি-না বা তাঁকে ভুলে যায় কি-না। আর যালেমের পরীক্ষা এভাবে হয় যে, সে আল্লাহ্র ভয়ে যুলুম থেকে বিরত হয় কি-না।

فَأَقْبَرَهُ 'অতঃপর তাকে তিনি কবরস্থ করান' বলার মধ্যে মানুষের লাশকে সসম্মানে কবর দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা রূপে সম্মানিত করেছেন (*বনু ইসরাঈল* ১৭/৭০)। মৃত্যুর পরেও তার সম্মান বজায় থাকে। তাই তার লাশ যাতে মাটিতে পড়ে না থাকে এবং শিয়াল-কুকুর বা শকুনে খেয়ে অমর্যাদা না করে, সেজন্য তাকে সসম্মানে ও যথার্থ সমাদরে গোসল দিয়ে পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় কবরস্থ করতে হবে। আজকাল রাষ্ট্রীয় মর্যাদার নামে মৃতকে স্যালুট দেওয়া, রাইফেলের গুলি ফুটানো ও বিউগলে বাঁশি বাজানোর এক অভিনব পদ্ধতি চালু হয়েছে। যার কোন নৈতিক, যৌক্তিক বা ইসলামী ভিত্তি নেই। স্রেফ লোক দেখানো ও অপচয় ব্যতীত এগুলি কিছুই নয়।

অনেকে মৃত্যুর আগে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করে যান। অথচ দেহের মালিক আল্লাহ্র এতে কোন অনুমোদন নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মৃতের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড্ডি ভাঙ্গার ন্যায়' (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا)।[১০৫] তিনি মৃতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিতে নিষেধ করেছেন।[১০৬] অতএব জনকল্যাণের জন্যে হ'লেও এসব থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য।

হাদীছে মাইয়েতকে পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে গোসল ও কাফন-দাফনের সুন্দর নিয়ম-কানূন সমূহ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দাফনের পূর্বে মাইয়েতের পরকালীন জীবন সুখময় হবার প্রার্থনা জানিয়ে জানাযার সুন্দর ব্যবস্থা দেওয়া আছে। অতএব আগুনে পোড়ানোর মত নিষ্ঠুর পদ্ধতি বা অন্য কোনভাবে মানুষের মৃতদেহ সৎকার করা আল্লাহ্র প্রেরিত বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ্র সবচাইতে প্রিয় সৃষ্টি মানুষের মরদেহকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করাতে আল্লাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। যারা এসব কাজ করেন, নিশ্চয় তারাও সহজভাবে এটা গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু তাদেরকে তথাকথিত ধর্মের দোহাই দিয়ে এসব করাতে বাধ্য করেন কথিত ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা। অথচ এগুলি আদৌ কোন ধর্ম নয়। বরং ধর্মের নামে অধর্ম এবং বানোয়াট রীতি মাত্র। কেননা প্রকৃত ধর্ম তাই যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। আর তা হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

(২২) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ 'অতঃপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পুনর্জীবিত করবেন'। এখানে أَنْشَرَهُ অর্থ أَحْيَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ 'মৃত্যুর পরে তাকে জীবিত করবেন'। মাদ্দাহ 'নাশর' বা 'নুশূর' অর্থ পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন। ঘুম থেকে উঠে আমরা যে দো'আ পাঠ করি,

---

১০৫. আবুদাঊদ হা/৩২০৯, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭১৪।
১০৬. আবুদাঊদ হা/২৬৬৭, মিশকাত হা/৩৫৪০।

তার শেষে বলি 'ওয়া এলাইহিন নুশূর' 'এবং তাঁর নিকটেই আমাদের পুনরুত্থান'। এ দো'আ পাঠের মাধ্যমে প্রতিদিন আমাদেরকে ক্বিয়ামতের কথা স্মরণ করানো হয়। পুনরুত্থানের বাস্তব প্রমাণ পেশ করে আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ– 'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল এই যে, তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন'। অতঃপর এখন তোমরা মানুষ হিসাবে (সারা পৃথিবীতে) ছড়িয়ে পড়েছ' *(রূম ৩০/২০)*। তিনি আরও বলেন, وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْماً– 'চেয়ে দেখ হাড্ডিগুলোর দিকে কিভাবে আমরা সেগুলিকে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপরে গোশতের আবরণ পরিয়ে থাকি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৯)*। আয়াতটি নাযিল হয় বিগত যুগে পুনরুত্থানে বিস্ময়বোধকারী জনৈক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর একশ বছর পরে জীবিত করে তাকেই প্রমাণ হিসাবে পেশ করা উপলক্ষে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ إِبْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيْهِ يُرَكَّبُ– 'প্রত্যেক আদম সন্তানের দেহ মাটিতে খেয়ে ফেলবে, কেবল মেরুদণ্ডের নীচের হাড্ডি ব্যতীত। তা থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাতেই তাকে পুনরায় অবয়ব দান করা হবে'।[১০৭] বস্তুতঃ উক্ত অণুর নমুনা থেকে প্রত্যেক মানুষ তার পূর্বের রূপ নিয়ে পুনরুত্থিত হবে। যেমন বট ফলের ছোট্ট বীজ থেকে বিশাল বটবৃক্ষের উত্থান ঘটে। ডিএনএ টেস্ট করার মাধ্যমে মানুষ যদি হাযার বছর পূর্বে মৃত মানুষের খবর জানতে পারে, তাহ'লে আল্লাহ্র জন্য এগুলি কিছুই নয়।

(২৩) كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ 'কখনই না। সে পূর্ণ করেনি, যা তাকে (আল্লাহ) আদেশ করেছেন'।

كَلاَّ ধিক্কারসূচক অব্যয় (حرف ردع)। অর্থাৎ ক্বিয়ামত হবে না বলে অবিশ্বাসীরা যে কথা বলে, তা কখনোই সঠিক নয়। বরং প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ কখনোই আল্লাহ্র নির্দেশ মানেনি। সে কখনোই তার ওয়াদা এবং কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেনি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে বলতেন, لم يف بالميثاق الذى أخذ عليه فى صلب آدم 'মানুষ কখনোই তার ওয়াদা পূর্ণ করেনি, যা আদমের পিঠ থেকে বের করে তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ সেদিন

---

১০৭. বুখারী হা/৪৮১৪, মুসলিম হা/২৯৫৫, মিশকাত হা/৫৫২১।

আল্লাহ যখন আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই'? তখন জওয়াবে আমরা বলেছিলাম, بَلَى হ্যাঁ (*আ'রাফ ৭/১৭২*)। কিন্তু দুনিয়ায় এসে শক্তি-সামর্থ্যের মালিক হয়ে সবকিছু অস্বীকার করছি আর বলছি আল্লাহ নেই, ক্বিয়ামত নেই, পরকালে জওয়াবদিহিতা নেই। অতএব খাও-দাও ফূর্তি করো। মুজাহিদ ও ক্বাতাদাহ বলেন, لا يقضى احد ما أمر به 'মানুষকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা আদেশ করা হয়েছে, সে তা পূর্ণ করে না' (*কুরতুবী*)।

এখানে সাধারণভাবে সকল মানুষকে ধিক্কার দিয়ে বলা হ'লেও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল 'অবিশ্বাসী মানুষ' (الإنسان الكافر)। কেননা অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র নিকটে কৃত ওয়াদা পালন করে না। আল্লাহ্র দ্বীন কবুল করে না। আল্লাহ্র দেওয়া ফরয-ওয়াজিব, হারাম-হালাল কিছুই মানে না। পক্ষান্তরে সত্যিকারের বিশ্বাসী মুমিন নর-নারীগণ সাধ্যমত আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধসমূহ মান্য করে চলেন। কোন কোন আধ্যাত্মিক আলেম (علماء الأرواح) এই আয়াতের ভিত্তিতে বলতে চান যে, দুনিয়াতে 'ইনসানে কামেল' বা পূর্ণ মানুষ বলে কেউ নেই। বরং 'ইনসানে ছালেহ' বা সৎ মানুষ রয়েছে (*তানতাভী*)। আমরা মনে করি তাদের এই দাবী যথার্থ নয়। কেননা নবী-রাসূলগণ কেবল সৎ মানুষ ছিলেন না, তারা ছিলেন ইনসানে কামেল বা মানবতার পূর্ণাঙ্গ নমুনা, উসওয়ায়ে হাসানাহ' (*মুমতাহিনা ৬০/৬; আহযাব ৩৩/২১*)। নবী-রাসূল ছাড়াও প্রথম যুগের মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণ এবং যুগে যুগে তাঁদের যথার্থ অনুসারী মুমিন নর-নারীগণ, যাদের উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাই সৃষ্টির সেরা' (*তওবাহ ৯/১০০; বাইয়েনাহ ৯৮/৭-৮*)। তারা নিঃসন্দেহে ইনসানে কামেল।

মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা ও তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের পর এক্ষণে আল্লাহ মানুষের জন্য কিভাবে খাদ্য ও পানীয় যোগান দেন, তার বর্ণনা দিচ্ছেন। যাতে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্কে চিনে ও তাঁর অনুগত হয়।-

(২৪-৩২) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِه، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا، وَّعِنَباً وَّقَضْباً، وَّزَيْتُوْناً وَّنَخْلاً، وَّحَدَائِقَ غُلْباً، وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا، مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ- 'অতএব মানুষ একবার লক্ষ্য করুক তার খাদ্যের দিকে (২৫) আমরা (কিভাবে তাদের জন্য) বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকি (২৬) অতঃপর ভূমিকে ভালভাবে বিদীর্ণ করি (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করি খাদ্য-শস্য (২৮) আঙ্গুর ও শাক-সবজি (২৯) যয়তুন ও খর্জুর (৩০) ঘন পল্লবিত উদ্যানরাজি (৩১) এবং ফল-মূল ও ঘাস-পাতা (৩২) তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগ্যবস্তু হিসাবে'।

شَقَّ يَشُقُّ شَقًّا অর্থ صَدَعَ ফাটানো, বিদীর্ণ করা, বিচ্ছিন্ন করা। সেখান থেকে شَقَقْنَا الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ 'আমরা মাটিকে বিদীর্ণ করি অংকুরোদ্গমের মাধ্যমে'।

উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহে মানুষের প্রতি আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহরাজির বর্ণনা দিয়েছেন। সাথে সাথে পুনরুত্থানের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন যে, আমরা যেভাবে মৃত যমীন থেকে জীবন্ত উদ্ভিদরাজি বের করে আনি, অনুরূপভাবে মানুষের মাটি হয়ে যাওয়া দেহকে ক্বিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করব। কুরআনের এসব আয়াত সমূহে উদ্বুদ্ধ হয়ে একসময় মুসলিম স্পেন ও বাগদাদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু উভয় স্থানে খেলাফতের পতনের সাথে সাথে মুসলমানদের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পতন শুরু হয় এবং মুসলিম উম্মাহ্র হাত থেকে বিজ্ঞানের নেতৃত্ব পাশ্চাত্যের হাতে চলে যায়। মুসলিম তরুণদের পুনরায় বিজ্ঞানের মূল উৎস কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে আসতে হবে এবং তাদের হারানো নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে হবে। এজন্য অবশ্যই রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কুরআনমুখী হতে হবে এবং কুরআন গবেষণায় সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।

২৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'মানুষ একবার তাকিয়ে দেখুক তার খাদ্যের দিকে'। তিনি কেন এটা বললেন? তার কারণ খাদ্য হ'ল মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান মাধ্যম। খাদ্যের মাধ্যমেই মানুষের দেহে শক্তি ও মাথায় বুদ্ধির যোগান হয়। দেহের প্রবৃদ্ধির যাবতীয় উপাদান ও প্রাণশক্তি আল্লাহ বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত রেখেছেন। এক এক খাদ্যের এক এক গুণ ও ক্ষমতা দান করেছেন। অতএব মানুষ যখন খাদ্য গ্রহণ করবে, তখন যেন সে চিন্তা করে যে, এই খাদ্য তার গুণ-ক্ষমতাসহ তার প্লেটে কে পাঠালো ও কিভাবে এলো।

বাংলাদেশে আমাদের প্রধান খাদ্য চাউল। যখন প্লেট থেকে এক লোকমা ভাত আমরা মুখে তুলি, তখন কি আমরা দেখি এই লোকমাটির সৃষ্টি রহস্য? ১০০ গ্রাম চাউলের মধ্যে কি কি উপাদান রয়েছে। কে এগুলি প্রয়োজনীয় পরিমাণে একত্রিত করে তাতে বিশেষ স্বাদ-গন্ধ ও প্রাণশক্তি দান করল? একটি ধানের বীজ থেকে সাতটি ধানের গাছ ও সাতটি ধানের গাছের প্রতিটির শীষে কে সাতশ ধান সৃষ্টি করলো ও সেখানে দুধ শুকিয়ে দানা শক্ত করল? ধানের উৎপাদনে কত মানুষের ও গরু-মহিষের শ্রম দিতে হ'ল? কৃষি-যন্ত্রপাতি তৈরী ও ব্যবহারে এবং কীটনাশক ঔষধ ও রাসায়নিক সার আবিষ্কারে কত মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তি ব্যয়িত হ'ল? প্রায় তিন মাস যাবত জমিতে ধান গাছটি কে বর্ধিত করল ও শুকালো? অতঃপর কেন তা শুকানোর পরেও গাছগুলি শীষসহ দাঁড়িয়ে থাকলো। এমনকি ঝড়ে গাছগুলি পড়ে গেলেও ধানগুলি কেন ঝরে পড়লো না? অতঃপর ধানগুলি কেটে এনে মাড়াই করে চাউল করে সরাসরি অথবা দেশের বাজার হতে কিংবা বিদেশ থেকে আমদানী হয়ে বাজারে আসার পর সেখান থেকে খরিদ করে বাড়ী এনে তা

রান্না করে প্লেটে খাদ্যরূপে আমাদের সামনে আসতে কত কৃষক- শ্রমিক-মজুর, কত বিজ্ঞানী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কত শত মানুষের শ্রম ও শ্রমঘণ্টা ব্যয় হয়েছে, তা কি আমরা কখনো চিন্তা করে দেখেছি? কে সেই মহান সত্তা যিনি আলো দিয়ে, উত্তাপ দিয়ে, বাতাস দিয়ে, বৃষ্টি দিয়ে উন্মুক্ত যমীনে আমাদের জন্য ধান-গম ও শাক-সবজি উৎপন্ন করলেন? কে আমাদের জন্য সুন্দর খাদ্য-ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেন? আমার-আপনার সমস্ত দেহমন আপনা থেকেই বলে উঠবে, তিনি আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। তিনি আমার মহান সৃষ্টিকর্তা ও দয়ালু পালনকর্তা। যিনি একক, যার কোন শরীক নেই। তাই খাওয়ার শুরুতে আল্লাহকে স্মরণ করে বলতে হয় *'বিসমিল্লাহ'* এবং শেষে আল্লাহ্র প্রশংসা করে বলতে হয়, *'আলহামদুলিল্লাহ'*।

দেখুন যে নাইট্রোজেন আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, সেই নাইট্রোজেন আমাদের খাদ্যের জন্য কত বড় বন্ধু? জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন জীবন রক্ষাকারী ঔষধের মত কাজ করে। এর উৎস হ'ল বজ্র ও বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ চমকের মাধ্যমে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন পতিত হয় এবং বাতাস ও বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে মিশ্রিত হয়, তা বছরে প্রায় এক কোটি টন ইউরিয়া সারের কাজ দেয়। প্রতি একর জমিতে যার পরিমাণ পাঁচ পাউণ্ডের মত। এভাবে মৃত যমীনকে আল্লাহ জীবিত করেন ও তার মাধ্যমে খাদ্য-শস্য উৎপাদন করেন।

এভাবে উদ্ভিদ জগতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রকারের ঊর্ধ্বে উদ্ভিদরাজি আমাদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত রয়েছে *(তানতাভী)*। কোন উদ্ভিদ আমাদের খাদ্য যোগান দিচ্ছে। যেমন ধান, গম, শাক-সবজি ইত্যাদি। কোন উদ্ভিদ আমাদের পোষাকের যোগান দিচ্ছে, যেমন তুলা গাছ ইত্যাদি। কোন উদ্ভিদ আমাদের তৈল-মশলা ও সুগন্ধি, কোন উদ্ভিদ আমাদের জন্য ফল-ফলাদি, কোনটা দিচ্ছে ঔষধের যোগান, কোনটা দিচ্ছে গৃহ-সরঞ্জামাদির যোগান ইত্যাদি। উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজি কেবল আমাদের ও আমাদের গবাদিপশুর খাদ্য ও ঔষধের যোগান দেয় না, বরং আমাদের জীবন রক্ষায় অকৃত্রিম বন্ধুর কাজ করে। বাতাসে শতকরা ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ অক্সিজেন থাকে। আল্লাহ্র হুকুমে গাছগুলি সারাদিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ছাড়ে এবং সারারাত অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে। এভাবে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিক থাকে। এই পরিমাণে তারতম্য ঘটলে শ্বাস-প্রশ্বাসে তারতম্য ঘটবে এবং প্রাণীজগত মারা পড়বে। উল্লেখ্য যে, মানুষ অক্সিজেন টানে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে। কোন অবস্থাতেই মানুষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড টানবে না। কারণ মানুষের নাককে সে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কখনও অক্সিজেন হঠাৎ না পেলে আপনা থেকেই মুখ গহ্বর হা করে হাই উঠে যায় এবং

পরক্ষণেই অক্সিজেন এসে গেলে মুখ বন্ধ হয়ে যায়। যদি অক্সিজেন ৫ মিনিট না আসত, তাহ'লে মুখের ঐ হা আর বন্ধ হতো না। ঐভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হতো।

হে মানুষ! বৃক্ষরাজির এই অমূল্য অবদান কি কেউ ভুলতে পারবে? আল্লাহ যে সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা এটা কি তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়? এজন্যই তো কুরআনের সার নির্যাস সূরায়ে ফাতিহার প্রথম আয়াতেই প্রতি ছালাতের প্রতি রাক'আতে আমরা পড়ি 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন'- 'কৃতজ্ঞতাপূর্ণ যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালকের জন্য'। এখানে খালেক বা সৃষ্টিকর্তা না বলে রব বা পালনকর্তা বলার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, অবিশ্বাসী কাফের-মুশরিকরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানলেও পালনকর্তা হিসাবে মানতে চায় না। ফেরাঊন এজন্য নিজেকে 'রব' দাবী করেছিল। কিন্তু 'খালেক' দাবী করেনি।

হে পাঠক! আসুন এবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করি, কেন আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বললেন? ধরুন। আপনি একজন বুদ্ধিমান চাষী। আপনি আপনার জমিতে ধান চাষ করবেন, না নেপিয়ার ঘাস চাষ করবেন? যদি আপনি ঘাসের চাষ করেন, তবে সেটা কেবল আপনার গবাদিপশুর খাদ্যের ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু আপনার ও আপনার সন্তানদের খাদ্যের ব্যবস্থা হ'ল না। আর যদি তামাকের চাষ করেন, তাহ'লে না আপনার খাদ্য হ'ল, না আপনার গবাদিপশুর খাদ্য হ'ল। কেননা তামাক এমন নিকৃষ্ট গাছ, যা ছাগল-গরু দূরে থাক, কুকুর-শূকরেও খায় না। যদিও সভ্য হওয়ার দাবীদার মানুষের কেউ কেউ তা মজা করে চিবিয়ে খায়। আবার বহুলোক তা মোড়কে ভরে তাতে আগুন ধরিয়ে সুখটান দিয়ে বংকিম ভঙ্গিতে ধোঁয়া উড়িয়ে বলেন, এর দ্বারা মগয গরম হয় ও বুদ্ধি বের হয়। অথচ তামাক হ'ল নেশাদার বৃক্ষ, যা মানুষকে মদমত্ত ও পথভ্রষ্ট করে।

পক্ষান্তরে যদি আপনি ধান চাষ করেন, তাহ'লে তাতে আপনার খাদ্য যেমন রয়েছে, আপনার গবাদিপশুর খাদ্যও তেমনি রয়েছে। এর মধ্যে আপনি দু'টি নে'মত একত্রে পেলেন। এটাই হ'ল তুলনা ঐ দুই ব্যক্তির জন্য যাদের একজন নেক আমল করল ও অন্যজন বদ আমল করল। যে ব্যক্তি নেক আমল করল, সে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করল। কিন্তু যে ব্যক্তি বদ আমল করল, সে কেবল দুনিয়ায় সাময়িক কিছু উপকার পেল। কিন্তু আখেরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল। বস্তুতঃ বর্ণিত আয়াতগুলিতে বান্দার প্রতি আল্লাহ্র এটাই হ'ল আন্তরিক আহ্বান, যেন সে দুনিয়াতে এমন আমল করে যা তার ইহকালে ও পরকালে কাজে লাগে। অন্যত্র একথাটিই আল্লাহ বলেছেন এভাবে,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ، (الشورى ٢٠)-

‘যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তার কিছু অংশ দেই। কিন্তু পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না’ (*শূরা ৪২/২০*)।

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলিতে *(২৪-৩২)* কিভাবে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ মৃত যমীনকে সজীব করেন এবং সেখান থেকে মানুষ ও গবাদিপশুর জন্য খাদ্য-শস্য ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেন ও বাগ-বাগিচা ও বন-জঙ্গল সৃষ্টির মাধ্যমে জীবকুলকে বাঁচিয়ে রাখেন- সবকিছু বর্ণনা করার পর অবশেষে ক্বিয়ামতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন *(৩৩-৪২ আয়াত)*।-

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ، **(৩৩-৪২)** لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ، وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ، وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ-

(৩৩) ‘অতঃপর যেদিন সেই নিনাদ আসবে (৩৪) সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে (৩৫) তার মা-বাপ (৩৬) এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। (৩৭) প্রত্যেক মানুষের সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, সে নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল (৩৯) সহাস্য, প্রফুল্ল (৪০) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত। (৪১) কালিমালিপ্ত। (৪২) তারা হ’ল অবিশ্বাসী, পাপিষ্ঠ’।

الصَّاخَّةُ অর্থ الصيحة العظيمة التى تَصُخُّ الآذان ‘মহা নিনাদ যা কান ফাটিয়ে দেয়’। এখানে অর্থ النفخ في الصور يوم القيامة ‘ক্বিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁকদান’। আর এটি হ’ল النفخة الثانية ‘দ্বিতীয় বারের ফুঁকদান’ *(কুরতুবী)*।

উপরের আয়াতগুলিতে ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সেদিন মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। কেউ কারু দিকে তাকানোর ফুরছত পাবে না। সেই ভয়ংকর বিপদের দিনে একটি নেকী দিয়েও কেউ কাউকে সাহায্য করবে না। সবাই নাফসী নাফসী করবে।[১০৮] এমনকি নারী-পুরুষের কেউ কারু গুপ্তাঙ্গের দিকেও তাকাবে না। স্ত্রী আয়েশার এমনি এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ‘হে আয়েশা সেদিনকার অবস্থা এমন ভয়ংকর হবে যে, কেউ কারু দিকে তাকাবার ফুরছত পাবে না’।[১০৯] সেদিন মানুষ তার প্রথম সৃষ্টির ন্যায় নগ্ন

১০৮. বুখারী হা/৩৩৪০; মুসলিম হা/৩২৭; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬৪৪।
১০৯. বুখারী হা/৬৫২৭, মুসলিম হা/২৮৫৯; মিশকাত হা/৫৫৩৬।

হয়ে উঠবে[১১০] এবং সেদিন প্রথম কাপড় পরানো হবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে।[১১১] সেদিন কেউ শিশু বা বৃদ্ধ থাকবেনা। বরং প্রত্যেকের বয়স ৩০ অথবা ৩৩ বছর হবে।[১১২]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ অর্থাৎ ঐদিন মানুষের মধ্যে দু'টি দল হবে। একদল হবে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট। এরা হবে জান্নাতী।

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ 'আরেকদল হবে মসীলিপ্ত চেহারা বিশিষ্ট। غَبَرَةٌ অর্থ غُبار বা ধোঁয়া ও ধূলি-বালি। قَتَرَةٌ বহুবচনে قَتَرٌ অর্থ আলকাতরা বা কালো রং।

أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 'এরা হ'ল অবিশ্বাসী ও পাপিষ্ঠের দল'। الْكَفَرَةُ وَالْفَجَرَةُ একবচনে الكافر والفاجر অর্থ অবিশ্বাসী ও পাপাচারী। অবিশ্বাসীরা কাফির, কপট বিশ্বাসীরা মুনাফিক এবং পাপিষ্ঠরা ফাসেক-ফাজির। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমীন!!

সারকথা :

দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব সকলকে সমান জ্ঞান করার শিক্ষা প্রদান এবং কুরআনে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী হওয়ার ভিত্তিতে পুনরুত্থান দিবসে দু'দল মানুষের দু'রকম অবস্থার বাণীচিত্র অংকন।

১১০. আম্বিয়া ২১/১০৪; বুখারী হা/৬৫২৭, মুসলিম হা/২৮৫৯; মিশকাত হা/৫৫৩৬।
১১১. বুখারী হা/৪৬২৫, মুসলিম হা/২৮৬০; মিশকাত হা/৫৫৩৫।
১১২. তিরমিযী হা/২৫৪৫, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫৬৩৯।

সূরা তাকভীর (আলোহীন করা)

সূরা লাহাবের পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮১, আয়াত ২৯, শব্দ ১০৪, বর্ণ ৪২৫।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যেদিন সূর্যকে আলোহীন করা হবে	اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ۪ۙ﴿۱﴾
(২) যেদিন নক্ষত্র সমূহ খসে পড়বে	وَ اِذَا النُّجُوۡمُ انۡكَدَرَتۡ ۪ۙ﴿۲﴾
(৩) যেদিন পাহাড়সমূহ উড়তে থাকবে	وَ اِذَا الۡجِبَالُ سُیِّرَتۡ ۪ۙ﴿۳﴾
(৪) যেদিন দশ মাসের গাভিন উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে	وَ اِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ۪ۙ﴿۴﴾
(৫) যেদিন বন্যপশুদের একত্রিত করা হবে	وَ اِذَا الۡوُحُوۡشُ حُشِرَتۡ ۪ۙ﴿۵﴾
(৬) যেদিন সমুদ্রগুলিকে অগ্নিময় করা হবে	وَ اِذَا الۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ۪ۙ﴿۶﴾
(৭) যেদিন আত্মাসমূহকে মিলিত করা হবে	وَ اِذَا النُّفُوۡسُ زُوِّجَتۡ ۪ۙ﴿۷﴾
(৮) যেদিন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে	وَ اِذَا الۡمَوۡءٗدَۃُ سُئِلَتۡ ۪ۙ﴿۸﴾
(৯) কি অপরাধে সে নিহত হ’ল?	بِاَیِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۚ﴿۹﴾
(১০) যেদিন আমলনামা সমূহ খুলে দেওয়া হবে।	وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ ۪ۙ﴿۱۰﴾
(১১) যেদিন আকাশকে আবরণমুক্ত করা হবে।	وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتۡ ۪ۙ﴿۱۱﴾
(১২) যেদিন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হবে।	وَ اِذَا الۡجَحِیۡمُ سُعِّرَتۡ ۪ۙ﴿۱۲﴾
(১৩) যেদিন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে।	وَ اِذَا الۡجَنَّۃُ اُزۡلِفَتۡ ۪ۙ﴿۱۳﴾
(১৪) সেদিন প্রত্যেকে জানবে সে কি হাযির করেছে।	عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّاۤ اَحۡضَرَتۡ ؕ﴿۱۴﴾
(১৫) আমি শপথ করছি ঐসব নক্ষত্রের, যা (দিবসে) হারিয়ে যায় ও (রাতে) প্রকাশিত হয়।	فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ ۙ﴿۱۵﴾
(১৬) যা চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়।	الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ ۙ﴿۱۶﴾
(১৭) শপথ রাত্রির যখন তা নিষ্ক্রান্ত হয়।	وَ الَّیۡلِ اِذَا عَسۡعَسَ ۙ﴿۱۷﴾
(১৮) শপথ প্রভাতকালের যখন তা প্রকাশিত হয়।	وَ الصُّبۡحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۙ﴿۱۸﴾

(১৯) নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বাহকের (জিব্রীলের) আনীত বাণী। | إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩

(২০) যিনি শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকটে মর্যাদাবান। | ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ۝٢٠

(২১) যিনি সকলের মান্যবর ও সেখানকার বিশ্বাসভাজন। | مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝٢١

(২২) তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) পাগল নন। | وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۝٢٢

(২৩) তিনি অবশ্যই তাকে (জিব্রীলকে) দেখেছেন প্রকাশ্য দিগন্তে। | وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ۝٢٣

(২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় (অহি) বর্ণনা করতে কৃপণ নন। | وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝٢٤

(২৫) এটা (কুরআন) বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। | وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ۝٢٥

(২৬) অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছ? | فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝٢٦

(২৭) এটা তো বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ মাত্র। | إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ۝٢٧

(২৮) সেই ব্যক্তির জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়। | لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝٢٨

(২৯) আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না কেবল অতটুকু ব্যতীত যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যিনি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা। | وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢٩

গুরুত্ব :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ– 'যে ব্যক্তি চোখের সামনে ক্বিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায়, সে যেন إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ও إِذَا السَّمَاءَ انْفَطَرَت এবং إِذَا السَّمَاءَ انْشَقَّتْ সূরাগুলি পাঠ করে।'[১১৩]

বিষয়বস্তু :

১- ক্বিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা বর্ণনা *(১-১৪ আয়াত)*। ২- কুরআন যে জিব্রীল ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত সত্যগ্রন্থ এবং নবী যে সত্য, সেকথা শপথ করে বর্ণনা *(১৫-২৯ আয়াত)*।

১১৩. তিরমিযী, আহমাদ, হাকেম হা/৩৩৩৩; আলবানী, ছহীহাহ হা/১০৮১।

ব্যাখ্যা : এখানে ক্বিয়ামত সংঘটন কালের **১২**টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে ৬টি হবে দুনিয়াতে এবং ৬টি হবে আখেরাতে। দুনিয়ার ছয়টি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে **১** হ'তে ৬ আয়াতে। হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, (১) মানুষ বাজার-ঘাটে মশগুল থাকবে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সূর্যের আলো নিভে যাবে। (২) নক্ষত্রসমূহ খসে পড়বে। (৩) পাহাড়সমূহ মাটির উপর ভেঙ্গে পড়বে ও সারা পৃথিবী কম্পিত ও আন্দোলিত হবে। (৪) এ সময় জিন-ইনসান সব ভয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে। (৫) পশু-পক্ষী সব ভীত-চকিত হয়ে একত্রিত হয়ে যাবে। (৬) সমুদ্র সব অগ্নিময় হয়ে একাকার হয়ে যাবে। এরপর একটি বায়ুপ্রবাহ আসবে। যাতে সবাই মারা পড়বে' *(সংক্ষেপায়িত; ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অতঃপর আখেরাতের ছয়টি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে ৭ হ'তে ১৪ আয়াতে। যার শুরু হয়েছে এই বলে, وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ 'যেদিন আত্মাসমূহকে মিলিত করা হবে'। এবং শেষ হয়েছে وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ 'যেদিন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে'। অতঃপর 'প্রত্যেকে জানবে সে কি হাযির করেছে'।

তাফসীর (১-১৪ আয়াত) :

অত্র আয়াতগুলিতে ক্বিয়ামতকালের ভয়ংকর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।-

(১) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ 'যেদিন সূর্যকে আলোহীন করা হবে'।

অর্থাৎ সৌরজগতের মূল কেন্দ্রবিন্দু সূর্যকে যখন গুটিয়ে নেয়া হবে, তখন তার গ্রহ-উপগ্রহ সবকিছুই বিচ্ছিন্ন হবে এবং আলোহীন হয়ে যাবে। চোখের পলকে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে।

শুধু তাই নয়, সূর্য-চন্দ্র ও অন্য যেসব বস্তুকে লোকেরা পূজা করত, সবগুলিকে আল্লাহ ঐদিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ 'তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের তোমরা ইবাদত কর, সবই জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে' *(আম্বিয়া ২১/৯৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ مُكَوَّرَانِ فِى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'সূর্য ও চন্দ্র ক্বিয়ামতের দিন দু'টি ষাঁড়ের আকৃতিতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১১৪] আলবানী বলেন, এটি তাদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে নয়। বরং যারা তাদের পূজা করত, তাদের ধিক্কার দানের উদ্দেশ্যে হবে'।[১১৫]

---

১১৪. বায়হাক্বী; ছহীহাহ হা/১২৪; বুখারী হা/৩২০০; মিশকাত হা/৫৬৯২, ৫৫২৬।
১১৫. মিশকাত হা/৫৫২৬-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

سُقِطَ অর্থাৎ كَارَ يَكُوْرُ كَوْرًا অর্থ كُوِّرَ অন্ধকার হওয়া, অথবা رُمِىَ 'নিক্ষিপ্ত হওয়া' অথবা سُقِطَ 'পতিত হওয়া'। সেখান থেকে كُوِّرَتْ-এর মাছদার التكوير অর্থ গুটিয়ে নেয়া *(কুরতুবী)*। যেমন গায়ে চাদর জড়িয়ে নেয়া হয় বা মাথায় পাগড়ী গুটিয়ে বাঁধা হয়। সূর্যকে গুটিয়ে নিলে তার আসল গ্যাসীয় রূপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফলে তাতে আর কিরণ উৎপন্ন হবে না। সেজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) كُوِّرَتْ অর্থ করেছেন أُظْلِمَتْ 'অন্ধকারময় করা হবে' *(ইবনু কাছীর)*।

كُوِّرَتْ শব্দটির মধ্যে বিজ্ঞানের একটি বিরাট উৎস বর্ণিত হয়েছে। যেকালে মানুষ সূর্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত, সেই যুগে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে যে, সূর্য একদিন নিঃশেষ হবে। অতএব সে কখনো উপাস্য হতে পারে না। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সূর্য হ'ল উত্তাপ ও শক্তির উৎস। যা মানুষ ও জীবজগতের কল্যাণে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সূর্য একসময় দীপ্তিহীন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর সেটাই হ'ল ক্বিয়ামতের দিন। যদিও বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, আগামী ৫০০ কোটি বছর পর সূর্য দীপ্তিহীন হয়ে যাবে এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে *(দ্রঃ পৃঃ+++)*।

(২) وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ 'যেদিন নক্ষত্র সমূহ খসে পড়বে'।

انْكَدَرَتْ অর্থ انْتَثَرَتْ 'বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে' বা انْقَضَّتْ 'খসে পড়বে'। তার ফলে নক্ষত্র সব আলোহীন হয়ে যাবে। انْكَدَرَتْ-এর মাদ্দাহ হ'ল الكُدُوْرَةُ 'ময়লা বা মলিন হওয়া'।

আকাশের নীচে ঝুলন্ত এই বিদ্যুৎ বাল্বগুলো রাতের পৃথিবীর ছাদের অপূর্ব শোভা হিসাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন *(মুল্‌ক ৬৭/৫)*। কিন্তু এগুলোকে যখন সূর্যের আকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে, তখন সমস্ত শৃংখলা ভেঙ্গে পড়বে এবং সেগুলি সাথে সাথে বিদ্যুৎহীন বাল্‌বের মত মলিন অবস্থায় আকাশ থেকে ঝরে পড়বে। আমাদের ঘরের বিদ্যুৎ চলে গেলে বা বাল্‌ব কেটে গেলে বা মেইন সুইচ অফ করে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থা তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষ যদি মেইন সুইচ অফ করে দিয়ে গোটা শহর এমনকি গোটা দেশ অন্ধকার করে ফেলতে পারে, তাহ'লে আকাশের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের মেইন সুইচ যাঁর হাতে, সেই মহান আল্লাহ যখনই ইচ্ছা করবেন, তখনই সবকিছুই অফ হয়ে যাবে ও সবকিছু ঘোর অন্ধকারে ডুবে যাবে। এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ বিষয়। 'নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে' বলে আল্লাহ পৃথিবী ধ্বংসের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেননা পৃথিবী নিজেই একটি নক্ষত্র।

(৩) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ 'যেদিন পাহাড়সমূহ উড়তে থাকবে'।

سُيِّرَتْ অর্থ قُلِعَتْ مِنَ الْأَرْضِ وَسُيِّرَتْ فِى الْهَوَاءِ 'পৃথিবী থেকে উৎপাটিত হবে এবং বাতাসে উড়তে থাকবে'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً 'যেদিন আমরা পাহাড়সমূহকে পরিচালিত করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত...' *(কাহফ ১৮/৪৭)*।

ক্বিয়ামতের দিন পাহাড়ের অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়ে কুরআনের বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন (ক) فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفاً 'তুমি বল আমার পালনকর্তা পাহাড় সমূহকে উৎপাটিত করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন'। 'অতঃপর পৃথিবীকে করবেন قَاعًا صَفْصَفًا মসৃণ সমতলভূমি' *(ত্বোয়াহা ২০/১০৫-১০৬)*। (খ) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا 'এবং পাহাড়সমূহ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে'। 'অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৫-৬)*। (গ) وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْباً مَّهِيْلاً 'পাহাড়সমূহ হবে বালুকাস্তূপ' *(মুযযাম্মিল ৭৩/১৪)*। (ঘ) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً 'পাহাড়সমূহ চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে' *(নাবা ৭৮/২০)*। (ঙ) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ 'এবং পাহাড়সমূহ হয়ে যাবে ধূনিত তুলার ন্যায়' *(ক্বারে'আহ ১০১/৫)* ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, ক্বিয়ামতের পর ভূপৃষ্ঠে পাহাড়ের কোন চিহ্ন থাকবে না। কেননা ঐ সময় পাহাড়ের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না।

(৪) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ 'যেদিন দশমাসের গাভিন উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে'।

আরবদের নিকটে গাভিন উষ্ট্রী অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। তারা একে সব সময় আগলে রাখে। কখনোই ছেড়ে রাখে না। কিন্তু ক্বিয়ামতের ভয়ংকর সময়ে তারা তাদের ঐ মূল্যবান উষ্ট্রীর কথা ভুলে যাবে। তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। মূলতঃ এটি আরবদের বুঝানোর জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। عُطِّلَتْ অর্থ أهملت من أهلها لاشتغالهم بأنفسهم 'উষ্ট্রীর মালিকের পক্ষ হ'তে উপেক্ষা করা হবে তাদের নিজেদের চিন্তায় বিভোর থাকার কারণে'। আল্লাহ বলেন, 'যেদিন মানুষ পালাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে এবং তার মা-বাপ, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। প্রত্যেক মানুষের সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, সে নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকবে' *(আবাসা ৮০/৩৪-৩৭)*।

(৫) وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ 'যেদিন বন্যপশুদের একত্রিত করা হবে'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন পশু-পক্ষী এমনকি পিঁপড়াও পুনর্জীবিত হবে। অতঃপর শিংওয়ালাদের কাছ থেকে অত্যাচারিত শিংহীনদের বদলা নেওয়া হবে (حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ)। এরপর বলা হবে তোমরা সব মাটি হয়ে যাও। ফলে সব মরে মাটি হয়ে যাবে। বাকী থাকবে কেবল জিন ও ইনসান শেষ বিচারের জন্য'।[১১৬] একই মর্মে বর্ণনা করেছেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)। অত্যাচারী পশুর কাছ থেকে যখন বদলা নেয়া হবে, তখন অত্যাচারী বনু আদমের অবস্থা কেমন হবে সহজেই বুঝা যায় *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন,

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ- (الأنعام ٣٨)-

'যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ায়, তারা সবাই তোমাদের মত এককেটি সৃষ্টি মাত্র। আমরা এই কিতাবে (দ্বীন-দুনিয়ার) কোন কিছুই (লিখতে) ছাড়িনি। অতঃপর তারা সবাই তাদের পালনকর্তার নিকটে সমবেত হবে' *(আন'আম ৬/৩৮)*।

পশু-পক্ষীর বিচারের বিষয়টি কাফেরদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রতীকী বিচার হতে পারে। কেননা জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্য কারু জন্য শারঈ বিধান মান্য করার বাধ্যবাধ্যকতা নেই।

(৬) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 'যেদিন সমুদ্রগুলিকে অগ্নিময় করা হবে'।

سُجِّرَتْ দু'টি অর্থ হ'তে পারে। ১. مُلِئَتْ مِنَ الْمَاءِ 'পানিতে ভরপুর হওয়া ও পানি উদ্বেলিত হওয়া' *(কুরতুবী)*। ২. أُوْقِدَتْ 'অগ্নিময় হওয়া'। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ বিদ্বানগণ এই অর্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(ইবনু কাছীর)*।

শতকরা ১১.১ ভাগ হাইড্রোজেন ও ৮৮.৯ ভাগ অক্সিজেন গ্যাস মিলিত হয়ে পানি সৃষ্টি হয়। ক্বিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্র হুকুমে সেই পারস্পরিক মিশ্রণ ও আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন এ দু'টি স্ব স্ব অবস্থায় ফিরে যাবে এবং পানিভরা সমুদ্র সব গ্যাসভর্তি আগুনে পূর্ণ হয়ে যাবে।

এখানে سُجِّرَتْ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ পানি সৃষ্টির উৎসের সন্ধান দিয়েছেন যে, এটি কেবল ঠাণ্ডা পানীয় নয়। বরং ওটা আসলে দু'টি গ্যাসের মিলিত রূপ। বান্দা এখন

---

১১৬. মুসলিম হা/২৫৮২, মিশকাত হা/৫১২৮ 'যুলুম' অনুচ্ছেদ; ইবনু জারীর, আহমাদ হা/৮৭৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৬৬-৬৭।

এই সূত্র ধরে বের করবে যে, এর মধ্যে কি কি গ্যাস আছে এবং কয়ভাগ করে আছে। এই গবেষণার মাধ্যমেই বান্দা জানতে পারবে কে এই দু'টি গ্যাসকে একত্রিত করে সুপেয় পানিতে পরিণত করল? ল্যাবরেটরী পরীক্ষায় যখন সে সবকিছু জানবে, তখন সে বিস্মিত হয়ে বলে উঠবে- 'আল্লাহ'। তিনি ব্যতীত এই ক্ষমতা কারু নেই'। জ্ঞানী বান্দা এক গ্লাস পানি বা পানীয় পান করার সময় যখন জানবে যে, জীবন হরণকারী এক গ্লাস আগুনকে তার জন্য জীবনদায়িনী এক গ্লাস পানিতে পরিণত করা হয়েছে, তখন তার দেহ-মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে- *আলহামদুলিল্লাহ* 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য'।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, বিজ্ঞানীদের এই মূলব্যান আবিষ্কারকে মানুষ ব্যবহার করছে মানুষের ধ্বংসের কাজে। তারা হাইড্রোজেন দিয়ে বোমা বানাচ্ছে। অথচ সুপেয় পানির অভাবে প্রতি বছর লাখ লাখ বনু আদম অসহায়ভাবে মারা যাচ্ছে।

ক্বিয়ামতের দিন ভূগর্ভে গ্যাসীয় আগুন এবং ভূপৃষ্ঠের সমুদ্রের আগুন মিলিত হয়ে সমস্ত পৃথিবী জ্বলে-পুড়ে একাকার হয়ে নতুন জগত সৃষ্টি হবে এবং সবকিছুই ঘটে যাবে আল্লাহ্র হুকুমে চোখের পলকে বা তার চাইতে কম সময়ে *(ইবরাহীম ১৪/৪৮; লোকমান ৩১/২৮; নাহল ১৬/৭৭)*। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে সংঘটিতব্য ৬টি বিষয় বর্ণনা শেষে এবার ক্বিয়ামতের পরে আখেরাতে সংঘটিতব্য ৬টি বিষয় বর্ণিত হচ্ছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

(৭) وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ 'যেদিন আত্মাসমূহকে মিলিত করা হবে'। অর্থ جمع كل شكل الي نظيره 'প্রত্যেকে তার সমশ্রেণীর সাথে মিলিত হবে' *(ইবনু কাছীর)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এক খুৎবায় জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, يُقْرَنُ الْفَاجِرُ مَعَ الفَاجِرِ وَيُقْرَنُ الصَّالِحُ مَعَ الصَّالِحِ 'অসৎ লোককে অসৎ লোকের সাথে এবং সৎ লোককে সৎ লোকের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে' *(ইবনু কাছীর)*।[১১৭] ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে তিনটি দলে ভাগ করা হবে। অগ্রবর্তীদের দল, ডান সারির দল এবং বাম সারির দল। আল্লাহ বলেন, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً 'তোমরা হবে তিন দলে বিভক্ত'। 'ডান সারির দল। কতই না ভাগ্যবান ডান সারির দল'। 'এবং বাম সারির দল। কতই না হতভাগা বাম সারির দল'। 'আর অগ্রবর্তী দলই অগ্রবর্তী'। 'তারাই হ'ল (আল্লাহ্র) নৈকট্যশীল' (*ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭-১১*)। প্রথম দু'টি দল হবে জান্নাতী ও বাম দলটি হবে জাহান্নামী *(ঐ, ৫৬/২৭-৪০, ৪১-৫৬; বালাদ ৯০/১৭-১৮, ১৯-২০)*। যালেম-মুশরিকদের সম্পর্কে খাছ করে আল্লাহ বলেন, أُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ- 'একত্রিত করো যালেমদের ও তাদের দোসরদের এবং যাদের তারা উপাসনা করতো তাদের' (*ছাফফাত ৩৭/২২*)।

---

১১৭. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৩৯০২, সনদ ছহীহ।

এখানে أَزْوَاجَهُمْ অর্থ أشكالهم 'তাদের সমমনাদের'। একথাটাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন এভাবে, أَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তার সাথে থাকবে, যাকে সে দুনিয়ায় ভালবাসতো'।[১১৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ 'তুমি তার সাথে থাকবে, যাকে তুমি ভালবাসতে'।[১১৯] আর এটি হ'ল আক্বীদাগত ভালোবাসা। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, النُّفُوْسُ অর্থ الضرباء 'সমমনা বা সমশ্রেণী'। মুজাহিদ বলেন, النُّفُوْسُ অর্থ الأمثال من الناس جمع بينهم 'সমশ্রেণীভুক্ত লোকেরা, যারা পরস্পরে মিলিত হবে'। ইবনু জারীর ও ইবনু কাছীর এটাকেই সঠিক বলেছেন।

ইকরিমা, শা'বী, হাসান বাছরী প্রমুখ বিদ্বান এর ব্যাখ্যা করেছেন, زوجت بالأبدان 'রূহগুলিকে স্ব স্ব দেহের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এ মর্মটিও গ্রহণযোগ্য। তবে কুরআন, হাদীছ ও খলীফা ওমর (রাঃ)-এর ব্যাখ্যই সর্বাগ্রগণ্য।

(৮-৯) وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 'যেদিন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে'। 'কি অপরাধে সে নিহত হ'ল'?

الْمَوْؤُوْدَةُ অর্থ اَلْمَدْفُوْنَةُ حَيَّةً 'জীবন্ত প্রোথিত কন্যা'। اَلْمَقْتُوْلَةُ صَغِيْرَةً 'শিশু অবস্থায় নিহত কন্যা'। নিরপরাধ মযলূম মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করার অর্থ হ'ল যালেম পিতা-মাতাকে তার সামনে ধিক্কার দেওয়া। অথবা হত্যাকারীকে মেয়েটির সামনে ডেকে এনে ধমক দিয়ে বলা হবে, তুমি বলো, কেন মেয়েটি নিহত হ'ল? *(ক্বাসেমী)*।

জাহেলী আরবদের কিছু লোকের মধ্যে এ কুসংস্কার ছিল মূলতঃ তিনটি কারণে। ১. ধর্মীয় বিশ্বাসগত কারণে। ২. অর্থনৈতিক কারণে এবং ৩. সামাজিক কারণে। প্রথমোক্ত কারণটি ছিল এই যে, তারা বলত, মেয়েরা সব আল্লাহ্র কন্যা। তাই কন্যা সন্তান দাফন করে তাকে তারা আল্লাহ্র সাথে মিলিয়ে দিত। যেমন ভারতের হিন্দুরা সদ্য বিধবা জীবন্ত নারীকে তার মৃত স্বামীর চিতায় জোর করে তুলে দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে স্বর্গে পাঠিয়ে দিত। একে বলা হ'ত 'সতীদাহ প্রথা'।

দ্বিতীয়টি ছিল দরিদ্রতার কারণে এবং কন্যা সন্তান মানুষ করা ও তাকে বিয়ে দেয়ার বোঝা বহনে অক্ষমতা। বর্তমানে ভারতে দরিদ্রতার কারণে প্রতি বছর হাযার হাযার কন্যা সন্তানের ভ্রুণ হত্যা করা হচ্ছে। তৃতীয় কারণ ছিল, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় মেয়েদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া ও দাসীবৃত্তি করানোর লজ্জা থেকে বাঁচা। শেষোক্তটি মর্যাদাগত কারণে ও লোকলজ্জার ভয়ে অনেকে করত। সাধারণতঃ একাজ মায়েরাই করত। ইবনু

---

১১৮. বুখারী হা/৬১৬৮, মুসলিম হা/২৬৪০; মিশকাত হা/৫০০৮, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।
১১৯. বুখারী হা/৩৬৮৮, মুসলিম হা/২৬৩৯; মিশকাত হা/৫০০৯।

আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রসবের প্রাক্কালে তারা ঘরের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে রাখত। মেয়ে হ'লে সাথে সাথে গর্তে মাটি চাপা দিয়ে মেরে ফেলত। আল্লাহ বলেন, وَيَجْعَلُوْنَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ- وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَ لاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ- 'তারা আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করত। অথচ তিনি (এসব থেকে) পবিত্র। আর তাদের জন্য ওটাই (অর্থাৎ পুত্র সন্তান) যা তারা কামনা করত'। 'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হ'ত, তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে যেত। আর সে ক্রোধে ক্লিষ্ট হ'ত'। 'তাকে শুনানো সুসংবাদের (?) গ্লানিতে সে সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে রাখত। সে ভাবত যে, গ্লানি সহ্য করেও মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! এর মাধ্যমে তারা কতই না নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত নিত' *(নাহল ১৬/৫৭-৫৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ 'নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা বোকামি ও অজ্ঞতা বশে নিজ সন্তানদের হত্যা করেছে'... *(আন'আম ৬/১৪০)*।

জাহেলী আরবরা বিভিন্নভাবে সন্তান হত্যা করত। যেমন (১) প্রসবের পূর্বক্ষণে ঘরের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে রাখত। অতঃপর মেয়ে হলে তাকে সাথে সাথে গর্তে পুঁতে মেরে ফেলত। (২) মেয়ে একটু বড় হলে বাপ তাকে নিয়ে কোন কূয়ায় নিক্ষেপ করত। মুসনাদে দারেমীর শুরুতে ২ নং হাদীছে নবুঅতপূর্ব যুগে আরবদের মধ্যে প্রচলিত জাহেলিয়াত সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা মুর্খতা যুগের অধিবাসী ছিলাম এবং মূর্তি পূজারী ছিলাম। তখন আমরা সন্তানদের হত্যা করতাম। আমার একটি মেয়ে ছিল। যখন সে বড় হ'ল। তখন সে আমার ডাকে খুশী হয়ে দৌড়ে আসত। একদিন আমি তাকে ডাকলাম। সে আমার কাছে চলে আসল। তারপর আমি তাকে নিয়ে আমাদের পরিবারের নিকটবর্তী একটি কুয়ার নিকটে গেলাম এবং তার হাত ধরে তাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিলাম। তখন 'আমার প্রতি তার শেষ বাক্য ছিল, وَكَانَ آخِرَ عَهْدِى بِهَا أَنْ تَقُولَ: يَا أَبَتَاهُ يَا أَبَتَاهُ হে আব্বা! হে আব্বা'! তার এই মর্মান্তিক ঘটনা শুনে রাসূল (ছাঃ)-এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন একজন বলল, হে অমুক! তুমি রাসূল (ছাঃ)-কে দুঃখ দিলে? তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে নিষেধ করে বললেন, ওকে বলতে দাও। কেননা সে তার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে জানতে এসেছে। অতঃপর তিনি তাকে ঘটনাটি পুনরায় বলতে বললেন। লোকটি পুনরায় একই কথা বলল। এতে রাসূল (ছাঃ)-এর অশ্রুধারা তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজিয়ে দিল। অতঃপর তিনি তাকে বললেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْنِفْ عَمَلَكَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ জাহেলী যুগে কৃত তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব তুমি নতুনভাবে তোমার সৎকর্ম শুরু কর'।[১২০]

একইভাবে সুনান দারেমীর **১ম** হাদীছে এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, জাহেলী যুগে কোন ব্যক্তি অন্যায় করলে সেজন্য তাকে পাকড়াও করা হবে কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْسَنَ فِى الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا كَانَ عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِى الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ 'যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর সুন্দর আমল করে, জাহেলী যুগের আমলের জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামে এসে অসৎকর্ম করল, তাকে পিছনের ও এখনকার উভয় পাপের জন্য পাকড়াও করা হবে'।[১২১]

উপরে বর্ণিত ঘটনাবলীতে প্রমাণিত হয় যে, কোনরূপ দরিদ্রতা বা সঙ্গত কারণ ছাড়াই জাহেলী যুগের মানুষ কত নিষ্ঠুরভাবে নিরপরাধ শিশু সন্তানদের হত্যা করত। ঐ মানুষটিই যখন ইসলাম কবুল করেছে, তখন তার জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এভাবে ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য সবচেয়ে বড় রহমত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। হাযার হাযার কন্যাশিশু অন্যায়ভাবে নিহত হওয়া থেকে বেঁচে গেছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

(৩) কন্যার বয়স ৬/৭ বছর হলে পিতা সন্তানের মাকে বলত, মেয়েকে ভালভাবে সাজিয়ে দাও ও সুগন্ধি মাখিয়ে দাও। ওকে ওর নানার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। আগেই সে মরুভূমিতে গর্ত খুঁড়ে আসত। তারপর মেয়েকে তার ধারে নিয়ে বলত, ভিতরে তাকিয়ে দেখ। অতঃপর মেয়েটি নীচের দিকে ঝুঁকে পড়তেই তাকে ঠেলে গর্তে ফেলে দিত ও দ্রুত মাটি চাপা দিয়ে সমান করে দিত।

অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও ছিল। সম্ভ্রান্ত আরবরা এটাতো করতই না, বরং বাধা দিত এবং অনেকে ঐসব কন্যাসন্তান খরিদ করে নিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতো। যেমন উমাইয়া যুগের বিখ্যাত কবি ফারাযদাক্ব (২০-১১০ হিঃ/৬৪১-৭২৮ খ্রিঃ) এ বিষয়ে নিজ বংশের গৌরব-গাথা লিখে কবিতা রচনা করেছেন। কেননা তার দাদা ছা'ছা'আহ বিন নাজিয়াহ তামীমী (صعصعة بن ناجية بن عقَال) মুসলমান হওয়ার আগে ৭০টি মতান্তরে ৯২, ৩০০, ৪০০, ১০০০ ঐরূপ শিশুকন্যাকে তাদের পিতা-মাতাদের কাছ থেকে খরিদ করে বাঁচিয়েছিলেন। ফারাযদাক্ব খলীফা সুলায়মান বিন আব্দুল মালেকের (৯৬-৯৯ হিঃ/৭১৫-৭১৭) দরবারে গর্ব করে বলেছিলেন, اَنَا اِبْنُ مُحْىِ الْمَوْتَى 'আমি মৃতদের

---

১২০. দারেমী হা/২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮৯ আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১২১. দারেমী হা/১; বুখারী হা/৬৯২১।

জীবিতকারীর সন্তান'। একথায় বিস্মিত খলীফার কাছে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেন, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا 'যে ব্যক্তি একটি প্রাণ বাঁচালো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচালো' *(মায়েদাহ ৫/৩২; কুরতুবী, ক্বাসেমী, তানতাভী)*।

হাসান বাছরী বলেন, বর্ণিত আয়াতে জীবন্ত প্রোথিত কন্যা শিশুকে হত্যার কারণ জিজ্ঞেস করার অর্থ হ'ল হত্যাকারীকে ধমকানো। কেননা শিশুটিকে বিনা দোষে হত্যা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এটাই হলো হত্যাকারীকে ধমকানোর সর্বোত্তম পন্থা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন ঐ মেয়েটি তার বাপকে ধরে বলবে- بِأَيِّ ذَنْبٍ قَتَلْتَنِىْ 'কি অপরাধে আপনি আমাকে হত্যা করেছিলেন'? সেদিন পিতা কোন জবাব দিতে পারবে না। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মেয়ে তার মাকে ধরে এনে বলবে, يَا رَبِّ هَذِهِ أُمِّىْ وَهَذِهِ قَتَلَتْنِىْ 'হে আমার রব! এই আমার মা। ইনি আমাকে হত্যা করেছিলেন' *(কুরতুবী)*। ইবনু কাছীর বলেন, فَإِذَا سُئِلَ الْمَظْلُوْمُ فَمَا ظَنُّ الظَالِمِ إِذًا؟ 'মযলূম কন্যা সন্তানকেই যখন এভাবে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন যালেম পিতা-মাতাকে কেমন অবস্থা করা হবে? *(ইবনু কাছীর)*। এযুগে যেসব নিষ্ঠুর মায়েরা তাদের সন্তানদের জীবন্ত ফেলে দিচ্ছে, তারা সাবধান হবে কি?

আলোচ্য আয়াতটিতে বর্ণিত প্রশ্ন ক্বিয়ামতের দিন ঈসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করার ন্যায়। যেমন নাছারাদের কৃত শিরকের ব্যাপারে ধমক দিয়ে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করবেন, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ 'তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য সাব্যস্ত করে নাও?' *(মায়েদাহ ৫/১১৬)*।

وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ -এর ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ, سَأَلَتْ অর্থাৎ মেয়েটি তার রক্তের বদলা দাবী করবে (طلبت بدمها)। আবুয যুহা, সুদ্দী, ক্বাতাদাহ সকলে অনুরূপ বলেন *(ইবনু কাছীর)*।

'জীবন্ত প্রোথিত সন্তান' বিষয়ে বেশ কিছু হাদীছ এসেছে, যা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে 'আযল' (العزل) বা 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, -ذَلِكَ الْوَأْدُ الخَفِىُّ وَهُوَ الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ 'এটি হ'ল গুপ্তভাবে সন্তান হত্যা এবং এটাই হ'ল কুরআনে বর্ণিত আয়াতের মর্মার্থ 'যেদিন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাশিশু জিজ্ঞাসিত হবে'।[১২২]

১২২. আহমাদ, মুসলিম হা/১৪৪২, ইবনু মাজাহ, প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৮৯।

(২) অন্য একজনের একই ধরনের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ 'প্রত্যেক পানিতে সন্তান হয় না। আল্লাহ যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তাকে কোন কিছুই রোধ করতে পারে না'।[১২৩]

(৩) দরিদ্রতার কারণে বিবাহে ব্যর্থ জনৈক ছাহাবী এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে খাসী (ভেসেকটমি) হওয়ার অনুমতি চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে নিষেধ করেন এবং নফল ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন।[১২৪]

(৪) কুরআন যে ১০টি বিষয়কে একই স্থানে হারাম ঘোষণা করেছে, তার একটি হ'ল খাদ্য সংকটের ভয়ে সন্তান হত্যা করা *(আন'আম ৬/১৫১; বনু ইস্রাঈল ১৭/৩১)*।

উপরোক্ত বিষয়গুলি একত্রিত করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।-

(১) মাতৃগর্ভে চারমাস বয়সে সন্তান জীবন লাভ করে। অতএব সেখানে জীবন্ত ভ্রূণ হত্যা করলে সেটা আয়াতে বর্ণিত 'জীবন্ত সন্তান হত্যা করার' শামিল হবে। অতএব এটা নিষিদ্ধ।

(২) খাদ্যাভাবের আশংকায় 'আযল' বা জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ। তবে স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত কারণে সেটা করা যেতে পারে। কিন্তু এ বিশ্বাস অটুট রাখতে হবে যে, যে সন্তান আসার তা আসবেই। তাক্বদীরকে খণ্ডনের ক্ষমতা কারু নেই। অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা সত্ত্বেও সন্তান এসে গেলে তাকে আল্লাহ্র বিশেষ দান হিসাবে স্বাগত জানাতে হবে। জঞ্জাল ভেবে গর্ভপাত বা ভ্রূণ হত্যা বা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা যাবে না।

(৩) স্থায়ী জন্মনিরোধ বা লাইগেশন সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

(৪) খাদ্যাভাবের ভয় দেখিয়ে মানুষকে জন্মনিয়ন্ত্রণে ও জন্মনিরোধে প্ররোচিত করা নিষিদ্ধ। বরং তার বিপরীতে আল্লাহ বান্দার একমাত্র রূযিদাতা *(যারিয়াত ৫১/৫৮)* এবং তিনি সন্তান দানসহ পৃথিবীতে সবকিছু পরিমাণমত সৃষ্টি করেন *(রা'দ ১৩/৮; ক্বামার ৫৪/৪৯)* এই প্রচারণা চালাতে হবে। যাতে মানুষ তার অনাগত সন্তানকে সম্পদ মনে করে এবং কোন অবস্থায় তাকে শত্রু বা জঞ্জাল না ভাবে।

আল্লাহ বলেন, لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন,যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন'। 'অথবা তাদের (কাউকে) পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

---

১২৩. মুসলিম হা/১৪৩৮, মিশকাত হা/৩১৮৭।
১২৪. বুখারী হা/৫০৭৩-৭৪।

অত্র আয়াতে সন্তানকে আল্লাহ 'দান' বা 'অনুগ্রহ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কন্যা সন্তানকে প্রথমে এনেছেন তার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করে। অতএব আল্লাহ প্রেরিত দানকে স্বাগত জানানোই বান্দার প্রধান কর্তব্য। কন্যার প্রতি বিশেষ মর্যাদা একারণে যে, কন্যা সন্তানের মাধ্যমেই মানব বংশ রক্ষা হয়। তাছাড়া সকল নবী-রাসূল ও শ্রেষ্ঠ মানুষ মায়ের গর্ভ থেকেই দুনিয়ায় এসেছেন।

অত্র আয়াতদ্বয়ে চার ধরনের পিতামাতার কথা এসেছে। ১- যারা কেবল কন্যা সন্তান লাভ করেছেন। যেমন হযরত লূত (আঃ)। ২- যারা কেবল পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। যেমন ইবরাহীম (আঃ)। ৩- যারা পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তান লাভ করেছেন। যেমন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ৪- যারা কোন সন্তান পাননি। যেমন ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ)। সবকিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তিনি সর্বশক্তিমান।

অতঃপর 'জীবন্ত প্রোথিত শিশু সন্তান' জান্নাতী হবে না জাহান্নামী হবে, এ বিষয়ে হাদীছের বক্তব্য সমূহ নিম্নরূপ :

১- اَلْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُوْدَةُ فِى النَّارِ 'সন্তান হত্যাকারিণী মা ও নিহত সন্তান উভয়ে জাহান্নামী হবে'।[১২৫] কেননা সন্তান সাধারণতঃ পিতা-মাতার অনুগামী হয়ে থাকে।

২- اَلنَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَئِيْدُ فِى الْجَنَّةِ 'নবী জান্নাতী, শহীদ জান্নাতী, সদ্য প্রসূত সন্তান জান্নাতী, জীবন্ত প্রোথিত শিশু সন্তান জান্নাতী'।[১২৬]

প্রথমোক্ত হাদীছটি হত্যাকারিণী মায়ের প্রতি ধমকি হিসাবে হতে পারে কিংবা সেটি দ্বিতীয় হাদীছটি দ্বারা মানসূখ বা হুকুম রহিত হতে পারে। কেননা অন্য হাদীছে এসেছে যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি, শিশু ও পাগল দোষী সাব্যস্ত হয় না।[১২৭] তাছাড়া সাবালক পুরুষ ও নারীর উপরেই শরী'আতের হুকুম প্রযোজ্য হয়, নাবালক শিশুর উপরে নয়। এদ্বারা বুঝা যায়, যেকোন মৃত শিশু সন্তান জান্নাতী হাবে। তবে সবকিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি একদলকে জান্নাতের জন্য ও একদলকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(শূরা ৪২/৭)*। ইমাম কুরতুবী সূরা মায়েদাহ ১১৬ এবং আহযাব ১৫ আয়াত দু'টি পেশ করে বলেন, এর মধ্যে সন্তানকে নয় বরং হত্যাকারী পিতা-মাতাকে ধমকানো হয়েছে। কারণ তারাই এজন্য দায়ী। অতঃপর তিনি বলেন, وفيه دليل بين على ان أطفال المشركين لايُعذّبون وعلى أن التعذيب لا يُستَحق إلا بذنب– 'এতে স্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, মুশরিকদের মৃত শিশু সন্তান শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। তাছাড়া কোন অপরাধ ব্যতীত শাস্তি প্রযোজ্য হয় না (অথচ ঐসব শিশু কোন অপরাধ করেনি)'।[১২৮]

১২৫. আহমাদ হা/১৫৯৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৭১৭ 'মুশরিকদের মৃত শিশু সন্তান' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১১২ ।
১২৬. আবুদাঊদ হা/২৫২১; মিশকাত হা/৩৮৫৬, সনদ ছহীহ।
১২৭. তিরমিযী হা/১৪২৩, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ।
১২৮. তাফসীরে কুরতুবী, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(১০) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ 'যেদিন আমলনামা সমূহ খুলে দেওয়া হবে'।

نُشِرَتْ অর্থ فتحت بعد أن كانت مطوية 'বন্ধ করার পর যা খোলা হয়'। যে সকল ফেরেশতা মানুষের ভাল-মন্দ কার্যসমূহ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন, মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে উক্ত আমলনামা তারা বন্ধ করে দেন। ক্বিয়ামতের দিন সেটাই তার সম্মুখে খুলে দেওয়া হবে। তখন সেই আমলনামা দেখে মানুষ বলে উঠবে- مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا 'হায় আফসোস! এ কেমন আমলনামা যে ছোট-বড় কোন কিছুই লিখতে বাদ রাখেনি' *(কাহফ ১৮/৪৯)*।

এ বিষয়ে সূরা হা-ক্কাহ ১৮ হ'তে ২৯ আয়াত পর্যন্ত ক্বিয়ামতের দিন মুমিন ও কাফিরের আনন্দ ও বিষাদময় বর্ণনা সমূহ উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِيْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَّلْقَاهُ مَنْشُوْراً- اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْباً- 'আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি এবং ক্বিয়ামতের দিন তাকে বের করে দেখাব একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে'। '(অতঃপর বলা হবে) পাঠ কর তুমি তোমার আমলনামা। আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমিই যথেষ্ট' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৩-১৪)*।

(১১) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ 'যেদিন আকাশকে আবরণমুক্ত করা হবে'।

كُشِطَتْ অর্থ قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة 'উৎপাটন করা হয়েছে, বিদূরিত করা হয়েছে। যেমন যবহকৃত পশুর চামড়া খুলে নেয়া হয়'। ক্বিয়ামতের দিন আকাশকে তার স্থান থেকে সরিয়ে নেয়া হবে, যেমন কোন কিছুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে নেয়া হয়। আকাশকে অতঃপর ভাজ করা হবে। যেভাবে কাগজ ভাজ করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ 'আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাজ করা অবস্থায় থাকবে' *(যুমার ৩৯/৬৭)*। তিনি বলেন, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ- 'যেদিন আমরা আকাশকে ভাজ করে নেব, যেমন ভাজ করা হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমাদের ওয়াদা সুনিশ্চিত। আমরা তা পূর্ণ করবই' *(আম্বিয়া ২১/১০৪)*। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ- 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং তা রক্তরঞ্জিত চামড়ার রূপ ধারণ করবে' *(রহমান ৫৫/৩৭)*। এসময় কেবল আল্লাহ্র আরশ বাকী থাকবে। যেমন তিনি বলেন, وَيَحْمِلُ

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ‘সেদিন তাদের উপরে তোমার পালনকর্তার আরশ বহন করবে আটজন ফেরেশতা’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/১৭)*। তিনি পৃথিবীকেও কব্জায় নিবেন আর বলবেন, أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟ ‘আমিই বাদশাহ। পৃথিবীর রাজা-বাদশাহরা কোথায়’?[১২৯]

(১২-১৩) وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ‘যেদিন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হবে’। ‘যেদিন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে’।

জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি সৃষ্ট অবস্থায় আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি‘রাজ রজনীতে তা স্বচক্ষে দেখেছেন। জাহান্নাম তো সর্বদাই উত্তপ্ত। তাহ’লে ক্বিয়ামতের দিন উত্তপ্ত করা হবে অর্থ কি? আল্লাহ বলেন, وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ‘(সেদিন) এর ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর’ *(তাহরীম ৬৬/৬)*। অর্থাৎ কাফের ও জ্বলন্ত পাথর দিয়ে জাহান্নামকে ঐদিন আরও উত্তপ্ত করা হবে। এক্ষণে বর্ণিত আয়াতে سُعِّرَتْ অর্থ হবে أُحْمِيَتْ وَزِيْدَ فِيْ إِحْمَائِهَا ‘উত্তপ্ত করা হবে এবং তার উত্তাপ অধিক বৃদ্ধি করা হবে’। ইবনু যায়েদ বলেন, ‘জাহীম’ হ’ল জাহান্নামের নাম সমূহের অন্যতম’ *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নাযে‘আত ১০ আয়াত)*।

أُزْلِفَتْ অর্থ قربت إلى أهلها ‘জান্নাতকে জান্নাতবাসীর নিকটবর্তী করা হবে’। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ‘জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের নিকটবর্তী করা হবে’ *(শো‘আরা ২৬/৯০)*। হাসান বাছরী বলেন, এর অর্থ হ’ল মুত্তাক্বীদেরকে জান্নাতের নিকটে নেয়া হবে। এটা নয় যে, জান্নাত তার স্থান থেকে সরে আসবে’ *(কুরতুবী)*।

৭ আয়াত হতে ১৩ আয়াত পর্যন্ত ক্বিয়ামতের দিন সংঘটিতব্য আখেরাতের ৬টি বিষয় বর্ণিত হ’ল। এভাবে ১ হ’তে ১৩ আয়াত পর্যন্ত ক্বিয়ামতের আগের ও পরের ৬+৬ মোট ১২টি বিষয় শর্তাকারে বর্ণিত হ’ল। অতঃপর এগুলির জওয়াবে আল্লাহ বলেন,

(১৪) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ‘সেদিন প্রত্যেকে জানবে সে কি হাযির করেছে’।

পূর্ববর্তী শর্তগুলির জওয়াব হ’ল অত্র আয়াতটি। ক্বিয়ামতের আগে-পিছে ১২টি বিষয় উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হ’ল বান্দাকে এটা বিশ্বাস করানো যে, তাকে অবশ্যই আল্লাহ্র নিকটে তার জীবনের সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَّمَا عَمِلَتْ مِن سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا

১২৯. বুখারী হা/৬৫১৯, মুসলিম হা/২৭৮৭, মিশকাত হা/৫৫২২।

وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيْداً 'যেদিন প্রত্যেকে চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে যেসব ভাল কাজ সে করেছিল এবং যা কিছু মন্দ কাজ সে করেছিল। সেদিন সে কামনা করবে, যদি এইসব কর্মের ও তার মধ্যকার ব্যবধান অনেক দূরের হতো' *(আলে ইমরান ৩/৩০)*। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ 'মানুষকে সেদিন অবহিত করা হবে যা সে আগে ও পিছে প্রেরণ করেছে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৩)*।

এ পর্যন্ত প্রথম বিষয়বস্তু ক্বিয়ামতের বর্ণনা শেষ হ'ল। এক্ষণে দ্বিতীয় বিষয়বস্তু কুরআনের বর্ণনা শুরু হ'ল।-

فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ **(১৫-১৮)**
'আমি শপথ করছি ঐসব নক্ষত্রের, যা (দিবসে) হারিয়ে যায় ও (রাতে) প্রকাশিত হয়'। 'যা চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়'। 'শপথ রাত্রির যখন তা নিষ্ক্রান্ত হয়'। 'শপথ প্রভাতকালের যখন তা প্রকাশিত হয়'।

فَلاَ أُقْسِمُ অর্থ أُقْسِمُ 'আমি শপথ করছি'। এখানে لا অব্যয়টি অতিরিক্ত। যা আনা হয়েছে বাক্যে তাকীদ সৃষ্টির জন্য।

الْخُنَّسِ একবচনে خَانِسٌ وَخَانِسَةٌ অর্থ خَنَّسَ إِذَا تَأَخَّرَ 'যখন পিছিয়ে গেল, হারিয়ে গেল'। الْجَوَارِ আসলে ছিল الْجَوَارِى একবচনে جَارِيَةٌ অর্থ সন্তরণশীল। الْكُنَّسِ অর্থ الْغُيَّبُ 'গুপ্ত'। একবচনে كَانِسٌ وَكَانِسَةٌ অর্থ ঝোপ। كَنَسَ الْوَحْشُ اِذْ دَخَلَ كِنَاسَهُ 'পশু লুকিয়ে গেল যখন সে তার ঝোপে প্রবেশ করল' *(তানতাভী)*। আলী (রাঃ) বলেন, وَالْخُنَّسُ هِيَ النُّجُوْمُ تَخْنِسُ بِالنَّهَارِ وَتَظْهَرُ بِاللَّيْلِ এগুলি হ'ল ঐসব তারকা, যা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে ও রাতের বেলায় প্রকাশিত হয়' *(কুরতুবী)*। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব নক্ষত্রকে বুঝানো হয়েছে, যা দ্রুত সন্তরণশীল এবং দিনে ও রাতে সর্বদা লুকিয়ে থাকে। এখানে আল্লাহপাক দ্রুত সন্তরণশীল ও বাহ্যতঃ ধীরে গমনকারী সকল প্রকার নক্ষত্রের শপথ করেছেন (سيارة كانت أو ثوابت) *(তানতাভী)*।

এর মধ্যে সৌরবিজ্ঞানের একটি বড় উৎসের দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে যে, ঝলমলে রাতের আকাশে যে অসংখ্য তারার মেলা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং আমরা তাদেরকে দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় হারিয়ে গিয়ে রাতের বেলায় উঠতে দেখি। এদের বাইরে বহু নক্ষত্র রয়েছে, যাদের আমরা দিনে বা রাতে কখনোই দেখতে পাই না। যাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে এখনও বহু আলোকবর্ষ প্রয়োজন হবে। তাদেরকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছোট ও ধীরগতির নক্ষত্র মনে করা হ'লেও তারা আসলে অনেক বড় এবং অনেক দ্রুতগতির। কিন্তু পৃথিবী থেকে বহু দূরে অবস্থান করায় এরূপ মনে হয়।

এমনকি আকাশের একটি উজ্জ্বলতম জোড়া নক্ষত্র যা 'লুব্ধক' নামে খ্যাত, সেটি আমাদের সৌরজগৎ থেকে সাড়ে আট আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাযার মাইল বা ৩ লক্ষ কিঃ মিঃ গতিবেগকে এক বছরের হিসাবে এক 'আলোকবর্ষ' বলা হয়। সে হিসাবে লুব্ধক কত দূরে তা চিন্তা করা আবশ্যক। অথচ তা কাছেই চকচকে দেখা যায়। এতেই বুঝা যায় নক্ষত্রটি কত বড়। আল্লাহ তাঁর শপথের মাধ্যমে বান্দাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের দৃষ্টিসীমা ও জ্ঞানসীমার বাইরে তোমাদের ও তোমাদের পৃথিবীর চাইতে বহু গুণ বড় সৃষ্টি আমার রয়েছে। অতএব তোমাদের কোন অহংকার মানায় না।

নক্ষত্ররাজির হারিয়ে যাওয়া ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বলার মধ্যে তাদের সন্তরণশীল হওয়ার ইঙ্গিত যেমন রয়েছে, তেমনি একথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্যেকটি নক্ষত্র দ্রুত হৌক বা বিলম্বে হৌক সেখানেই ফিরে আসবে, যেখান থেকে তার উদয় হয়েছিল। এর মধ্যে তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে এবং নিজ অক্ষের উপরে আবর্তনশীল হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। গতিশীল এইসব তারকা যে মহান সত্তার হুকুমে সৃষ্টি হয়েছে ও গতিপ্রাপ্ত হয়েছে, তার হুকুমেই একদিন সব গতিহীন হবে ও বিলুপ্ত হবে। প্রত্যেক সৃষ্টিরই লয় আছে। এ পৃথিবীরও একদিন লয় হবে। বাকী রইবেন কেবল আল্লাহ। যেমন তিনি বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ 'পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হবে'। 'বাকী থাকবে কেবল তোমার পালনকর্তার চেহারা, যিনি মহাপরাক্রান্ত ও মহামহিম *(রহমান ৫৫/২৬-২৭)*। তিনি আরও বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ 'সবকিছুই ধ্বংস হবে কেবল তাঁর চেহারা ব্যতীত। তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব। আর তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

(১৭-১৮) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ 'শপথ রাত্রির যখন তা নিষ্ক্রান্ত হয়'। 'এবং শপথ প্রভাতকালের যখন তা প্রকাশিত হয়'।

عَسْعَسَ শব্দটি أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ আগমন ও নিষ্ক্রমণ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ إِقْبَالُ الظَّلاَمِ فِيْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَإِدْبَارُهُ فِيْ آخِرِهِ– 'রাত্রির শুরুতে অন্ধকারের আগমন এবং শেষে তার নিষ্ক্রমণ'। এখানে দু'টি অর্থই প্রযোজ্য। তবে ইবনু কাছীর প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ইবনু জারীর দ্বিতীয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এর পরেই আল্লাহ প্রভাতকালের শপথ করেছেন। যা রাত্রিকাল নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পরেই এসে থাকে।

تَنَفَّسَ অর্থ طَلَعَ وَأَضَاءَ 'উদিত হওয়া ও উজ্জ্বল হওয়া'। অর্থাৎ প্রভাতকালে সূর্যের উদয় হওয়া ও চারিদিকে পরিষ্কার হওয়া। تَنَفَّسَ-এর আসল অর্থ خُرُوْجُ النَّسِيْمِ مِنَ الْجَوْفِ

'পেট থেকে শ্বাস বের হওয়া' *(কুরতুবী)*। অন্য অর্থে اِنْشَقَّ وَانْفَلَقَ 'ফেটে যাওয়া, বিভক্ত হওয়া'।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে সূর্যের আলো বেরিয়ে আসে- এই মর্মটি ফুটিয়ে তোলার জন্যেই এখানে طَلَعَ না বলে تَنَفَّسَ বলা হয়েছে। যাতে বান্দার জন্য ইঙ্গিত রয়েছে পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান হওয়ার প্রতি এবং এর আহ্নিক গতির প্রতি, যা ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজ অক্ষকেন্দ্রে আবর্তন করে থাকে এবং যার ফলে দিবস ও রাত্রির আগমন ও নির্গমন ঘটে। মাত্র একটি (تَنَفَّسَ) শব্দে বিজ্ঞানের একটি বিরাট উৎসের সন্ধান দেওয়া হয়েছে এই আয়াতে। অথচ নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কখনোই কোন বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। কুরআন যে স্রেফ আল্লাহ্র কালাম- এতে যে নবী বা ফেরেশতার বক্তব্যের কোন মিশ্রণ নেই, এ সকল বৈজ্ঞানিক আয়াত তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এর মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে যে রাত্রিকে সরিয়ে দিবসকে বের করে আনতে পারে? এটা কেবল আল্লাহ্রই একক ক্ষমতা। যেমন তিনি বলেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ أَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ-

'তুমি বলে দাও, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি আল্লাহ রাত্রিকে তোমাদের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদের নিকট সূর্যকিরণ এনে দেবে? তবুও কি তোমরা কথা শুনবে না'? 'তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি আল্লাহ দিবসকে তোমাদের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদের নিকট রাত্রি এনে দিবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারবে? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না'? *(ক্বাছাছ ২৮/৭১-৭২)*।

(১৯) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ 'নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বাহকের (জিব্রীলের) আনীত বাণী'।

অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত বড় বড় সৃষ্টির শপথ করে আল্লাহ বলছেন যে, কুরআন কারু বানোয়াট কালাম নয়। বরং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র কালাম, যা স্বীয় দূত জিব্রীলের মাধ্যমে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকটে প্রেরিত হয়েছে। ১৫ থেকে ১৮ পর্যন্ত চারটি আয়াতে আল্লাহপাক যে শপথগুলি করেছেন, এ আয়াতটি হ'ল তার জওয়াব।

এখানে رَسُوْلٌ তার আভিধানিক অর্থে এসেছে। অর্থাৎ দূত বা সংবাদবাহক। তিনি জিব্রীল (আঃ) ব্যতীত আর কেউ নন। কেননা জিব্রীল হ'লেন একমাত্র অহিবাহক ফেরেশতা এবং তিনিই হ'লেন ফেরেশতাদের সরদার। যেমন আল্লাহ বলেন, نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ 'রূহুল আমীন (জিব্রীল) এটা নিয়ে অবতরণ করে' *(শো'আরা ২৬/১৯৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ- 'তুমি বলে দাও ঐ লোকদের যারা জিব্রীলের শত্রু, তিনি আল্লাহ্র হুকুমে এ কালাম তোমার অন্তরে নাযিল করেন। যা পূর্বের কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা' *(বাক্বারাহ ২/৯৭)*।

كَرِيْمٌ অর্থ كَرِيْمٌ عَلَى اللهِ 'আল্লাহ্র নিকটে সম্মানিত'। ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ, শা'বী, হাসান বাছরী প্রমুখ বলেন, هو جبريل عليه السلام 'তিনি হলেন জিব্রীল আলাইহিস সালাম'। ইবনু কাছীর বলেন, إن هذا القران لتبليغ رسول كريم 'নিশ্চয়ই এই কুরআন অবশ্যই ঐ মহান দূতের পৌঁছানো কালাম' *(ইবনু কাছীর)*।

(২০-২১) ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ 'যিনি শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকটে মর্যাদাবান'। 'যিনি সকলের মান্যবর ও সেখানকার বিশ্বাসভাজন'।

অত্র আয়াত দু'টিতে জিব্রীলের চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম গুণ তিনি হলেন ذِيْ قُوَّةٍ 'শক্তিশালী'। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوَى، ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى- 'তাকে শিক্ষা দান করেন এক শক্তিশালী ফেরেশতা'। 'যিনি সহজাত শক্তিসম্পন্ন। যিনি নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেলেন'। 'যখন তিনি ছিলেন ঊর্ধ্ব দিগন্তে' *(নাজম ৫৩/৫-৭)*। বস্তুতঃ জিব্রীলের সহজাত শক্তির আধিক্য বর্ণনার জন্য অত্র আয়াতে ذُو مِرَّةٍ বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে করে এই ধারণার অবকাশ না থাকে যে, অহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব খাটাতে পারে। কেননা জিব্রীল (আঃ) এতই শক্তিশালী যে শয়তান তার কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তাছাড়া তিনি আল্লাহ্র যেকোন হুকুম পালনে সক্ষম। বস্তুতঃ জিব্রীলের শক্তিমত্তার বহু প্রমাণ দুনিয়াতেই রয়েছে। যেমন লূত (আঃ)-এর কওমকে ভূমি ও নগরীসহ চোখের পলকে উৎপাটিত করে ফের উপুড় করে ফেলে ধ্বংস করে দেওয়া। ৮১০ কি.মি. (৫৫×১৮ কি.মি.×৩৭৭ মি.) ব্যাপী জর্ডানের যে স্থানটি আজও মৃত সাগর বা লূত সাগর নামে

প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে *(উইকিপিডিয়া)*। এছাড়াও রয়েছে আদ, ছামূদ, শু'আয়েব প্রমুখ নবীদের শক্তিশালী জাতিগুলিকে নিমিষে নিশ্চিহ্ন করার ইতিহাস। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, জিব্রীলকে প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহ মহাশক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় গুণ হল مَكِيْنٍ বা মর্যাদাবান। অর্থ صاحب شرف ومكانة عند الله ومنزلة رفيعة لديه 'আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে তাঁর বিশেষ স্থান ও উচ্চ মর্যাদা'।

তৃতীয় গুণ হ'ল مُطَاعٍ ثَمَّ 'সেখানে মান্যবর' অর্থাৎ مسموع القول فى الملأ الأعلى 'উচ্চতম স্থানের ফেরেশতাগণ তার কথার অনুবর্তী'। তিনি সাধারণ ফেরেশতা নন; বরং ফেরেশতাগণের সর্দার। আর সেজন্যই তাঁকে আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে অহী প্রেরণের মহান দূতিয়ালীর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

চতুর্থ গুণ হ'ল أَمِيْنٍ অর্থ أمين على وحيه تعالى ورسالته 'আল্লাহ প্রদত্ত অহি ও রিসালাত পৌঁছানোর ব্যাপারে তিনি বিশ্বস্ত ও আমানতদার'। এটাই হ'ল তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় বিশেষণ যে, স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে 'আমীন' বা আমানতদার বলে ঘোষণা করেছেন। তাই এটা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কুরআন ও হাদীছের যেটুকু অহী আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে প্রেরণ করেন, জিব্রীল (আঃ) সেটুকু হুবহু যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। একটি শব্দ বা বর্ণ সেখান থেকে খেয়ানত হয়নি। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

(২২) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُوْنٍ 'তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) পাগল নন'।

এখানে 'তোমাদের সাথী' বলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। জিব্রীলকে দেখা ও তার মাধ্যমে অহী নাযিলের বিষয়কে মুশরিক নেতারা বিশ্বাস করত না। তাই তারা রাসূল (ছাঃ)-কে 'পাগল' বলত। আবার কখনো 'ভূতে ধরা রোগী' (رَجُلاً مَّسْحُوْرًا) বলত *(ইসরা ১৭/৪৭)*। এখানে সেকথারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে। ১৯ নং আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটিও جواب القسم বা পূর্ববর্তী শপথসমূহের জওয়াব হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ আমি শপথ করে বলছি যে, মুহাম্মাদ পাগল নন। কিংবা তিনি জিনে ধরা রোগীর মত কোন কথা বলেন না বা জ্ঞান লোপ পাওয়া ব্যক্তির মত প্রলাপ বকেন না। আল্লাহ বলেন, بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ 'বরং তিনি এসেছেন সত্য সহকারে এবং তিনি বিগত রাসূলগণের সত্যায়ন করেন' *(ছাফফাত ৩৭/৩৭)*।

(২৩) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ 'তিনি অবশ্যই তাকে (জিব্রীলকে) দেখেছেন প্রকাশ্য দিগন্তে' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিব্রীলকে তার নিজস্ব রূপে দেখেছেন। অতএব উক্ত ফেরেশতা তাঁর নিকটে অপরিচিত নন। তিনিই তার নিকটে অহী নিয়ে আগমন করে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, জিব্রীলকে তার স্বরূপে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার মি'রাজের পূর্বে ও দ্বিতীয়বার মি'রাজের সময় সিদরাতুল মুনতাহায়। প্রথম দেখেন মক্কার বাত্বহা (بطحاء) উপত্যকায় ৬০০ ডানা বিশিষ্ট বিশাল অবয়বে। যাতে আসমান যমীনের মধ্যবর্তী দিগন্ত বেষ্টিত হয়ে পড়ে।[১৩০] আয়েশা (রাঃ) বলেন, সাধারণতঃ জিব্রীল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসতেন একজন পুরুষ মানুষের বেশ ধারণ করে। কিন্তু এবার তিনি আসেন নিজস্ব রূপে। যাতে দিগন্তরেখা বন্ধ হয়ে যায়'। 'ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, এসময় তাঁর ৬০০ ডানা ছিল'।[১৩১] যা বর্তমান সূরায় এবং সূরা নজম ৫ হ'তে ১০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১৩২] দ্বিতীয়বার দেখেন মে'রাজ রজনীতে, যা বর্ণিত হয়েছে সূরা নজম ১৩ হ'তে ১৬ আয়াতে।[১৩৩] আর এটা স্পষ্ট (আল্লাহ সর্বাধিক অবগত) যে, বর্তমান সূরাটি মে'রাজের রাত্রির আগে নাযিল হয়েছে। কেননা এখানে মাত্র একটি দর্শনের কথা বলা হয়েছে, যেটি প্রথম দর্শন। আর দ্বিতীয়বার দর্শনটি বলা হয়েছে সূরা নজম ১৩ আয়াতে' *(ইবনু কাছীর)*। বস্তুতঃ জিব্রীলকে স্বরূপে দেখানোর উদ্দেশ্য হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর বিশ্বাসকে আরও মযবুত করা এবং এটা নিশ্চিত করা যে, তাঁর আনীত ইসলামী শরী'আত স্পষ্ট ও দিব্যজ্ঞানের উপর ভিত্তিশীল। কোনরূপ ধারণা ও কল্পনার উপরে নয় *(ক্বাসেমী)*।

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র এক অনন্য সৃষ্টি। যারা নূরের তৈরী। সেকারণ মানুষের চর্মচক্ষু দিয়ে তাদের দেখা সম্ভব নয়। চোখের পলকের চেয়ে তারা দ্রুতগতিসম্পন্ন। আল্লাহ্র হুকুম পাওয়া মাত্র তারা তা বাস্তবায়ন করেন *(নাহল ১৬/৫০)*। কল্পনা জগতে যেমন দ্রুততার সাথে আমরা বিচরণ করি। ফেরেশতাগণ তার চাইতে দ্রুততায় আসমান ও যমীনের মাঝে যাতায়াত করে থাকেন। আমাদের স্বপ্ন ও কল্পনাজগতে যা কিছু দৃশ্যমান হয়, আমরা তা ভাবে ও ভাষায়, কথায় ও কলমে প্রকাশ করি। স্বপ্ন ও কল্পনার জগতকে আমরা না দেখে বিশ্বাস করি। বরং বলা চলে, স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে ও সম্মুখে এগিয়ে চলে। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ মৃত লাশের শামিল। আমরা ফেরেশতাগণকে দেখিনা। কিন্তু তাদের অবস্থান অনুভব করি।

পাশ্চাত্যে এখন স্বপ্নজগত নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। স্বপ্নকে আমরা বাহ্যিকভাবে দেখতে পাই না, ধরতে পারি না। অন্তরজগতে দেখি ও তা বাস্তব বলে বিশ্বাস করি। ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব অনুরূপভাবে বাস্তব। তবে পার্থক্য এই যে, মানুষের স্বপ্ন বাস্তবে কোন রূপ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু ফেরেশতাগণ প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন রূপ ধারণ

---

১৩০. তিরমিযী হা/৩২৭৮, ৩২৮৩; মিশকাত হা/৫৬৬১-৬২।

১৩১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬২।

১৩২. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى- ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى- وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى- فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى =নাজম ৫৩/৫-১০।

১৩৩. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى- عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى- عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى- إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى =নাজম ৫৩/১৩-১৬।

করতে পারেন। যেমন ছাহাবী দেহিয়াতুল কালবীর রূপ ধারণ করে একবার জিব্রীল (আঃ) স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের মজলিসে হাযির হয়ে ইসলাম, ঈমান, ইহসান, ক্বিয়ামত ও ক্বিয়ামতের আলামত বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করে ছাহাবীগণকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছিলেন। মিশকাতের শুরুতেই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। যা 'হাদীছে জিব্রীল' নামে খ্যাত। ফেরেশতাগণকে মানুষ তার চর্মচক্ষুতে দেখতে পায় না। তবে অবিশ্বাসীদের জবাব দেবার জন্যই সম্ভবতঃ শেষনবী (ছাঃ)-কে আল্লাহ দেখিয়েছিলেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে। যেভাবে তাঁকে পার্থিব জগত থেকে বের করে পারলৌকিক জগতে মে'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে। যদি ফেরেশতা ও রাসূলের মধ্যে কোন সম্পর্ক না থাকতো, তাহ'লে অহী বা রিসালাত কোনটাই পাওয়া সম্ভব হতো না।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ জিব্রীলকেও 'রাসূল' বলেছেন *(তাকভীর ৮১/১৯)*, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও 'রাসূল' বলেছেন *(হা-ক্কাহ ৬৯/৪০)*। প্রথমজন হ'লেন 'ফেরেশতা রাসূল' (رسول ملكى) এবং দ্বিতীয়জন হ'লেন 'মানুষ রাসূল' (رسول بشرى)। আল্লাহ কুরআনকে উক্ত দুই রাসূলের কালাম হিসাবে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ হ'ল, 'ফেরেশতা রাসূল' ওটাকে আল্লাহ্র নিকট থেকে 'মানুষ রাসূল'-এর নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি সেটা স্বীয় উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। মূল কথক হ'লেন আল্লাহ। আর কুরআন হ'ল আল্লাহ্র বাণী। অতঃপর উক্ত বাণীবাহক হ'লেন জিব্রীল, অতঃপর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)। বাস্তবিকপক্ষে ফেরেশতাগণের উপর ঈমান না থাকলে ইসলামের পুরা প্রাসাদটিই ভেঙ্গে পড়বে। আর ফেরেশতা যে সত্য, তারা যে বিশ্বস্ত, তাদের মধ্যেমে প্রেরিত কুরআন যে সত্য এবং কুরআনের বাহক রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে সত্য, সে কথা নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহপাক এখানে নক্ষত্ররাজি এবং রাত্রি ও প্রভাতকালের শপথ করেছেন।

(২৪) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ 'তিনি অদৃশ্য বিষয় (অহি) প্রকাশ করতে কৃপণ নন'।

অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকটে যা কিছু নাযিল হয়, তা প্রকাশ করতে এবং বিশ্ববাসীকে জানাতে তিনি কৃপণতা করেন না। বরং তা সকলকে পৌঁছে দিয়ে থাকেন। এখানে عَلَى الْغَيْبِ অর্থ على الوحى 'অহীর বিষয়ে'। অর্থাৎ أنه صادق فيما يخبر به من الوحى المتلو وغير المتلو 'অহিয়ে মাতলু (কুরআন) ও গায়ের মাতলু (হাদীছ)-এর যে সব বিষয়ে তাকে খবর দেওয়া হয়, সব ব্যাপারে তিনি সত্যবাদী'। যেমন রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার দরবারে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ 'অহি-র দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে কি তোমরা কখনো তাকে মিথ্যাবাদিতার তোহমত দিয়েছিলে? আবু সুফিয়ান বললেন, না। তখন

সম্রাট বললেন, أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ على الناس ثم يذهب فيكذِبَ على الله 'যিনি মানুষের উপর মিথ্যারোপ করেন না, তিনি আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করতে পারেন না'।[১৩৪]

ইবনু জারীর بِضَنِيْنٍ পড়েছেন, যার অর্থ 'কৃপণ' এবং আবু ওবায়দাহ ও ইবনু কাছীর পড়েছেন, بِظَنِيْنٍ যার অর্থ 'অপবাদগ্রস্ত' (مُتَّهَم)। দু'টোর অর্থ কাছাকাছি। অর্থাৎ আল্লাহ্র অহীসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করায় যেমন রাসূল কৃপণ নন, তেমনি প্রকাশ না করার বিষয়ে তিনি অপবাদগ্রস্ত নন। ইবনু কাছীর বলেন, দু'টি ক্বিরাআতই 'মুতাওয়াতির' এবং দু'টিরই অর্থ সঠিক *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। কাফেররা রাসূল (ছাঃ)-কে গণৎকার (كاهن) বলেছিল। এখানে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, কিছু পাওয়ার আশায় গণৎকার যেমন অনেক কথা লুকিয়ে রাখে, রাসূল (ছাঃ) তা নন। বরং তিনি সবকিছু প্রকাশ করে দেন *(ক্বাসেমী)*।

অত্র আয়াতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানবতার কল্যাণে সবচেয়ে বড় খিদমত হ'ল অহীর ইলমের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। যে কাজ ফেরেশতা ও নবীগণ করে গেছেন। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মালিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিষয়টি যথার্থভাবে উপলব্ধি করলে জাতির কল্যাণ ত্বরান্বিত হবে।

(২৫) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ 'এটা (কুরআন) বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়'।

অর্থাৎ এই কুরআন বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তানের উক্তি নয়। এটি মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র বাণী মাত্র। কুরায়েশরা 'রাজীম' অর্থ বুঝতো مرجوم و ملعون 'বিতাড়িত ও অভিশপ্ত' *(কুরতুবী)*। বস্তুত কুরআন নাযিল করা শয়তানের জন্য কখনোই সম্ভব নয় এবং তার সাধ্যের মধ্যেও নয়। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ، وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُوْنَ، إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ- 'এই কুরআন নিয়ে শয়তানেরা অবতরণ করেনি'। 'তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর ক্ষমতা রাখে না'। 'তাদেরকে তো (অহী) শ্রবণের স্থান থেকে দূরে রাখা হয়েছে' *(শো'আরা ২৬/২১০-২১২)*। এর মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে আরোপিত গণৎকারের অপবাদ খণ্ডন করা হয়েছে।

(২৬) فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ 'অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

ক্বাতাদাহ বলেন, এর অর্থ হ'ল- إلى أين تعدلون عن هذا القول وأين تذهبون عن كتابى هذا وطاعتى؟ 'এই বাণী ছেড়ে তোমরা কোন দিকে ফিরে যাচ্ছ? আমার এই কিতাব ও

১৩৪. বুখারী হা/২৯৪১, মুসলিম হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/৫৮৬১।

আমার আনুগত্য ছেড়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' যাজ্জাজ বলেন, أي طريق تسلكون أبين من الطريق الذي بينه الله لكم 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রাস্তা বাৎলে দিয়েছেন, তার চাইতে স্পষ্ট কোন্ রাস্তায় তোমরা চলেছ'? *(কুরতুবী)*। যেমন আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেছিলেন বনু হানীফা গোত্রের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে, যখন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসেছিল এবং ভণ্ডনবী মুসায়লামার বানোয়াট কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শুনিয়েছিল। যা ছিল চরম বাজে ও হাস্যকর বস্তু। তিনি সেদিন বলেছিলেন, ويحكم، أين يُذهَبُ بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إلٍّ : أى من إله– 'তোমাদের ধ্বংস হৌক! তোমাদের জ্ঞান-বিবেক কোথায় গিয়েছে? আল্লাহ্র কসম এরূপ কথা কখনোই আল্লাহ্র নিকট থেকে বের হয়নি' *(ইবনু কাছীর)*।

এজন্যেই আরবীতে প্রবাদ রয়েছে, كلام الملوك ملوك الكلام 'রাজার কথা হয় কথার রাজা'। অর্থাৎ আল্লাহ যেমন সেরা, তাঁর বাণীও তেমনি সেরা। অন্যের কোন কথা তার তুলনীয় হ'তে পারে না।

(২৭) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ 'এটা তো বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ মাত্র'।

এখানে إِنْ অর্থ مَا। কেননা নিয়ম হ'ল এই যে, إِنْ-এর পরে إِلاَّ আসলে তার অর্থ হবে مَا অর্থাৎ 'না'।

কুরআন হ'ল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ এবং অফুরন্ত কল্যাণের উৎস। যা থেকে মানুষ যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব নেবে এবং মানসিক শান্তি ও দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ লাভ করবে। অন্য আয়াতে কুরআনের বিশেষণে আল্লাহ বলেছেন, هَـــذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ 'এ কুরআন মানুষের জন্য বিস্তৃত ব্যাখ্যা, সুপথ প্রদর্শক এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশবাণী' *(আলে ইমরান ৩/১৩৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ 'মানুষের জন্য হেদায়াত এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাবলী এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। কুরআনের এ সত্য শাশ্বত ও চিরন্তন। যা যুগের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তনশীল নয়। বরং কুরআন হ'ল যুগ ও সমাজের পরিবর্তনকারী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَّعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– 'তোমার পালনকর্তার বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। (এর বিরুদ্ধে লোকেরা যা কিছু বলে, সে বিষয়ে তিনি) শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১১৫)*। অতএব তাদের শাস্তি ইহকালে

ও পরকালে হবেই। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ প্রবৃত্তির অনুসারী ও পথভ্রষ্ট। ফলে অধিকাংশের চাপে যাতে রাসূল (ছাঃ) ভীত না হন, সেজন্য এর পরের আয়াতেই বলা হয়েছে, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ– 'যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুরসণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)।*

অতএব কুরআনের সত্যতায় সন্দেহবাদ আরোপ করে অবিশ্বাসীরা যা খুশী বলুক, তুমি তাতে কর্ণপাত করবে না। বরং কুরআনের উপদেশবাণী সবাইকে উদারভাবে শুনিয়ে যাও। কেননা إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلاً 'এই কুরআন হ'ল উপদেশগ্রন্থ। অতএব যে চায় সে তার প্রভুর রাস্তা অবলম্বন করুক' *(দাহর ৭৬/২৯)।*

(২৮) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ 'সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়'।

অর্থ من شآء أن يتبع الحق ويقيم عليه 'যে ব্যক্তি চায় হক-এর অনুসরণ করতে ও তার উপর দৃঢ় থাকতে' *(কুরতুবী)*। এর মধ্যে অদৃষ্টবাদী (জাবরিয়া)-দের প্রতিবাদ রয়েছে।

অর্থাৎ কুরআন হ'ল উপদেশগ্রন্থ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও ছহীহ সুন্নাহ্র উপরে দৃঢ় থাকতে চায়। কেননা প্রকৃত সত্যের সন্ধানী যারা, কুরআন হ'ল তাদের চূড়ান্ত পথ নির্দেশক। এ পথেই রয়েছে মুক্তি। আর অন্য পথে রয়েছে কেবলই ধ্বংস আর বিপত্তি। ইবনু কাছীর বলেন, من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاةٌ له وهداية ولا هداية فيما سواه– 'যে ব্যক্তি সুপথ পেতে চায়, তার জন্য অপরিহার্য হ'ল এই কুরআন। কেননা এটিই হ'ল তার জন্য নাজাত ও হেদায়াতের পথ। এর বাইরে কোন সুপথ নেই'।

এখানে استقامت তথা দৃঢ় থাকার কথা বলা হয়েছে। কেননা যুক্তিবাদী দোদেল বান্দার কোন স্থান আল্লাহ্র কাছে নেই। আল্লাহ তার রাসূলকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ– 'তোমাকে যেভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, সেভাবে দৃঢ় থাক এবং যারা তোমার সঙ্গে তওবা করেছে তারাও। (কোন অবস্থায়) সীমালংঘন করবে না। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু দেখেন যা তোমরা করো' *(হূদ ১১/১১২)*। এ আয়াতে শুধু নবীকেই নয়, সকল ঈমানদার ও মুত্তাকী মুসলমানকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা দুনিয়ার যত অশান্তির মূলে হ'ল বাতিলের সঙ্গে আপোষকামী দুর্বলচেতা লোকেরা। প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি কখনই তাদের দলভুক্ত হবে না।

রাসূল (ছাঃ)-এর দাড়িতে তাড়াতাড়ি পাক ধরলে একদিন হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সূরা হূদ, ওয়াক্বি'আহ, মুরসালাত, নাবা ও তাকভীর আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে'।[১৩৫]

কুরতুবী বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, সূরা হূদের فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ *(১১/১১২)* আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-কে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।[১৩৬] কেননা শয়তানের জাঁকজমক ও বাতিলে ভরা এ দুনিয়ায় আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকা খুবই কঠিন বিষয়। যারা সত্যের উপরে দৃঢ় থাকে, তাদের ইহকালীন ও পরকালীন পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنتُمْ تُوْعَدُوْنَ- نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ- نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ-

'নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে। তাদের উপরে ফেরেশতাগণ নাযিল হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না, তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর'। 'ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। যেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যা তোমরা দাবী করবে'। 'এটা হবে ক্ষমাশীল ও দয়াময়ের পক্ষ হ'তে বিশেষ আপ্যায়ন' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩০-৩২)*।

(২৯) وَمَا تَشَاؤُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ 'আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না কেবল ঐটুকু ব্যতীত যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন, যিনি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা'।

২৭ আয়াতে বর্ণিত ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ও বর্তমান আয়াতে বর্ণিত رَبُّ الْعَالَمِيْنَ-এর মর্ম এক নয়। কেননা পূর্বের আয়াতে 'জগদ্বাসী'কে বুঝানো হয়েছে এবং অত্র আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত সকল সৃষ্টবস্তুকে বুঝানো হয়েছে। পূর্বের আয়াতের চাইতে বর্তমান আয়াতের অর্থ অতি ব্যাপক। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, كل ما سوى الله فهو عالم وانا واحد من ذلك العالم 'আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই সৃষ্টবস্তু (عالم) এবং আমিও তার অন্যতম'।

অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে সবকিছু নির্ভর করে না। তোমরা ইচ্ছা করলেই সত্যের উপর টিকে থাকবে, এটা তোমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়।

---

১৩৫. তিরমিযী হা/৩২৯৭, হাকেম ২/৪৭৬; ছহীহাহ হা/৯৫৫।
১৩৬. কুরতুবী, সূরা হূদ-এর তাফসীরের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অতএব সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কামনা করতে হবে। কারণ, وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ 'আল্লাহ যাকে চান তাকে স্বীয় রহমতের জন্য খাছ করে নেন' *(বাক্বারাহ ২/১০৫)*। يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهِ 'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, নিজ অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করান' *(দাহর ৭৬/৩১)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ 'আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে সক্ষম হয় না' *(ইউনুস ১০/১০০)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ– 'তুমি যাকে চাও তাকে হেদায়াত করতে পারো না; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করে থাকেন' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এই যে, যখন পূর্বের ২৮ নং আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আবু জাহল শুনে বলে ওঠে, الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم 'এখন তো বিষয়টি আমাদের হাতে এসে গেল। আমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌র উপরে অবিচল থাকব, নইলে থাকব না'। তখন তার জওয়াবে অত্র আয়াতটি নাযিল হয় *(ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

একই ধরনের অজুহাত পূর্বের ও পরের সকল কাফির-মুশরিকরা পেশ করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَ لاَ آبَاؤُنَا وَ لاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوْا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُوْنَ– 'সত্বর মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা করত, না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে। অবশেষে তারা আমাদের শাস্তি আস্বাদন করেছে। তুমি বল, তোমাদের কাছে (উক্ত দাবীর পক্ষে) কোন প্রমাণ আছে কি, যা আমাদের দেখাতে পার? বস্তুতঃ তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ কর এবং তোমরা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বল' *(আন'আম ৬/১৪৮)*।

ইমাম কুরতুবী বলেন, আবু জাহল হ'ল তাকদীর অস্বীকারকারীদের নেতা (رأس القدرية)। কেননা তাকদীরকে অস্বীকারকারী লোকেরা নিজেদেরকে অদৃষ্টের স্রষ্টা বলে থাকে। তারা মনে করে, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। এইসব লোকের কণ্ঠে আবু জাহলের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

বস্তুতঃ 'ভাগ্য' হ'ল আল্লাহ্‌র 'নির্ধারণ' যা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বেই তিনি নির্ধারণ করেছেন।[১৩৭] মায়ের গর্ভে রূহ প্রেরণের পর সেই পূর্ব নির্ধারিত

১৩৭. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।

তাকদীর অর্থাৎ মানব সন্তানের আয়ুষ্কাল, তার কর্মকাণ্ড, তার রিযিক ও সে ভাগ্যবান (জান্নাতী) হবে, না হতভাগা (জাহান্নামী) হবে- এ চারটি বিষয় তার কপালে লিখে দেওয়া হয়।[১৩৮] ঠিক যেমন ঔষধের আবিষ্কারক তার ঔষধের গুণাগুণ, কর্মক্ষমতা, মেয়াদকাল সব আগে থেকেই জানেন এবং তা পরে বাজারে ছাড়ার আগে প্যাকেটের উপরে লিখে দেন। আবিষ্কারক তা জানলেও ঔষধ নিজে তা জানে না। অমনিভাবে মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষের সবকিছু আগে থেকে জানলেও মানুষ তা জানে না। তার নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা তার নেই। যতক্ষণ না আল্লাহ তা পরিবর্তন করেন। এক্ষণে মানুষ যেহেতু তার ভাগ্য সম্পর্কে জানে না, তাই তাকে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে তার দেখানো পথে কাজ করে যেতে বলা হয়েছে। কাজ করা বা না করার ব্যাপারে এবং ভাল-মন্দ পথ বেছে নেবার ব্যাপারে আল্লাহ তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য *(দাহর ৭৬/৩; মুল্ক ৬৭/২)*। মানুষ তার শক্তি ও সাধ্যমত বৈধ পথে চেষ্টা করে যাবে এটাই তার দায়িত্ব। চেষ্টা না করলে সে কিছুই পাবে না *(নাজম ৫৩/৩৯)* এবং আল্লাহ তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন না *(রা'দ ১৩/১১)*। সফলতা ও ব্যর্থতা সবকিছুই আল্লাহ্র হাতে *(রা'দ ১৩/৩১)*। এভাবে তার প্রচেষ্টা যেখানে শেষ হবে, তার তাকদীর সেখান থেকে শুরু হবে। যদিও তার প্রচেষ্টাও তাকদীরের অংশ। এভাবে বান্দার ইচ্ছা অবশেষে আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ মানুষকে সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও ক্ষমতা দান করেছেন। সেই ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেলে নিজেকে ইচ্ছায় হৌক অনিচ্ছায় হৌক আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারণ অর্থাৎ তাকদীরের কাছে সমর্পণ করে দিতেই হয়। আর আল্লাহ্র ইচ্ছার মধ্যে সর্বদা বান্দার কল্যাণ নিহিত থাকে। যদিও অনেক সময় বান্দা আল্লাহ্র সেই হিকমত বুঝতে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئاً وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ- 'তোমরা কোন বস্তু অপসন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর। আবার তোমরা কোন বস্তু পসন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ (সকল বিষয়ে) জানেন। কিন্তু তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*।

উপরোক্ত আয়াতকে ভ্রান্ত ফের্কা জাবরিয়াগণ (অদৃষ্টবাদীগণ) নিজেদের পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে বলেন যে, 'মানুষের ইচ্ছা বলে কিছু নেই'। 'কিছু হইতে কিছু হয় না। যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়'। অপরদিকে আরেক ভ্রান্ত ফের্কা মু'তাযিলা যুক্তিবাদীগণ বলেন যে, শিরক কখনো আল্লাহ্র ইচ্ছায় হ'তে পারে না। অতএব বান্দা নিজ ইচ্ছায় স্বাধীন। তাকদীর বলে কিছু নেই। অথচ তাদের এই যুক্তি বাতিল। কেননা সূরা আন'আম ১৪৮ আয়াতে আল্লাহ মুশরিকদের নিন্দা করেছেন এজন্য যে, তারা

১৩৮. বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২।

সত্যের সন্ধানে প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেছে।[১৩৯] আর তারা এসব কথা বলেছে ঠাট্টা ও বিদ্রুপচ্ছলে। যেমন তারা বলত, وَقَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ 'দয়াময় (আল্লাহ) চাইলে আমরা ঐসব উপাস্যদের পূজা করতাম না' *(যুখরুফ ৪৩/২০)*। যদি তারা একথা আল্লাহ্র প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ থেকে বলত, তাহ'লে আল্লাহ তাদেরকে দোষারোপ করতেন না। যেমন তিনি বলেছেন, وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوْا 'আল্লাহ চাইলে তারা শিরক করতো না' *(আন'আম ৬/১০৭)*। তারা ঈমান আনতে পারত না, যদি আল্লাহ না চাইতেন *(আন'আম ৬/১১১)*। তিনি চাইলে সবাইকে হেদায়াত দান করতেন *(নাহল ১৬/৯; সাজদাহ ৩২/১৩)*। মুমিনগণ এসব কথা বলে থাকে আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস থেকে *(কুরতুবী)*। কিন্তু অন্যেরা তা বলে অবিশ্বাস থেকে।

তাকদীরে বিশ্বাসের ফল এই দাঁড়ায় যে, বান্দা ব্যর্থতার গ্লানিতে হতাশাগ্রস্ত হয় না। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে তার উপরে ভরসা করে সে পুনরায় নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলে। পক্ষান্তরে তাকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি কোন কাজে ব্যর্থ হ'লে হতাশার গ্লানিতে ভেঙ্গে পড়ে। এমনকি আত্মহত্যা করতেও পিছপা হয় না। এজন্যেই তো দেখা যায় জাপান সহ পৃথিবীর শিল্পোন্নত ও সচ্ছল দেশগুলিতেই আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা বেশী। অথচ তাকদীরে বিশ্বাসী একজন সত্যিকারের মুসলমান শত বিপদেও ভেঙ্গে পড়ে না। সে একে আল্লাহ্র পরীক্ষা মনে করে এবং তা হাসিমুখে বরণ করে নেয়। অতঃপর আল্লাহ্র উপরে ভরসা রেখে এবং তারই সাহায্য প্রার্থনা করে তারই দেখানো পথ ধরে বিপদ উত্তরণের চেষ্টায় ব্রতী হয়। যেসব লোকেরা হরহামেশা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা বলেন, তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন কি? এত বড় অহংকারী কথা আল্লাহ কখনোই বরদাশত করেন না।

সারকথা :

সূরাটিতে ক্বিয়ামতের বাস্তব বাণীচিত্র অংকন করা হয়েছে। এতে মানুষকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ভবলীলা একদিন সাঙ্গ হবেই এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবেই। অতঃপর প্রত্যেক মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকটে তার সারা জীবনের ভাল-মন্দ কর্মসমূহের হিসাব দিতে হবে। আর নিঃসন্দেহে কুরআন আল্লাহ প্রেরিত কিতাব। যা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ স্বরূপ।

---

১৩৯. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ অনুবাদ : 'সত্বর মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ চাইতেন, আমরা বা আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করত না এবং আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম না। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্বেকার অবিশ্বাসীরা (স্ব স্ব রাসূলদেরকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেছিল। বলুন! তোমাদের (এ দাবীর স্বপক্ষে) কোন প্রমাণ আছে কি? যা আমাদের কাছে পেশ করতে পারো? তোমরা তো কেবল ধারণার অনুসরণ কর। আর তোমরা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলছ' *(আন'আম ৬/১৪৮)*।

সূরা ইনফিত্বার (বিদীর্ণ হওয়া)

সূরা নাযে'আত-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮২, আয়াত ১৯, শব্দ ৮১, বর্ণ ৩২৬।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে	اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ﴿۱﴾
(২) যেদিন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে	وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ﴿۲﴾
(৩) যেদিন সাগরসমূহ উত্তাল হবে	وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ﴿۳﴾
(৪) যেদিন কবরসমূহ উন্মুক্ত হবে	وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ﴿۴﴾
(৫) সেদিন প্রত্যেকে জানবে সে অগ্রে ও পশ্চাতে কি প্রেরণ করেছে।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ؕ﴿۵﴾
(৬) হে মানুষ! কোন্ বস্তু তোমাকে তোমার মহান প্রভু থেকে বিভ্রান্ত করল?	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ﴿۶﴾
(৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর সুষম করেছেন।	الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ﴿۷﴾
(৮) তিনি তোমাকে তেমন আকৃতিতে গঠন করেছেন, যেভাবে তিনি চেয়েছেন।	فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ؕ﴿۸﴾
(৯) কখনোই না। বরং তোমরা বিচার দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছ।	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ﴿۹﴾
(১০) অথচ তোমাদের উপরে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে।	وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ﴿۱۰﴾
(১১) সম্মানিত লেখকবৃন্দ।	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ﴿۱۱﴾
(১২) তারা জানেন তোমরা যা কর।	يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۱۲﴾
(১৩) নিশ্চয়ই নেককার ব্যক্তিগণ থাকবে জান্নাতে	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۚ﴿۱۳﴾
(১৪) এবং পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে।	وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۚۖ﴿۱۴﴾

(১৫) তারা বিচার দিবসে তাতে প্রবেশ করবে।	يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝
(১৬) তারা সেখান থেকে দূরে থাকবে না।	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝
(১৭) তুমি কি জানো বিচার দিবস কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝
(১৮) অতঃপর তুমি কি জানো বিচার দিবস কি?	ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝
(১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝

গুরুত্ব :

সূরাটিতে ক্বিয়ামতের দৃশ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি আমরা পূর্বোক্ত সূরা তাকভীরের শুরুতে বর্ণনা করেছি।

এতদ্ব্যতীত হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে যে, একদিন হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) স্বীয় মহল্লার জামা'আতে মাগরিব কিংবা এশার ছালাতে ইমামতি করার সময় ক্বিরাআত দীর্ঘ করেন। তাতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে অভিযোগ আসে। তখন তিনি মু'আয (রাঃ)-কে ডেকে বলেন, أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالضُّحَى وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ 'মু'আয তুমি কি লোকদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছ? তুমি সূরা আ'লা, যোহা, ইনফিত্বার পড়ো না কেন?[১৪০] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সূরাগুলি এশার ছালাতে পড়া উচিত। যাতে বান্দা ক্বিয়ামত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করে ও ঘুমাতে যাওয়ার আগেই গোনাহ থেকে তওবা করে।

বিষয়বস্তু :

সূরাটিতে চারটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ১- ক্বিয়ামতের কিছু দৃশ্যের অবতারণা *(১-৫ আয়াত)*। ২- নিজের সৃষ্টিতে অপারগ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কেন তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ থেকে বিভ্রান্ত হ'ল সেজন্য ধিক্কার প্রদান *(৬-৮ আয়াত)*। ৩- মানুষকে বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তার সকল কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ হচ্ছে, সে বিষয়ে হুঁশিয়ারী প্রদান *(৯-১২ আয়াত)*। ৪- লেখক ফেরেশতাগণের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ক্বিয়ামতের দিন মানুষের সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল দু'দলে বিভক্ত হওয়ার বর্ণনা *(১৩-১৯ আয়াত)*।

---

১৪০. নাসাঈ হা/৯৯ 'এশার ছালাতের ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ; হাদীছের মূল ও প্রথমাংশ ছহীহায়েনে রয়েছে; বিস্তারিত সূরা ফজরের তাফসীরে দেখুন)।

তাফসীর :

(১) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে'।

انْفَطَرَتْ অর্থ انشقت بأمر الله 'বিদীর্ণ হবে আল্লাহ্র হুকুমে' *(কুরতুবী)*। নিশ্চিত বিষয় যা ভবিষ্যতে ঘটবে, এমন মর্ম প্রকাশের জন্য এখানে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্বিয়ামতের নিশ্চয়তা বুঝানো হয়েছে।

অত্র আয়াতে ক্বিয়ামত শুরুর প্রাক্কালে আকাশের অবস্থা কেমন হবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন একই শব্দে অন্যত্র বলা হয়েছে, السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُوْلاً 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে' *(মুযযাম্মিল ৭৩/১৮)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلاَئِكَةُ تَنْزِيْلاً 'যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদের নামিয়ে দেওয়া হবে' *(ফুরক্বান ২৫/২৫)*।

(২) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ 'যেদিন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে'।

পরস্পরের মধ্যকার মধ্যাকর্ষণ শক্তি যখন আল্লাহ্র হুকুমে ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন মহাশূন্যে সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র যা কিছু আছে সবই বিছিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে ও আলোহীন হয়ে যাবে।

انْتَثَرَتْ বা ঝরে পড়া শব্দের মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে বেঁধে রাখার। বিজ্ঞানী ব্যক্তিকে এ শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ চৌদ্দশত বছর পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন মধ্যাকর্ষণ শক্তির তথ্য। যদিও বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খৃঃ) তার সন্ধান পেয়েছেন মাত্র ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে।

(৩) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ 'যেদিন সাগরসমূহ উত্তাল হবে'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَجَّرَ اللهُ بَعْضَهَا فِىْ بَعْضٍ 'আল্লাহ পানির একাংশকে অপর অংশের মধ্যে মিলিয়ে দিবেন'। ফলে সাগরসমূহ মিলিত হয়ে একটি সাগরে পরিণত হবে। ক্বাতাদাহ বলেন, اختلط مالحها بعذبها 'লবণাক্ত পানি মিঠা পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে' *(ইবনু কাছীর)*।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে সংঘঠিত হবে, যা ইতিপূর্বে সূরা তাকভীরের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে وإذا البحار سجرت 'যেদিন সমুদ্রগুলি অগ্নিময় হবে।' দু'টি আয়াতে দু'টি অবস্থা বর্ণিত হ'তে পারে। প্রথমে সাগরসমূহ উদ্বেলিত হয়ে একাকার হবে। অতঃপর তা সবই অগ্নিময় হবে।

(৪) وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ‘যেদিন কবরসমূহ উন্মুক্ত হবে’।

সুদ্দী বলেন, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ এমনভাবে আন্দোলিত হবে যে, কবরসমূহ উন্মুক্ত হবে এবং তার ভিতরকার মাইয়েত সব বেরিয়ে আসবে’। ভূপৃষ্ঠের তাযা কবর ছাড়াও যেসব কবরে লাশ মাটি হয়ে গেছে কিংবা যাদের লাশ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে বা বাঘ-কুমীরের পেটে গেছে, সকলের রূহ যেখানে আবৃত থাকে, সেটাই হ’ল তার ‘কবর’। সেই কবরে তাকে শাস্তি বা শান্তি পৌঁছানো হয়। যেভাবে স্বপ্নজগতে আনন্দ বা বেদনার অনুভূতি হয়। সেই কবর থেকেই সে বেরিয়ে আসবে আল্লাহ্র হুকুমে দেহ ধারণ করে। ফার্রা প্রমুখ বলেন, এর দ্বারা ক্বিয়ামতপূর্ব আলামতের কথা বলা হয়েছে যে, সেই সময় ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় সোনা-রূপা বেরিয়ে আসবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ‘যেদিন পৃথিবী তার ভিতরকার সব বোঝা বের করে দিবে’ *(যিলযাল ৯৯/২)*। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ভূগর্ভে আল্লাহপাক তার বান্দার জন্য বহু মূল্যবান রত্ন ও ধাতুসমূহ সঞ্চিত রেখেছেন। বান্দাকে তা উত্তোলন করে কাজে লাগাতে হবে।

(৫) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ‘যেদিন প্রত্যেকে জানবে সে অগ্রে ও পশ্চাতে কি প্রেরণ করেছে’।

পূর্বের চারটি আয়াতের জওয়াব হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, সাগরসমূহ একাকার হয়ে যাবে এবং কবরসমূহ উন্মোচিত হবে, সেদিন ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং মানুষের হাতে তাদের স্ব স্ব আমলনামা তুলে দেয়া হবে। তখন তারা তাদের আগে-পিছের ভাল-মন্দ সব কর্মকাণ্ডের রেকর্ড সেখানে দেখতে পাবে’। একই মর্মে অন্যত্র বলা হয়েছে, يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ‘যেদিন মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে আগে-পিছে যা কিছু সে করেছে’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৩)*। তাকে বলা হবে, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ‘তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৪)*।

(৬) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ‘হে মানুষ! কোন্ বস্তু তোমাকে তোমার মহান প্রভু থেকে বিভ্রান্ত করল?’

ক্বিয়ামত অস্বীকারকারী লোকদের উদ্দেশ্যে ধিক্কার দিয়ে একথা বলা হয়েছে। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, মানুষ ধোঁকা খায় তার মূর্খতার কারণে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْماً جَهُوْلاً ‘মানুষ অত্যাচারী ও মূর্খ *(আহযাব ৩৩/৭২)*। এর কারণ হ’ল মানুষ অন্যায় করার সাথে সাথে আল্লাহ তাকে গ্রেফতার করেন না। তাতে সে আরও বেড়ে যায় ও সীমা অতিক্রম করে। শুরুতে আল্লাহ্র এই ক্ষমা

তাকে ধোঁকায় ফেলে। অতঃপর একসময় সে ক্বিয়ামত ও আখেরাতে জওয়াবদিহিতাকে অস্বীকার করে বসে। এটাই হ'ল তার সবচেড়ে বড় মূর্খতা। আল্লাহ যেহেতু প্রথমে তাকে পাকড়াও না করে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দেন, এটাকে তাই আল্লাহ্র করুণা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং সেজন্য এখানে আল্লাহ্র 'কারীম' বা 'মহান' গুণবাচক নামটির অবতারণা করা হয়েছে। এর দ্বারা এবিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, মন্দ কর্মসমূহ নিয়ে মহান আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়ানো যায় না *(ইবনু কাছীর)*।

এখানে مَا প্রশ্নবোধক (استفهامية) এসেছে। এর জবাব উহ্য থাকলেও পরবর্তী আয়াত সমূহে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সেটি হ'ল আল্লাহ্র সহনশীলতা ও তাঁর অবকাশ দান। বরং غَرَّهُ كَرَمُهُ 'আল্লাহ্র মহত্ত্ব হ'ল তাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ'। অতএব আয়াতের সারমর্ম হ'ল, لا تغتروا بحلم الله وكرمه فتتركوا العمل فى قربات الله 'তোমরা আল্লাহ্র সহনশীলতা ও তাঁর দয়ার কারণে ধোঁকা খেয়োনা এবং আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের সৎকর্মসমূহ ছেড়ে দিয়ো না'।

যুন্নুন মিছরী বলেন, كم من مغرور تحت السَّتر وهو لا يشعُر 'বহু ধোঁকা খাওয়া মানুষ রয়েছে আল্লাহ্র (ক্ষমার) পর্দার নীচে। অথচ সে তা বুঝতে পারে না' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ অনেক মানুষের দোষ-ত্রুটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ পর্দা ফেলে রেখেছেন। তাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি। ফলে তারা আরো ধোঁকায় পড়ে গেছে। মোটকথা আল্লাহ্র ক্ষমাকে মানুষ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে এবং বেপরওয়া হয়ে সীমা অতিক্রম করে ও আল্লাহকে ভুলে যায়। ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসীরাই এটা বেশী করে থাকে। তবে মুমিনরা তওবা করে ফিরে আসে। যা অবিশ্বাসীরা করে না।

অত্র আয়াত দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, আসমান-যমীনের সৃষ্টির বিষয়টি এখানে মুখ্য নয়। বরং মুখ্য বিষয় হ'ল মানুষ। তার জন্যই সবকিছুর সৃষ্টি। অতএব তার বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতাই আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে বেশী ক্রোধ উদ্দীপক।

(৭) الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ 'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর সুষম করেছেন'।

অর্থাৎ جعلك سَوِيًّا معتدل القامة فى بطن امك 'তোমার মায়ের গর্ভে তোমাকে সুবিন্যস্ত ও সুষম অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন'। অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে তার সৃষ্টিকৌশল বর্ণনা করেছেন, যাতে সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয় এবং তাকে ভুলে শয়তানের তাবেদার না হয়। এখানে সৃষ্টি, বিন্যস্তকরণ ও সুষমকরণ, তিনটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য বহু চিন্তার খোরাক রয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। সৃষ্টি দু'রকমের। এক- অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন। যেভাবে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয় *(বাক্বারাহ ২/৩০-৩৯)*। দুই- অস্তিত্ব থেকে পৃথক অস্তিত্বে আনয়ন। যেমন পিতা-মাতার মাধ্যমে সন্তানের জন্মগ্রহণ। এই সৃষ্টি করা হয়েছে স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে স্ত্রীর গর্ভে। আর মাতৃগর্ভ ব্যতীত অন্য কোথাও মানবশিশু সৃষ্টি হয় না। জনৈক বিজ্ঞানী তার ল্যাবরেটরীতে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে মানবদেহ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ২০টি গ্যাসীয় অণু নিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা করেও অবশেষে মানবশিশুর ভ্রূণ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন।[১৪১] ভ্রূণ সৃষ্টি করার পর তাকে হাত-পা, চোখ-কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা 'সুবিন্যস্ত' করা হয় *(সাজদাহ ৩২/৯)*। যেমন এক হাত আরেক হাত থেকে বা এক পা আরেক পা থেকে দীর্ঘ না হওয়া। একইভাবে আঙ্গুলগুলি অসমভাবে খাটো ও লম্বা না হওয়া ইত্যাদি। অতঃপর তাকে 'সুষম' করা হয়। অর্থাৎ দেহের আকৃতি, প্রকৃতি, রক্তের গ্রুপ, দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি, স্বভাব-চরিত্র সবকিছুকে সুষম করা হয়। যেমন মুরগী স্রেফ দু'পায়ে চলে ও গরু-ছাগল চার হাত-পা দিয়ে চলে। অথচ মানুষ সবাই দু'পা দিয়ে চলে ও দু'হাত দিয়ে কাজ করে। যদি এটা আল্লাহ না করতেন, তাহ'লে মানুষের মধ্যে পরস্পরে কোন সামঞ্জস্য থাকতো না। কেউ হতো ১০ হাত লম্বা, কেউ হতো দু'হাত লম্বা। কেউ ভাত-রুটি খেতো, কেউ ঘাস-পাতা খেতো। মানুষের সৃষ্টি ও চরিত্রের সামঞ্জস্য বিচার করে কোন খাদ্য, পানীয় বা ঔষধ তৈরী করা যেত না। দেহের মাপের আন্দায করে কোন পোষাকের ডিজাইন তৈরী হতো না। জামা-কাপড়, জুতা, স্যান্ডেল কিছুই বানানো যেত না। পরিবার, সমাজ ও দেশ পরিচালনার জন্য কোন সাধারণ নীতি-কৌশল বা আইনও তৈরী করা যেত না। ফলে পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি হতো এক দারুণ বিশৃংখলা।[১৪২]

বুস্র বিন জিহাশ আল-ক্বারশী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন নিজ হাতের তালুতে থুথু ফেলেন। অতঃপর সেখানে আঙ্গুল রেখে বলেন, আল্লাহ বলেছেন, يَا ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِى وقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ 'হে আদম সন্তান! তুমি কিভাবে আমাকে অক্ষম করবে? অথচ তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি এটির মত করে? অতঃপর যখন আমি তোমাকে বিন্যস্ত করেছি ও সুষম করেছি, তখন তুমি সকাল-সন্ধ্যায় চলাফেরা করতে থাকলে। আর পৃথিবীতে পেলে কঠিন জীবন। অতঃপর তুমি মাল সঞ্চয় করলে ও বখীল হ'লে। অবশেষে যখন মৃত্যুক্ষণ এসে গেল, তখন তুমি বললে, أَتَصَدَّقُ

১৪১. মাওলানা আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব (ঢাকা : ২০০৩) ৪০৮ পৃঃ।
১৪২. মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বের উপরে আলোচনা সূরা আবাসা ১৮-২০ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ আমি ছাদাক্বা করব। অথচ কোথায় তখন ছাদাক্বার সময়'? *(ইবনু কাছীর)*।[১৪৩]

(৮) فِيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ 'তিনি তোমাকে তেমন আকৃতিতে গঠন করেছেন, যেভাবে তিনি চেয়েছেন'।

في أيِّ شبه من الوالد أو الأم أو الجد أو غيرهم. অর্থ 'পিতা-মাতা, দাদা-নানা বা অন্য যেকোন চেহারার সাথে সামঞ্জস্য করে তিনি সৃষ্টি করেন'।

অর্থাৎ في أبدع الصور وأعجبها 'কোনরূপ পূর্ব নমুনা ছাড়াই তিনি বিস্ময়করভাবে নব নব আকৃতিতে সৃষ্টি করেন'। একই পিতা-মাতার সন্তান অথচ কারু সঙ্গে কারু মিল নেই। রঙে-রূপে, স্বভাবে-চরিত্রে, মেধায় ও বুদ্ধিমত্তায়, স্বাস্থ্যে ও সামর্থ্যে সব দিক দিয়েই প্রত্যেক সন্তান সম্পূর্ণ নতুন। ফারসী কবির ভাষায়, ہرگل را رنگ وبوئے دیگر است 'প্রত্যেক ফুলের রং ও সুগন্ধি পৃথক'। এরপরেও তাদের মধ্যে থাকে এক ধরনের মিল। যা দেখলেই বুঝা যায়। সন্তানের চেহারায় যেন পিতা-মাতার চেহারা ভেসে ওঠে। তার স্বভাবে ও কর্মে পিতা-মাতার স্বভাব ও কর্মের অনেকটা প্রতিফলন ঘটে। বৈষম্যের মধ্যেও এই যে মিল, আবার মিলের মধ্যেও এই যে বৈষম্য, নব নব আকৃতি ও প্রতিভা সৃষ্টির এই যে অলৌকিক ক্রিয়া-কৌশল, তা কেবলমাত্র আল্লাহ্র পক্ষেই সম্ভব। কস্মিনকালেও কোন মানুষের পক্ষে এটি সম্ভব নয়। অতএব হে অহংকারী বান্দা! এর পরেও কি তুমি আল্লাহকে অস্বীকার করবে?

(৯) كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ 'কখনোই না। বরং তোমরা বিচার দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছ'।

আল্লাহ নেই, ক্বিয়ামত নেই, হিসাব-নিকাশ নেই বলে হে অবিশ্বাসীরা তোমরা যেসব কথা বলছ, তা কখনোই ঠিক নয়। বরং আসল কথা এই যে, তোমরা আখেরাতে জওয়াবদিহিতাকে মিথ্যা বলতে চাও। কেননা তোমরা হিসাব দিবসকেই বেশী ভয় পাও। যেমন দুর্নীতিবাজরা দুনিয়াতে জবাবদিহিতাকেই বেশী ভয় পায়। ক্বিয়ামতকেও তারা একই কারণে ভয় পায়। আর সেজন্যেই তাকে মিথ্যা বলে তৃপ্তি খুঁজতে চায়। তারা বলে, إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। আমরা আদৌ পুনরুত্থিত হব না' *(মুমিনূন ২৩/৩৭)*।

---

১৪৩. আহমাদ হা/১৭৮৭৬; ইবনু মাজাহ হা/২৭০৭, সনদ ছহীহ।

এখানে كَلاَّ অর্থ حَقًّا হতে পারে। অর্থাৎ ‘অবশ্যই তোমরা বিচার দিবসকে মিথ্যা মনে করো’। كَلاَّ অর্থ لا হ’তে পারে। অর্থাৎ ليس كما تقولون ‘তোমরা যেমনটি বলছ, তেমনটি নয়’। তখন كَلاَّ হবে حرف ردع وزجر ধমক ও ধিক্কারসূচক অব্যয়। অর্থাৎ ‘আল্লাহ্র ধৈর্য ও দয়ার কারণে তোমরা ধোঁকা খেয়ো না’।

ইবনুল আম্বারী বলেন, كَلاَّ-এর পরে ওয়াক্ফ করা অর্থাৎ বিরতি দেওয়াটা হবে মন্দকার্য (قبيح)। বরং আয়াতের শেষে বিরতি দেওয়াই হবে উত্তম (جيد)’। এখানে ‘তোমরা’ বলতে মক্কাবাসী মুশরিকদের বুঝানো হ’লেও তা সকল যুগের সকল অবিশ্বাসীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। এখানে الدِّيْنُ অর্থ الحساب বা يوم الحساب। অর্থাৎ বিচার দিবস। بَلْ এসেছে لنفى ما تقدم وتحقيق ما بعده ‘পূর্বের বিষয়টি না করার জন্য এবং পরের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য’ *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ لا شئ يغرك بربك الكريم الا تكذيبك بالمعاد والحساب ‘তোমার প্রভু থেকে তোমাকে বিভ্রান্ত হওয়ার একমাত্র কারণ হ’ল পুনরুত্থান ও হিসাব দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা’।

(১০-১২) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ، كِرَاماً كَاتِبِيْنَ، يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ‘অথচ তোমাদের উপরে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে’ ‘সম্মানিত লেখকবৃন্দ’। ‘তারা জানেন তোমরা যা কর’।

এখানে إِنَّ ও لَ দু’টি নিশ্চয়তাবোধক অব্যয় দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক ও লেখক ফেরেশতাদ্বয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অত্র আয়াত তিনটিতে আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, তোমাদের পাহারাদার ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আমি ফেরেশতাদের নিযুক্ত করেছি। তারা তোমাদের সবকিছু জানেন এবং তারা সর্বদা তোমাদের ভাল-মন্দ কাজ-কর্ম লিপিবদ্ধ করছেন। তোমরা যে ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করছ, এটাও তারা লিখছেন। অতএব সাবধান হও! তারা অতি সম্মানিত। তাদের সামনে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী কোন কথা তোমরা বলো না এবং কোন মন্দ কাজ তোমরা করো না। কেননা এতে যেমন তারা অসম্মানিত হন, তেমনি তোমরাও গোনাহগার হয়ে থাক।

উল্লেখ্য যে, আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের দৃষ্টির বাইরে একটি আত্মিক জগত (عوالم روحية) রয়েছে। যেখানকার অশরীরী আত্মাগুলি সর্বদা মানুষের নানাবিধ সেবায় নিয়োজিত রয়েছে *(তানতাভী)*। অথচ কুরআন ও হাদীছ দেড়

হাযার বছর আগেই আমাদেরকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছে। বরং ঈমানের ৬টি স্তম্ভের দ্বিতীয়টি হ'ল ফেরেশতাগণের উপরে ঈমান আনা। উক্ত ৬টি বিশ্বাসকে একত্রে 'ঈমানে মুফাছছাল' বলা হয়। যেগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হ'তে পারে না।

জানা আবশ্যক যে, জিনেরাও অশরীরী আত্মা। তবে তারা আগুনের তৈরী ও ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী। জিনদের মধ্যে মুমিন ও কাফের আছে। ফাসেক জিনগুলি মানুষের ক্ষতি করে ও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। তারা মানুষের চাইতে শক্তিশালী। কিন্তু ফেরেশতাগণ জিনের চাইতে শক্তিশালী। তারা সবাই মুমিন এবং সবাই আল্লাহ্র হুকুমে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে। রাণী বিলক্বীসের সিংহাসন জিন সর্দার এনে দিতে চেয়েছিল সুলায়মান (আঃ) তাঁর স্থান থেকে উঠে দাঁড়াবার পূর্বে। কিন্তু ফেরেশতা ওটা এনে দিয়েছিলেন তার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই' *(নমল ২৭/৩৯-৪০)*। এতে বুঝা যায় ফেরেশতা জিনের চাইতে বহুগুণ শক্তিশালী।

কাফের-মুশরিকদের উপরে লেখক ফেরেশতা থাকবে কি-না এবিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, থাকবে না। কেননা তারা তো অবিশ্বাসী এবং তাদের চেহারা দেখেই ক্বিয়ামতের দিন চেনা যাবে' *(রহমান ৫৫/৪১)*। কেউ বলেছেন, থাকবে। কেননা আল্লাহ বলেন, ক্বিয়ামতের দিন তাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে' *(আল-হাক্কাহ ৬৯/২৫)*। যদি আমলনামা লেখাই না হবে, তাহ'লে কি দেওয়া হবে? তবে কুফর ও শিরকের কারণে তাদের কোন নেকীর কাজ যেহেতু আল্লাহ্র নিকটে গৃহীত হবে না, সেহেতু ডান পার্শ্বের ফেরেশতার জন্য লিখবার কিছু থাকবে না। এমতাবস্থায় তিনি পাপকর্ম লেখক বামপার্শ্বের ফেরেশতার লেখনীর সাক্ষী হবেন। আর অপেক্ষায় থাকবেন কখন ঐ অবিশ্বাসী মুশরিক ব্যক্তিটি তওবা করে ঈমানদার হবে *(কুরতুবী)*।

ফেরেশতাগণ পায়খানার সময়, স্ত্রী মিলনের সময় ও গোসলের সময় বান্দাকে ছেড়ে যান বলে কুরতুবী ও ইবনু কাছীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে মুসনাদে বাযযার ও ইবনু আবী হাতেম থেকে কয়েকটি হাদীছ এনেছেন, যা সনদের দিক দিয়ে সবল নয় এবং যা কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের বিরোধী। তাছাড়া অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ– 'যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল লিপিবদ্ধ করে'। 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই লিপিবদ্ধ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)*। এখানে কথা দ্বারা কথা ও কাজ দু'টিই বুঝানো হয়েছে। অতএব এটাই ঠিক যে, ফেরেশতাগণ সর্বাবস্থায় থাকেন এবং বৈধ-অবৈধ কর্মগুলি লিপিবদ্ধ করেন।

(১৩-১৪) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ 'নিশ্চয়ই নেককার ব্যক্তিগণ থাকবে জান্নাতে' 'এবং পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে'।

এখানে মানুষকে আবরার ও ফুজ্জার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'আবরার' একবচনে بَرٌّ এরা তারাই যারা সৎকর্মশীল ও খাঁটি ঈমানদার। যারা আল্লাহ প্রদত্ত ফরয-ওয়াজিবসমূহ ঠিকমত আদায় করে এবং নিষেধসমূহ হ'তে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে 'ফুজ্জার' একবচনে فَاجِرٌ এরা তারাই যারা এর বিপরীত। অর্থাৎ ফাসিক-মুনাফিক, কাফির-মুশরিক সবাই এই দলভুক্ত।

এই দুই দল বিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ 'একদল জান্নাতে ও একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(শূরা ৪২/৭)*। দু'দলের এই বিভক্তি তাদের আক্বীদা ও আমল তথা বিশ্বাস ও কর্মের ভিত্তিতে হবে। যদিও আল্লাহ্র ইলমে তা আগে থেকেই ছিল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে একদলভুক্ত করে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে এক দলভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে যে বিধানসমূহ দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নিতে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর'...*(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। তিনি বলেন, وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন ও যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন। আর তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(নাহল ১৬/৯৩)*। তিনি বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا 'আমরা মানুষকে রাস্তা বাৎলে দিয়েছি। এক্ষণে সে হয় কৃতজ্ঞ বান্দা হবে, নয় অকৃতজ্ঞ হবে' *(দাহর ৭৬/৩)*। এভাবে আল্লাহ মানুষের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, ভাল অথবা মন্দ পথ বেছে নেবার জন্য। অত্র আয়াতে অদৃষ্টবাদী ভ্রান্ত ফেরকা জাবরিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে।

(১৫) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ 'তারা বিচার দিবসে তাতে প্রবেশ করবে'।

অর্থ يَحْتَرِقُوْنَ بِهَا 'জাহান্নামের আগুনে তাদের পোড়ানো হবে'। صَلِيَ صَلًى وَصِلًى النَّارَ 'আগুনে জ্বলা'। صَلَى صَلْيًا النَّارَ 'আগুনে নিক্ষেপ করা'। সেখান থেকে ভাবার্থ নেওয়া

হয়েছে, বিচার শেষে ফলাফল হিসাবে কেউ জান্নাতে ও কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যদিও কবরে থাকতে তারা এর কিছু স্বাদ আস্বাদন করেছিল। এখানে ها সর্বনাম দ্বারা جَحِيْمٌ বুঝালে অর্থ হবে 'তারা ঐদিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।

(১৬) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ 'তারা সেখান থেকে দূরে থাকবে না'। অর্থাৎ আযাব থেকে কবরে ও জাহান্নামে কখনোই তাদের অবকাশ দেওয়া হবে না। বরং তারা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এখানে কেবল জাহান্নামে প্রবেশ করা ও তার শাস্তির কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হ'ল বান্দাকে এ থেকে ভয় প্রদর্শন করা। নইলে জাহান্নামীরা যেমন সেখানে প্রবেশ করবে, জান্নাতীরাও তেমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(১৭-১৮) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ 'তুমি কি জানো বিচার দিবস কি? 'অতঃপর তুমি কি জানো বিচার দিবস কি?

ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা বুঝানোর জন্য প্রশ্নবোধক বাক্যটি পরপর দু'বার আনা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, الْقَارِعَةُ، مَا الْقَارِعَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ 'করাঘাতকারী' 'করাঘাতকারী কি'? 'তুমি কি জানো করাঘাতকারী কি?' *(ক্বারে'আহ ১০৩/১-৩)*। করাঘাতকারী অর্থ ক্বিয়ামত কথাটি বারবার প্রশ্নবোধক বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রোতার কর্ণকুহর থেকে তার হৃদয়ের গভীরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানেও একইভাবে বলা হয়েছে। যাতে বান্দার অন্তরে ক্বিয়ামত বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ উঁকি-ঝুকি মারতে না পারে। অতঃপর সেদিনের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে,

(১৯) يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذ لله 'যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র'।

দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা মানুষ ব্যবহার করে প্রায় স্বাধীনভাবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কেউ কারু সামান্যতম উপকার করতে পারবে না। দুনিয়ার জেলখানায় তার নমুনা রয়েছে। এখানে কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেউ কারু প্রতি মানবিক সাহায্য পর্যন্ত করতে পারে না।

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেউ কারু জন্য সুফারিশ করতে পারবে না' মর্মে অনেকগুলি আয়াত এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه 'এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে'? *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। তিনি আরও বলেন, وَلاَ يَشْفَعُوْنَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى 'তারা

(ফেরেশতারা) সুফারিশ করতে পারে কেবল তার জন্য যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট' *(আম্বিয়া ২১/২৮)*। তিনি বলেন, لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى 'তাদের কোন সুফারিশ কাজে আসবে না। যতক্ষণ না আল্লাহ অনুমতি দেন যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট' *(নাজম ৫৩/২৬)*। এছাড়াও রয়েছে ছাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে স্বীয় কওমের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া সেই যুগান্তকারী ভাষণ, يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا– 'হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কেননা আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র হাত থেকে বাঁচানোর কোনই ক্ষমতা রাখি না'।[১৪৪]

প্রশ্ন হ'তে পারে, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্তৃত্ব আল্লাহ্র। তাহ'লে বিশেষ করে ঐদিন 'সব কর্তৃত্ব আল্লাহ্র' বলার কারণ কি? জবাব এই যে, আল্লাহ্র হুকুমে দুনিয়াতে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। এটা হ'ল তার জন্য স্বাধীন জগত (عالم اختيارى)। কিন্তু আখেরাত হ'ল বাধ্যগত জগত (عالم اضطرارى)। সেখানে তার নিজস্ব ইচ্ছা চলবে না। কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত। আল্লাহ সেদিন বলবেন,

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ–

'আজ কর্তৃত্ব কার? কেবলমাত্র আল্লাহ্র। যিনি এক ও মহাপরাক্রান্ত'। 'আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে। আজ কারু প্রতি যুলুম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব সম্পাদনকারী' *(গাফির/মুমিন ৪০/১৬-১৭)*।

সারকথা :

সূরাটিতে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেদিনের সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে উদাসীন মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অতএব হে মানুষ সাবধান হও!

১৪৪. বুখারী হা/৩৫২৭, মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩।

সূরা মুত্বাফফেফীন

(মাপে ও ওযনে কম দানকারীগণ)

সূরা আনকাবূত-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮৩, আয়াত ৩৬, শব্দ ১৬৯, বর্ণ ৭৪০।

[ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও ক্বাতাদাহ বলেন, সূরাটি মাদানী। তবে ২৯ হ'তে শেষের ৮টি আয়াত মাক্কী। কালবী ও জাবের ইবনু যায়েদ বলেন, সূরাটি মক্কা ও মদীনার মাঝে নাযিল হয়। মুক্বাতিল বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর সর্বপ্রথম এই সূরাটি নাযিল হয়'। সূরাটির প্রথমাংশ মদীনায় ও শেষাংশ মক্কায় নাযিল হয়। সম্ভবতঃ একারণে ইবনু মাস'ঊদ, যাহহাক প্রমুখ সূরাটিকে মাক্কী বলেছেন (কুরতুবী)।]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। — وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ①

(২) যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় — الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ②

(৩) এবং যখন লোকদের মেপে দেয়, বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়। — وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ③

(৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? — أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ④

(৫) সেই মহা দিবসে, — لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑤

(৬) যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে। — يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑥

(৭) কখনই না। নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে। — كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ⑦

(৮) তুমি কি জানো সিজ্জীন কি? — وَمَآ أَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ⑧

(৯) লিপিবদ্ধ খাতা। — كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ⑨

(১০) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য। — وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ⑩

(১১) যারা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। — الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ⑪

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۙ

(১২) অথচ এতে কেউ মিথ্যারোপ করে না সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যতীত।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ؕ

(১৩) যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন বলে, এসব পুরাকালের কাহিনী মাত্র।

كَلَّا بَلْ ٜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

(১৪) কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে।

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ؕ

(১৫) কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে।

ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ؕ

(১৬) অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ؕ

(১৭) অতঃপর তাদের বলা হবে, এটাই তো সেই স্থান, যাতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ؕ

(১৮) কখনই না। নিশ্চয়ই নেককারগণের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়ীনে।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ؕ

(১৯) তুমি কি জানো ইল্লিয়ীন কি?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۙ

(২০) লিপিবদ্ধ খাতা।

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ

(২১) নৈকট্যশীলগণ তা প্রত্যক্ষ করে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۙ

(২২) নিশ্চয়ই নেককারগণ থাকবে জান্নাতে

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۙ

(২৩) উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে।

تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۚ

(২৪) তুমি তাদের চেহারাসমূহে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা দেখতে পাবে।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۙ

(২৫) তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে।

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ؕ

(২৬) তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾

(২৭) আর তাতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

(২৮) এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে পান করবে নৈকট্যশীলগণ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾

(২৯) নিশ্চয়ই যারা পাপী, তারা (দুনিয়ায়) বিশ্বাসীদের উপহাস করত।

وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾

(৩০) যখন তারা তাদের অতিক্রম করত, তখন তাদের প্রতি চোখ টিপে হাসতো।

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾

(৩১) আর যখন তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত।

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾

(৩২) যখন তারা বিশ্বাসীদের দেখত, তখন বলত নিশ্চয়ই ওরা পথভ্রষ্ট।

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) অথচ তারা বিশ্বাসীদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরিত হয়নি।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) পক্ষান্তরে আজকের দিনে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের দেখে হাসবে।

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে।

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) অবিশ্বাসীরা যা করত, তার প্রতিফল তারা পেয়েছে তো?

বিষয়বস্তু :

সূরাটিতে দু'টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এক- মাপে ও ওযনে কমবেশী করার পরিণতি এবং দুই- ইল্লিয়ীন ও সিজ্জীনে নেককার ও বদকারদের আমলনামা সংরক্ষিত হওয়া। প্রথম দু'টিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বড় যুলুম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত বিষয়টি বর্ণনার মাধ্যমে বান্দাকে সাবধান করা হয়েছে যে, তার ভাল-মন্দ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং তা বিশেষ স্থানে সংরক্ষিত হচ্ছে।

শানে নুযূল :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন মদীনাবাসীগণ ছিল মাপে ও ওযনে কম-বেশী করায় সিদ্ধহস্ত (كانوا من أخبث الناس كيلاً)। তখন আল্লাহপাক وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ নাযিল করেন। ফলে তারা বিরত

হয় এবং মাপ ও ওযনে সততা অবলম্বন করে'। তিনি বলেন, فهم من أَوْفَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا 'তারা এখন পর্যন্ত মাপ ও ওযনের সততায় সবার চাইতে সেরা'।[১৪৫]

তাফসীর :

(১) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য'।

আরবী বাকরীতি অনুযায়ী وَيْلٌ অর্থ দুর্ভোগ বা ধ্বংস। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ يَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ- 'দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, যাতে লোকেরা হাসে। তার জন্য দুর্ভোগ, তার জন্য দুর্ভোগ'।[১৪৬] তবে এখানে وَيْلٌ-এর সাথে يَوْمَئِذٍ যোগ হওয়ায় এর অর্থ হবে 'জাহান্নাম'। কেননা ক্বিয়ামতের দিন দুর্ভোগের একমাত্র পরিণাম হ'ল জাহান্নাম। মাপ ও ওযনে ইচ্ছাকৃতভাবে কম-বেশী করে যারা, এটাই হবে তাদের পরকালীন পুরস্কার। মূলতঃ এই পাপেই বিগত যুগে হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে *(হূদ ১১/৮৪-৯৪)*। ঐ ধ্বংসের পুনরাবৃত্তি হওয়া এ যুগে মোটেই অসম্ভব নয়।

আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ করে দাও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে। আমরা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেই না' *(আন'আম ৬/১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً- 'তোমরা মেপে দেয়ার সময় মাপ পূর্ণ করে দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করো। এটাই উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে শুভ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ- 'তোমরা যথার্থ ওযন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওযনে কম দিয়ো না' *(রহমান ৫৫/৯)*।

التَّطْفِيْفُ অর্থ البخس فى المكيال والميزان 'মাপে ও ওযনে কম করা'। এটা দু'ভাবে হ'তে পারে। ১- নেয়ার সময় বেশী নেয়া এবং ২- দেয়ার সময় কম দেওয়া। পরের আয়াতেই এভাবে ব্যাখ্যা এসেছে। التطفيف এর মাদ্দাহ হ'ল الطفيف যার অর্থ الخفيف أو القليل 'হালকা বা নগণ্য'। মাপ ও ওযনে কম-বেশীর দ্বারা চুরির মাধ্যমে সামান্য কিছু অর্জিত হয় বলে এখানে হীনকর অর্থে শব্দটি আনা হয়েছে।

---

১৪৫. নাসাঈ কুবরা হা/১১৬৫৪ 'তাফসীর' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/২২২৩, সনদ ছহীহ।
১৪৬. আহমাদ হা/২০০৬৭, আবুদাঊদ হা/৪৯৯০, তিরমিযী, নাসাঈ; মিশকাত হা/৪৮৩৪।

এই কম-বেশী করাটা কেবল মাপ ও ওযনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি ইবাদত ও মু'আমালাতের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'বলা হয়ে থাকে যে, لكل شئٍ وفاءٌ وتطفيفٌ وقال آخرون: حتى فى الوضوء والصلاة– 'প্রত্যেক বস্তুর পূর্ণমাত্রা ও হ্রাসমাত্রা রয়েছে'। অন্যেরা বলেন, এমনকি ওযূ ও ছালাতের মধ্যেও। এরপর তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর বক্তব্য থেকে দলীল পেশ করেন যে, একদা ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে আছরের জামা'আতে হাযির হতে না দেখে বলেন, طَفَّفْتَ 'তুমি কম পেয়েছ'।[১৪৭] অর্থাৎ তুমি নেকী কম পেয়েছ। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও বান্দার প্রাপ্য হক আদায়ে কম-বেশী করে, সেও এই আয়াতে বর্ণিত ধমকির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাকে مُطَفِّفٌ বা 'কমকারী' বলা হবে।

(২) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ 'যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়'।

এখানে عَلَى النَّاسِ অর্থ ফার্রা, যাজ্জাজ, ইবনু কাছীর প্রমুখ বলেছেন من الناس 'লোকদের থেকে'। ইবনু জারীর বলেছেন عند الناس 'লোকদের নিকট'। দু'টিরই মর্ম কাছাকাছি। অর্থাৎ إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم وافيًا وزائدًا 'যখন তারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়, তখন পুরোপুরি বা বেশী করে নেয়'।

(৩) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 'এবং যখন লোকদের মেপে দেয়, বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়'।

অর্থ كالوا لهم أو وزنوالهم 'তাদের জন্য মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয়'। যেমন বলা হয়, نَصَحْتُكَ অর্থ نَصَحْتُ لَكَ 'আমি তোমাকে উপদেশ দিয়েছি'। এক্ষণে আয়াতের মর্ম দাঁড়ালো, وإذا كالوا للناس او وزنوا لهم ينقصوهم فى حقهم الواجب لهم 'আর যখন তারা লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন তাদের প্রাপ্য ওয়াজিব হক থেকে কম করে দেয়'।

মাপে ও ওযনে কমদানকারীদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ শুনানোর কারণ হ'তে পারে দু'টি। ১- ঐ ব্যক্তি গোপনে অন্যের মাল চুরি করে ও তার প্রাপ্য হক নষ্ট করে। ২- ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র দেওয়া অমূল্য জ্ঞান-সম্পদকে লোভরূপী শয়তানের গোলাম বানায়। জ্ঞান ও বিবেক হ'ল মানুষের প্রতি আল্লাহ্র দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত। আর এজন্যেই মানুষ আশরাফুল মাখলূক্বাত বা সৃষ্টির সেরা। মানুষ যখন তার এই শ্রেষ্ঠ

---

১৪৭. কুরতুবী; মুওয়াত্ত্বা হা/২৯ 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ।

জ্ঞান-সম্পদকে নিকৃষ্ট কাজে ব্যবহার করে, তখন তার জন্য কঠিনতম শাস্তি প্রাপ্য হয়ে যায়। আর সেই শাস্তির কথাই প্রথম আয়াতে শুনানো হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْفَقْرُ وَمَا ظَهَرَتْ فِيْهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْمَوْتُ (أَوْ إِلاَّ ظَهَرَ فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ) وَلاَ طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلاَّ مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ، وَلاَ مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلاَّ حُبِسَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ، أخرجه الديلمى وخرجه البزار بمعناه و مالك من حديث ابن عمر-

‘পাঁচটি বস্তু পাঁচটি বস্তুর কারণে হয়ে থাকে। **এক**- কোন কওম চুক্তিভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের উপরে তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। **দুই**- কেউ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের বাইরের বিধান দিয়ে দেশ শাসন করলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। **তিন**- কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল কাজ বিস্তৃত হ’লে তাদের মধ্যে মৃত্যু অর্থাৎ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। **চার**- কেউ মাপে বা ওযনে কম দিলে তাদের জন্য খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে। **পাঁচ**- কেউ যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়’।[১৪৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত অনুরূপ আরেকটি হাদীছে এসেছে (১) যে জাতির মধ্যে খেয়ানত অর্থাৎ আত্মসাতের ব্যাধি আধিক্য লাভ করে, সে জাতির অন্তরে আল্লাহ শত্রুর ভয় নিক্ষেপ করেন (২) যে জাতির মধ্যে যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, সে জাতির মধ্যে মৃত্যুহার বেড়ে যায় (৩) যে জাতি মাপে ও ওযনে কম দেয়, তাদের রিযিক উঠিয়ে নেওয়া হয়। (৪) যে জাতি অন্যায় বিচার করে, তাদের মধ্যে খুন-খারাবি ব্যাপক হয় (৫) যে জাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়’।[১৪৯]

(৪-৫) أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوْثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ‘তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে?’। ‘সেই মহা দিবসে’।

অর্থাৎ তারা কি ক্বিয়ামতের দিনকে ভয় পায় না এবং তারা কি এটা বিশ্বাস করে না যে, তাদেরকে একদিন এমন এক মহান সত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হ’তে হবে, যিনি তার প্রতিপালক এবং যিনি তার ভিতর-বাহির সবকিছুর খবর রাখেন।

---

১৪৮. দায়লামী হা/২৯৭৮; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৯৯২, সনদ হাসান; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭৬৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৪০।

১৪৯. মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৫৩৭০ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়, ৭ অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১০৬-১০৭।

এখানে أَلَا يَظُنُّ 'তারা কি ধারণা করে না'? কথাটি إنكار وتعجب তথা অস্বীকার ও বিস্ময়বোধক হিসাবে এসেছে। এখানে ظن বা ধারণা অর্থ يقين বা বিশ্বাস। কেননা তারা যদি ক্বিয়ামতে সত্যিকারের দৃঢ় বিশ্বাসী হ'ত, তাহ'লে কখনোই মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার মত নিকৃষ্টতম পাপ তারা করতে পারত না।

উমাইয়া বংশের দোর্দণ্ড প্রতাপ খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান (৬৫-৮৬/৬৮৫-৭০৫ খৃঃ) বলেন, তার সম্মুখে একদিন জনৈক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কি সূরা মুত্বাফফেফীন পড়েছেন? সেখানে আল্লাহ কি কঠিন ধমকি দিয়েছেন? আপনি যে মুসলমানদের মাল-সম্পদ বিনা মাপে ও বিনা ওযনে নিয়ে থাকেন فما ظنك بنفسك 'এবিষয়ে আপনার নিজের ব্যাপারে কি ধারণা?' *(কুরতুবী)*। বেদুঈনের এই বক্তব্যে যেমন খলীফার বিরুদ্ধে ইনকার ও বিস্ময় ফুঠে উঠেছে, অত্র আয়াতেও তেমনি মাপ ও ওযনে কম দানকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ইনকার ও বিস্ময় ফুঠে উঠেছে।

উক্ত ঘটনার মধ্যে আধুনিক যুগের রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনেতাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের শুধু নয়, তৎকালীন সময়ে সমগ্র বিশ্বের অন্যতম মহাশক্তিধর রাষ্ট্রনেতার মুখের উপর একজন সাধারণ বেদুঈন যদি এরূপ কঠোর বাক্য বিনা দ্বিধায় প্রয়োগ করতে পারে এবং খলীফা যদি তা বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করতে পারেন ও বিনা দ্বিধায় তা অন্যকে বলতে পারেন, তাহ'লে আজকের বিশ্বের তথাকথিত গণতন্ত্রী ও উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনেতাগণ হক কথা বরদাশত করতে পারেন না কেন? এইসব গণতন্ত্রীদের কাছে যাওয়া দূরে থাক, তাদের সাথে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ কি কোন মযলূমের বা কোন দুর্বলের আছে? অথচ ভারতবর্ষের বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মত শাসক (১৬০৫-২৭ খৃঃ) সেযুগে তাঁর বাসকক্ষ হ'তে প্রাসাদের বহিরাঙ্গন পর্যন্ত শিকল টাঙিয়ে রাখতেন। যাতে রাতে-দিনে যখন খুশী যেকোন নাগরিক শিকল নাড়া দিয়ে ঘণ্টা বাজালে তিনি জানতে পারেন ও তার সমস্যার কথা তিনি শুনতে পারেন।

বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীর (১০৬৮-১১১৮/১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ) জানতে পারলেন যে, তার এক গরীব ব্রাহ্মণ প্রজার সুন্দরী মেয়েকে তার এক সেনাপতি যবরদস্তি বিয়ে করতে চায়। আলমগীর উক্ত বিয়ের আগের রাতে ছদ্মবেশে একাকী উক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আত্মগোপন করে থাকেন ও সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দেন। পরদিন সকালে বিয়ে করতে আসা বরের সম্মুখে উলঙ্গ তরবারি হাতে যমদূতের মত হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। রাজধানী দিল্লী থেকে বহু দূরে পাঞ্জাবের অজ পাড়াগাঁয়ে এই হিন্দুপল্লীতে স্বয়ং বাদশাহকে দেখে ভয়ে ও আতংকে সেনাপতি সেখানে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এই ঘটনায় ঐ এলাকার হিন্দু জনসাধারণ বাদশাহকে দেবতা জ্ঞান করে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে এবং এলাকার নাম পাল্টে 'আলমগীরগঞ্জ' রাখে। যে কক্ষে তিনি ইবাদতে কাটান, সে কক্ষে আজও কেউ জুতা পায়ে প্রবেশ করে না। কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণকে

বুকে জড়িয়ে ধরে সম্রাট সেদিন বলেছিলেন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। আল্লাহ সকল ক্ষমতার মালিক।[১৫০]

এটা ছিল কুরআনের বরকত। কেননা কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রক্ষমতা আল্লাহ্‌র দান। আর উক্ত ক্ষমতায় আসীন কোন মুসলমান কখনোই কোন নাগরিকের অধিকার হরণ বা ক্ষুন্ন করতে পারেন না। তিনি তার কোন নাগরিককে কখনোই তার 'গোলাম' (كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ) ভাবতে পারেন না। বরং তাকে সব সময় 'আল্লাহ্‌ওয়ালা' (رَبَّانِيِّيْنَ) হয়ে থাকতে হয় *(আলে ইমরান ৩/৭৯)*। বাদশাহগণ যদি আল্লাহভীরু হয়ে প্রজার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারেন, তাহ'লে ব্যবসায়ীগণ কেন ক্রেতাসাধারণের প্রাপ্য হক আদায় করতে পারেন না?

তারা কি ভাবেন না যে, তাদেরকে একদিন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াতে হবে? যেদিন মানুষের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাদের হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ও দেহচর্ম সাক্ষ্য প্রদান করবে। সেদিন অবস্থাটা কেমন হবে? *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫; হামীম সাজদাহ ৪১/২০-২১)*।

(৬) يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে'।

এখানে يومَ শব্দের শেষাক্ষর যবরযুক্ত হয়েছে উহ্য ক্রিয়ার কর্ম (مفعول به) হিসাবে। মূলে ছিল يُبعثون يومَ يقومُ الناسُ। তবে পূর্বের আয়াত لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ থেকে بدل হওয়াটাও সিদ্ধ আছে। তখন يَوْمَ শব্দটি مبنى হবে এবং শেষাক্ষরে যের-এর পরিবর্তে যবর হবে (منصوب بنزع خافض), যেটা এখন হয়েছে। সূরার শুরু থেকে এপর্যন্ত এসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ক্বিরাআত বন্ধ হয়ে যেত এবং তিনি ক্রন্দন করতেন *(কুরতুবী)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِى رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ ক্বিয়ামতের দিন ঘামে কারু কারু কানের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে'।[১৫১]

মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُوْنَ قِيْدَ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ قَالَ: فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُوْنُوْنَ فِى الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ

---

১৫০. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, ইতিহাসের ইতিহাস (ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ ২০০৪) ১৬৬ পৃঃ।
১৫১. বুখারী হা/৪৯৩৮; মুসলিম হা/২৮৬২।

–إِلْجَامًا ‘ঐদিন সূর্য এক মাইল বা দু’মাইল মাথার উপরে চলে আসবে। অতঃপর সূর্যতাপে তাদের দেহ গলে যাবে। তাতে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী কারু হাঁটু পর্যন্ত, কারু কোমর পর্যন্ত, কারু পায়ের টাখনু পর্যন্ত, কারু বুক পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।[১৫২] যেমন ব্যাঙ পানিতে হাবুডুবু খায়। এছাড়া তাদের পানীয় হবে দেহনিঃসৃত রক্ত ও পুঁজ..’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩৬)*।

এদেরকে আল্লাহ তাঁর শত্রু হিসাবে অভিহিত করে বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ‘যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদের জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন দলে’ *(হামীম সাজদাহ ৪১/১৯)*।

উল্লেখ্য যে, ক্বিয়ামতের একটি দিন হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান *(মা‘আরেজ ৭০/৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ এটা কাফিরদের উপর করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন চিরস্থায়ী আযাবের জন্য’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। কুরতুবী বলেন, আরবরা কঠিন দিনগুলিকে দীর্ঘ এবং আনন্দের দিনগুলিকে সংক্ষিপ্ত বলে থাকে’ *(কুরতুবী, মা‘আরেজ ৭০/৪)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِيْنَ أَلْفِ سَنَةٍ يُهَوَّنُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ ‘মানুষ সেদিন আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে। যে দিনটি হবে ৫০ হাযার বছরের অর্ধেকের সমান। যা মুমিনদের উপর সহজ করা হবে এমনভাবে যে, অস্তায়মান সূর্য যেমন অস্ত যায়’।[১৫৩]

পক্ষান্তরে সৎ ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ‘সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী ক্বিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে’।[১৫৪] তিনি বলেন, التُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ ‘ব্যবসায়ীরা ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে পাপাচারী হিসাবে। কেবল সেইসব ব্যবসায়ী ব্যতীত, যারা আল্লাহভীরু, সৎকর্মশীল ও সত্যবাদী’।[১৫৫]

---

১৫২. তিরমিযী হা/২৪২১; মুসলিম হা/২৮৬৪; মিশকাত হা/৫৫৪০ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়-২৮, ‘হাশর’ অনুচ্ছেদ-২।

১৫৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৩৩৩; মুসনাদে আবু ইয়া‘লা হা/৬০২৫; ছহীহাহ হা/২৮১৭।

১৫৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৭৪; ছহীহাহ হা/৩৪৫৩, ছহীহ তারগীব হা/১৭৮২।

১৫৫. তিরমিযী হা/১২১০, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৯৯; ছহীহাহ হা/৯৯৪, ১৪৫৮।

ক্বিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 'আল্লাহ হ'লেন মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ'তে আলোর দিকে নিয়ে যান' *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*। এতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত মুমিনরাই আল্লাহ্‌র অলী বা বন্ধু। অতঃপর তিনি বলেন, أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ 'মনে রেখ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(ইউনুস ১০/৬২)*। দুর্ভাগ্য অত্র আয়াতটি এখন বিভিন্ন পীরের মাযারে বড় বড় হরফে শোভা পাচ্ছে। এর দ্বারা ভক্তদের বুঝানো হচ্ছে যে, পীর ছাহেব মরেন নি। বরং তিনি কবরে জীবিত আছেন। তিনি প্রার্থীদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন ও তাদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ এগুলি পরিষ্কারভাবে শিরক। আর যেখানে শিরকের মত মহাপাপ হয় এবং যেসব পীরেরা ভক্তদের এসব আক্বীদা শিখিয়ে থাকেন, তারা কিভাবে আউলিয়া বা আল্লাহ্‌র বন্ধু হন? বরং তারাতো শয়তানের বন্ধু।

এক্ষণে আল্লাহ্‌র বন্ধু কারা? এর ব্যাখায় পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُوْنَ– 'যারা ঈমান আনে এবং পাপ থেকে বিরত হয়' *(ইউনুস ১০/৬৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُوْنَ، أَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ– 'যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। 'অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে' *(রূম ৩০/১৪-১৫)*। অতএব সৎ ব্যবসায়ী মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বন্ধু। পক্ষান্তরে যারা অসৎ ব্যবসায়ী, তারা আল্লাহ্‌র শত্রু।

كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنٌ، كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ **(৭-৯)**
'কখনোই না। নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে'। 'তুমি কি জানো সিজ্জীন কি?' 'লিপিবদ্ধ খাতা'।

كَلاَّ অস্বীকার ও ধিক্কার সূচক অব্যয় (حرف ردع وزجر)। অর্থাৎ কখনোই না। তবে كَلاَّ অর্থ حقًّا হ'তে পারে।

অর্থাৎ পাপাচারীরা মাপে ও ওযনে কম দিয়ে লাভবান হয়েছে বলে যা মনে করে এবং আখেরাতে জওয়াবদিহিতাকে যে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তা কখনোই হবার নয়। বরং সঠিক কথা এই যে, এইসব পাপীদের আমলনামা অবশ্যই সংরক্ষিত হচ্ছে সিজ্জীনে। এই সিজ্জীন হ'ল তাদের কর্মকাণ্ডের রেকর্ড বুক। তাদের সকল অন্যায় কথা ও কাজের হিসাব যথাযথভাবে সেখানে রক্ষিত হচ্ছে। অতঃপর তার মৃত্যুর সাথে সাথে সেখানে

মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তা খোলা হবে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ– 'যে ব্যক্তি এক সরিষাদানা পরিমাণ নেকী করবে, সেটাও সেদিন দেখা হবে এবং যে ব্যক্তি এক সরিষাদানা পরিমাণ দুষ্কর্ম করবে, সেটাও সেদিন দেখা হবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*।

سِجِّيْنٍ শব্দটি سِجْنٌ থেকে এসেছে। যার অর্থ সংকীর্ণ স্থান বা কয়েদখানা। সিজ্জীন কি এবং কোথায়- এ বিষয়ে ত্বাবারী, বাগাভী প্রমুখ বিদ্বানগণ অনেকগুলি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। যেমন (ক) সেটি হ'ল সাত তবক যমীনের নীচে। সেখানে ইবলীস ও তার সন্তানেরা বসবাস করে। (খ) সিজ্জীন হ'ল সাত তবক যমীনের নীচে একটি কালো পাথরের নাম, যাতে প্রত্যেক কাফেরের নাম লেখা আছে। অবিশ্বাসীদের রূহগুলো সেখানে গিয়ে মিশবে। (গ) সিজ্জীন হ'ল জাহান্নামের একটি কূয়ার নাম ইত্যাদি *(কুরতুবী)*। এগুলি সবই ইস্রাঈলিয়াত মাত্র। যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ বিষয়ে একমাত্র ব্যাখ্যা হ'ল সেটাই যা আল্লাহ দিয়েছেন। অর্থাৎ সিজ্জীন হ'ল كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ 'লিপিবদ্ধ খাতা' বা অবিশ্বাসীদের আমলনামা। তবে ইবনু কাছীর বলেন, এটি হ'ল, كِتَابُ الْفُجَّارِ-এর ব্যাখ্যা। سِجِّيْنٌ-এর ব্যাখ্যা নয়'। যদিও এ ব্যাপারে ইবনু কাছীরের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। তাফসীরে কুরতুবীর টীকাকার বলেন, সিজ্জীনের ব্যাখ্যা 'লিপিবদ্ধ খাতা' ব্যতীত আর সবই বাতিল।[১৫৬] মোদ্দাকথা, পাপাচারীদের আমলনামা সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীনে এবং সেখানেই কাফেরদের রূহ সমূহ জমা হবে।

(৮) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنٌ ؟ 'তুমি কি জানো সিজ্জীন কি?' একথা বলে সিজ্জীনের ভয়ংকর বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন ক্বিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে اَلْقَارِعَةُ، مَا الْقَارِعَة، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ؟ 'করাঘাতকারী' 'করাঘাতকারী কি'? 'তুমি কি জানো করাঘাতকারী কি?' *(ক্বারে'আহ ১০১/১-৩)*। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে সিজ্জীনে কারু আমল লেখার নির্দেশ হ'লে বুঝতে হবে যে, সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী। নিঃসন্দেহে তা ভয়ংকর বিষয়।

(৯) كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ 'লিপিবদ্ধ খাতা'। مَرْقُوْمٌ এসেছে رقم থেকে। যার অর্থ লেখা। যাহহাক বলেন, مرقوم-এর অর্থ مختوم অর্থাৎ মোহরাংকিত। জীবনের শেষ অবধি মানুষের আমল লিখিত হয়। অতঃপর মৃত্যুর সাথে সাথে লেখা বন্ধ হয়ে যায় এবং উক্ত খাতা মোহর করে দেয়া হয়। তাতে কোনরূপ কম-বেশী করার সুযোগ থাকে না। অবশ্য

১৫৬. কুরতুবী হা/৬২৭৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

তিন প্রকারের ছাদাক্বার নেকী তার আমলনামায় যুক্ত হ'তে থাকে, যে বিষয়ে ছহীহ মুসলিমে স্পষ্ট হাদীছ এসেছে।[১৫৭]

বস্তুতঃ মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার কর্ম হারিয়ে যায় না। বরং পৃথিবীতে এক পার্শ্বে রাত্রির অন্ধকার নেমে এলেও সূর্য তার আলোসহ যেমন পৃথিবীর অপর পার্শ্বে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে মানুষের জীবনে মৃত্যুর অন্ধকার নেমে এলেও তার রূহ তার আমলনামাসহ ইল্লিয়ীন অথবা সিজ্জীনে অবস্থান করে আল্লাহ্র হুকুমে। ক্বিয়ামতের দিন যা বিচারের জন্য পেশ করা হয়। *সুবহানাল্লা-হি ওয়াবেহামদিহী, সুবহানাল্লা-হিল 'আযীম*।

(১০) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ 'সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য'।

(১১) الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ 'যারা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে'। পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে যে, মিথ্যারোপকারী তারাই যারা ক্বিয়ামত দিবসকে মিথ্যা মনে করে এবং এটাকে অসম্ভব বিষয় বলে থাকে।

يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থ يوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد 'হিসাব গ্রহণ, বদলা প্রদান ও বান্দাদের বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়ছালা করার দিন'। এক কথায় 'বিচার দিবস'। সূরা ফাতিহাতে আল্লাহপাক নিজেকে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 'বিচার দিবসের মালিক' বলেছেন।

(১২) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ 'অথচ এতে কেউ মিথ্যারোপ করে না, সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যতীত'।

অর্থ معتدٍ فى أفعاله وأثيمٌ فى أقواله 'কাজে সীমালংঘনকারী ও কথায় পাপাচারী'। عَدَا يَعْدُوْ عَدْوًا অর্থ দৌড়ানো, অতিক্রম করা। সেখান থেকে اعتدى অতঃপর معتدى অর্থ সীমালংঘনকারী। আয়াতে مضاف اليه হওয়ার কারণে শেষের ى বিলুপ্ত হয়ে مُعْتَدٍ হয়েছে। অর্থ معتدى عن الحق 'সত্য লংঘনকারী'। আর সীমালংঘনকারী ও পাপাচারী মূলতঃ তারাই হয়ে থাকে, যারা ক্বিয়ামতকে মিথ্যা বলে এবং আখেরাতে জওয়াবদিহিতাকে অস্বীকার করে।

অলীদ বিন মুগীরাহ, আবু জাহল প্রমুখ মুশরিক নেতাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াত নাযিল হয়। তাদের চরিত্রের প্রধান দু'টি দিক সম্পর্কে مُعْتَدٍ ও أَثِيْمٍ দু'টি শব্দে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যুগে যুগে সকল অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের চরিত্র প্রায় একই ধরনের।

---

১৫৭. উক্ত তিনটি আমল হ'ল, (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) উপকারী ইল্ম ও (৩) সুসন্তানের দো'আ; মুসলিম হা/১৬৩১ 'অছিয়ত' অধ্যায়; মিশকাত হা/২০৩ 'ইলম' অধ্যায়।

(১৩) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ‘যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন বলে, এসব পুরাকালের কাহিনী মাত্র’।

অর্থাৎ ঐ অবিশ্বাসীর নিকটে যখন আল্লাহ্র কালাম পাঠ করে শুনানো হয়, তখন সে এগুলি তাচ্ছিল্য করে বলে, ছাড়ো! ওসব হ’ল পুরানো দিনের কাহিনী মাত্র। সে আল্লাহ্র কালাম সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে এবং মুখে যা ইচ্ছা তাই বলে। কুরআন সম্পর্কে কাফেরদের এই উক্তি ৯টি সূরায় ৯টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১৫৮] বস্তুতঃ এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাফেরদের দেওয়া ১৫টি অপবাদের অন্যতম। أساطير একবচনে أسطورة বা إسطارة অর্থ উপকথা বা কল্পকাহিনী *(কুরতুবী)*। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চায় যে, কুরআন মুহাম্মাদ-এর বানোয়াট কালাম। এটি আল্লাহ্র কালাম ও তাঁর ‘অহি’ নয়।

(১৪) كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ‘কখনোই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে’।

এখানে بَلْ-এর পরে সামান্য সাকতা বা বিরতি রয়েছে। তবে সাকতা করা হৌক বা না হৌক তাতে অর্থের কোন হেরফের হবে না।

অর্থাৎ তারা যা বলছে, তা কখনোই নয়। কুরআন কখনোই কোন উপকথা নয়। বরং পাপাচার ও মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের হৃদয়ে কালিমা জমে গেছে। যেমন লোহার উপরে মরিচা ধরে যায়। মিথ্যার কালিমা তাদেরকে ঈমানের নূর হ’তে বঞ্চিত করেছে। জণ্ডিসের রোগী যেমন সবকিছু হলুদ দেখে, সাপে কাটা রোগী যেমন তিতাকে মিঠা বলে, এইসব বস্তুবাদী নাস্তিকরা তেমনি মিথ্যাকে সত্য বলে ও সত্যকে মিথ্যা বলে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে শেষ করে দেয়, কুফর, নিফাক ও ফাসেকীর কলুষ-কালিমা তেমনি এদের ঈমান গ্রহণের সহজাত যোগ্যতাকে অকেজো করে দেয়। কুরআন নাযিলের সময়কাল হ’তে এযাবত এর ব্যত্যয় ঘটেনি। আল্লাহ বলেন, بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ– ‘হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করে ও পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/৮১)*। এটাই হ’ল অন্তরে মরিচা। وهو الذنب على الذنب حتى يسوِّد القلبَ ‘এটা হ’ল পাপের উপর পাপ, যা অন্তরকে কালিমাচ্ছন্ন করে’।

---

১৫৮. আন‘আম ৬/২৫; আনফাল ৮/৩১; নাহল ১৬/২৪; মুমিনূন ২৩/৮৩; ফুরক্বান ২৫/৫; নামল ২৭/৬৮; আহক্বাফ ৪৬/১৭; ক্বলম ৬৮/১৫; মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৩।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللهُ (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)-

'বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে পাপ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেয় ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে, তখন অন্তরের মরিচা ছাফ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে পাপের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে মরিচা বৃদ্ধি পায়। এমনকি মরিচা তার অন্তরের উপরে জয়লাভ করে (অর্থাৎ সে আর তওবা করে ফিরে আসে না)। এটাই হ'ল সেই মরিচা যে বিষয়ে আল্লাহ (উপরোক্ত আয়াতে) বর্ণনা করেছেন'।[১৫৯] হাসান বাছরী বলেন, هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت- 'এটি পাপের উপরে পাপ, যা অবশেষে হৃদয়কে অন্ধ করে ফেলে। অতঃপর অন্তর মরে যায়'। একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বিদ্বানগণ *(ইবনু কাছীর)*।

رَانَ يَرِيْنُ رَيْنًا رُيُوْنًا অর্থ 'জয়লাভ করল'। যেমন বলা যে, رانت الخمر على عقله 'মদ তার জ্ঞানের উপর জয়লাভ করেছে'। ران هواه على قلبه 'প্রবৃত্তি তার হৃদয়ের উপর বিজয়ী হয়েছে'। যাজ্জাজ বলেন, الرَّين وهو كالصَّدَأ يُغَشِّى القلب كَالْغَيْمِ الرقيق 'এটি হ'ল মরিচার মত, যা পাতলা মেঘের ন্যায় হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ মরিচা যেমন লোহার উপরে বৃদ্ধি পেয়ে লোহার শক্তি ও ঔজ্জ্বল্যকে বিনষ্ট করে। তেমনিভাবে পাপের কালিমা বৃদ্ধি পেয়ে অন্তরের মধ্যকার ঈমানের জ্যোতিকে ঢেকে ফেলে। যা মুমিনের ভিতর ও বাইরের শক্তি ও সৌন্দর্য বিনষ্ট করে।

(১৫) كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ 'কখনোই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে'।

كَلاَّ অর্থ لا অর্থাৎ অন্তরে মরিচা ধরার কারণে তারা কখনোই কোন নেকী অর্জন করতে পারে না। ফলে ক্বিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে তারা বঞ্চিত হবে। كَلاَّ অর্থ حقًّا হতে পারে। অর্থাৎ অন্তরে মরিচা ধরার কারণে তারা অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন তাদের প্রভুর দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।

---

১৫৯. তিরমিযী হা/৩৩৩৪; নাসাঈ হা/১১৬৫৮; ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায় إن المؤمن এসেছে; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; মিশকাত হা/২৩৪২ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।

حَجَبَ يَحْجُبُ حَجْبًا وحِجَابًا 'পর্দা করা'। مَحْجُوْبٌ অর্থ ممنوع 'নিষিদ্ধ'। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের জন্য ঐদিন আল্লাহ্র দর্শন লাভ নিষিদ্ধ হবে'। যাজ্জাজ বলেন, 'এই আয়াতে দলীল রয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখা যাবে। যদি সেটা না হয়, তাহ'লে এই আয়াতের কোন ফায়েদা থাকেনা। আর কাফেরদের মর্যাদারও কোন ঘাটতি বুঝানো যায় না' *(কুরতুবী)*।

ক্বিয়ামতের দিন সত্যিকারের মুমিনগণ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবে। যেভাবে মেঘমুক্ত রাতে পূর্ণিমার চাঁদকে স্পষ্ট দেখা যায়। এ বিষয়ে বহু ছহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৬০] যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'লোকেরা জিজ্ঞেস করল, يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ، هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا لاَ. قَالَ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا لاَ. فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا- 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে ক্বিয়ামতের দিন দেখতে পাব? জবাবে তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়? লোকেরা বলল, না। তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমদের কোন অসুবিধা হয়? লোকেরা বলল, না। তখন তিনি বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, ঐ দু'টিকে দেখতে তোমাদের যদি কিছু সমস্যাও হয়, তবু তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে সেদিন সে সমস্যাটুকুও হবে না'।[১৬১]

হযরত ছোহায়েব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَرْفَعُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُوْنَ إِلَى وَجْهِ اللهِ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلاَ (لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ)- 'জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আরও কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি? এবং জাহান্নাম থেকে আমাদের নাজাত দেননি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর নূরের পর্দা উন্মোচন করে দিবেন।

---

১৬০. বুখারী হা/৫৫৪, মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫-৫৬ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮, 'আল্লাহকে দেখা' অনুচ্ছেদ-৬।

১৬১. বুখারী হা/৪৫৮১, মুসলিম হা/১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৫৫, বঙ্গানুবাদ হা/৫৩২১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮, 'হিসাব ও মীযান' অনুচ্ছেদ-৩।

তখন তারা আল্লাহ্র চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এভাবে তাদের প্রভুকে চাক্ষুষ দেখার চাইতে প্রিয়তর কোন বস্তু তাদেরকে এযাবৎ দেওয়া হয়নি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 'যারা উত্তম কাজ করেছে, তাদের প্রতিদান হ'ল জান্নাত এবং তার চাইতে কিছু অতিরিক্ত'।[১৬২] অন্য আয়াতেও এর দলীল এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'যেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে'। 'তাদের প্রতিপালকের দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*।

বিশ্বাসে ও কর্মে সর্বাবস্থায় যারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর নাযিলকৃত বিধানের উপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেটাই সেদিন তাদের চোখের দীপ্তি হিসাবে প্রতিভাত হবে এবং তার প্রেমাস্পদ আল্লাহকে সামনাসামনি দেখে তার চক্ষু জুড়াবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ ও তার বিধানসমূহের ব্যাপারে অবিশ্বাসী বা কপট বিশ্বাসী ছিল কিংবা দুর্বল বিশ্বাসী বা সুবিধাবাদী ছিল, দেখেও না দেখার ভান করেছিল। পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে কিংবা এ যুগে অচল বলে বাতিল করেছিল অথবা নানা অপব্যাখ্যার আড়ালে সত্যকে লুকাতে চেয়েছিল। এসবই সেদিন তাদের চোখের অন্ধত্ব হিসাবে দেখা দিবে। যেটা অন্য আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। যেমন, مَنْ كَانَ فِي هَـــذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيْلاً 'যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল, সে ব্যক্তি পরকালেও হবে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭২)*। এখানে ইহকালে অন্ধ বলতে হৃদয়ের অন্ধ বুঝানো হয়েছে, চর্মচক্ষুর অন্ধ নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى- قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا- قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى- 'যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ, তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়'। 'সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো ছিলাম চক্ষুষ্মান'। 'তিনি বলবেন, এরূপই। আমাদের আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিল। কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। অতএব সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হ'লে' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪-২৬)*।

বস্তুতঃ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পারাটাই হবে মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার ও সবচেয়ে বড় আনন্দঘন মুহূর্ত। সেকারণ ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন, أما والله لو لم يُوْقَنْ محمدَ بنَ ادريسَ أنه يرى ربه فى المعاد لما عبده فى

---

১৬২. ইউনুস ১০/২৬; মুসলিম হা/১৮১, মিশকাত হা/৫৬৫৬, বঙ্গানুবাদ হা/৫৪৯৩ 'আল্লাহকে দর্শন' অনুচ্ছেদ।

–الدنيا 'আল্লাহ্‌র কসম! যদি মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস (শাফেঈ)-এর নিকট এটা স্পষ্ট না হ'ত যে, সে তার প্রভুকে আখেরাতে দেখতে পাবে, তাহ'লে সে কখনো দুনিয়াতে তার ইবাদত করতো না' *(কুরতুবী)*।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা বুঝা যায় যে, মুমিনগণ আল্লাহকে ক্বিয়ামতের ময়দানে দেখবে। অতঃপর জান্নাতে গিয়ে পুনরায় দেখবে *(ইবনু কাছীর)*। ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ স্বীয় পায়ের নলা বের করে দিয়ে সেখানে সবাইকে সিজদা করতে বলবেন। ঈমানদারগণ সিজদা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মুনাফিক ও কাফিরগণ ব্যর্থ হবে *(ক্বলম ৬৮/৪২-৪৩)*। হাসান বাছরী বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ স্বীয় পর্দা খুলে দিবেন, তখন মুমিন ও কাফির সাবই সেদিকে তাকাবে। কিন্তু মুমিনরা দেখবে ও কাফিররা বঞ্চিত হবে' *(ইবনু কাছীর)*।

উল্লেখ্য যে, মু'তাযেলী মুফাসসিরগণ আল্লাহ দর্শনে বিশ্বাস করেন না। ফলে তারা অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেন, اى عن كرامته ورحمته ممنوعون 'তারা আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত হবে' *(কুরতুবী)*। এ ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদীছের বিরোধী। যা গ্রহণযোগ্য নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে কুরতুবী নিজেই এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা বাতিল *(আল-মাগরাবী, আল-মুফাসসিরূন ১/৪৪৫)*। তাঁরা দলীল দেন আন'আম ১০৩ আয়াত দিয়ে। -لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (চক্ষুসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করে না, বরং তিনিই চক্ষুসমূহকে পরিবেষ্টন করেন' *(আন'আম ৬/১০৩)*। অথচ এ আয়াত তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। কেননা এখানে 'পরিবেষ্টন' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু 'দর্শন'কে নিষিদ্ধ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এর মাধ্যমে দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা অসম্ভব বুঝানো হয়েছে। যেমন মূসা (আঃ) দেখতে পাননি। কিন্তু আখেরাতের বিষয়টি আলাদা।

(১৬-১৭) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ، ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ 'অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে'। 'অতঃপর তাদের বলা হবে, এটাই তো সেই স্থান, যাতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে'।

صَلِيَ صَلًى وَصِلًى صَلِيًّا النَّارَ অর্থ احترق بها وفيها 'আগুনে জ্বলা'। সেখান থেকে اسم فاعل হ'ল صَالٍ বহুবচনে صَالِيُوْنَ অতঃপর ي বিলুপ্ত করে হয়েছে صَالُوْنَ যার উপরে لام تاكيد এসেছে। অতঃপর পরবর্তী শব্দের প্রতি إضافت-এর কারণে نون جمع বিলুপ্ত হয়ে لَصَالُوا الْجَحِيْمِ হয়েছে। অর্থ 'তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে'। এখানে لَ ও إِنَّ দু'টি তাকীদপূর্ণ অব্যয় আনা হয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহকে দেখার মহা সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হওয়ার পর তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে এবং সেখান থেকে তারা আর বের হতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَن يَخْرُجُوْا مِنْهَا أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ– 'পক্ষান্তরে যারা পাপাচারী, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে তার স্বাদ আস্বাদন কর' *(সাজদাহ ৩২/২০)*।

এখানে দুই আয়াতে দুই রকম আযাবের কথা এসেছে। এক- জাহান্নামের দৈহিক শাস্তি। দুই- তারা যে মিথ্যারোপ করেছিল, সে বিষয়ে ধিক্কার ও বিদ্রুপের মানসিক শাস্তি।

তাদের আযাবের ধরন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ 'যখন তাদের চামড়াগুলো জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন পুনরায় আমরা তা পাল্টে দেব নতুন চামড়া দিয়ে। যাতে তারা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে' *(নিসা ৪/৫৬)*।

দুনিয়াতে যেমন দুষ্টু লোকদের স্তরভেদ থাকে। আখেরাতে তেমনি থাকবে। সেখানে মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে *(নিসা ৪/১৪৫)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এই আয়াত বা এটির ন্যায় অন্য আয়াত সমূহে আল্লাহ কাফেরদের দু'টি আযাব একত্রে বর্ণনা করেছেন। একটি হ'ল আল্লাহকে দেখতে না পাওয়ার আযাব (عذاب الحجاب), অন্যটি হ'ল জাহান্নামের আযাব (عذاب النار)। দেখতে না পাওয়ার আযাব হবে তাদের অন্তরে ও আত্মায় এবং দেহের আযাব হবে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে। এর বিপরীত তিনি মুমিনদের জন্য দু'টি পুরস্কার দিবেন। এক- আল্লাহকে দেখার পুরস্কার এবং দুই- জান্নাতে সুখ-সম্ভারের পুরস্কার' *(ক্বাসেমী)*। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত সৌভাগ্যের অধিকারী করুন -আমীন!

বদকারদের শাস্তি বর্ণনার পর এক্ষণে নেককারদের আপ্যায়নের বর্ণনা শুরু হচ্ছে (১৮-২৮)।-

(১৮-২১) كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ، كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ 'কখনই না। নিশ্চয়ই নেককারগণের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়ীনে'। 'তুমি জানো ইল্লিয়ীন কি?' 'লিপিবদ্ধ খাতা'। 'নৈকট্যশীলগণ তা প্রত্যক্ষ করে'। এটি পূর্বে বর্ণিত كِتَابَ الْفُجَّارِ-এর বিপরীত।

৭ হ'তে ১৭ পর্যন্ত ১১টি আয়াতে বদকার লোকদের পরকালীন শাস্তি বর্ণনার পরে এক্ষণে ১৮ হ'তে ২৮ পর্যন্ত ১১টি আয়াতে নেককার লোকদের পারলৌকিক পুরস্কারের বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

كَلَّا অর্থাৎ নেককার ব্যক্তিগণ কখনোই বদকারদের মত নয়। দুনিয়াতে তারা ঈমানের বরকতে উন্নত চরিত্র ও উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিল। আখেরাতেও তাদের আমলনামা সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থানে থাকবে।

عِلِّيِّيْنَ এসেছে علو থেকে। যার অর্থ উচ্চ। যার বিপরীত হ'ল سِجِّيْنٌ যা সর্বনিম্ন স্থানে থাকবে *(ইবনু কাছীর)*। ফার্রা বলেন, عِلِّيِّيْنَ অর্থ উঁচুর উপরে উঁচু। যা সর্বদা বহুবচন হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। এর কোন এক বা দ্বিবচন নেই। এতে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সবক্ষেত্রে বহুবচনের نون جمع আসে। যেমন عشرون، ثلثون বিশ, ত্রিশ ইত্যাদি *(কুরতুবী)*। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিষয়টি মূলত মর্যাদাগত। তবে স্থানগতও হ'তে পারে। যেমন ইবনু আব্বাস, যাহহাক, ক্বাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইল্লিয়ীন হ'ল সাত আসমানের উপরে আরশের নীচে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। যা সকল বস্তুর প্রত্যাবর্তন স্থল। আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত যা অতিক্রম করা যায় না *(কুরতুবী)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَيُوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَيُوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِى الأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ- 'জান্নাতবাসীগণ উপর থেকে পরস্পরের কক্ষ সমূহ দেখতে পাবে বহু দূরে অবস্থিত উজ্জ্বল তারকারাজি ন্যায় পরস্পরের মর্যাদা অনুযায়ী'।[১৬৩] এর দ্বারা ইল্লিয়ীন একটি উচ্চ স্থানের নাম বলে প্রমাণিত হয়।

(১৯) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ 'তুমি কি জানো ইল্লিয়ীন কি?' এর দ্বারা ইল্লিয়ীনের উচ্চমর্যাদা বুঝানো হয়েছে।

(২০) كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ 'লিপিবদ্ধ খাতা'। অর্থাৎ এটি লিপিবদ্ধ। যা পরিবর্তনীয় নয়।

বিদ্বানগণের মতে এটি ইল্লিয়ীনের ব্যাখ্যা নয়। বরং ঈমানদার বান্দাগণের দফতর, যেখানে তাদের নেক আমলসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে *(কুরতুবী)*। উচ্চমর্যাদার কারণে এই দফতরকে 'ইল্লিয়ীন' বলা হয়েছে।

---

১৬৩. মুসলিম হা/২৮৩১; বুখারী হা/৩২৫৬; তিরমিযী হা/৩৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৯৬।

(২১) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ‘নৈকট্যশীলগণ তা প্রত্যক্ষ করে’।

এখানে ‘নৈকট্যশীলগণ’ অর্থ ফেরেশতাগণ এবং বান্দাগণ দু’টিই হ’তে পারে। ‘বান্দাগণ’ অর্থ নিলে সেটি ১৮ আয়াতে বর্ণিত الْأَبْرَار ‘নেককারগণ’ হ’তে পুনরুক্তি হবে *(ক্বাসেমী)*। যারা অটুট আনুগত্য ও অধিক ইবাদতের কারণে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল হয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদাকে আল্লাহ উচ্চ করবেন’ *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। আর তারা এই আমলনামা দেখবেন আল্লাহ্র সান্নিধ্যে বসে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر– ‘নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও নদীতে’। ‘প্রকৃত সম্মানের আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্র সান্নিধ্যে’ *(ক্বামার ৫৪/৫৪-৫৫)*।

অর্থাৎ সকল নৈকট্যশীল ফেরেশতা ও নেককার বান্দারা তা দেখবে ও আনন্দ প্রকাশ করবে। দুনিয়াতে যেমন নিকটজনের ভাল কর্মফলে নিকটজনেরা খুশী হয়। আখেরাতে তেমনি ফেরেশতারা নেককার বান্দাদের সুন্দর কর্মফল ও সুন্দর আমলনামা দেখে মহা খুশী হবে। দুনিয়াতে যেমন নেককার মুমিনদের স্তরভেদ থাকে, আখেরাতেও তেমনি থাকবে। তারা তাদের ঈমান, ইলম ও আমল অনুযায়ী জান্নাতের বিভিন্ন স্তরে স্থান পাবেন এবং তাদের আপ্যায়নও সে ধরনের হবে। যারা আল্লাহ প্রদত্ত ইলম ও চিন্তাশক্তিকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র প্রচারক, ব্যাখ্যাকারী ও প্রতিষ্ঠা দানকারী হওয়ার পিছনে সাধ্যমত সবকিছু ব্যয় করেন, তারা নিশ্চয়ই অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর যারা তাদের অনুসারী হবেন ও সাহায্যকারী হবেন, তারা ক্বিয়ামতের দিন দক্ষিণ সারির অন্তর্ভুক্ত হবেন। সর্বোচ্চ মুমিনদের জান্নাতুল ফেরদৌসে রাখা হবে এবং সেখানে তাদের সর্বোচ্চ আপ্যায়ন করা হবে *(কাহফ ১৮/১০৭; ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৭-৪০)*।

(২২) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ‘নিশ্চয়ই নেককারগণ থাকবে জান্নাতে’।

‘আবরার’ হল ‘ফুজ্জার’-এর বিপরীত এবং ‘নাঈম’ হ’ল ‘জাহীম’-এর বিপরীত। ক্বিয়ামতের দিন আবরার অর্থাৎ নেককার, সত্যবাদী ও আনুগত্যশীল মুমিনগণ নে‘মতপূর্ণ স্থানে থাকবে। আর সেটা হ’ল ‘নাঈম’ বা জান্নাত। যা চিরস্থায়ী নে‘মতে সর্বদা পূর্ণ থাকবে।

(২৩) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُوْنَ ‘উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে’। অর্থাৎ তারা মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসে মুগ্ধ নয়নে জান্নাতের নে‘মতসমূহ দেখতে থাকবে।

(২৪) تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ‘তুমি তাদের চেহারাসমূহে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা দেখতে পাবে’। অর্থাৎ তাদের চেহারায় সর্বদা সজীবতা ও উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে। আর

এটা হবে তাদের অনন্ত সুখ ও প্রাচুর্যের উৎফুল্লতা। যা সুখী ও সচ্ছল লোকদের মাঝে সচরাচর দেখা যায় এবং যার উজ্জ্বলতা তাদের চেহারায় ফুটে ওঠে।

জান্নাতের নে'মত দু'ধরনের হবে। দৈহিক ও মানসিক। দৈহিক নে'মত, যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ثم قرأ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমনসব নে'মতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি, হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি'। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, 'কেউ জানেনা তাদের জন্য তাদের সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ চক্ষুশীতলকারী কত নে'মত লুক্কায়িত রয়েছে'।[১৬৪] আর মানসিক শান্তির নে'মত, যেমন বলা হবে, سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ 'তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখী হও। আর তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর চিরস্থায়ীভাবে' *(যুমার ৩৯/৭৩)*।

(২৫) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ 'তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে'।

পক্ষান্তরে বদকারদের পানীয় হবে তাদের দেহনিঃসৃত ঘাম ও পুঁজ-রক্ত আর উত্তপ্ত পানি *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩৬; নাবা ৭৮/২৫)*। আর থাকবে তিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত 'যাক্কূম' বৃক্ষ *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৫২-৫৪)* এবং বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত শুকনা 'যরী' ঘাস'। যা তাদের ক্ষুধা দূর করবে না এবং তারা তাতে পুষ্ট হবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/৬-৭)*। ইবনু মাস'উদ, ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বলেন, 'রাহীক্ব' হ'ল জান্নাতী শারাবের নাম'। খলীল বলেন, যা হ'ল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও উত্তম' (أصفى الخمر وأجودها)। যা পান করলে দুনিয়ার শারাবের মত তাদের শিরঃপীড়া হবে না বা মাথা ঘুরবে না ও তারা মাতালও হবে না *(ছাফফাত ৩৭/৪৭; ওয়াক্বি'আহ ৫৬/১৯)*। বরং তারা স্থায়ী আনন্দ লাভ করবে।

(২৬) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ 'তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত'। অর্থাৎ জান্নাতীদের জন্য নির্ধারিত শারাবের মোহর হবে মিশকের যা হ'ল সর্বাপেক্ষা সুগন্ধিময়। 'আর এরূপ (মূল্যবান ও সর্বোত্তম) বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ 'এমন সাফল্যের জন্যই পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত' *(ছাফফাত ৩৭/৬১)*।

---

১৬৪. বুখারী হা/৩২৪৪, মুসলিম হা/২৮২৪ মিশকাত হা/৫৬১২; সাজদাহ ৩২/১৭।

اَلتَّنَافُس এসেছে النفيس থেকে। যার অর্থ الشئ النفيس 'সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু'। যা পাওয়ার জন্য মানুষ সর্বদা লালায়িত হয়। এক্ষণে আয়াতের মর্ম দাঁড়াচ্ছে, فليرغب الراغبون بالاستباق إلى طاعة الله تعالى 'এমন বস্তুর প্রতি লোভীদের লালায়িত হওয়া উচিৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করার মাধ্যমে' *(ক্বাসেমী)*।

(২৭) وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيْمٍ 'আর তাতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের'। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, مِزَاجُهُ অর্থ خَلْطُهُ 'মিশ্রণ' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ 'রাহীক্ব' শারাবের সঙ্গে 'তাসনীম' ঝর্ণার পানীয়ের মিশ্রণ থাকবে। আর 'তাসনীম' হ'ল জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ পানীয়, যা অগ্রবর্তী ও আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নৈকট্যশীল বান্দাদের একমাত্র পানীয় হবে। যেমন পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেন,

(২৮) عَيْناً يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ 'এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে পান করবে নৈকট্যশীলগণ'। অর্থাৎ 'তাসনীম' পানীয়ের ঝর্ণাটি আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। তারা কেবল এখান থেকেই পান করবেন। আর مِزَاجُهُ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, দক্ষিণ সারিভুক্ত জান্নাতীদের 'রাহীক্ব' পানীয়ের সাথে সর্বোচ্চ পানীয় 'তাসনীম'-এরও মিশ্রণ থাকবে (يشربها المقربون صِرْفًا وتمزج لاصحاب اليمين مَزَجًا)। যাতে তারাও এর স্বাদ কিছুটা আস্বাদন করতে পারে। ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ, মাসরূক্ব প্রমুখ একথা বলেন *(ইবনু কাছীর)*।

'তাসনীম' অর্থ উচ্চ। উটের পিটের কুঁজোকে 'সিনাম' (سنام) বলা হয় দেহ থেকে উঁচু হওয়ার কারণে। 'তাসনীম' হ'ল জান্নাতের সর্বোচ্চ পানীয়। যার ঝর্ণাধারা আল্লাহ্‌র আরশের নীচ থেকে জান্নাতসমূহের দিকে প্রবাহিত হয়। সর্বোচ্চ প্রশংসিত পানীয় হওয়ার কারণেই এর নাম হয়েছে 'তাসনীম' *(কুরতুবী)*।

উল্লেখ্য যে, এখানে يَشْرَبُ مِنْهَا না বলে يَشْرَبُ بِهَا কেন বলা হ'ল? এর জবাব দু'ভাবে হ'তে পারে। এক- এখানে بِهَا অর্থ مِنْهَا এবং দুই- يَشْرَبُ بِهَا অর্থ يَرْوَى بِهَا 'পরিতৃপ্ত হবে'। শেষের মর্মটাই উত্তম। কেননা অনেক সময় পানি পান করলেও তৃপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু তৃপ্ত হ'লে পান করাটাও বুঝায়।

অতঃপর দুনিয়াতে পাপী ব্যক্তিরা নেককার ব্যক্তিদের সাথে কেমন আচরণ করত এবং পরকালে তার ফলাফল তাদের কেমন হবে, আল্লাহ তার বিবরণ দিচ্ছেন (২৯-৩৬)।-

(২৯) إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ 'নিশ্চয়ই যারা পাপী, তারা (দুনিয়ায়) বিশ্বাসীদের উপহাস করত'।

অর্থাৎ অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী ও গর্বোদ্ধত এইসব পাপিষ্ঠ মুশরিক নেতারা ঈমানদারগণকে দেখে তাচ্ছিল্য ভরে হাসতো ও উপহাস করতো। ঈমানদার বলতে সে সময় 'আম্মার, খাব্বাব, ছোহায়েব, বেলাল প্রমুখ গোলাম ছাহাবীদের বুঝানো হলেও এর অর্থ সকল যুগের সকল ঈমানদার মুসলমানগণ।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আয়াতগুলি মক্কার মুশরিক নেতা অলীদ বিন মুগীরাহ, ওক্ববা ইবনু আবী মু'আইত্ব, 'আছ বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগূছ, 'আছ বিন হেশাম, আবু জাহ্ল ও নযর ইবনুল হারেছ প্রমুখ সম্পর্কে নাযিল হয় *(কুরতুবী)*। এইসব নিকৃষ্টতম শত্রুদের আচরণ রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের সাথে কেমন ছিল, তার বাস্তব বাণীচিত্র ফুটে উঠেছে সূরার শেষ পর্যন্ত বর্ণিত আয়াতগুলিতে। যুগে যুগে খালেছ ইসলামী নেতৃবৃন্দের সাথে মুশরিক নেতাদের আচরণ ঠিক অনুরূপ হবে, সেকথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরআনের খালেছ অনুসারী ঈমানদার নেতৃবৃন্দকে। সাথে সাথে তাদেরকে জান্নাতের বিনিময়ে ধৈর্যধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৩০) وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ 'যখন তারা তাদের অতিক্রম করত, তখন তাদের প্রতি চোখ টিপে হাসতো'। অর্থাৎ তাদের যেতে দেখলে এই সব নেতারা তাচ্ছিল্যভরে কটাক্ষ করত'।

اَلْغَمْزُ অর্থ الإشارة بالعين أو الجفن والحاجب 'চোখ, পলক ও ভ্রু দিয়ে ইঙ্গিত করা' *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ চোখ টিপে হাসা ও কটাক্ষ করা।

(৩১) وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ 'আর যখন তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত'। অর্থাৎ তারা কেবল রাস্তাঘাটেই এরূপ আচরণ করতো না, বরং তারা যখন তাদের বাড়ীতে স্ব স্ব পরিবারের কাছে ফিরে যেত, তখনও এই সব গরীব ও দুর্বল মুসলমানদের নিয়ে হাসাহাসি করতো। তারা বিস্ময় প্রকাশ করতো একথা ভেবে যে, এই সব লোকেরা ইসলামের মধ্যে কি পেয়েছে, যার জন্য তারা বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করছে? মারপিট ও অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করছে। কেউ কেউ জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। তথাপি মুহাম্মাদ ও তার দ্বীনকে ছাড়ছে না। দুনিয়ার কোন মায়া-মহব্বত ও লোভ-লালসা এদেরকে ইসলাম থেকে একচুল নড়াতে পারছে না।

(৩২) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ 'যখন তারা বিশ্বাসীদের দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই ওরা পথভ্রষ্ট'।

অর্থাৎ মুসলমানদের দেখলে তারা বলত যে, এরা সবাই বিভ্রান্ত। কেননা সমাজনেতাদের কাছে প্রকৃত পথ হ'ল সেটাই, যে পথে তারা চলেন বা তাদের বাপ-দাদারা চলেছেন।

যেমন ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তার জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, مَا أُرِيْكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ– ‘আমি যা বুঝি তোমাদেরকে তাই বুঝাই। আর আমি তোমাদের কেবল মঙ্গলের পথই দেখাই’ *(মুমিন ৪০/২৯)*। আজও ইসলাম বিরোধী নেতাকর্মীরা ইসলামী নেতাকর্মীদেরকে সেকথাই বলে থাকে। তারা সর্বদা উপদেশ খয়রাত করেন ও সবাইকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথিত মূল স্রোতে ফিরে আসতে বলেন। অথচ ওটা তো শয়তানী স্রোত। যেখানে দুনিয়াপূজারীদের ভিড়। এদের ভিড়ে অনেক অদূরদর্শী ইসলামী নেতাও ঢুকে পড়েন এবং অন্যদের পরিশুদ্ধ করার নামে অবশেষে নিজেরাই অশুদ্ধ হয়ে যান। যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ– ‘এরাই হ’ল সেইসব লোক, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াবী জীবনকে খরিদ করে নিয়েছে। তাদের উপরে আযাবকে হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য করা হবে না’ *(বাক্বারাহ ২/৮৬)*।

ইহুদী-নাছারা ধর্মনেতারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া খরিদ করতো। মুসলিম ধর্মনেতারাও যে তার অনুসরণ করবে, সে বিষয়ে হাদীছে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى قَالَ: فَمَنْ؟ ‘অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতির অনুকরণ করবে বিঘতে-বিঘতে, হাতে-হাতে ঠিক-ঠিকভাবে। বলা হ’ল, তারা কি ইহুদী-নাছারা? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নয়তো আবার কারা?’[১৬৫]

জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষকামী ও সুবিধাবাদী লোকদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ‘যারা রাসূলের আদেশের (অর্থাৎ তার আনীত শরী‘আতের) বিরোধিতা করবে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হৌক যে তাদেরকে (দুনিয়ায়) গ্রাস করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (আখেরাতে) পাকড়াও করবে মর্মান্তিক আযাব’ *(নূর ২৪/৬৩)*।

আল্লাহ্র এ অমোঘ বাণী কি আজকের দুনিয়ায় বাস্তব হয়ে দেখা দেয়নি? আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধোঁকা দিয়ে নেতা-কর্মীদের মনগড়া আইন ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মযলূম মানবতা আজ ত্রাহি

---

১৬৫. বুখারী হা/৩৪৫৬, মুসলিম হা/২৬৬৯; মিশকাত হা/৫৩৬১ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়, ৭ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/২৬৪০, আহমাদ, আবূদাঊদ; মিশকাত হা/১৭১-৭২, হাদীছ ছহীহ।

ত্রাহি করছে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য, দলাদলি-হানাহানি, যুদ্ধ-সন্ত্রাস বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলিই তো দুনিয়াপূজারীদের জন্য দুনিয়াবী আযাব। আখেরাতে জাহান্নামের কঠিন আযাব তো এদের জন্য প্রস্তুত করাই আছে। আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ '(জাহান্নামের) কঠিন শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমরা অবশ্যই (দুনিয়াতে) লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

(৩৩) وَمَا أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ 'অথচ তারা বিশ্বাসীদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরিত হয়নি'।

অর্থাৎ ঐসব সমাজনেতাদেরকে মুমিন-মুসলমানদের তত্ত্বাবধানকারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়নি। অথচ বাস্তব কথা এই যে, নেতারা সর্বদা সেটাই মনে করে থাকেন। আর দুর্বলচেতা লোকেরাও নেতাদেরকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমন স্থানে নিয়ে যায় যে, তারা নিজেদেরকে সেভাবেই কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। দুনিয়াদার নেতারা অবশেষে জনগণের 'রব'-এর আসন দখল করেন অঘোষিতভাবে। যা তাদেরকে উদ্ধত ও অহংকারী করে তোলে। অবশেষে ফেরাঊনের মত আল্লাহ্র গযবে তারা ধ্বংস হয়ে যায় ও সেই সাথে জনগণও গযবের শিকার হয়।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত রয়েছে এবিষয়ে যে, আল্লাহ্র দ্বীনের সত্যিকারের অনুসারীদের জন্য সর্বদা দু'ধরনের শত্রু থাকবে। একদল থাকবে মূর্খ বিদ্রুপকারী। আরেক দল থাকবে চিন্তাশীল হিংসুক শ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর নির্যাতন সহ্য করেই ইসলামের বিজয়ী কাফেলা সর্বদা এগিয়ে চলে জান্নাতের পানে।

(৩৪) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ 'পক্ষান্তরে আজকের দিনে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের দেখে হাসবে'।

কেননা দুনিয়াতে যেসব নেতারা ঈমানদারগণকে বিদ্রুপ করতো এবং নিজেদেরকে সফলকাম ভাবতো, তারাই এখন পর্যুদস্ত হয়ে জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে। এ দৃশ্য দেখে তাদের হাসি পাবে।

(৩৫) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ 'উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে'। যেসব দুনিয়াপূজারী নেতা দুর্বল মুমিন-মুসলমানদের সেকেলে ও নস্ট্যালজিক (Nostalgic) বলে গালি দিত, যাদেরকে চেয়ারে বসতে দেওয়া দূরে থাক, দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করতে বাধ্য করা হ'ত। সেইসব অহংকারী লোকেরাই এখন উপুড় মুখে মাটি ঘেঁষে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ 'যেদিন

তাদেরকে উপুড়মুখী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে (এবং বলা হবে,) আগুনের স্বাদ আস্বাদন কর' *(ক্বামার ৫৪/৪৮)*। এধরণের শাস্তি যারা পাবে ক্বিয়ামতের দিন তাদের বিচার প্রথম দিকেই করা হবে। তারা হবে প্রথমে 'লোক দেখানো শহীদ'। অতঃপর 'দুনিয়াদার আলেম'। অতঃপর 'কথিত দানবীর'।[১৬৬] পক্ষান্তরে নিষ্কাম মুমিন-মুসলমানেরা মহাসম্মানিত উচ্চাসনে বসে ওদের লজ্জাকর শাস্তি অবলোকন করবে।

(৩৬) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ 'অবিশ্বাসীরা (দুনিয়ায়) যা করতো, তার প্রতিফল (আজ আখেরাতে) তারা পেয়েছে তো?' অর্থাৎ আল্লাহ বলবেন, দুনিয়ায় পাপীদের অবিশ্বাস ও বিশ্বাসীদের প্রতি তাচ্ছিল্যের শাস্তি তারা আজ পুরোপুরি পেয়েছে। বস্তুতঃ এটাই হ'ল অবিশ্বাসীদের চূড়ান্ত পরিণতি। অহংকারীদের এই পরিণতির কোন ব্যত্যয় দুনিয়াতে নেই। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! আমীন!!

ثُوِّبَ অর্থ أُثِيْبَ وجُوْزِىَ যা এসেছে ثَابَ يَثُوْبُ থেকে, যার অর্থ رَجَعَ প্রত্যাবর্তন করা। এক্ষণে ثواب অর্থ হ'ল, ما يرجع على العبد فى مقابلة عمله 'আমলের বিনিময়ে বান্দার দিকে যা প্রত্যাবর্তিত হয়'। এটি ভাল ও মন্দ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় *(কুরতুবী)*। যেমন ৩য় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে বিপর্যস্ত মুসলিম সেনারা রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বানকে উপেক্ষা করে যখন পাহাড়ে উঠে পালাচ্ছিল, তখন তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ 'আল্লাহ তোমাদের বদলা দিলেন দুঃখের পর দুঃখ'... *(আলে ইমরান ৩/১৫৩)*। পক্ষান্তরে ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে ওছমান (রাঃ)-কে হত্যার খবর শুনে মক্কার মুশরিক নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিরস্ত্র ১৪০০ ছাহাবী যখন আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের বায়'আত করেন, তখন খুশী হয়ে আল্লাহ আয়াত নাযিল করে বলেন, وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا 'আল্লাহ তাদেরকে বিনিময় দিলেন আসন্ন বিজয়' *(ফাৎহ ৪৮/১৮)*। যা পরবর্তীতে ৮ম হিজরীর ১৭ রামাযান মঙ্গলবার সকালে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। আলোচ্য আয়াতে 'ছওয়াব' ক্রিয়াটি অবিশ্বাসীদের জন্য 'মন্দ বদলা' অর্থে এসেছে।

সারকথা :

হকদারের প্রাপ্য হক আদায়ে কমতি করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং তাদের ভাল-মন্দ সকল কাজকর্ম যে সুনির্দিষ্ট দফতরে লিপিবদ্ধ হচ্ছে, সে বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

১৬৬. মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫ 'ইলম' অধ্যায়।

সূরা ইনশিক্বাক্ব (বিদীর্ণ হওয়া)

সূরা ইনফিত্বার-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮৪, আয়াত ২৫, শব্দ ১০৮, বর্ণ ৪৩৬।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١

(২) এবং সে তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। আর এটাই তার কর্তব্য।

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢

(৩) যেদিন পৃথিবী প্রসারিত হবে

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝٣

(৪) এবং তার ভিতরকার সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে।

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤

(৫) আর সে তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। আর এটাই তার কর্তব্য।

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥

(৬) হে মানুষ! তুমি নিশ্চিতভাবে তোমার কৃতকর্মসহ তোমার প্রভুর পানে ফিরে চলেছ। অতঃপর তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝٦

(৭) অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে,

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝٧

(৮) সহজেই তার হিসাব-নিকাশ হয়ে যাবে।

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝٨

(৯) এবং সে তার পরিবারের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝٩

(১০) পক্ষান্তরে যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন থেকে দেওয়া হবে,

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝١٠

(১১) সে তার ধ্বংসকে আহ্বান করবে

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝١١

(১২) এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝١٢

(১৩) অথচ (দুনিয়াতে) সে তার পরিবারে হৃষ্টচিত্তেই ছিল।

اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝١٣

(১৪) সে ভেবেছিল যে, সে কখনোই (তার প্রভুর কাছে) ফিরে যাবে না।

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝١٤

بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ؕ﴿۱۵﴾

(১৫) হ্যাঁ (অবশ্যই সে ফিরে যাবে)। নিশ্চয়ই তার প্রভু তার বিষয়ে সবকিছু জানেন।

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ﴿۱۶﴾

(১৬) আমি শপথ করছি সান্ধ্য লালিমার,

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ﴿۱۷﴾

(১৭) এবং রাত্রির ও যা সে জমা করে,

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ﴿۱۸﴾

(১৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ ধারণ করে।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ؕ﴿۱۹﴾

(১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হ’তে আরেক স্তরে অধিরোহন করবে।

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۲۰﴾

(২০) অতএব তাদের কি হ’ল যে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না?

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ؕ﴿۲۱﴾

(২১) এবং যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদা করে না? (সিজদা)[১৬৭]

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۖ﴿۲۲﴾

(২২) বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۖ﴿۲۳﴾

(২৩) অথচ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন যা তারা (বুকের মধ্যে) সঞ্চিত রেখেছে।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۲۴﴾

(২৪) অতএব তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿۲۵﴾

(২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।

গুরুত্ব :

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ– ‘যদি কেউ চোখের সামনে ক্বিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করে খুশী হ’তে চায়, তবে সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিত্বার ও সূরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে’।[১৬৮]

---

১৬৭. এখানে একটি সিজদা করা মুস্তাহাব। এই সিজদার জন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয় (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ পৃ: ১৫৩)।

১৬৮. আহমাদ হা/৪৯৩৪, তিরমিযী হা/৩৩৩৩, হাকেম; আলবানী, ছহীহাহ হা/১০৮১।

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ- 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে (ছালাতের মধ্যে) সূরা ইনশিক্বাক্ব ও সূরা 'আলাক্বে সিজদা করেছি'।[১৬৯]

বিষয়বস্তু :

সূরাটিতে দু'টি বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে। ১- ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই মানুষ তার কর্মফল জানতে পারবে *(১-১৫)*। ২- মানুষের জীবন কষ্টে ও আনন্দের মধ্যে পরিবর্তনশীল থাকবে। অতঃপর চূড়ান্ত বিচারে ক্বিয়ামতের দিন সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী হবে *(১৬-২৫)*।

তাফসীর :

(১) إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে'। অর্থ أذكر يوم تفطرت السماء و انصدعت 'স্মরণ কর যেদিন আকাশ চূর্ণ হবে ও বিদীর্ণ হবে'। এখানে ইস্রাফীল কর্তৃক শিঙ্গায় ফুঁক দেবার পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা আকাশ যে শক্ত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا 'আর আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর শক্ত সপ্তাকাশ' *(নাবা ৭৮/১২)*।

(২) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ 'এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। আর এটাই তার কর্তব্য'। অর্থ استمعت وأطاعت لربها وحق لها أن تطيع 'সে তার প্রভুর কথা শুনবে ও মান্য করবে। আর তার কর্তব্য হ'ল মান্য করা'। أَذِنَ لَهُ اَىْ اِسْتَمَعَ 'সে মনোযোগ দিল'। حُقَّ لَهُ أَن يَّفْعَلَ كَذَا اَىْ حُقَّ فَثَبَتَ وَصَدَقَ 'তার জন্য কাজটি করা নিশ্চিত হ'ল ও যথার্থ হ'ল' *(আল-মু'জাম)*। সেখান থেকে وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ অর্থ যাহহাক বলেন, أَطَاعَتْ وَحُقَّ لَهَا أَن تُطِيْعَ رَبَّهَا 'সে আনুগত্য করবে এবং তার প্রভুর আনুগত্য করাই তার কর্তব্য' *(কুরতুবী)*। সে কিসে আনুগত্য করবে? اى سمعت له فى تصدعها وتشققها 'সে আনুগত্য করবে তার ফেটে যাওয়ার ব্যাপারে ও বিদীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে' *(ক্বাসেমী)*।

অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে যে, আকাশ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি। বরং তার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহ্র হুকুমেই আকাশ সৃষ্টি হয়েছে এবং আল্লাহ্র হুকুমেই আকাশ বিদীর্ণ হবে। আর এটাই তার কর্তব্য। ইস্রাফীল কর্তৃক

১৬৯. বুখারী হা/১০৭৪ 'সুজূদুল কুরআন' অধ্যায়; মুসলিম হা/৫৭৮ 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়; মিশকাত হা/১০২৪।

শিঙ্গায় ফুঁক দানের তীব্র আওয়ায *(ক্বাফ ৫০/২০)* একটি অসীলা মাত্র। ফার্রা বলেন, অত্র আয়াতে ও ৪র্থ আয়াতে وَأَلْقَتْ-এর واو 'অতিরিক্ত' (زائدة) হিসাবে এসেছে *(কুরতুবী)*।

(৩) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ 'যেদিন পৃথিবী প্রসারিত হবে'। এতে বুঝা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী চ্যাপ্টা নয়, বরং গোলাকার। যা ক্বিয়ামতের দিন সমান হয়ে যাবে। অর্থাৎ সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-ভূতলের কোন তারতম্য থাকবে না। সবকিছু একাকার ও সমান হয়ে নতুন এক পৃথিবীর রূপ ধারণ করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'যেদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হয়ে যাবে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী একক আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। পৃথিবী ঐদিন একাট্টা হয়ে যাবে এবং একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দেখা যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يُبَصَّرُونَهُمْ 'তাদেরকে ঐদিন একে অপরের দৃষ্টিগোচর করা হবে' *(মা'আরিজ ৭০/১১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَجْمَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِى وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ পূর্বের ও পরের সবাইকে একটি মাটিতে একত্রিত করবেন। ফলে তারা একে অপরের কথা শুনতে পাবে ও একে অপরকে দেখতে পাবে'।[১৭০]

(৪) وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ 'এবং তার ভিতরকার সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে'। অর্থাৎ কবরসমূহ খালি করে সকল মৃতব্যক্তিকে বাইরে জীবিত নিক্ষেপ করবে।

একথাটাই অন্যত্র বলা হয়েছে এভাবে- وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا 'সেদিন পৃথিবী তার ভিতরকার বোঝাসমূহ বের করে দিবে' *(যিলযাল ৯৯/২)*।

(৫) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ 'আর সে তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। আর এটাই তার কর্তব্য'- একথার মধ্যেও দলীল রয়েছে যে, আকাশের ন্যায় পৃথিবীও আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি। বরং তারও একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তাঁর হুকুমেই তার পূর্বের রূপ বিনষ্ট হয়ে আজ নতুন রূপ ধারণ করেছে। আর সর্বাবস্থায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করাই তার প্রধান কর্তব্য এবং হুকুম পাওয়ার পর সে কাজটিই সে করবে ক্বিয়ামতের দিন।

---

১৭০. বুখারী হা/৪৭১২; মুসলিম হা/১৯৪ (৩২৭)।

এর মধ্যে একথারও দলীল রয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর এক ধরনের জীবন ও অনুভূতি রয়েছে, যা অন্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন বলা হয়েছে, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ– 'অতঃপর তিনি মনোনিবেশ করেন আকাশের দিকে, যা ছিল ধূম্রবিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম অনুগত হয়ে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১১)*। অথচ গাছের জীবন আছে, একথা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ খৃঃ) প্রমাণ করেছেন মাত্র গত ১৯২৬ সালে।

(৬) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيْهِ 'হে মানুষ! তুমি নিশ্চিতভাবে তোমার কৃতকর্মসহ তোমার প্রভুর পানে ফিরে চলেছ। অতঃপর তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে'। অর্থাৎ প্রভু পর্যন্তই তার শেষ গন্তব্যস্থল। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى 'নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল' *('আলাক্ব ৯৬/৮)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى 'তোমার প্রতিপালকের নিকটেই সবকিছুর সমাপ্তি' *(নাজম ৫৩/৪২)*। পূর্বের পাঁচটি আয়াতের বক্তব্যের পর মানুষকে ডেকে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং পৃথিবী প্রসারিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করবে, সেদিন অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন لاقى الإنسان كدحه من ربه 'মানুষ তার প্রভুর নিকট থেকে তার কর্মফল হাতে-নাতে পেয়ে যাবে'।

الكَدُّ والكَدْحُ اى السعى والعمل بالمشقة অর্থ- চেষ্টা করা, কষ্টের সাথে কোন কাজ করা। كَادِحٌ অর্থ عامل وكاسب আমলকারী বা উপার্জনকারী। এখানে অর্থ إنك راجع إلى ربك رجوعا لا محالة 'তুমি তোমার প্রভুর পানে দ্রুত ফিরে চলেছ নিশ্চিতভাবে' *(কুরতুবী)*। অথবা ساعٍ إلى ربك سعيًا 'দৌড়ে চলেছ তোমার প্রভুর পানে দ্রুতবেগে' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ তোমার কৃতকর্মসহ তুমি দ্রুত ফিরে চলেছ তোমার প্রতিপালকের নিকটে। আলোর গতির হিসাবে মানুষ প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে তার মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 'নিশ্চয়ই আমাদের নিকটেই তাদের প্রত্যাবর্তন'। 'অতঃপর আমাদের উপরেই তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব' *(গাশিয়াহ ৮৮/২৫-২৬)*।

(৭) فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِه 'অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে'। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে বান্দার মুলাক্বাত দু'ভাবে হবে। কেউ আল্লাহ্র নিকট থেকে ডানহাতে আমলনামা পাবে। কেউ পাবে পিছন দিক থেকে বাম হাতে। এখানে 'ডান

হাতে আমলনামা দেয়া হবে’ বলার মাধ্যমে ডান হাতের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এই মর্যাদা একইভাবে দুনিয়াতেও রয়েছে। যেমন ডান হাতে পরস্পরে মুছাফাহা করার মধ্যে সেই মর্যাদা প্রতিফলিত হয়। মুছাফাহার অর্থ إلصاق صفح الكف بالكف ‘পরস্পরের হাতের তালু মিলানো’ *(লিসানুল আরব)*। পরস্পরে ডান হাতের তালু মিলানোর মধ্যেই সেটা প্রতিভাত হয়। কিন্তু সেই সাথে বাম হাত লাগিয়ে দিলে উক্ত মর্যাদায় হস্তক্ষেপ হয়। যা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া ছহীহ হাদীছ সমূহের দলীল অনুযায়ী পরস্পরে ডান হাতে মুছাফাহা করাই সুন্নাত। দুইজনের বাম হাতে কিংবা চার হাতে মুছাফাহার কোন কওলী বা ফে‘লী দলীল নেই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِه وَتَرَجُّلِه وَطُهُوْرِه وَفِيْ شَأْنِه كُلِّه ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা পরিধান, চুল আঁচড়ানো, ওযূ করা এবং তার সকল শুভ কাজ ডান দিক দিয়ে করা পসন্দ করতেন’।[১৭১]

প্রথম আয়াতে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ‘যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে’ বাক্যের শুরুতে إِذَا অব্যয়টি ‘শর্ত’ (شرط) এবং তার ‘জওয়াব’ (الجزاء) হ’ল فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِه ‘অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডানহাতে দেওয়া হবে’। কিসাঈ একথা বলেন। আবু জা‘ফর আন-নাহহাস বলেন, এটাই হ’ল সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সুন্দর *(কুরতুবী)*।

(৮) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ‘সহজেই তার হিসাব-নিকাশ হয়ে যাবে’। অর্থ حسابا سهلا لا نوقش ‘সহজ হিসাব যাতে যাচাই-বাছাই করা হবে না’। বরং স্রেফ পেশ করা হবে মাত্র। যেমন মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ ذَالِكَ الْحِسَابُ، إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ ، مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ ‘ওটা হিসাব নয়, বরং পেশ করা মাত্র। কেননা ক্বিয়ামতের দিন যার আমলনামা যাচাই করা হবে, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে’।[১৭২] মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, هَلَكَ ‘সে ধ্বংস হবে’। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক ছালাতে দো‘আ পাঠ করেন, اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِى حِسَاباً يَّسِيْرًا ‘হে আল্লাহ! আমার হিসাবে নিন সহজ হিসাব’। অতঃপর সালাম ফিরানোর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সহজ হিসাব কি? তিনি বললেন, أَنْ يَنْظُرَ فِى كِتَابِه فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ ‘সেটা এই যে, তিনি কারু আমলনামার দিকে তাকাবেন। অতঃপর তাকে ছেড়ে দিবেন।

---

১৭১. বুখারী হা/১৬৮, মুসলিম হা/২৬৮ ‘ত্বাহারৎ’ অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১৯, মিশকাত হা/৪০০।
১৭২. বুখারী হা/৪৯৩৯; মুসলিম হা/২২০৪; তিরমিযী হা/৩৩৩৭।

কেননা ঐদিন যার হিসাব যাচাই করা হবে হে আয়েশা! সে ধ্বংস হবে'।[১৭৩] অতএব সূরা গাশিয়াহ্র শেষে বা কুরআনের যেসকল স্থানে হিসাবের কথা এসেছে, সেখানে পাঠক-শ্রোতা উভয়ের জন্য উক্ত দো'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব।

'সহজ হিসাব'-এর নমুনা যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ মুমিন বান্দাকে শেষ বিচারের দিন কাছে ডেকে নিরিবিলিতে তার পাপগুলি বলবেন। তখন সে স্বীকার করবে ও নিজের ধ্বংস চিন্তায় ব্যাকুল হবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ 'দুনিয়াতে এগুলি আমি তোমার উপর গোপন রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার এগুলি ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। কিন্তু যারা কাফির ও মুনাফিক, তাদের বেলায় সৃষ্টিজগতের সামনে বলে দেওয়া হবে যে, ঐ লোকগুলি তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখো, যালেমদের উপরে আল্লাহ্র লা'নত'।[১৭৪]

(৯) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوْرًا 'এবং সে তার পরিবারের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে'। অর্থাৎ يرجع إلى أهله في الجنة 'সে জান্নাতে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে'। মুমিন বান্দা ডান হাতে আমলনামা পাওয়ার পর খুশীতে বাগবাগ হয়ে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে। এর সহজ ব্যাখ্যা এই যে, দুনিয়ায় যারা তার পরিবার ছিল, তাদের কাছে ফিরে গিয়ে হৃষ্টচিত্তে নিজের সুন্দর কর্মফল জানাবে। যেভাবে দুনিয়ায় কোন পরীক্ষার সুন্দর রেজাল্ট হ'লে সন্তানেরা ছুটে গিয়ে তাদের পিতা-মাতাকে জানায়। তবে ক্বাতাদাহ বলেন, এর অর্থ أزواجه في الجنة من الحور العين 'জান্নাতে তার স্ত্রীগণ, যারা হবেন আনতনয়না সুন্দরী তন্বী হূরগণ' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এই 'হূর' তাদের দুনিয়ার স্ত্রীগণও হতে পারেন, যদি তারা জান্নাতী হন। তাছাড়া أهله অর্থাৎ 'তার পরিবার' বলতে কেবল স্ত্রী বুঝায় না। বরং স্ত্রী ও সন্তান সবাইকে বুঝায়। অতএব দুনিয়ার স্ত্রী ও সন্তানেরা জান্নাতী হ'লে তারাও তাদের স্বামী ও পিতা-মাতাদের সঙ্গে থাকবে ও তাদেরকে আমলনামা দেখিয়ে আনন্দ করবে।

ঈমানদার পুরুষগণের ঈমানদার স্ত্রীগণ যে জান্নাতে তাদের স্ত্রী হিসাবে সাথী হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ. '(অতএব) জান্নাতে প্রবেশ

---

১৭৩. আহমাদ হা/২৪২৬১; হাকেম হা/৮৭২৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৫৬২ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮, 'হিসাব ও মীযান' অনুচ্ছেদ-৩।

১৭৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, হূদ ১১/১৮।

কর তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে' *(যুখরুফ ৪৩/৭০)*। অনুরূপভাবে ঈমানদার সন্তানগণ যে ঈমানদার পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে থাকবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ– 'আর যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানেরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমরা তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তানদের। আর আমরা তাদের কর্মফলে বিন্দুমাত্র হ্রাস করব না। বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কৃতকর্মের জন্য দায়ী' *(তূর ৫২/২১)*।

শেষোক্ত আয়াত অনুযায়ী কেবল পিতা-মাতাই নয়; বরং ঈমানদার দাদা-পরদাদা ও তদূর্ধ্ব পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী যাদের সঙ্গে দুনিয়ায় দেখা হয়নি, জান্নাতে তাদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হবে। জান্নাতীগণ সুন্দর পরিবেশে প্রফুল্লচিত্তে মুখোমুখি বসে একে অপরকে বলবে, قَالُوْا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ– فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ– 'আমরা ইতিপূর্বে আমাদের বাড়ী-ঘরে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম'। 'অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন' *(তূর ৫২/২৬-২৭)*। ইবনু যায়েদ বলেন, আল্লাহ ঈমানদারগণকে তাদের দুনিয়ার ভীতি ও কষ্টের বিনিময়ে আখেরাতে জান্নাত দিবেন এবং অবিশ্বাসীদের দুনিয়ায় আনন্দ-ফূর্তির বিনিময়ে আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তি দিবেন। একথা বলে তিনি পূর্বের আয়াত দু'টি *(তূর ২৬-২৭)* পাঠ করেন' *(কুরতুবী)*।

(১০) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ 'পক্ষান্তরে যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন থেকে দেওয়া হবে'। অর্থাৎ পিঠের পিছন দিক হ'তে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি ডানহাতে নেবার জন্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে এবং অবশেষে পিছন দিকে বাম হাতে নিতে বাধ্য হবে *(কুরতুবী)*।

(১১) فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُوْراً 'সে তার ধ্বংসকে আহ্বান করবে'। এবং বলবে يا ويلاه، يا ثبوراه হায় দুর্ভোগ, হায় ধ্বংস! অন্যত্র বলা হয়েছে, وَإِذَا أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْراً– لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْراً وَاحِداً وَادْعُوْا ثُبُوْراً كَثِيْراً– 'যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় জাহান্নামের কোন এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে আহ্বান করবে'। '(বলা হবে) আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকোনা, বরং অনেক মৃত্যুকে ডাক' *(ফুরক্বান ২৫/১৩-১৪)*। কিন্তু তাতে কোন কাজ হবেনা। কেননা সেখানে কারু মৃত্যু হবেনা *(আ'লা ৮৭/১৩)*। বরং তাকে বাঁচিয়ে রেখে কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করা হবে *(নাবা ৭৮/৩০)*।

ثُبُوْراً অর্থ هلاك ধ্বংস অর্থাৎ মৃত্যু। চূড়ান্তভাবে অপদস্থ ও শাস্তিপ্রাপ্ত হ'লে মানুষ নিজের ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করে থাকে। এখানে সেটাই বলা হয়েছে।

(১২) وَيَصْلَى سَعِيْراً 'এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে'। অর্থাৎ বাম হাতে আমলনামা পাওয়ার পরিণতি হিসাবে সে জাহান্নামের প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করবে। অবশ্য সে ইচ্ছা করে প্রবেশ করবে না। বরং তাকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে *(যুমার ৩৯/৭১; ক্বাফ ৫০/২১)*। সেটার ধরন কেমন হবে সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ، ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ، ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوْهُ- '(ফেরেশতাদের বলা হবে) একে ধর, গলায় বেড়ী পরাও'। 'অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর'। 'অতঃপর সত্তর গজ দীর্ঘ শিকলে একে আচ্ছামত বাঁধো' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩০-৩২)*।

(১৩) إِنَّهُ كَانَ فِيْ أَهْلِه مَسْرُوْراً 'অথচ (দুনিয়াতে) সে তার পরিবারে হৃষ্টচিত্তেই ছিল'। অর্থাৎ সে কখনোই পরকালীন জওয়াবদিহিতার কথা আমলেই নিত না। সর্বদা খাও-দাও ফূর্তি কর- এই মতবাদে সে বিশ্বাসী ছিল। দুনিয়ার সেই সাময়িক অপরিণামদর্শী আনন্দ-ফূর্তির প্রতিফল স্বরূপ সে আজ আখেরাতে চিরস্থায়ী দুঃখে নিপতিত হ'ল এবং জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হ'ল।

(১৪) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ 'সে ভেবেছিল যে, সে কখনোই (তার প্রভুর কাছে) ফিরে যাবে না'। অর্থাৎ أنه لن يرجع حيا مبعوثا فيحاسب 'সে কখনোই জীবন্ত পুনরুত্থিত হয়ে ফিরে যাবে না এবং তাকে হিসাব দিতে হবে না'। তার ধারণা ছিল যে, সে প্রাকৃতিক নিয়মেই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। বড় হয়েছে। আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই মারা যাবে। তার কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তার রূহ কারু কাছ থেকে প্রেরিত হয়নি এবং কারু কাছে তা প্রত্যাবর্তিত হবে না। দুনিয়াতেই তার চাওয়া-পাওয়া শেষ। আখেরাত বলে কিছু নেই এবং তার কোন কাজের হিসাবও কাউকে কখনো দিতে হবে না।

اَلْحَوْرُ অর্থ الرجوع ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ما عرفت تفسيره حتى سمعت أعرابية تقول لبنتها حُورى أى إرجعى 'আমি উক্ত শব্দের ব্যাখ্যা জানতে পেরেছি একজন বেদুঈন মহিলার কাছ থেকে। যখন সে তার মেয়েকে বলছিল, حُورى 'ফিরে এসো' *(কুরতুবী)*।

এখানে ফিরে আসা অর্থ আল্লাহ্র নিকটে প্রত্যাবর্তন করা। আব্দুল্লাহ বিন সারজিস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রার্থনা করেছেন, اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আধিক্য হ'তে ক্ষতির দিকে ফিরে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি' (أَىْ مِنَ الرُّجُوْعِ إِلَى النُّقْصَانِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ)।[১৭৫]

ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় الْحَورِ بعد الكَورِ-এর বদলে الكَونِ এসেছে। الْحَورِ بعد الكَونِ-এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে মা'মার (مَعْمَر) বলেন, এরা হ'ল 'কুন্তী' (الكُنْتِي)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আগে সৎ ছিল, পরে অসৎ হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি বলে আমি যৌবনে এমন ছিলাম তেমন ছিলাম ইত্যাদি *(কুরতুবী)*। এক্ষণে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে যে, ঐ ব্যক্তি ভেবেছিল দুনিয়ার আনন্দ-ফূর্তি থেকে সে কখনোই আখেরাতে ধ্বংসের দিকে ফিরে যাবে না'।

(১৫) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْراً 'হ্যাঁ! (অবশ্যই সে ফিরে যাবে)। নিশ্চয়ই তার প্রভু তার বিষয়ে সবকিছু জানেন'। অর্থ إنه كان عالما من قبل أن يخلقه بأن مرجعه إليه 'তাকে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি জানতেন যে, তাকে তার কাছে ফিরে আসতে হবে' *(কুরতুবী)*। بَصُرَ اى صار البصير اي العالم অর্থ জ্ঞানী *(লিসানুল আরব)*। البصر اي العلم অর্থ জানা। بصيرًا 'সে জ্ঞানী হ'ল *(আল-মু'জাম)*। আল্লাহ বলেন, قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ... 'সামেরী বলল, আমি দেখেছিলাম, যা তারা দেখেনি... *(ত্বোয়াহা ২০/৯৬)*। অর্থাৎ আমি জিব্রীলকে জেনেছিলাম, যা তারা জানেনি।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, সে যা ভেবেছিল, তা সঠিক ছিল না। বরং তাকে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসতেই হবে। কেননা তার সৃষ্টি থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সব খবরই আল্লাহ জানেন। সে যে এরূপ হঠকারিতা করবে সেকথাও তিনি আগে থেকে জানতেন।

(১৬) فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ 'আমি শপথ করছি সান্ধ্য আকাশের লালিমার'।

এখানে فَلاَ أُقْسِمُ অর্থ فَأُقْسِمُ কালেমা لاَ অতিরিক্ত, যা বাক্যের মধ্যে صلة বা সংযোগের জন্য ও শ্রোতাকে সতর্ক (تنبيه) করার জন্য আনা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ *(আল-হা-ক্কাহ ৬৯/৩৮)*, فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ *(মা'আরিজ ৭০/৪০)*, لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ *(বালাদ ৯০/১)*, لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১)* ইত্যাদি। অত্র আয়াতে শপথকারী হ'লেন আল্লাহ এবং শপথকৃত বস্তু হ'ল অস্ত যাওয়া সূর্যের লালিমা। শপথের মাধ্যমে পরবর্তী বক্তব্যের বিষয়বস্তুকে যোরদার করা হয়েছে। الشفق অর্থ 'অস্ত যাওয়া সূর্যের লালিমা'। আরবদের পরিভাষাও তাই *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ 'মাগরিবের

১৭৫. মুসলিম হা/১৩৪৩; তিরমিযী হা/৩৪৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৮; মিশকাত হা/২৪২১।

ওয়াক্ত হ'ল যতক্ষণ না সূর্যের লালিমা বিলুপ্ত হয়'।[১৭৬] অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ ও মুজতাহিদ বিদ্বানগণের মতামতও সেটাই *(কুরতুবী)*। তবে মুজাহিদ বলেন, প্রভাত সূর্যের লালিমা। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে দু'টি বর্ণনার একটিতে বলা হয়েছে যে, الشفق هو البياض 'শাফাক্ব' অর্থ সান্ধ্য লালিমার পরবর্তী শুভ্রতা *(কুরতুবী)*। ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, أقسم اللهُ بالنهار مُدْبِرًا وبالليل مُقْبِلاً 'আল্লাহ এখানে বিদায়ী দিবসের ও আগমনকারী রাত্রির শপথ করেছেন' *(ইবনু কাছীর)*।

(১৭) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ 'এবং রাত্রির ও যা সে জমা করে'। অর্থাৎ তারকারাজি ও প্রাণীকুল। কেননা রাতের আগমনে একদিকে যেমন আকাশে নক্ষত্ররাজির সমাবেশ ঘটে, অন্যদিকে তেমনি পৃথিবীতে মানুষ ও পশু-পক্ষী সবাই স্ব স্ব আশ্রয়ে ফিরে আসে। যারা দিনের বেলায় বিভিন্ন কাজে-কর্মে চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ফলে চূড়ান্ত বিচারে রাত্রিই এদেরকে জমা করে।

(১৮) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ 'এবং শপথ চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ ধারণ করে'। হাসান বাছরী বলেন, إِذَا اتَّسَقَ অর্থ إذا امتلأ 'যখন পূর্ণ হয়' অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ।

(১৯) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হ'তে আরেক স্তরে অধিরোহন করবে'। অর্থাৎ এক অবস্থা হ'তে আরেক অবস্থায় তোমাদের উত্তরণ ঘটবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أى حالاً بعد حال 'এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায়'।[১৭৭] যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ 'আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে। অতঃপর দুর্বলতার পরে দেন শক্তি। শক্তির পরে আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(রূম ৩০/৫৪)*।

পূর্বের তিনটি আয়াতে বর্ণিত তিনটি বস্তুর শপথের জওয়াব হিসাবে অত্র আয়াতটি এসেছে। এখানে বলা হয়েছে যে, হে মানুষ! অবশ্যই তোমাদের এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উত্তরণ ঘটবে। যেমন- তোমরা প্রথমে মাতৃগর্ভে ছিলে শুক্রবিন্দু আকারে, তারপর জমাট রক্তবিন্দু, তারপর গোশতপিণ্ড, তারপর জীবন্ত শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠ হ'লে।[১৭৮] তারপর মায়ের দুধ ছেড়ে শক্ত খাবার খেতে শিখলে। অতঃপর আস্তে আস্তে শক্ত-সমর্থ জোয়ান হ'লে। তারপর বার্ধক্যে উপনীত হ'লে ও মৃত্যুবরণ করলে। জীবনকালে তোমরা কখনো ধনী ও সচ্ছল ছিলে, কখনো গরীব ও অসচ্ছল ছিলে।

---

১৭৬. মুসলিম হা/৬১২, মিশকাত হা/৫৮১ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ-১।
১৭৭. বুখারী হা/৪৯৪০।
১৭৮. মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য সূরা 'আবাসা ১৮-২০ আয়াতের তাফসীর।

তোমরা রোগী হ'লে, অতঃপর সুস্থ হ'লে। বিপদগ্রস্ত হ'লে আবার বিপদমুক্ত হ'লে। তোমরা কষ্টে পড়লে, আবার সুখী হ'লে। এভাবে অবস্থার পরিবর্তন আমি ঘটিয়ে থাকি এবং জীবনের এই উত্থান-পতন ও অবস্থান বৈচিত্র্য তোমাদের ঘটবেই। আর এ থেকে তোমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে, নিজের জীবনকালে চাক্ষুষভাবে যখন এইসব উত্থান-পতন তোমরা দেখছ এবং জীবনের একেকটি স্তর অতিক্রম করছ, তখন অবশ্যই মৃত্যুর পর তোমার পুনরুত্থান ঘটবে এবং সেটাই হবে তোমার জীবনের সফরসূচীর চূড়ান্ত পর্ব। তারপরে আর কোন গন্তব্য নেই।

অনেকের ধারণা মৃত্যুই সবকিছুর শেষ এবং কবরই শেষ আশ্রয়স্থল। এই ধারণা ভুল। কেননা আল্লাহ বলেন, حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ 'যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১০২/২)*। এখানে 'যিয়ারত' শব্দ বলা হয়েছে। আর যিয়ারতকারী কখনো সে স্থানে স্থায়ী হয় না। অতএব তার স্থায়ী ঠিকানা হ'ল কবরের জীবন শেষে পুনরুত্থানের পর জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

'মৃত্যুর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষের ইহকালীন জীবনের উপর পর্দা পড়ে যাবে' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। অতঃপর পরকালীন জীবনের দৃশ্যাবলী তার সামনে উদ্ভাসিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ 'তুমি ছিলে এদিন সম্পর্কে উদাসীন। আজ আমরা তোমার চক্ষু থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ' *(ক্বাফ ৫০/২২)*।

উল্লেখ্য যে, জীবনচক্রের এই পরিবর্তন কেবল মানুষের ক্ষেত্রে নয়, বরং পশু-পক্ষী, উদ্ভিদরাজি, সাগর-নদী, সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে রয়েছে। নদীর জোয়ার-ভাটা চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্ত, উদ্ভিদের উদ্গাম-বৃদ্ধি ও মৃত্যু এরই প্রমাণ বহন করে।

এখানে আরেকটি চিন্তার বিষয় এই যে, আল্লাহ এখানে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে বাছাই করে সূর্য, চন্দ্র ও রাত্রির কসম করলেন কেন? বলা চলে যে, এর উদ্দেশ্য হ'ল মুসলমানদের সৌরবিজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করা। যাতে তারা নভোমণ্ডলে সঞ্চিত আল্লাহ্র নে'মত সমূহ থেকে কল্যাণ আহরণ করতে পারে এবং আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়ে বলে, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে বৃথা সৃষ্টি করো নি। তুমি মহা পবিত্র। অতএব আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে রক্ষা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*।

(২০) فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ 'অতএব তাদের কি হ'ল যে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না?' অর্থাৎ যাবতীয় নিদর্শন ও প্রমাণাদি স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোন্ বস্তু তাদেরকে ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে? এটি ইনকার অথবা বিস্ময়পূর্ণ প্রশ্নবোধক (استفهام إنكار أو تعجب) বাক্য।

(২১) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُوْنَ 'এবং যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদা করে না?' হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এই আয়াত পাঠ শেষে সিজদা করেন। অতঃপর বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এখানে সিজদা করেছি'।[১৭৯]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, أنها ليست من عزائم السجود، لأن المعنى : لا يُذعنون ولا يطيعون فى العمل بواجباته– 'এর অর্থ ফরয সিজদা নয়। কেননা এর তাৎপর্য হ'ল, তারা মাথা নত করে না এবং কুরআনের ওয়াজিব সমূহ প্রতিপালনের মাধ্যমে আনুগত্য প্রদর্শন করে না' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ এখানে সিজদার পারিভাষিক অর্থ প্রযোজ্য হবে না। বরং আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য হবে। এক্ষণে لاَ يَسْجُدُوْنَ অর্থ হবে لاَ يَخْضَعُوْنَ وَلاَ يَنْقَادُوْنَ 'তারা অবনত হয় না ও অনুগত হয় না'। তবে উপরে বর্ণিত হাদীছের আলোকে এখানে সিজদা করা মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির দলীল রয়েছে। যাতে ভ্রান্ত ফের্কা মুর্জিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা তাদের নিকট ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও সাধারণ মুসলমানের ঈমান সমান'। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا 'প্রকৃত মুমিন তারাই, যখন তাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয় এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়' *(আনফাল ৮/২)*।

(২২) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُوْنَ 'বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে'। অর্থাৎ কাফেররা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর আনীত শরী'আতে মিথ্যারোপ করে এবং কুরআনের অকাট্য সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। মূলতঃ স্বার্থান্ধ হঠকারী ব্যক্তিরা কখনো এলাহী সত্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনা। আর সেকারণেই এরা তাতে সর্বদা মিথ্যারোপ করে এবং এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পায়।

(২৩) وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ 'অথচ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন যা তারা (বুকের মধ্যে) সঞ্চিত রেখেছে'। মুজাহিদ ও ক্বাতাদাহ বলেন, এর অর্থ بما يكتمون فى صدورهم 'যা তারা লুকিয়ে রেখেছে তাদের বুকের মধ্যে' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ নবী ও কুরআন বিষয়ে যে মিথ্যারোপ এবং শত্রুতা তাদের অন্তরে লুক্কায়িত রয়েছে, আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন। يُوْعُوْنَ ক্রিয়াটির মাদ্দাহ হ'ল الوِعَاءُ অর্থাৎ পাত্র, যাতে কিছু সঞ্চিত থাকে'। যেমন

১৭৯. মুসলিম হা/৫৭৮ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১০২৪।

অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, وَجَمَعَ فَأَوْعَى 'সে সম্পদ জমা করে। অতঃপর তা সঞ্চিত রাখে' *(মা'আরিজ ৭০/১৮)*। এর অর্থ স্মৃতিতে ধারণ করাও হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, (বিগত উম্মতগুলির ধ্বংস কাহিনী তোমাদের শুনানো হ'ল) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ 'যাতে এগুলিকে তোমাদের জন্য আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে রেখে দিতে পারি এবং স্মৃতিধর কানগুলি এসব ঘটনা স্মরণে রাখে' *(হা-ক্কাহ ৬৯/১২)*।

وَعَاهُ أى حَفِظَهُ 'সে এটি মুখস্থ করেছে'। এক্ষণে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দু'প্রকারের হ'তে পারে। ১- তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও কুরআনের সত্যতার বিষয়টি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। যদিও মুখে তা অস্বীকার করে। ২- উক্ত দু'টি বিষয়ে আক্রোশ ও বিদ্বেষ হৃদয়ে সঞ্চিত রাখে। দু'টিরই প্রতিফল পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।-

(২৪) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 'অতএব তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও'। অর্থাৎ যারা আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও আখেরাতকে অবিশ্বাস করে ও হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ করে, হে রাসূল! তুমি তাদের এ খবরটি জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের জন্য জাহান্নামের মর্মান্তিক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। এটি নিঃসন্দেহে কঠিন দুঃসংবাদ। কিন্তু আল্লাহ একে 'সুসংবাদ' বলেছেন অবিশ্বাসীদের তাচ্ছিল্য করার জন্য।

(২৫) إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ 'কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার'। এখানে إلا (ব্যতীত) অর্থ لكن (কিন্তু)। কেননা বাক্যটি استثناء منقطع অর্থাৎ পূর্বের বাক্য থেকে বিছিন্ন একটি পৃথক বাক্য হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। অনেক বিদ্বান এখানে إِلاَّ অর্থ واو (এবং) বলেছেন। অর্থাৎ এটি পূর্বের বাক্য হ'তে استثناء নয়, বরং সম্পূর্ণ নতুন বাক্য হিসাবে এসেছে। তখন অর্থ হবে 'এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে' *(কুরতুবী)*।

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থ ثواب غير منقوص ولا مقطوع এমন ছওয়াব যা কম হবার নয় বা ছিন্ন হবার নয়' *(কুরতুবী)*। এক কথায় তারা অফুরন্ত ছওয়াবের অধিকারী হবে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ 'এ দান হবে অবিচ্ছিন্ন' *(হূদ ১১/১০৮)*। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ

يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا 'যদি কেউ পীড়িত হয় বা সফরে থাকে, তাহ'লে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় সে যে নেক আমল করত, সেইরূপ ছওয়াব তার জন্য লেখা হবে'।[১৮০]

উল্লেখ্য যে, আখেরাতের পুরস্কার সদা বর্ধমান। তা দুনিয়ার মত নয় যে, গাছে কখনো ফল হয় কখনো হয় না। আল্লাহ বলেন, وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا 'সেখানে তাদের জন্য রিযিক থাকবে সকালে ও সন্ধ্যায়' *(মারিয়াম ১৯/৬২)*। তিনি বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً 'কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করবে। অতঃপর তিনি তাকে বহুগুণ দান করবেন'? *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। আর উত্তম ঋণ অর্থ অগ্রিম নেক আমল সমূহ।

তবে হাদীছে এসেছে যে, শুধুমাত্র 'আমল' দ্বারা কেউ জান্নাত পাবে না। যদি না আল্লাহ্র রহমত শামিল হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلاَ يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللهِ 'তোমাদের আমল তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না বা জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং আমিও বাঁচতে পারব না, আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত'।[১৮১] তাছাড়া আল্লাহ বলেন, يدْخُلُ مَن يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِه 'তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেন' *(দাহর ৭৬/৩১)*। তিনি আরও বলেন, وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ 'আল্লাহ যাকে খুশী স্বীয় রহমতের জন্য খাছ করে নেন' *(বাক্বারাহ ২/১০৫)*।

বস্তুতঃ ঈমানদারগণের উপরে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ আছে বলেই তারা ঈমান আনার ও সৎকর্ম করার তাওফীক লাভে ধন্য হয়েছে। অতএব তারা মূলতঃ আল্লাহ্র রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবলমাত্র তাদের আমলের কারণে নয়। কেননা ঈমান ও আমল তাদের জান্নাত লাভের অসীলা হ'তে পারে। কিন্তু মূল কারণ হ'ল আল্লাহ্র রহমত। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করে নিন -আমীন!

সারকথা :

মানুষকে অবশ্যই তার কষ্টকর জীবন পাড়ি দিয়ে তার প্রভুর নিকটে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর সেখানে গিয়ে তার কর্মফল অনুযায়ী সে জান্নাত অথবা জাহান্নামের অধিকারী হবে। অতএব মানুষ যেন লক্ষ্যচ্যুত না হয়।

---

১৮০. বুখারী হা/২৯৯৬, মিশকাত হা/১৫৪৪ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১।
১৮১. মুসলিম হা/২৮১৬, মিশকাত হা/২৩৭২ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ-৫।

সূরা বুরূজ (নক্ষত্ররাজি)

সূরা শাম্স-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮৫, আয়াত ২২, শব্দ ১০৯, বর্ণ ৪৫৯।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴿١﴾

(১) শপথ নক্ষত্রশোভিত আকাশের

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ﴿٢﴾

(২) শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ﴿٣﴾

(৩) শপথ সাক্ষ্যদাতার ও উপস্থিতগণের।

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ﴿٤﴾

(৪) অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴿٥﴾

(৫) বহু ইন্ধনযুক্ত আগুনওয়ালারা।

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ﴿٦﴾

(৬) যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল

وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿٧﴾

(৭) এবং বিশ্বাসীগণের সাথে যে আচরণ তারা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٨﴾

(৮) তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল কেবল এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মহাপরাক্রান্ত ও মহাপ্রশংসিত আল্লাহ্র উপরে।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٩﴾

(৯) যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿١٠﴾

(১০) নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নির্যাতন করেছে, অতঃপর তারা তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং রয়েছে তীব্র দহন জ্বালা।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿١١﴾

(১১) পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। আর এটাই হ'ল বড় সফলতা।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾

(১২) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

(১৩) তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করেন।	اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيۡدُ ﴿١٣﴾
(১৪) তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,	وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُ ﴿١٤﴾
(১৫) তিনি আরশের মালিক, তিনি মহিমাময়।	ذُو الۡعَرۡشِ الۡمَجِيۡدُ ﴿١٥﴾
(১৬) তিনি যা চান তাই করেন।	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيۡدُ ﴿١٦﴾
(১৭) তোমার কাছে সেনাদলের খবর পৌঁছেছে কি?	هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ الۡجُنُوۡدِ ﴿١٧﴾
(১৮) ফেরাঊনের ও ছামূদের?	فِرۡعَوۡنَ وَثَمُوۡدَ ﴿١٨﴾
(১৯) বরং কাফেররা মিথ্যারোপে লিপ্ত আছে।	بَلِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فِيۡ تَكۡذِيۡبٍ ﴿١٩﴾
(২০) অথচ আল্লাহ তাদেরকে চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন।	وَّاللّٰهُ مِنۡ وَّرَآئِهِمۡ مُّحِيۡطٌ ﴿٢٠﴾
(২১) বরং এটি মর্যাদামণ্ডিত কুরআন,	بَلۡ هُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِيۡدٌ ﴿٢١﴾
(২২) যা সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।	فِيۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ ﴿٢٢﴾

বিষয়বস্তু :

(ক) আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনার অপরাধে বিগত যুগের জনৈক বাদশাহ কর্তৃক একদল মুমিনকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। (খ) অতঃপর ফেরাঊন ও ছামূদ জাতির ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে কষ্টদানকারী মক্কার মুশরিক নেতৃবৃন্দ এবং মুমিন নর-নারীদের নির্যাতনকারী সকল যুগের যালেমদের ধ্বংস করে দেবার হুমকির বিষয়টি কঠোর ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। (গ) সাথে সাথে মযলূম মুমিনদের পরকালীন সফলতা বর্ণনা করা হয়েছে।

তাফসীর :

(১) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ 'শপথ নক্ষত্রশোভিত আকাশের'।

بُرُوْجٌ -এর একবচন بُرْجٌ অর্থ প্রকাশিত হওয়া। এ কারণে নারীর পর্দাহীনতাকে تَبَرُّجٌ বলা হয়। একই কারণে উঁচু টাওয়ারকে এবং গুম্বজকে 'বুর্জ' বলা হয়। এখানে অর্থ হ'ল 'গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি'। কেননা তা উচ্চাকাশে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। بُرُوْجٌ অর্থ 'রাশিচক্র' করা ভুল। যেমন রাশি গণনার মাধ্যমে মানুষের শুভাশুভ নির্ধারণকারী তথাকথিত জ্যোতিষীরা ও 'কোয়ান্টাম' অনুসারীরা করে থাকেন। অথচ ভাগ্যনিয়ন্তা হলেন আল্লাহ। এতে মানুষের বা অন্য কারু কোন হাত নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ 'অদৃশ্যের চাবিসমূহ কেবল তাঁর (আল্লাহ্র)

কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না' *(আন'আম ৬/৫৯)*। তিনি স্বীয় নবীকে বলেন, قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ 'তুমি বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত আমি আমার নিজের জন্য ভাল বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। যদি আমি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তাহ'লে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না' *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*।

হিন্দু জ্যোতিষীরা তাদের দেবতাদের নামানুসারে শনি, রবি, সোম, মঙ্গল প্রভৃতি বাংলা সাতটি বারের ন্যায় আকাশের সাতটি গ্রহের নামকরণ করেছেন। অথচ এখনকার গণনায় গ্রহের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অতঃপর তাদের কক্ষপথসমূহে বারোটি রাশি আছে বলে কল্পনা করেছেন ও নিজেদের পসন্দমত নামকরণ করেছেন। যথা : মেষ (ভেড়া), বৃষ (মহিষ), মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এইসব গ্রহ ও রাশির প্রভাবে পৃথিবীতে খরা, বৃষ্টি ও মানুষের মঙ্গলামঙ্গল হয়ে থাকে বলে তারা বিশ্বাস করেন। অথচ কেবলমাত্র এটাই সত্য, যা কুরআন বলেছে যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় আল্লাহ মাসের গণনা ১২টি করেছেন' *(তওবা ৯/৩৬)*। সূর্যের আবর্তন-বিবর্তনে যা পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় এবং গ্রীষ্মকাল-শীতকাল ইত্যাদি ঋতু বৈচিত্র্য একই কারণে হয়ে থাকে।

অনেক তাফসীরে بُرُوْجٌ-এর অনুবাদ 'রাশিচক্র' করা হয়েছে, যা মূল শব্দের স্পষ্ট বিরোধী। কেননা 'বুরূজ' অর্থ 'প্রকাশ্য'। অথচ কেবল নক্ষত্ররাজিই হ'ল প্রকাশ্য, যা খালি চোখে দেখা যায়। সূর্য ও চন্দ্র অন্যতম নক্ষত্র, যা আল্লাহ্র হুকুমে দিবসে ও রাত্রিতে প্রকাশিত হয় এবং যা সর্বদা প্রাণীকুলের সেবায় নিয়োজিত *(লোকমান ৩১/২০)*। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি কারু মঙ্গলামঙ্গলের ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 'আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্যতম হ'ল রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়। তোমরা সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার প্রতিপালক বলেছেন, আমার বান্দা মুমিন ও কাফের হয়ে যাবে। এক্ষণে যে বলে আল্লাহ্র রহমতে ও তাঁর অনুগ্রহে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে (مُطِرنا بفضل الله ورحمته) সে ব্যক্তি আমার উপর বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের উপর অবিশ্বাসী। পক্ষান্তরে যদি সে বলে, অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তাহ'লে সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী'।[১৮২]

১৮২. বুখারী হা/৮৪৬, মুসলিম হা/৭১, মিশকাত হা/৪৫৯৬।

এতে বুঝা যায় যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর ঈমান আনা কুফরী কাজ। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 'যে ব্যক্তি ভাগ্যগণনাকারী অথবা জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ শরী'আতের সাথে কুফরী করে।[১৮৩] কিন্তু যদি কেউ এতে বিশ্বাসী না হয়েও এদের কাছে যায়, তবে সেটাও সম্পূর্ণরূপে হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 'যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং তার কাছে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না'।[১৮৪]

নমরূদের রাজত্বকালে তারকাপূজারীদের বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আঃ) লড়াই করেছিলেন এবং এসবের স্রষ্টা আল্লাহ্র প্রতি ইবাদতের জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কুরআনের আহ্বানও সেদিকে। যা তাওহীদে ইবাদতের মূলকথা। অথচ তাফসীরকারগণ অনেকে নিজেদের অজান্তে মুশরিক জ্যোতিষীদের খপ্পরে পড়ে গেছেন।[১৮৫] বস্তুতঃ

---

১৮৩. আহমাদ হা/৯৫৩২, আবূদাঊদ হা/৩৯০৪, মিশকাত হা/৪৫৯৯।

১৮৪. মুসলিম হা/২২৩০, মিশকাত হা/৪৫৯৫।

১৮৫. দুর্ভাগ্য, এই শিরকী বিশ্বাসকে মানুষের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করার জন্য বিভিন্ন নভোথিয়েটারে সৌরজগত প্রদর্শনের নামে প্রতিদিন এইসব রাশিগুলিই দেখানো হয় এবং বিভিন্ন পঞ্জিকায় ও পত্রিকায় রাশিফল প্রচার করা হয়। এগুলি মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। তাওহীদ বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরানোর আরেকটি শয়তানী ফাঁদ 'কোয়ান্টাম মেথড'-এর নেতারা একই উদ্দেশ্যে এই আয়াতকে তাদের প্রতারণার পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। অতএব জান্নাতপিয়াসী মুমিনগণ সাবধান!

উল্লেখ্য যে, জ্যোতিষীরা ভাগ্য গণনার জন্য প্রাচীন যুগেই তৈরী করেছেন রাশিচক্র। রাশিচক্র মাকড়শার জালের মত একটি চক্রাকার চিত্র, যাতে সূর্যের গতিপথ অনুসারে ১২টি রাশি স্থির করা হয়েছে। সেখানে বিশেষ কোন দিনে নক্ষত্রমণ্ডলের পটভূমিতে দেখানো হয় বিভিন্ন গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান। এই অবস্থান অনুসারে নেওয়া হয় ভাগ্য গণনার সিদ্ধান্ত। পশ্চিমা বিশ্বে 'শুক্র' (ভেনাস)-কে প্রেমের দেবী বলা হয়। অতএব শুক্র যদি রাশিচক্রের বিশেষ স্থানে থাকে, তাহ'লে জ্যোতিষীরা বলে থাকেন জাতকের উপর প্রেম ভর করেছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় পুরাণে 'শুক্র' অসুরদের গুরু। অতএব ভারতীয় মতে জ্যোতিষীরা বলে থাকেন, জাতকের উপর প্রেমের বদলে হিংস্রতা ভর করেছে। ফলে কোন ব্যক্তি পশ্চিমাদের রাশিচক্র অনুসারে প্রেমে ডুববে এবং ভারতীয় মতে হিংস্রতায় মেতে উঠবে; যা পরস্পর বিরোধী। এছাড়াও পশ্চিমারা সূর্যের হিসাবে ভাগ্য গণনা করে এবং ভারতীয়রা চন্দ্রের হিসাবে গণনা করে। সবকিছুই কাল্পনিক। ফলে মতভেদ স্বাভাবিক।

بُرُوْجٌ শব্দটি কুরআনের চার জায়গায় এসেছে। যথা সূরা নিসা ৭৮, হিজর ১৬, ফুরক্বান ৬১ ও বুরূজ ১। এগুলির মধ্যে সূরা নিসা ৭৮ আয়াতে 'বুরূজ' অর্থ দুর্গসমূহ। কারণ এখানে مُشَيَّدَة বিশেষণ রয়েছে, যার অর্থ সুদৃঢ়। তাছাড়া পৃথিবীতে সামরিক দুর্গগুলি অন্যের থেকে পৃথক ও সুপ্রকাশিত। বাকী তিনটি আয়াতে 'বুরূজ' অর্থ নক্ষত্ররাজি, যা আকাশে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উক্ত আয়াত তিনটির অনুবাদে অনেকের ভুল হয়েছে। যেমন (১) মাওলানা মহিউদ্দীন খান بـــرج অর্থ হিজর ১৬ ও ফুরক্বান ৬১ আয়াতে করেছেন 'রাশিচক্র'। কিন্তু সূরা বুরূজ ১ আয়াতে অর্থ করেছেন 'শপথ গ্রহ-নক্ষত্রশোভিত আকাশের' যা সঠিক। অতঃপর তিনি পরবর্তী দার্শনিক তাফসীরবিদদের ধারণাসমূহের প্রতিবাদ করেছেন। যেমন সমগ্র আকাশমণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগকে بـــرج বলা হয়। তাদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব বুর্জ-এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ এখানে অবতরণ করে ইত্যাদি। (২) ড. মুজীবুর রহমান আগের দু'টির অনুবাদ ঠিক করেছেন। কিন্তু সূরা বুরূজে এসে করেছেন 'রাশিচক্র'। (৩)

জ্যোতিষ শাস্ত্র মুশরিকদের তৈরী একটি জাহেলী শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের প্রভাবে একসময় ফেরাঊনী অত্যাচারে হাযার হাযার ইস্রাঈলী শিশুর জীবন গেছে। পরে আল্লাহ্র রহমতে মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাবে এর স্রোত দমিত হয়। পরবর্তীতে সুলায়মান (আঃ) এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ইসলাম আসার পর এটা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীকদের অনুসরণে কিছু নামধারী মুসলিম পুনরায় এর পিছনে ছুটেছেন। তারা কুরআনের সূরা নহল ১৬ আয়াত ও তার সমমর্মের আন'আম ৯৭ আয়াতকে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। সেইসাথে আলোচ্য আয়াতের 'বুরূজ' শব্দের অপব্যাখ্যা করেছেন 'রাশিচক্র' বলে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ 'নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথ নির্দেশ পায়' *(নাহল ১৬/১৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُـــمُ النُّجُـــومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 'তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার স্থলে ও সমুদ্রে' *(আন'আম ৬/৯৭)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন তিন উদ্দেশ্যে। এক- নিম্ন আকাশকে সুশোভিত করা। দুই- শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ হিসাবে *(মুলক ৬৭/৫)* এবং তিন- পথিকের পথ-নির্দেশের জন্য *(নাহল ১৬/১৬)*। যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি কারণ ব্যতীত অন্য কোন অর্থে এটি ব্যবহার করবে, সে ভুল করবে। সে তার অংশ (ঈমান) নষ্ট করল এবং যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই, তার প্রতি ব্যর্থ চেষ্টা করল'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে এমন বিষয়ে অনর্থক চেষ্টা করল, যে বিষয়ে নবী ও ফেরেশতাদেরও কোন জ্ঞান নেই *(রাযীন)*।[১৮৬]

(২) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ 'শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের'। অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসের।

(৩) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ' শপথ সাক্ষ্যদাতার ও উপস্থিতগণের'।

ই. ফা. বা. (ঢাকা) ফুরক্বান ৬১-এর অনুবাদ 'রাশিচক্র' করেছে। অথচ বাকী দু'টিতে 'গ্রহ-নক্ষত্র' ও 'বুর্জশোভিত' লিখেছে। এতে বুঝা যায়, বুর্জ-এর অর্থ তাঁদের কাছে পরিষ্কার নয়। (৪) ইংরেজী তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী অর্থ ও ব্যাখ্যা করেছেন Zodiacal Signs ১২টি 'রাশিচক্রের প্রতীকসমূহ' *(হিজর ১৫/১৬ টীকা ১৯৫০)*। (৫) মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আবুবকর আল-জাযায়েরী স্বীয় আয়সারুত তাফাসীরে ১২টি রাশি ও কক্ষপথ বলেছেন। (৬) সঊদী সরকার প্রকাশিত ছালাহুদ্দীন ইউসুফের উর্দূ তাফসীরে পরবর্তী কোন কোন তাফসীরকারের নামে ১২টি রাশি বলা হয়েছে এবং এতে কোন দোষ নেই' বলেছেন *(হিজর ১৬)*। বুরূজ ১-এর তাফসীর ও তার বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে, 'রাশিচক্র যা নক্ষত্রমালার প্রাসাদ ও অট্টালিকার মত। তার আকাশে প্রকাশ ও স্পষ্ট হওয়ার কারণে 'বুরূজ' বলা হয়'। (৭) শায়খ উছায়মীনও ১২টি বুর্জ নামসহ কবিতাকারে লিখেছেন এবং তার মধ্যে ৩টি বসন্তকালের জন্য, ৩টি গ্রীষ্মকালের জন্য, ৩টি শরৎকালের জন্য ও ৩টি শীতকালের জন্য ভাগ করেছেন। তিনি 'বুরূজ' বলতে উক্ত ১২টি 'নক্ষত্রের বিশাল সমষ্টি'-কে বুঝিয়েছেন। অথচ এগুলি স্রেফ ধারণা ও কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা পৃথিবী থেকে আকাশে খোলা চোখে কেবল ১২টি নয়, বরং অগণিত নক্ষত্ররাজি দেখা যায়। তাদের কক্ষপথ বা রাশিচক্র কিছুই দেখা যায় না। আর কুরআন সর্বদা মানুষের জন্য সহজবোধ্য উদাহরণসমূহ পেশ করে থাকে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

১৮৬. বুখারী তা'লীক্ব; মিশকাত হা/৪৬০২ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অধ্যায়।

আল্লাহ এখানে তিনটি বস্তুর শপথ করেছেন। নক্ষত্রশোভিত আকাশের, ক্বিয়ামত দিবসের এবং ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত 'শাহেদ' ও 'মাশহূদের'। অর্থাৎ দুনিয়ার আদালতে আসামী ও সাক্ষী হাযির হওয়ার ন্যায় ঐদিন আল্লাহ্র আদালতে জিন-ইনসান ও তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্যদাতাগণ সকলের শপথ।

ইমাম বাগাভী বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে শাহেদ ও মাশহূদ অর্থ জুম'আর দিন ও আরাফাহ্র দিন *(ইবনু কাছীর)*। কারণ ঐদিন সকলে উপস্থিত হয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের সাক্ষী হয়। বস্তুতঃ বিদ্বানগণ কারণ বিবেচনায় কোন বিষয়কে খাছ করলেও আয়াতের বক্তব্যটি 'আম। যা দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যপ্ত।

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেন, هل سألت أحدا قبلى؟ 'তুমি কি আমার পূর্বে কাউকে এ প্রশ্ন করেছ'? লোকটি বলল, হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছেন, কুরবানীর দিন এবং জুম'আর দিন। তখন হাসান (রাঃ) বললেন, না। বরং 'শাহেদ' অর্থ মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অতঃপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاَءِ شَهِيْداً– 'আর সেদিন কি অবস্থা হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হ'তে একজন সাক্ষ্যদাতাকে (অর্থাৎ তাদের নবীকে) ডেকে আনব এবং তোমাকে দাঁড় করাবো তাদের সকলের উপরে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে' *(নিসা ৪/৪১)*। অতঃপর তিনি বলেন, 'মাশহূদ' অর্থ ক্বিয়ামতের দিন। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ– 'সেটি এমন এক দিন, যেদিন সকল মানুষ একত্রিত হবে। আর সেদিনটি যে হাযির হওয়ার দিন' *(হূদ ১১/১০৩; ইবনু কাছীর)*।

তাছাড়া অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَّنَذِيْراً 'হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি' *(আহযাব ৩৩/৪৫)*। বস্তুতঃ ক্বিয়ামতের দিন আগে-পিছের সকল উম্মত একত্রে সমবেত হবেন। যাদের সাক্ষ্যদাতা হবেন স্ব স্ব নবীগণ এবং সকলের সাক্ষী হবেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এছাড়া বিগত সকল উম্মতের উপর সাক্ষী হবে উম্মতে মুহাম্মাদী এবং রাসূল (ছাঃ) হবেন তাদের উপর সাক্ষী' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। এতদ্ব্যতীত সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকবেন প্রত্যেক মানুষের সার্বক্ষণিক সাথী ও সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতামণ্ডলী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ 'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষ্যদাতা' *(ক্বাফ ৫০/২১)*। সাক্ষী হবে মানুষের ত্বক ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/২০-২২; নূর ২৪/২৪; ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ বলার পরেই وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ বলাতে শেষোক্ত ব্যাখ্যার যথাযর্থতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(৪-৭) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ– 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা'। 'বহু ইন্ধনযুক্ত আগুনওয়ালারা'। 'যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল'। 'এবং বিশ্বাসীগণের সাথে যে আচরণ তারা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল'।

ফার্রা বলেন, পূর্বের আয়াতসমূহে বর্ণিত শপথের জওয়াব হিসাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে। হযরত ঈসা ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া একটি হৃদয় বিদারক ঘটনার খবর দিয়ে অত্র আয়াতগুলিতে যালেমদের উপরে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গর্তওয়ালারা অভিশপ্ত হয়েছে। যারা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে মুমিন নর-নারীদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং এই মর্মান্তিক দৃশ্য বসে বসে উপভোগ করেছে।

(৪) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা'।

এখানে قُتِلَ অর্থ لُعِنَ অভিশপ্ত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُلُّ شَيْئٍ فِى الْقُرْآنِ قُتِلَ فَهُوَ لُعِنَ 'কুরআনে যেখানেই قُتِلَ এসেছে, সেখানেই তার অর্থ হবে لُعِنَ অর্থাৎ অভিশপ্ত হয়েছে *(কুরতুবী)*।

ফার্রা বলেন, قُتِلَ-এর পূর্বে একটি 'লাম তাকীদ' (لَ) উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَقُتِلَ 'অবশ্যই ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা'। যেমন وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 'সূর্য ও প্রভাতকালের শপথ' করার পর পরপর ৭টি শপথ শেষে আল্লাহ বলছেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 'যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করেছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে' *(শাম্স ৯১/৯)*।

الْأُخْدُوْدُ অর্থ الحفر المستطيل فى الارض 'ভুগর্ভের দীর্ঘ বড় গর্ত'। এর উৎপত্তি خَدٌّ থেকে। যার অর্থ 'মুখগহ্বর'। এখানে অগ্নিগহ্বর বুঝানো হয়েছে।

(৫) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ 'বহু ইন্ধনযুক্ত আগুনওয়ালারা'।

পূর্ব বাক্যের الْأُخْدُوْدُ হ'তে بدل الاشتمال হয়েছে। অর্থাৎ বহু ইন্ধনযুক্ত আগুনের গর্ত। الْوَقُوْدُ অর্থ ইন্ধন। কোন কোন বিদ্বান ذَاتُ الْوَقُوْدِ পড়েছেন। যার অর্থ أحرقتهم النار ذات الوقود 'বহু দাহিকাশক্তি সম্পন্ন আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে দিল' *(কুরতুবী)*।

'গর্তওয়ালারা অভিশপ্ত হয়েছে' বলে তাদের পরকালীন ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। ইহকালে গর্তওয়ালা যালেমরা জিতে গেলেও মানবতার কাছে ওরা চিরদিনের জন্য পরাজিত হয়েছে এবং ইতিহাসে ঘৃণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নিহত ঈমানদার নর-নারীগণ চিরকালের জন্য বরণীয় ও সম্মানিত হয়েছে।

(৬) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ 'যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল'।

(৭) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ 'এবং বিশ্বাসীগণের সাথে যে আচরণ তারা করেছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল'।

গর্তওয়ালা কারা?

(১) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, ইয়ামনের ইহুদী বাদশাহ ইউসুফ যু-নুওয়াস বিন তুব্বা' আল-হিমইয়ারী জানতে পারলেন যে, নাজরানের পৌত্তলিক অধিবাসীরা সব তাওহীদবাদী ঈসায়ী হয়ে গেছে জনৈক আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছামির (عبد الله بن الثامر) নামক ছোট্ট বালকের ইবাদতগুযারী ও তার অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে মুগ্ধ হয়ে। যু-নুওয়াস নাজরানবাসীকে এখতিয়ার দিলেন। হয় তারা শিরকপন্থী ইহুদী হবে, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে। এতে নাজরানবাসীগণ মৃত্যুকে বেছে নিল। তথাপি তাওহীদবাদী ঈসায়ী ধর্ম ছাড়তে রাযী হ'ল না। তখন বাদশাহ অনেকগুলি গভীর ও দীর্ঘ অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে সেখানে তার সেনাবাহিনীর মাধ্যমে একদিন সকালেই প্রায় ২০ হাযার জীবন্ত নর-নারী ও শিশুকে পুড়িয়ে হত্যা করেন। একজন মাত্র ব্যক্তি দাওস যু-ছা'লাবান (دوس ذو ثعلبان) কোনক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি গিয়ে শামের রোম সম্রাট ক্বায়ছারকে খবর দেন। তিনি হাবশার শাসক নাজাশীকে নির্দেশনামা পাঠান। নাজাশী তখন আরিয়াত্ব ও আবরাহা (أرياط و أبرهة) নামক দুই সেনাপতির অধীনে একদল খ্রিষ্টান সেনা পাঠিয়ে দেন। তারা গিয়ে ইয়ামনকে ইহুদী দুঃশাসন থেকে মুক্ত করেন। যা পরবর্তী ৭০ বছর অব্যাহত থাকে। ইউসুফ যু-নুওয়াস পালিয়ে গিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেন।[১৮৭]

(২) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, নাজরানবাসীরা ইতিপূর্বে মূর্তিপূজারী ছিল। সেখানে একজন ঈসায়ী ধর্মযাজকের আবির্ভাব ঘটে। যিনি রাস্তার ধারে তাঁবু টাঙিয়ে সর্বদা সেখানে ছালাত ও ইবাদতে রত থাকতেন। এর মধ্যে জাদুবিদ্যা শিক্ষাকারী জনৈক বালক আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছামির যাওয়া-আসার পথে উক্ত ঈসায়ীর কাছে উঠা-বসার মাধ্যমে ঈসায়ী হয়ে যায় এবং এক আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে নিষ্ঠাবান ধার্মিকে পরিণত হয়। তার মাধ্যমে অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড

১৮৭. তাফসীর ইবনে কাছীর; সীরাতে ইবনে হিশাম (মিসর : বাবী হালবী প্রেস, ২য় সংস্করণ ১৩৭৫ হিঃ/১৯৫৫ খৃঃ) ১/৩৭ পৃঃ।

সম্পাদিত হ'তে থাকে। বহু লোক নানাবিধ রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ থেকে মুক্ত হ'তে থাকে। ফলে তারা সব ঈসায়ী হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম আসার পর বিগত ইহুদী-নাছারা ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন ইসলাম হ'ল মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। এর বাইরে কোন ধর্ম আল্লাহ্র নিকট কবুলযোগ্য নয় *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

লোকদের দলে দলে ঈসায়ী হওয়ার খবর পেয়ে নাজরানের পৌত্তলিক শাসক ঐ বালককে গ্রেফতার করে রাজদরবারে এনে বলেন, أفسدتَ عليَّ أهلَ قريتي وخالفتَ ديني ودينَ آبائي: لأُمثِّلَنَّ بك- 'তুমি আমার উপরে আমার জনগণকে বিগড়ে দিয়েছ। তুমি আমার ও আমার বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করেছ। আমি তোমার হাত-পা কেটে দেব'। তারপর বালককে হত্যা করার নানাবিধ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন বালক বলে যে, আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবেন। বাদশাহ তাই করলেন এবং বালককে হত্যা করলেন। কিন্তু তিনিও সেখানেই ধ্বংস হয়ে গেলেন। তখন থেকেই নাজরানে ঈসায়ী ধর্ম শিকড় গাড়ে।[১৮৮] যা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যামানা পর্যন্ত ছিল এবং পরে তারা সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়।

(৩) ইমাম আহমাদ *(হা/২৩৯৭৬)*, মুসলিম *(হা/৩০০৫)*, তিরমিযী *(হা/৩৩৪০)* প্রমুখ ছোহায়েব রূমী (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে এ বিষয়ে যে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

প্রাক-ইসলামী যুগের জনৈক বাদশাহ্র একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য একজন বালককে তার নিকটে জাদুবিদ্যা শেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। যাতায়াতের পথে একটি গীর্জায় একজন ঈসায়ী ধর্মযাজক ছিলেন। বালকটি দৈনিক তার কাছে বসত। ঈসায়ী ধর্মযাজকের বক্তব্য শুনে সে ঈসায়ী হয়ে যায়। কিন্তু তা গোপন রাখে। একদিন দেখা গেল যে, বড় একটি হিংস্র জন্তু (সিংহ) রাস্তা আটকে দিয়েছে। লোকেরা ভয়ে আগাতে পারছে না। বালকটি মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, পাদ্রীর দাওয়াত সত্য, না জাদুকরের দাওয়াত সত্য। সে একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়ে বলল, اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس- 'হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর দাওয়াত তোমার নিকটে জাদুকরের দাওয়াতের চাইতে অধিক পসন্দনীয় হয়, তাহ'লে এই জন্তুটাকে তুমি মেরে ফেল, যাতে লোকেরা যাতায়াত করতে পারে' বলেই সে পাথরটি নিক্ষেপ করল এবং জন্তুটি সাথে সাথে মারা পড়ল। এখবর পাদ্রীর কানে পৌঁছে গেল। তিনি বালকটিকে

১৮৮. তাফসীর কুরতুবী; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৫ পৃঃ।

ডেকে বললেন, يا بنى أنت أفضل منى وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدلّ علىّ 'হে বৎস! তুমি আমার চাইতে উত্তম। তুমি অবশ্যই সত্বর পরীক্ষায় পতিত হবে। যদি হও, তবে আমার কথা বলো না'। বালকটির কারামত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার মাধ্যমে অন্ধ ব্যক্তি চোখ ফিরে পেত। কুষ্ঠরোগী সুস্থ হ'ত এবং অন্যান্য বহু রোগ ভাল হয়ে যেত। ঘটনাক্রমে বাদশাহ্র এক মন্ত্রী ঐ সময় অন্ধ হয়ে যান। তিনি বহুমূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে বালকটির নিকটে আগমন করেন। বালকটি তাকে বলে, ما أنا أشفى أحدًا إنما يشفى الله فإن أنت أمنت بالله دعوت الله فشفاك– 'আমি কাউকে রোগমুক্ত করি না। এটা কেবল আল্লাহ করেন। এক্ষণে যদি আপনি আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করব। অতঃপর তিনিই আপনাকে সুস্থ করবেন'। মন্ত্রী ঈমান আনলেন। বালক দো'আ করল। অতঃপর তিনি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন। পরে রাজদরবারে গেলে বাদশাহ্র প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আমার পালনকর্তা আমাকে সুস্থ করেছেন। বাদশাহ বলেন, তাহ'লে আমি কে? মন্ত্রী বললেন, لا، بل ربى وربك الله– 'না। বরং আমার ও আপনার পালনকর্তা হ'লেন আল্লাহ'। তখন বাদশাহ্র হুকুমে নির্যাতন শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি উক্ত বালকের নাম বলে দেন। তখন বালককে ধরে এনে একই প্রশ্নের একই জবাব পেয়ে তার উপরেও চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। ফলে এক পর্যায়ে সে পাদ্রীর কথা বলে দেয়। তখন বৃদ্ধ পাদ্রীকে ধরে আনলে তিনিও একই জওয়াব দেন। বাদশাহ তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে বললে তারা অস্বীকার করেন। তখন পাদ্রী ও মন্ত্রীকে জীবন্ত করাতে চিরে তাদের মাথাসহ দেহকে দু'ভাগ করে ফেলা হয়। এরপর বালকটিকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার হুকুম দেয়া হয়। কিন্তু তাতে বাদশাহ্র লোকেরাই মারা পড়ে। অতঃপর তাকে নদীর মধ্যে নিয়ে নৌকা থেকে ফেলে দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও বালক বেঁচে যায় ও বাদশাহ্র লোকেরা ডুবে মরে। দু'বারেই বালকটি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেছিল, اَللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ 'হে আল্লাহ! এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর যেভাবে তুমি চাও'। পরে বালকটি বাদশাহকে বলে, আপনি আমাকে কখনোই মারতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি আমার কথা শুনবেন। বাদশাহ বললেন, কি সে কথা? বালকটি বলল, আপনি সমস্ত লোককে একটি ময়দানে জমা করুন। অতঃপর একটা তীর নিয়ে আমার দিকে নিক্ষেপ করার সময় বলুন, بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلاَمِ 'বালকটির পালনকর্তা আল্লাহ্র নামে'। বাদশাহ তাই করলেন এবং বালকটি মারা পড়ল। তখন উপস্থিত হাযার হাযার মানুষ সমস্বরে বলে উঠল, آمَنَّا بِرَبِّ هَذَا الْغُلاَمِ 'আমরা বালকটির প্রভুর উপরে ঈমান আনলাম'। তখন বাদশাহ বড় বড় ও দীর্ঘ গর্ত খুঁড়ে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে সবাইকে হত্যা করেন। নিক্ষেপের আগে প্রত্যেককে

তাওহীদ বর্জনের বিনিময়ে মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু কেউ তা মানেনি। শেষ দিকে একজন মহিলা তার শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। হঠাৎ কোলের অবোধ শিশুটি বলে ওঠে, اِصْبِرِي يَا أُمَّاهُ، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ 'ধৈর্য ধরো মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছো'। তখন বাদশাহ্র লোকেরা মা ও শিশুপুত্রকে একসাথে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে'। তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী ঐদিন ৭০ হাযার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয় *(সনদ জাইয়িদ)*। তবে একথাটি রাবী ছোহায়েব রূমীর হ'তে পারে। কেননা তাঁর নিকট নাছারাদের ইল্ম ছিল *(ইবনু কাছীর)*।

উল্লেখ্য যে, বিগত যুগে গর্তওয়ালা যালেম সম্রাট ছিল তিনজন। ১. আলোচ্য ইয়ামনের বাদশাহ ইউসুফ যু-নুওয়াস বিন তুব্বা'। ২. রোম সম্রাট কনস্টান্টাইন বিন হিলাসী। যখন সিরিয়ার খ্রিষ্টানরা তাওহীদ ছেড়ে ক্রুশ পূজা শুরু করে। তখন তিনি তাদের পুড়িয়ে মারেন। ৩. পারস্য (বাবেল) সম্রাট বুখতানছর। যখন তিনি তাকে সিজদা করার জন্য লোকদের নির্দেশ দেন। তখন (নবী) দানিয়াল ও তাঁর সাথীগণ এতে নিষেধ করেন। ফলে সম্রাট তাদের আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন'।[১৮৯] ইবনু কাছীর বলেন, আরবের অন্তর্ভুক্ত ইয়ামনের নাজরানবাসীদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা কুরআনে অত্র সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পারস্য সম্রাট ও রোম সম্রাটের মানুষ পুড়িয়ে মারার ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে কিছুই বর্ণিত হয়নি *(ইবনু কাছীর)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

উপরে বর্ণিত কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহপাক অত্র আয়াতগুলি নাযিল করেন ও মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের সান্ত্বনা দেন। যাহহাকের বর্ণনা মতে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মবর্ষে ইয়ামনের বুকে ঘটে যাওয়া *(কুরতুবী)* এই হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় ছাহাবা ও উম্মতকে সাবধান করেছেন যেন তারা দুনিয়াবী লাভের চিন্তায় শাসন-নির্যাতনের মুখে ঈমান থেকে বিচ্যুত না হয় এবং আখেরাতকে হাতছাড়া না করে।

উক্ত ঘটনায় দেখা গেছে যে, ঐ বৃদ্ধ পাদ্রী ও মন্ত্রীকে মাথায় করাত দিয়ে জীবন্ত চিরে দু'ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তথাপি তারা ঈমান ত্যাগ করেননি। ছোট্ট বালকটির ঈমান ও ধৈর্য আরও বেশী বিস্ময়কর। সে বাদশাহকে নিজের মৃত্যুর পদ্ধতি বলে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মৃত্যুবরণের চেয়ে সত্যকে রক্ষা করা তার নিকটে অনেক বেশী মূল্যবান। বস্তুতঃ বালকটির এই সত্যনিষ্ঠা ও হাসিমুখে মৃত্যুবরণের দৃশ্য হাযার হাযার মানুষের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে এবং তারা সবাই সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যায়। পরবর্তীতে তারাও হাসিমুখে ঈমানের বিনিময়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। একেই বলে 'জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি, শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দেগানি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, –أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ 'শ্রেষ্ঠ জিহাদ হ'ল যালেম

১৮৯. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩১, টীকা-২।

শাসকের সামনে হক কথা বলা'।[১৯০] তিনি আরও বলেন, لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئاً وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ– 'তুমি শিরক কর না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় ও জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়'।[১৯১]

বালকটিকে হত্যার পরপরই তার অনুসারী হাযার হাযার নারী-পুরুষকে শিরক বর্জন করে তাওহীদ বরণ করার অপরাধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে খুবায়েব, আছেম, ইয়াসির পরিবার কি এর অন্যতম উদাহরণ নয়? যুগে যুগে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এরূপ অত্যাচার-নির্যাতন মুমিন নর-নারীর উপর হ'তে থাকবে। এরপরেও ইসলাম যিন্দা থাকবে। বরং তা একদিন ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি মাটির ঘরে ও ঝুপড়ি ঘরে প্রবেশ করবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।[১৯২] ইসলামের বিজয় ও অগ্রযাত্রাকে রোখার ক্ষমতা যালেমদের হবে না। তবে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী গভীর ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যথাযোগ্য প্রস্তুতিসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে *(আনফাল ৮/৬০)।*

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইহুদী অত্যাচারী শাসক ইউসুফ যু-নুওয়াসের ধ্বংসের পর ক্ষমতায় বসা খ্রিষ্টান গভর্ণর আবরাহা কা'বাগৃহের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে একই বছরে মক্কা অভিযান করেন এবং আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যান। অত্যাচারী ইহুদী শাসক ইউসুফ যু-নুওয়াস এবং ক্ষমতাগর্বী খ্রিষ্টান শাসক আবরাহা উভয়ের ধ্বংসের ঘটনা ঘটে যায় স্রেফ তাওহীদ ও শিরকের আদর্শিক সংঘাতের কারণে। দু'টি ঘটনাতেই তাওহীদের বিজয় হয়। মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় এরূপ ঘটনাবলীকে 'ইরহাছাত' (من باب إلارهاص) -এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। যা ভবিষ্যৎ নবী আগমনের ভিত্তি ও নিদর্শন স্বরূপ ছিল। মানুষের সসীম জ্ঞান যা বুঝতে সর্বদা অক্ষম।

(৬-৭) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ 'যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল'। 'এবং বিশ্বাসীগণের সাথে যে আচরণ তারা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল'।

এখানে إِذْ-এর عامل হ'ল পূর্ববর্তী বাক্যের قُتِلَ অর্থাৎ তারা অভিশপ্ত হয়েছে তখনই, যখন তারা অগ্নিকুণ্ডে তাদের নিক্ষেপ করছিল এবং তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল। عَلَيْهَا অর্থ عندها 'অগ্নিকুণ্ডের পাশে'। يَفْعَلُوْنَ-এর উহ্য কর্তা হ'ল 'কাফেররা'। عَلَى অর্থ مع অর্থাৎ মুমিনদের সাথে যে ব্যবহার করা হচ্ছিল'। এখানে 'তারা বসে বসে প্রত্যক্ষ করছিল'

১৯০. তিরমিযী হা/২১৭৪; মিশকাত হা/৩৭০৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।
১৯১. আহমাদ; মিশকাত হা/৬১; ছহীহাহ হা/৯১৪।
১৯২. আহমাদ হা/২৩৮৬৫; মিশকাত হা/৪২।

বলার মধ্যে শ্লেষমিশ্রিত ক্ষোভ রয়েছে ঐসব লোকদের প্রতি, যারা অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করে না বা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেয় না।

(৮-৯) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ، الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ– 'তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল কেবল এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মহাপরাক্রান্ত ও মহাপ্রশংসিত আল্লাহ্র উপরে'। 'যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন'।

অর্থাৎ উক্ত মযলূম মানুষগুলির একমাত্র অপরাধ ছিল আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা। আর একারণেই তাদের উপরে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল। যদি তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা বাপ-দাদার ধর্মের উপরে টিকে থাকত এবং আল্লাহ্র উপরে ঈমান না আনতো, তাহ'লে তাদের উপরে এই যুলুম নেমে আসত না।

এখানে আল্লাহ স্বীয় ছিফাত হিসাবে 'আযীয' (মহাপরাক্রান্ত) ও 'হামীদ' (মহাপ্রশংসিত) এনেছেন। অতঃপর বলেছেন, যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা এবং তিনি সবকিছু দেখছেন'। একথাগুলির মধ্যে যালেমদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। বরং প্রকাশ্যেই বলে দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারী যত বড় শক্তিশালী হৌক না কেন, তার অত্যাচার প্রতিরোধে তিনি 'আযীয' বা মহাপরাক্রান্ত। আর মযলূমের পক্ষে যালেমদের বদলা নেয়ার জন্য তিনি 'হামীদ' বা চির প্রশংসিত। আসমান ও যমীনের বাইরে পালাবার কোন ক্ষমতা যালেমদের নেই। আর এসবের উপরেই রয়েছে আল্লাহ্র একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরংকুশ মালিকানা। তাই যে কোনভাবেই হৌক আল্লাহ যালেমদের প্রতিশোধ নেবেনই।

وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ 'বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন'। অর্থ عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية 'তিনি তার সৃষ্টজীবের কর্মসমূহ জানেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকেনা'। এর দ্বারা যালেম ও মযলূম উভয়কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। যালেম যেন যুলুম না করে এবং মযলূম যেন ধৈর্য হারিয়ে কুফরী না করে। বরং যালেমদের জানা উচিত যে, তাদের এই যুলুম হ'ল উম্মতের জাগৃতির সোপান (بل هذه النقم هى الموقظات للأمم والأفراد)। মযলূমকে তাই আল্লাহ্র উপর ঈমান রেখে সকল প্রকার বৈধ পথে যালেমকে রুখে দাঁড়াবার সার্বিক প্রস্তুতি নিতে হবে *(আনফাল ৮/৬০)*।

(১০) إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ 'নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নির্যাতন করেছে, অতঃপর তারা তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং রয়েছে তীব্র দহন জ্বালা'।

অর্থাৎ গর্তওয়ালা কাফেররা যেসব নারী-পুরুষকে ঈমান আনার কারণে পুড়িয়ে হত্যা করেছে অথবা মক্কাবাসীরা শেষনবী ও তাঁর সাথীদের উপরে এবং যুগে যুগে যালেমরা ঈমানদারগণের উপরে যেসব নির্যাতন করে চলেছে, অথচ তারা তওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামে দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে। এক তো কুফরীর শাস্তি। দ্বিতীয় ঈমানদারগণকে নির্যাতন করার শাস্তি। জাহান্নামে এই দ্বিগুণ শাস্তি কিভাবে দেওয়া হবে, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন। তবে আমরা যেমন তিনশ' পাওয়ারের হিটার ব্যবহার করি, আবার হাযার পাওয়ারের হিটার ব্যবহার করি। অনুরূপভাবে জাহান্নামের হিটারের সুইচ যাঁর হাতে, তিনি সেখানে কাকে কিভাবে শাস্তি দিবেন, কত মাত্রায় দিবেন, সেটা তিনিই ভাল জানেন। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন -আমীন!

হাসান বাছরী বলেন, أنظروا الى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة- 'আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণা দেখ, তার বন্ধু ঈমানদারগণকে যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করল, তিনি তাদেরকেও তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছেন' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ যদি তারা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ'লে তিনি ঐ দুরাচার কাফেরদের ক্ষমা করে দেবেন। নইলে জাহান্নামে শাস্তি দিবেন। এর মধ্যে মুমিনদের ফিৎনায় নিক্ষেপকারী ও যুগে যুগে নির্যাতনকারী যালেমদের প্রতি যেমন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি তাদেরকে যুলুম থেকে তওবা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এক গভীর দূরদৃষ্টি। কেননা যালেমরা যদি একবার ভেবে নেয় যে, তাদের পাপের কোন ক্ষমা নেই, তাহ'লে তারা যিদ বশে অধিক পাপকাজে উৎসাহী হবে। আর যদি মনে করে যে, তওবা করলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন, তাহ'লে তারা দ্রুত অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে এবং তার জীবনের মোড় পবিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ- 'হে রাসূল! তুমি বলে দাও যে, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের নফসের উপরে যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল গোনাহ মাফ করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

জাহান্নামের আযাব ও দহনজ্বালার আযাবের অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, যালেমদের আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে দু'জায়গাতেই হবে এবং সাধারণতঃ সেটাই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ- 'আমরা অবশ্যই তাদেরকে বড় শাস্তির পূর্বে লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*। নিঃসন্দেহে যালেমদের এই শাস্তি দুনিয়াতেই হবে। নইলে আখেরাতে তো আর ফিরে আসার সুযোগ নেই। আদ, ছামূদ, ফেরাঊন, আবু জাহল, আবু লাহাবসহ বিগত যুগের ও বর্তমান যুগের কোন যালেমই আল্লাহ্‌র এই শাস্তি

থেকে রেহাই পায়নি, পাবেও না। বলা চলে যে, এটা আল্লাহ্র এক সাধারণ নীতি। এছাড়া আখেরাতের কঠিন শাস্তি তো আছেই। যা দুনিয়াবী শাস্তির তুলনায় হাযার গুণ বেশী। যেমন আল্লাহ বলেন, لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللهِ مِنْ وَّاقٍ 'দুনিয়ার জীবনে এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অবশ্যই আখেরাতের আযাব এর চাইতে কঠোরতম। আল্লাহ্র কবল থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই' *(রা'দ ১৩/৩৪)*।

(১১) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ– 'পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। আর এটাই হ'ল বড় সফলতা'।

অর্থাৎ যারা বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা কুসংস্কার ছেড়ে খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, সেইসব ঈমানদার নর-নারীকে যেসব যালেমরা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে, একইভাবে মক্কার মুশরিক নেতারা এবং পরবর্তীকালে যেসব যালেমরা শক্তির জোরে ঈমানদারগণের উপরে যুলুম করে চলেছে, ঐসব ঈমানদার ও সৎকর্মশীল মানুষের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন শান্তিময় জান্নাত, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী ও ঝর্ণাসমূহ এবং এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় সফলতা। যালেমদের দৃষ্টিতে ঈমানদাররা পরাজিত ও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ঈমানদারগণ জয়ী ও সফল হয়েছে। জ্ঞানী ও বিবেকবান সমাজও সেটাই মনে করেন। তা না হ'লে যে নবীগণ দুনিয়াতে কেবল নির্যাতিতই হয়েছেন, মৃত্যুর পরে বিশ্বব্যাপী তাদের অনুসারী দল কিভাবে সৃষ্টি হয়?

সসীম জ্ঞানের মানুষ আল্লাহ্র এ কথায় নিশ্চয়ই হাসবে ও তাচ্ছিল্য করবে। কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের জ্ঞানের বাইরে বহু জিনিস লুকিয়ে আছে, যা তাদের ধারণা ও কল্পনার অলিন্দে কখনোই প্রবেশ করতে পারে না। আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি যালেম সর্বদা জয়ী হচ্ছে ও মযলূম পরাজিত হচ্ছে। যালেম তার অর্থ-বিত্ত ও শক্তির জোরে সর্বত্র বাহবা কুড়াচ্ছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হরহামেশা তাদের প্রশংসাগীতি হচ্ছে। অন্যদিকে নির্দোষ নিরপরাধ মযলূম সদা বদনামগ্রস্ত হচ্ছে। দুনিয়ার এ অবস্থা নিশ্চিতভাবে দাবী করে যে, এমন একটি জগত অপরিহার্য, যেখানে যালেম তার প্রাপ্য শাস্তি পাবে এবং মযলূম তার যথার্থ পুরস্কার পাবে। নিঃসন্দেহে সেই জগতটাই হ'ল আখেরাত। দুনিয়ার সফলতা-ব্যর্থতা চূড়ান্ত কিছু নয়। বরং চূড়ান্ত হ'ল আখেরাতের ফায়ছালা। আল্লাহপাক অত্র আয়াতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল নর-নারীদের জন্য আগাম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। জান্নাত যেন অপেক্ষায় আছে ঈমানদার নর-নারীদের পাবার জন্য। ক্বিয়ামতের দিন যখন তারা সেখানে প্রবেশ করবে, তখন দাররক্ষীসহ চারিদিক থেকে ফেরেশতাগণের অভিবাদনের আওয়ায আসবে সালাম আর সালাম। سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ 'আপনাদের উপর সালাম। আসুন!

শান্তির সাথে চিরকালের জন্য এখানে প্রবেশ করুন'।[১৯৩] নিঃসন্দেহে এটিই হ'ল বড় সফলতা। দুনিয়ায় যার কোন তুলনা নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সেই সফলতা দান করুন- আমীন!

(১২) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ 'নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন'। এর মাধ্যমে যালেমদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

মুবাররাদ বলেন, এটি পূর্ববর্তী শপথের জওয়াব হিসাবে এসেছে অর্থাৎ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ 'নক্ষত্রশোভিত আকাশের শপথ' বলার পরে মধ্যবর্তী বাক্যগুলি শপথের তাকীদ হিসাবে এসেছে। হাকীম তিরমিযীও একথা বলেছেন। অর্থাৎ যারা রাসূল (ছাঃ)-কে অবিশ্বাস করে বা তাঁর আনীত শরী'আতের অবাধ্যতা করে এবং ঈমানদার নর-নারীদের উপর যুলুম করে, তাদের বিরুদ্ধে শপথ করে আল্লাহ বলছেন যে, অবশ্যই তোমার প্রভুর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। যখন তিনি ধরবেন, তখন সেখান থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ আর থাকবে না। অতএব সাবধান হও হে মানুষ! তওবা করে যুলুম ও অবাধ্যতা হ'তে নিবৃত্ত হও! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও!!

আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ 'যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, আমরা তাদের অজান্তে ধীরে ধীরে তাদের পাকড়াও করি'। 'আমি তাদেরকে অবকাশ দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অত্যন্ত মযবুত' *(আ'রাফ ৭/১৮২-৮৩; ক্বলম ৬৮/৪৪-৪৫)*। তিনি বলেন, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 'আর এভাবেই তোমার প্রতিপালক অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত মর্মন্তুদ ও কঠোর' *(হূদ ১১/১০২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমকে অবকাশ দেন। অবশেষে যখন তিনি তাকে ধরেন, তখন আর সুযোগ দেন না। অতঃপর তিনি হূদ ১০২ আয়াতটি পাঠ করেন'।[১৯৪]

(১৩) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ 'তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করেন'। অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেছেন এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবার পরে তিনিই আবার পুনরুত্থান ঘটাবেন। মানুষ মরে মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর হুকুমে ক্বিয়ামতের দিন সবাই পুনর্জীবিত হবে। আর যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা খুবই সহজ। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ

---

১৯৩. যুমার ৩৯/৭৩; ফুরক্বান ২৫/৭৫; ইউনুস ১০/৯-১০।

১৯৪. বুখারী হা/৪৬৮৬; মুসলিম হা/২৫৮৩; মিশকাত হা/৫১২৪।

الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটি তাঁর জন্য অতীব সহজ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সর্বোচ্চ স্থান তাঁরই। তিনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(রূম ৩০/২৭)*।

(১৪-১৫) وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ 'তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। 'তিনি আরশের মালিক, তিনি মহিমাময়'।

অর্থাৎ তিনি তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থনাকারী সকল বান্দার প্রতি ক্ষমাশীল এবং বান্দার প্রতি প্রেমময় ও দয়ার্দ্র্যচিত্ত। কারণ মানুষ হ'ল আল্লাহ্র অত্যন্ত প্রিয় সৃষ্টি, যাকে তিনি নিজ দু'হাতে সৃষ্টি করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)* এবং যাকে দুনিয়ার সকল সৃষ্টির উপরে সম্মানিত করেছেন *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭০)*। তারা পাপ করে তওবা করলে যেমন তিনি ক্ষমা করেন, তেমনি পাপী ও নিরপরাধ সকল বান্দাকে তিনি আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, পানি দিয়ে এক কথায় সকল প্রকার নে'মত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। কারণ তিনি প্রেমময়। তিনি অতীব দয়াশীল ও স্নেহময়। তিনি কেবল মানুষের সৃষ্টিকর্তাই নন; বরং মহান আরশের মালিক। যার বিস্তৃতি এত বিশাল যে, তার মধ্যে 'আসমান ও যমীন সবই পরিবেষ্টিত' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, এখানে الْمَجِيْدُ-এর শেষে পেশ অথবা যের দু'টিই পড়া যাবে। দুটিই ছহীহ। পেশ পড়লে তখন ওটা আল্লাহ্র ছিফাত হবে এবং যের পড়লে আরশ-এর ছিফাত হবে *(ইবনু কাছীর)*।

আরশ ও কুরসী :

হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম। দেখলাম রাসূল (ছাঃ) একা আছেন। তখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বসলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নিকট সর্বোত্তম কোন্ আয়াতটি নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। মনে রেখ, مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلاَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ 'কুরসীর তুলনায় সাত আসমান প্রশস্ত ময়দানে ফেলে রাখা একটি আংটির মত। আর আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ একটি আংটির মত' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, কিতাবুল 'আরশ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, কুরসী বিষয়ে এটি ব্যতীত আর কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই। তিনি বলেন, আরশের পরে কুরসী হ'ল আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় সৃষ্টি এবং দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। 'কুরসী' অর্থ আল্লাহ্র পা রাখার স্থান (موضع القدمين) নয় বা তাঁর ইলম কিংবা রাজত্ব নয়। এসব বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[১৯৫]

১৯৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৯।

(১৬) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ 'তিনি যা চান, তাই করেন'। অর্থাৎ তার হুকুমকে রদ করার ক্ষমতা কারু নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী ও দ্রুত শাস্তি দানকারী' *(রা'দ ১৩/৪১; আন'আম ৬/১১৫, ১৬৫)*। তিনি যা করেন, তাতে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা কারু নেই *(আম্বিয়া ২১/২৩)*। তিনি যদি কাউকে কষ্ট দেন, তা দূর করার কেউ নেই তিনি ব্যতীত। আর তিনি যদি কারু মঙ্গল করেন, তবে সেটাকেও রদ করার ক্ষমতা কারু নেই। সব কিছুর উপরে তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতাশালী। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ *(আন'আম ৬/১৭-১৮; ইউনুস ১০/১০৭)*।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে দেখতে আসা ছাহাবীগণ বললেন, ألا نأتيك بطبيب 'আমরা কি আপনার জন্য ডাক্তার আনব না'? জওয়াবে তিনি বললেন, قد رآني 'তিনি আমাকে দেখেছেন'। ছাহাবীগণ বললেন, فما قال لك؟ 'তিনি আপনাকে কি বলেছেন? জবাবে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বললেন, قَالَ: إِنِّيْ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ 'তিনি বলেছেন যে, আমি যা চাই তাই করি' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। *সুবহানাল্লাহ,* কত বড় তাওয়াক্কুল!

(১৭-১৮) هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ، فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ 'তোমার কাছে সেনাদলের খবর পৌঁছেছে কি? 'ফেরাঊনের ও ছামূদের'?

অত্র আয়াতে স্বীয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, দোর্দণ্ড প্রতাপ শাসক ফেরাঊন ও তার বিশাল সেনাদলকে এবং দুর্ধর্ষ ছামূদ জাতিকে আমি চোখের পলকে ধ্বংস করেছি এবং তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছি তাদের সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে। অতএব হে রাসূল! তুমি ভয় পাবে না। তোমার প্রতিপক্ষ মক্কার কাফেররা তাদের তুলনায় কিছুই নয়। তাদের বাড়াবাড়ির পরিণামও বিগত জাতিগুলোর মতই হবে। ওরা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন পারেনি ছামূদ জাতির নবী ছালেহ এবং ফেরাঊনের কাছে প্রেরিত নবী মূসা ও হারূণের। এখানে ছামূদ ও ফেরাঊনকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার কারণ হ'ল ছামূদ ছিল আরবদের একটি জাতি। যাদের ধ্বংসলীলার ঘটনা আরবদের নিকটে প্রসিদ্ধ ছিল। অন্যদিকে ফেরাঊনের ঘটনা ছিল মিসরের এবং তা কিতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের নিকটে খুবই পরিচিত ছিল।

فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ তার পূর্ববর্তী حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ থেকে بدل হয়েছে। অর্থাৎ ফেরাঊন ও ছামূদের সেনাদলের পরিণতির খবর তুমি জানো কি?

(১৯-২০) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ، وَاللهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ 'বরং কাফেররা মিথ্যারোপে লিপ্ত আছে'। 'অথচ আল্লাহ তাদেরকে চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন'। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন।

এখানে تَكْذِيْب অর্থ تكذيب للحق والوحي مع وضوح آياته وظهور بيناته عنادًا وبغيًا 'আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও হঠকারিতা ও বিদ্রোহ বশে তারা হক ও অহি-র ব্যাপারে মিথ্যারোপ করে' *(ক্বাসেমী)*।

অর্থাৎ মক্কার কাফেররা ছামূদ, ফেরাঊন প্রমুখ বিগত কাফেরদের মন্দ পরিণতি জানা সত্ত্বেও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং এদের মিথ্যারোপ পূর্বেকার সকল মিথ্যারোপের চাইতে বেশী। অথচ তারা বিলক্ষণ জানে যে, তারা চারিদিক থেকে আল্লাহ্র ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়েছে। তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচার ক্ষমতা যেমন ফেরাঊন ও ছামূদ জাতির হয়নি, তেমনি মক্কার কাফেরদের এমনকি কোন যুগের কাফির-মুনাফিকদের হবে না। একথা বলার মাধ্যমে আল্লাহ সকল যুগের ঈমানদার নর-নারীর উপরে ও ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ নেতৃবৃন্দের উপরে নির্যাতনকারী কাফের ও ফাসেকদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

مِنْ وَرَآئِهِمْ অর্থ 'তাদের পিছন থেকে'। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, وَرَاءَ ظَهْرِهِ 'তার পিঠের পিছন থেকে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/১০)*। অর্থাৎ الله مُحْصٍ عليهم أعمَالَهم ومُجازِيْهم على جَمِيْعها 'আল্লাহ তাদের সকল কর্ম গণনা করে রাখছেন এবং তিনি সবগুলির যথাযথ বদলা দিবেন' *(ক্বাসেমী)*। অথবা এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, যালেমরা পিছন দিক দিয়েও পালাবার পথ পাবে না। সেদিকেও আল্লাহ তাদের ঘিরে রেখেছেন।

(২১-২২) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ، فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ 'বরং এটি মর্যাদামণ্ডিত কুরআন' 'যা সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ'।

একথার মধ্যে অবিশ্বাসীদের প্রতি ধমক ও তাচ্ছিল্য রয়েছে। কারণ তারা আল্লাহ্র কালামকে দূরে নিক্ষেপ করে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে। অথচ তারা যে কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, তা অতীব পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এটি কোন সৃষ্ট বস্তু নয়; বরং সরাসরি আল্লাহ্র কালাম। এটি সর্বোচ্চ স্থানে সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। যাতে কোন বাতিলের প্রবেশাধিকার নেই *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪২)* বা কোনরূপ পরিবর্তন ও কমবেশী করার সুযোগ নেই *(আন'আম ৬/১১৫; ইউনুস ১০/১৫; কাহফ ১৮/২৭)*। অতএব কুরআনের উপর কাফেরদের অবিশ্বাস ও মিথ্যারোপে কিছুই যায় আসে না। তারা এর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

এর মধ্যে মুমিনদের প্রতি উপদেশ রয়েছে, তারা যেন অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআনকে আঁকড়ে থাকে এবং সার্বিক জীবনে তার অনুসারী হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয়।

সারকথা :

অত্র সূরায় বিগত সময়ে গর্তওয়ালাদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার ঘটনা এবং ফেরাঊন ও ছামূদ জাতির ধ্বংসের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূল ও উম্মতে মুহাম্মাদীকে কুরআনী সত্য দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার ও তার বিধানসমূহ বাস্তবায়নে জীবন উৎসর্গ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

সূরা তারেক (রাত্রিতে আগমনকারী)

সূরা বালাদ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮৬, আয়াত ১৭, শব্দ ৬১, বর্ণ ২৪৯।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ আকাশের ও রাত্রিতে আগমনকারীর।

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾

(২) তুমি কি জানো রাত্রিতে আগমনকারী কি?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾

(৩) তা হ'ল উজ্জ্বল নক্ষত্র।

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

(৪) নিশ্চয়ই প্রত্যেকের উপরে হেফাযতকারী রয়েছে।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

(৫) অতএব মানুষের দেখা উচিত সে কোন্ বস্তু হ'তে সৃষ্ট হয়েছে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

(৬) সে সৃষ্ট হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হ'তে।

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

(৭) যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থল হ'তে।

يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾

(৮) নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম।

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

(৯) যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾

(১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

(১১) শপথ বর্ষণশীল আকাশের

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

(১২) এবং বিদারণশীল পৃথিবীর।

وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾

(১৩) নিশ্চয়ই এ কুরআন সিদ্ধান্তকারী বাণী

اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾

(১৪) এবং এটি কোন বৃথাবাক্য নয়।

وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾

(১৫) নিশ্চয় তারা দারুণভাবে চক্রান্ত করে।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾

(১৬) আর আমিও যথাযথ কৌশল করি।

وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

(১৭) অতএব অবিশ্বাসীদের সুযোগ দাও, ওদের অবকাশ দাও কিছু দিনের জন্য।

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

গুরুত্ব :

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদিন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) মহল্লার মসজিদে মাগরিবের অথবা এশার জামা'আতে ইমামতির সময় সূরা বাক্বারাহ অথবা সূরা নিসা তেলাওয়াত করেন। এতে অভিযোগ এলে রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে বলেন, أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقْرَأَ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوَ هَذَا؟ 'হে মু'আয তুমি কি ফিৎনাকারী? সূরা তারেক, শামস বা অনুরূপ কোন সূরা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়'?[১৯৬]

বিষয়বস্তু :

সূরাটি ছোট হ'লেও এতে রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সমাহার। যেমন আকাশের সৌন্দর্য বর্ণনা, নক্ষত্ররাজির আগমন-নির্গমন, ফেরেশতামণ্ডলীর তত্ত্বাবধানকার্য, মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টির কৌশল, ক্বিয়ামতের দিন মানুষের জওয়াবদিহিতার হুঁশিয়ারি, সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড হিসাবে কুরআনের গুরুত্ব বর্ণনা এবং অবিশ্বাসীদের যাবতীয় কৌশল যে অবশেষে ব্যর্থ হবে, তার বর্ণনা।

তাফসীর :

(১-৩) وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، النَّجْمُ الثَّاقِبُ– 'শপথ আকাশের ও রাত্রিতে আগমনকারীর'। 'তুমি কি জানো রাত্রিতে আগমনকারী কি?' 'তা হ'ল উজ্জ্বল নক্ষত্র'।

এখানে وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ বলে 'আকাশ ও নক্ষত্ররাজি' পরপর দু'টি বিষয়ে শপথ করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَالسَّمَاءِ وَمَا يَطْرُقُ فِيْهَا 'আকাশ ও সেখানে যা রাত্রিতে আগমন করে'। মাওয়ার্দী বলেন, اَلطَّارِقُ-এর মূল হ'ল الطَّرْقُ যার অর্থ الدَّقُّ 'ধাক্কানো, খটখটানো'। সেখান থেকে হয়েছে اَلْمِطْرَقَةُ 'হাতুড়ি'। আভিধানিক অর্থে দিনে বা রাতে যেকোন সময়ের আগন্তুককে 'তারেক' বলা যায়। কেননা তিনি এলে দরজায় করাঘাত করেন। তবে আরবরা প্রত্যেক রাত্রির আগন্তুককে 'তারেক' বলে থাকে *(কুরতুবী)*। আল্লাহ এখানে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন النَّجْمُ الثَّاقِبُ অর্থাৎ 'উজ্জ্বল তারকা' বলে। কেননা তা রাতের আকাশে আগমন করে ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়।

---

১৯৬. নাসাঈ হা/৯৮৪, ১১৬৬৪; বুখারী হা/৭০৫; বিস্তারিত দেখুন সূরা ফজরের তাফসীরে, টীকা-২৪৫।

اَلثَّاقِبُ এর মূল الثقب 'ছিদ্র'। এখানে الثاقب বিশেষণ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে كأنه يثقُب الظلامَ بضوئه فينفُذ فيه 'যেন সে তার আলো দ্বারা অন্ধকার ছিদ্র করে বেরিয়ে যায়'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ، 'আমরা দুনিয়ার আকাশকে সুসজ্জিত করেছি অসংখ্য দীপালীর মাধ্যমে' *(মুল্ক ৬৭/৫)*।

اَلسَّمَاءُ এসেছে سَمُوٌّ থেকে। سَمَا يَسْمُوْ سَمْوًا অর্থ উঁচু হওয়া। যেমন বলা হয় سما اليه بصرى 'তার দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল'। সেখান থেকে اَلسَّمَاءُ অর্থ 'আকাশ'। যা উচ্চে অবস্থিত। আকাশের সীমানা ও উচ্চতার কোন সীমা-সরহদ নেই। সীমাহীন নীলাকাশের সৌন্দর্য হ'ল তারকারাজি। যা আমরা চর্মচক্ষুতে দেখতে পাই। এগুলি আল্লাহ্র এক অপূর্ব সৃষ্টি। নক্ষত্ররাজি কেবল আলো দেয় না, এরা রাতের অন্ধকারে আমাদের পথ দেখায়। আল্লাহ বলেন, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ 'তারকারাজির মাধ্যমে লোকেরা পথ খুঁজে পায়' *(নাহল ১৬/১৬)*। তারকারাজির সংখ্যারও কোন শেষ নেই। এমন বহু নক্ষত্র রয়েছে, যাদের আলো লক্ষ লক্ষ বছর পরেও পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে কি-না সন্দেহ। মানুষের তুলনায় এসব সৃষ্টির বিশালতা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ এখানে আকাশ ও তারকারাজির শপথ করেছেন।

اَلطَّارِقُ ও اَلثَّاقِبُ শব্দ দু'টি একবচন হ'লেও এখানে إسم جنس বা জাতিবোধক বিশেষ্য হয়েছে। অর্থাৎ রাত্রির উজ্জ্বল তারকারাজি।

(৪) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ 'প্রত্যেকের উপরে হেফাযতকারী রয়েছে'।

এটি পূর্বের তিনটি আয়াতে বর্ণিত শপথের জওয়াব। আল্লাহপাক এখানে আকাশ ও নক্ষত্ররাজির শপথ করে বলছেন যে, প্রত্যেকের জন্য তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এই ফেরেশতা তাকে প্রতি মুহূর্তে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। তার দুনিয়াবী জীবনের ও দৈহিক স্বাস্থ্যের শৃংখলা বিধান করে। তার দেহের রক্ত চলাচল, হযমশক্তি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি, নিদ্রা ও চিন্তাশক্তি প্রভৃতি ঠিক রাখে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে ফেরেশতামণ্ডলী নিযুক্ত রয়েছে। যারা তাকে সর্বদা বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে। তবে যেটা তাক্বদীরে পূর্ব নির্ধারিত থাকে, সেটা এসেই যায়।

إِنْ 'না' বোধক (نافية) হয়েছে। অর্থ مَا كُلُّ نَفْسٍ 'এমন কোন প্রাণী নেই'। لَمَّا তাশদীদযুক্ত অথবা তাশদীদমুক্ত (لَمَا) দু'ভাবেই পড়া যায়। প্রথমটির অর্থ হবে ما كل نفس إلا عليها حافظ 'এমন কোন প্রাণী নেই, যার উপরে তত্ত্বাবধায়ক নেই'। এ সময় مَا

'না' বোধক (نافية) হবে। আর দ্বিতীয়টা পড়লে অর্থ হবে كل نفس لَعليها حافظ 'প্রত্যেক প্রাণীর উপরে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে'। এ সময় مَا অতিরিক্ত (زائدة) হবে এবং لَ নিশ্চয়তাবোধক (لام تأكيد) হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 'নিশ্চয়ই তোমাদের উপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ'। 'সম্মানিত লেখকবর্গ'। 'তোমরা যা কর সবই তারা অবগত হন' *(ইনফিত্বার ৮২/১০-১২)*। তিনি বলেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 'মনে রেখ, দু'জন গ্রহণকারী ফেরেশতা ডাইনে ও বামে বসে সর্বক্ষণ কর্ম লিপিবদ্ধ করে'। 'এভাবে মানুষ যে কথাই মুখে উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য সদা তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)*। মূলতঃ হেফাযতকারী হ'লেন আল্লাহ। তিনি হেফাযত না করলে এ দুনিয়ায় কেউ চলতে পারত না। আল্লাহ্র হুকুমে ফেরেশতা ছাড়াও মানুষের জ্ঞান ও বিবেক হ'তে পারে সেই তত্ত্বাবধায়ক। যা মানুষকে সর্বদা ভাল ও মন্দ পথ দেখিয়ে থাকে। যাকে হাদীছে وَاعِظُ اللهِ 'আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে উপদেশদাতা' বলা হয়েছে।[১৯৭] রয়েছে নফসে লাউয়ামাহ (বিবেক), যা মানুষকে সর্বদা ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। রয়েছে নফসে মুত্বমাইন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা), যা সর্বদা মানুষকে সাধুতা ও আল্লাহভীতির প্রেরণা যোগায়।

আল্লাহ্র হুকুমে ফেরেশতারা তাকে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক করে ও বিপদাপদ থেকে হেফাযত করে। আল্লাহ বলেন, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ 'তার জন্য সম্মুখ থেকে ও পিছন থেকে অনুসরণকারী ফেরেশতারা রয়েছে। যারা তাকে হেফাযত করে আল্লাহ্র হুকুমে' *(রা'দ ১৩/১১)*। বস্তুতঃ আল্লাহ হ'লেন মূল তত্ত্বাবধায়ক। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী' *(নিসা ৪/১)*। وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا 'এবং তিনি সকল বস্তুর উপর তত্ত্বাবধায়ক' *(আহযাব ৩৩/৫২)*। অতএব فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا 'আল্লাহ হ'লেন সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক' *(ইউসুফ ১২/৬৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতাদের দু'টি দল রাত্রি ও দিনে বান্দার হেফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। উভয় দল ফজর ও আছরের ছালাতের সময় একত্রিত হয় এবং একে অপরের নিকট দায়িত্ব বদল করে'।[১৯৮]

---

১৯৭. রাযীন, আহমাদ হা/১৭৬৭১, মিশকাত হা/১৯১, সনদ ছহীহ।
১৯৮. বুখারী হা/৫৫৫, মুসলিম হা/৬৩২; মিশকাত হা/৬২৬ 'ছালাতের ফযীলত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৩।

কা'ব আল-আহবার বলেন, যদি আল্লাহ ফেরেশতা নিয়োগ করে তোমাদের পাহারার ব্যবস্থা না করতেন, তাহ'লে শয়তান জিনেরা তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যেত' *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা রা'দ ১১)*। অবশ্য যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে কষ্টে নিক্ষেপ করেন, তখন এই রক্ষা ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যেমন একদিন হযরত আলী (রাঃ) একাকী ছালাত আদায় করছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, আপনি পাহারা নিযুক্ত করুন। জবাবে আলী (রাঃ) বললেন, প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন করে ফেরেশতা থাকে, যারা তাকে হেফাযত করে। فإذا جاء الْقَدَرُ خَلَّيَا بينه وبينه 'কিন্তু যখন তাক্বদীর এসে যায়, তখন তারা সরে যায়' *(তাফসীর ইবনু কাছীর, রা'দ ১১)*।

অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, বান্দা তার বাহ্যিক হেফাযতের জন্য কোন ব্যবস্থা নিবে না। বরং বান্দাকে সে নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন *(আনফাল ৮/৬০)* এবং রাসূল (ছাঃ) নিজের উম্মতের জন্য সে ব্যবস্থা নিয়েছেন। বস্তুতঃ নবীজীবনের সকল যুদ্ধ ও জিহাদ দ্বীন ও দ্বীনদারদের হেফাযতের জন্যই হয়েছিল।

উপরের আলোচনায় বুঝা যায় যে, আয়াতে বর্ণিত حَافِظٌ বা তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা একবচন হ'লেও তার অর্থ হবে ফেরেশতামণ্ডলী।

আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُوْنَ، أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلاَ هُمْ مِنَّا يُصْحَبُوْنَ- 'তুমি বলে দাও, 'রহমান'-এর পরিবর্তে কে তোমাদের রক্ষা করে থাকে রাত্রিতে ও দিনে? বরং তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে'। 'তবে কি আমরা ব্যতীত তাদের আর কোন উপাস্য আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না। আর আমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না' *(আম্বিয়া ২১/৪২-৪৩)*।

(৫) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ 'অতএব মানুষের দেখা উচিত সে কোন্ বস্তু হ'তে সৃষ্ট হয়েছে'।

فَلْيَنْظُرِ এখানে امر غائب معروف হয়েছে। অর্থ 'দেখা উচিৎ'। এখানে نظر অর্থ চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা নয়, বরং জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখা। অর্থাৎ 'চিন্তা-গবেষণা করা'।

এখানে فاء এসেছে উহ্য প্রশ্নের জওয়াব হিসাবে। অর্থাৎ إن ارتاب مرتاب في كل نفس من الأنفس عليها رقيب، فلينظر- 'যদি কোন সন্দেহবাদী সন্দেহ করে এব্যাপারে যে,

প্রত্যেক প্রাণীর উপরে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে, তাহ'লে সে দেখুক নিজের সৃষ্টিকে' *(ক্বাসেমী)*। বস্তুতঃ এটি হ'ল পূর্ববর্তী শপথের উপর প্রমাণস্বরূপ এবং তাকীদের উপর তাকীদ স্বরূপ।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মানুষের সৃষ্টিকৌশল বর্ণিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মানুষকে তার নিজের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যাতে সে নিজের তুচ্ছতা ও সাথে সাথে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বড়ত্ব ও সৃষ্টিজগতের উপর তাঁর তত্ত্বাবধান উপলব্ধি করতে পারে।

আল্লাহ বলেন, মানুষের চিন্তা করা উচিত তার নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে। কিসের দ্বারা ও কিভাবে সে জীবন পেয়েছে ও দুনিয়াতে এসেছে। কেননা ইতিপূর্বে সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা *(দাহর ৭৬/১)*।

(৬) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ 'সে সৃষ্ট হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হ'তে।

دَافِقٍ অর্থ المندفق بشدة قوته 'সবেগে নির্গত'। সেখান থেকে مَّاءٍ دَافِقٍ অর্থ ماء مصبوب في الرحم 'মাতৃগর্ভে স্থিত পানি'। অর্থাৎ পিতা ও মাতার মিলিত শুক্রবিন্দু। দু'টি মিলে একটি বিন্দু হওয়ায় مَّاءٍ دَافِقٍ একবচন হয়েছে। অন্য আয়াতে একে نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ বা 'মিশ্র শুক্রবিন্দু' বলা হয়েছে *(দাহর ৭৬/২)*।

আল্লাহ বলেন, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা তার মায়ের গর্ভে স্থিত থাকে। পিতা ও মাতা উভয়ের পানি সেখানে জমা হয়ে একটি পানি বিন্দু অর্থাৎ মিশ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পিতা ও মাতা উভয়ের মিলিত একটি পানি বিন্দুই হ'ল মানব সৃষ্টির উৎস। যা মায়ের গর্ভে স্থিতি লাভ করে এবং সেখানে পুষ্ট হয়ে সাধারণত ৯ মাস ১০ দিন পরে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর রূপ ধারণ করে। মাটিতে বীজ বপন করার পর প্রয়োজনীয় তাপ, চাপ ও খাদ্য যোগানোর মাধ্যমে যেমন তা নির্ধারিত সময়ে অংকুর হিসাবে উদ্গাত হয় ও পরে বীজ অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্ভিদে পরিণত হয়। পিতার শুক্রাণু তেমনি বীজ হিসাবে মায়ের ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে সেখানে প্রয়োজনীয় তাপ, চাপ ও খাদ্য যোগানের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। অতঃপর পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু হিসাবে দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয়। সেকারণ সন্তান তার পিতা ও মাতা উভয়ের রং, রূপ ও স্বভাব কমবেশী প্রাপ্ত হয়।

(৭) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ 'যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থল হ'তে'।

الصُّلْب অর্থ মেরুদণ্ড বা পিঠ। এটি দু'ভাবে পড়া হয়েছে- الصُّلْب ও الصُّلُب তবে এর আরো দু'টি পাঠ রয়েছে الصَلَب ও الصَالِب (قالب-এর ওযনে)। التَّرَائِبِ একবচনে

التَّرِيْبَةُ অর্থ عظام الصدر 'নারী ও পুরুষের বুকের উপর দিককার হাড্ডি'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ موضع القلادة 'মেয়েদের কণ্ঠহারের স্থান'।

আয়াতে مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ বলতে পিতা ও মাতা প্রত্যেকের পিঠ ও বুকের মধ্য হ'তে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কেননা দেহের সকল প্রধান অঙ্গের অবস্থান মূলত পিঠ ও বুকের মধ্যেই থাকে। দেহের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল মস্তিষ্ক। আর তার প্রতিনিধি হিসাবে মেরুদণ্ডের হাড্ডির মধ্যে লুক্কায়িত স্নায়ুকাণ্ড তার শাখা-প্রশাখা ও শিরা-উপশিরার মাধ্যমে মস্তিষ্কের হুকুম সারা দেহে সঞ্চালিত করে।

'যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থল হ'তে'- একথার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে। তা এই যে, জন্ম পূর্ববর্তী অবস্থায় অর্থাৎ শিশুর দেহ গঠনের স্তরে তার অণ্ডকোষ বা ডিম্বাশয় মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের হাড্ডির মাঝে বিকশিত হওয়া শুরু করে। পরবর্তীতে এগুলো নীচে নেমে গেলেও তাদের রক্ত সঞ্চালন পূর্বের স্থান থেকেই হয়।

(৮) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ 'নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম'। এর অর্থ দু'টি হ'তে পারে। **এক**- মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ বলেন, এর অর্থ স্খলিত পানিকে আল্লাহ পূর্বের স্থানে ফেরত নিতে পারেন'। অর্থাৎ পানি স্খলিত হ'লেও তাতে কোন সন্তান জন্মাবে না। ইবনু যায়েদ বলেন, অথবা শত চেষ্টায়ও পানি স্খলিত হবে না। যেটা বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত হয়ে থাকে।

দুই- ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পরে আখেরাতে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। ইবনু জারীর একথা সমর্থন করেন এবং কুরতুবী এটাকেই শক্তিশালী বলেছেন। কেননা পরবর্তী আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

(৯-১০) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرٍ 'যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে'। 'সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না'। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন যখন তার সকল গোপন কর্ম প্রকাশিত হবে এবং সবকিছু পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার নিজের কোন ক্ষমতা থাকবে না বা অন্য কাউকে সে সাহায্যকারী পাবে না। ভিতর ও বাহির সবদিক দিয়ে সে দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়বে। সে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রেহাই পাবেনা। মানুষ সাধারণতঃ দু'টি শক্তি নিয়ে দুনিয়ায় চলাফেরা করে। এক- নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তি। দুই- অন্যের সহযোগিতার শক্তি। ক্বিয়ামতের দিন তার কোন শক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।

এখানে تُبْلَى অর্থ تَظْهر او تُخْتبر 'প্রকাশিত হবে' অথবা 'পরীক্ষিত হবে'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক খেয়ানতকারীর জন্য তার পিছনের কটিদেশে একটি ঝাণ্ডা উড়ানো হবে এবং বলা হবে, এটি অমুকের পুত্র অমুকের খেয়ানতের নিদর্শন'।[১৯৯] এভাবে তার গোপন কর্ম প্রকাশিত হয়ে যাবে। এ হাদীছ দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার পিতার নামসহ ডাকা হবে। অতএব প্রত্যেকের সুন্দর নাম রাখা উচিত। অন্য হাদীছে এসেছে, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের নামের রেজিষ্টারে তাদের স্ব স্ব পিতা ও গোত্রের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে।[২০০]

এখানে 'গোপন বিষয়াদি প্রকাশিত হবে' বলে মুনাফিক ও চক্রান্তকারীদের মনের মধ্যে লুক্কায়িত কপটতা সমূহ প্রকাশিত হবে বুঝানো হয়েছে। নইলে বাহ্যিক ছালাত-ছিয়ামে সকলেই সমান। যেমন বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুযানী বলেন, ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ، ولكن بشيء وقر في صدره 'আবুবকর অন্যদের চাইতে ছালাত-ছিয়ামে অগ্রগামী নন। বরং অন্যদের চাইতে তিনি অগ্রণী হ'লেন তাঁর হৃদয়ে স্থিত ঈমানের কারণে' *(হাকীম, তিরমিযী, নাওয়াদের)*। অতএব প্রত্যেকের উচিত কর্মজগত সুন্দর করার সাথে সাথে অন্তরজগতকে পরিচ্ছন্ন করা এবং নিজেকে যাবতীয় কপটতার কালিমা হ'তে মুক্ত করা।

(১১-১২) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 'শপথ বর্ষণশীল আকাশের'। 'এবং বিদারণশীল পৃথিবীর'।

আলোচ্য আয়াতে আসমান ও যমীনের যে দু'টি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির জন্য রয়েছে চিন্তার অফুরন্ত খোরাক। এর মধ্যে যেমন রয়েছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের বর্ণনা, তেমনি রয়েছে প্রতিপালক আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রাণীকুলের জন্য খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার এক অপূর্ব পালন কৌশলের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বৃষ্টি। ইবনু যায়েদ বলেছেন, গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন-বিবর্তন। দু'টি অর্থই সঠিক। কেননা الرَّجْعِ অর্থ পরপর আসা।

---

১৯৯. বুখারী হা/৬১৭৭, মুসলিম হা/১৭৩৬, মিশকাত হা/৩৭২৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।
২০০. তিরমিযী হা/২১৪১; মিশকাত হা/৯৬ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

বৃষ্টি প্রতিবছর বারবার আসে এবং বৃষ্টি একটার পর একটা আসে। অনরূপভাবে সূর্য ও চন্দ্র একটার পর একটা আসে। وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 'শপথ বিদারণশীল পৃথিবীর'। الصَّدْعِ অর্থ الشق ফেটে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا 'অতঃপর আমরা যমীনকে বিদীর্ণ করি সুন্দরভাবে' *(আবাসা ৮০/২৬)*। মাটি ফেটে বীজের অংকুরোদ্গাম হয়। অতঃপর তা ফুলে-ফলে সুশোভিত পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়।

আকাশ ও নক্ষত্ররাজির সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক অতীব নিবিড়। সূর্যের তাপ পানিতে পড়ে তা বাষ্পাকারে উত্থিত হয়। অতঃপর পরিচ্ছন্ন বৃষ্টি আকারে বায়ু দ্বারা চালিত হয়ে তা আল্লাহ্র হুকুমে যথাস্থানে পরিমাণ মত বর্ষিত হয়। সেই সাথে বিদ্যুৎ চমকানোর মাধ্যমে নাইট্রোজেন নিক্ষিপ্ত হয়ে ভূমিকে উর্বর করে। অতঃপর দিনের বেলায় সূর্যের তাপ ও রাতের বেলায় চন্দ্রের মায়াবী আলোর পেলব স্পর্শে ভূমি থেকে উদ্গাত হয় নানাবিধ উদ্ভিদ ও গাছ-গাছালী। যা মানুষ ও গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে পরিবেশিত হয়। এইভাবে নক্ষত্ররাজির আবর্তন-বিবর্তন, আলো ও উত্তাপ দান, বায়ু প্রবাহের আগমন-নির্গমন, বৃষ্টিবর্ষণ এবং যমীন থেকে উদ্ভিদ ও খাদ্যের যোগান দানের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতিপালন ও পরিপাটি সাধন করেন ও সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন। আর সবকিছুই আল্লাহ করেন পরিমাণমত। তিনি বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 'আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি পরিমাণমত' *(ক্বামার ৫৪/৪৯)*। তিনি আরো বলেন, وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ 'আর সকল বস্তুই তার নিকটে রয়েছে পরিমাণমত' *(রা'দ ১৩/৮)*। যদি না মানুষ নিজের হঠকারিতা বশে তাতে ব্যত্যয় ঘটায় এবং নিজের ক্ষতি নিজে ডেকে আনে। মনে রাখা আবশ্যক যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে কোন কিছুই এক্সিডেন্টের সৃষ্টি নয়। বরং সবকিছুই তাঁর পরিকল্পনা মতে ও তাঁর জ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে। যেমন তিনি বলেন, وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ 'আমাদেরই কাছে রয়েছে সবকিছুর ভাণ্ডার এবং আমরা সবকিছু জ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি' *(হিজর ১৫/২১)*।

মায়ের গর্ভে পিতার শুক্রাণু নিক্ষেপের ফলে যেমন সন্তান জন্মলাভ করে, তেমনি আকাশ থেকে ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণের ফলে উদ্ভিদরাজি ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়। এজন্যই বলা হয়েছে, وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ 'আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু' *(যারিয়াত ৫১/২২)*। আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করে আল্লাহ আমাদের নিকটে তাঁর সৃষ্টিকৌশল ও পালনকৌশল যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি আমাদেরকে তাঁর প্রদত্ত নে'মতরাজি সন্ধান করে তা ভোগ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। বিজ্ঞানীরা

এদিকে যত মনোযোগ দিবেন ততই মুগ্ধ ও বিমোহিত হবেন এবং অবশ্যই অবনত মস্তকে আল্লাহকে স্বীকার করবেন ও তাঁর বিধানসমূহ মানতে উদ্বুদ্ধ হবেন। কুরআনের বাহক মুসলিম তরুণ বিজ্ঞানীরা এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন কি?

(১৩-১৪) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ 'নিশ্চয়ই এ কুরআন সিদ্ধান্তকারী বাণী'। 'এবং এটি কোন বৃথাবাক্য নয়'।

الفَصْلُ মাছদার যা اسم فاعل অর্থে এসেছে। যার অর্থ الفاصل بين الحق والباطل 'সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী'। الْهَزْلِ যা ضِدُّ الْجِدِّ 'সত্যের বিপরীত' অর্থাৎ বৃথা বাক্য।

আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর কসম করে বলছেন, নিশ্চয়ই কুরআন সত্য ও মিথ্যার ফায়ছালাকারী। আর এটা কোন বৃথাবাক্য নয়। যারা কুরআনকে এড়িয়ে চলতে চায় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে চায়, মূলতঃ তারাই কুরআনী সত্যকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অগ্রাহ্য করে থাকে। কুরআনের বিরুদ্ধে যত কথাই তারা বলুক, সবই বাজে কথা মাত্র। কুরআনে কোন বাহুল্য কথা নেই। কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও বর্ণ বিপুল জ্ঞান ও অর্থ সম্ভারে পূর্ণ। আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَّعَدْلاً 'তোমার প্রভুর কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ' *(আন'আম ৬/১১৫)*।

কুরআন পাঠের সময় চিন্তাশীল পাঠককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এর প্রতিটি বাক্য সত্য ও চূড়ান্ত। এর প্রতিটি বর্ণ ও বর্ণনার স্টাইল অনন্য ও অচিন্তনীয় এবং তা চিরন্তন কল্যাণের ইঙ্গিতবাহী। বান্দাকে তার গভীরে ডুব দিয়ে তা বের করে আনতে হবে হাদীছের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী। কেননা কুরআনের ব্যাখ্যা হ'ল হাদীছ এবং কুরআনের কোন বর্ণই অনর্থক বা অহেতুক নয়।

উল্লেখ্য যে, সূরার শুরুতে আকাশের ও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে। অতঃপর এখানে পুনরায় আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করে বলা হচ্ছে যে, 'কুরআন হ'ল সিদ্ধান্তকারী বাণী'। দুই শপথের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভবতঃ এই যে, (আল্লাহ সর্বাধিক অবগত) প্রথম শপথে উজ্জ্বল নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে, যা প্রয়োজনে শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়, যারা 'অহি' চুরি করতে চায়। যার মাধ্যমে কুরআনকে হেফাযত করা হয়। দ্বিতীয় শপথে বর্ষণশীল আকাশের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা মৃত যমীনকে জীবন্ত করা হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন হ'ল জীবন সদৃশ। যা মানুষের মৃত হৃদয়কে জীবিত করে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا 'আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট 'অহি' করেছি রূহ (কুরআন) আমাদের নির্দেশক্রমে' *(শূরা ৪২/৫২)*। এখানে কুরআনকে 'রূহ' বলা হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। নিঃসন্দেহে কুরআন মানবজাতির জন্য রূহ সদৃশ।

(১৫-১৬) إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْداً، وَأَكِيْدُ كَيْداً 'নিশ্চয় তারা দারুণভাবে চক্রান্ত করে'। 'আর আমিও যথাযথ কৌশল করি'।

الكَيْدُ অর্থ الْمَكْرُ ধোঁকা, প্রতারণা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র। এই অর্থ বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে অর্থ হবে جزاء كيدهم 'তাদের চক্রান্তের বদলা' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কৌশল হ'ল শত্রুদের যথাযথ বদলা দেওয়া।

মক্কায় কাফির-মুশরিকরা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও অকথ্য নির্যাতন করেছিল, অত্র আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 'স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন কাফিররা (মক্কায় দারুন নাদওয়াতে বসে) তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দী করার বা হত্যা করার বা বহিষ্কার করার জন্য। বস্তুতঃ তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ কৌশল করেন। আর আল্লাহ হ'লেন সেরা কৌশলী' *(আনফাল ৮/৩০)*।

বস্তুতঃ অবিশ্বাসীরা সর্বযুগে রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বিরুদ্ধে মানুষকে নানাবিধ ধোঁকার জালে আবদ্ধ করে থাকে। তারা কুরআনের আলো নিভিয়ে দেবার জন্য এবং কুরআনের প্রচার ও প্রসার বন্ধ করার জন্য নানাবিধ কৌশল করে থাকে। আর আল্লাহ তার যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করেন। আর তা হ'ল তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কুরআনের বিরোধিতা করার সুযোগ দেওয়া এবং যথাসময়ে পাকড়াও করা। যে পাকড়াওয়ের সময়সীমা সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের কোন পূর্ব ধারণা থাকবে না।

আল্লাহ বলেন, يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِؤُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ- 'তারা আল্লাহ্‌র জ্যোতি (কুরআন)-কে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তার জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করবেন। যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপসন্দ করে' *(ছফ ৬১/৮; তওবা ৯/৩২)*। তিনি আরও বলেন, وَالَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ، وَأُمْلِيْ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ- 'বস্তুতঃ যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, আমরা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন স্থান থেকে যে, তারা জানতেও পারবে না'। 'আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল অতীব সুনিপুণ' *(আ'রাফ ৭/১৮২-১৮৩; ক্বলম ৬৮/৪৪-৪৫)*।

(১৭) فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً 'অতএব অবিশ্বাসীদের সুযোগ দাও, ওদের অবকাশ দাও কিছু দিনের জন্য'।

أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً অর্থ أَمْهِلْهُمْ إِمْهَالاً رُوَيْداً 'ওদেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ দাও'। أَرْوَدَ يُرْوِدُ إِرْوَادًا থেকে رُوَيْدًا এখানে مصدر مصغَّر হয়েছে। অর্থাৎ إِمْهَالاً رُوَيْداً 'সামান্য অবকাশ'। যা أَمْهِلْهُمْ-এর نعت বা বিশেষণ হিসাবে এসেছে *(কুরতুবী)*।

অতএব হে রাসূল! কাফেরদের কিছুটা অবকাশ দিন। ওদের দ্রুত ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করবেন না। তাদেরকে কিছুটা সুযোগ দিন এবং দেখুন তাদের উপরে আল্লাহ্র কি গযব নেমে আসে।

বস্তুতঃ কাফেরদের উপরে দুনিয়াবী গযব নেমে এসেছিল প্রথমতঃ মুসলমানদের হাতে বদরের যুদ্ধে। সেদিন রাসূল (ছাঃ)-কে মক্কায় হত্যার ষড়যন্ত্রকারী আবু জাহল সহ ১৪ জন নেতার ১১ জনই নিহত হয় এবং তারা সবাই একটি পরিত্যক্ত দুর্গন্ধময় কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়। আবু সুফিয়ান সহ বাকী ৩ জন নেতা পরে মুসলমান হন। এছাড়া আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয় আবু লাহাব, তার ছেলে উতায়বা বিন আবু লাহাব, উমাইয়া বিন খালাফ ও তার ভাই উবাই বিন খালাফ সহ আরও অনেকে। অতঃপর এ ঘটনার মাত্র ৬ বছরের মাথায় ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান তারিখে রাসূল (ছাঃ) বিনা যুদ্ধে মক্কা জয় করে ফিরে আসেন সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে। আল্লাহ বলেন, نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيْظٍ 'আমরা তাদেরকে স্বল্পকালের জন্য ভোগবিলাসের সুযোগ দেব। অতঃপর তাদের বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে' *(লোকমান ৩১/২৪)*।

সারকথা :

আকাশ ও নক্ষত্ররাজির শপথ করে আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি ও পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর কুরআনী সত্যের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের চূড়ান্তভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। সাথে সাথে এর মধ্যে আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীদের জন্য সুসংবাদ লুক্কায়িত রয়েছে।

সূরা আ'লা (সর্বোচ্চ)

সূরা তাকভীরের পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮৭, আয়াত ১৯, শব্দ ৭২, বর্ণ ২৯৩।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾

(১) তুমি তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর।

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾

(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বিন্যস্ত করেছেন।

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾

(৩) যিনি পরিমিত করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।

وَالَّذِىْۤ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾

(৪) যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন।

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾

(৫) অতঃপর তাকে শুষ্ক-কালো বর্জ্যে পরিণত করেন।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى ﴿٦﴾

(৬) সত্বর আমরা তোমাকে পাঠ করাবো (কুরআন)। অতঃপর তুমি তা ভুলবে না।

اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ
اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾

(৭) তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয়ই তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾

(৮) আর আমরা তোমাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾

(৯) অতএব তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়।

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾

(১০) সত্বর উপদেশ গ্রহণ করবে, যে ব্যক্তি ভয় করে।

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾

(১১) আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগা।

الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾

(১২) যে প্রবেশ করবে মহা অগ্নিতে।

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾

(১৩) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾

(১৪) নিশ্চয়ই সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে পরিশুদ্ধ হয়।

(১৫) এবং তার প্রভুর নাম স্মরণ করে। অতঃপর ছালাত আদায় করে। وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

(১৬) বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

(১৭) অথচ আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী। وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

(১৮) নিশ্চয়ই এটা লিপিবদ্ধ ছিল পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে- اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

(১৯) ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে। صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى

গুরুত্ব :

(১) হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই ঈদ ও জুম'আর ছালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ পাঠ করতেন। এমনকি জুম'আ ও ঈদ একদিনে হ'লেও তিনি উক্ত দু'টি সূরাই পড়তেন'।[২০১]

(২) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয বিন জাবালকে বলেন, 'তুমি সূরা আ'লা, ফজর, শাম্স, লায়েল, যোহা পাঠ কর না কেন'? [২০২]

(৩) বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে মদীনায় প্রথম আসেন মুছ'আব বিন ওমায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম। তারা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে থাকেন। অতঃপর আসেন 'আম্মার, বেলাল ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াকক্বাছ। তারপর বিশ জনের একটি দল নিয়ে আসেন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব। অতঃপর আসেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে। আমি মদীনাবাসীকে কখনো এত খুশী হ'তে দেখিনি যত খুশী তাঁর আগমনে হ'তে দেখেছি। এমনকি ছোট্ট শিশু-কিশোররা বলতে থাকে, هَذَا رَسُوْلُ اللهِ قَدْ جَاءَ 'এই যে আল্লাহ্র রাসূল এসে গেছেন'। তিনি আসা পর্যন্ত আমি পাঠ করতাম সূরা আ'লা এবং অনুরূপ সূরা সমূহ'।[২০৩]

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর ছালাতে সূরা আ'লা, কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন'। তবে আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি শেষ রাকআতে সূরা ইখলাছ এবং ফালাক্ব ও নাস পাঠ করতেন'।[২০৪]

---

২০১. মুসলিম হা/৮৭৮; মিশকাত হা/৮৪০ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।
২০২. বুখারী হা/৭০৫; মুসলিম হা/৪৬৫; বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : সূরা ফজর, টীকা-২৪৫।
২০৩. বুখারী হা/৪৯৪১ 'তাফসীর' অধ্যায়।
২০৪. তিরমিযী হা/৪৬২-৬৩; হাকেম ১/৩০৫; মিশকাত হা/১২৬৯ 'বিতর' অধ্যায়।

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِى آخِرِهِنَّ 'এ সময় তিনি শেষ রাক'আতে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না'।[২০৫] আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِى آخِرِهِنَّ 'শেষ রাক'আতে ব্যতীত বসতেন না'।[২০৬] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, তোমরা মাগরিবের ছালাতের ন্যায় (মাঝখানে বৈঠক করে) বিতর ছালাত আদায় করো না'।[২০৭]

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) *সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা* পাঠ করার পর বলতেন, *সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি সর্বোচ্চ)।[২০৮] এটি ছালাতের মধ্যে ও ছালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় পাঠক ও শ্রোতা সকলের জন্য পড়া মুস্তাহাব।[২০৯]

বিষয়বস্তু :

অত্র সূরাতে আল্লাহ্র সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া এবং এজন্য তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা, মানুষের সৃষ্টি ও তার পথ প্রদর্শন, তাকে স্মৃতিশক্তির নে'মত প্রদান, বিশুদ্ধ অন্তরের লোকদের জন্য ইসলাম সহজতর হওয়া, দুনিয়াবী জীবনের চাইতে আখেরাতের জীবন উত্তম ও চিরস্থায়ী হওয়া এবং কুরআনের এইসব বক্তব্য যে বিগত ইলাহী কিতাবসমূহের সারনির্যাস- সেসব বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীর :

(১) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى 'তুমি তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর'।

অর্থ نزه ربك من كل ما لا يليق بجلاله وعظمته 'তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর ঐ সকল বস্তু হ'তে যা তাঁর পরাক্রম ও মহত্ত্বের উপযুক্ত নয়'। এখানে আল্লাহ্র নামের পবিত্রতা অর্থ আল্লাহ্র সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করা যবান দিয়ে ও হৃদয় দিয়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, معنى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى أَىْ عَظِّمْ رَبَّكَ الْأَعْلَى 'তোমার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর' অর্থ 'তোমার মহান পালনকর্তার বড়ত্ব ঘোষণা কর' *(কুরতুবী)*। অন্যত্র এসেছে فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

২০৫. নাসাঈ হা/১৭০১, সনদ ছহীহ।
২০৬. মুস্তাদরাক হাকেম ১/৩০৪ হা/১১৪০; বায়হাক্বী ৩/২৮।
২০৭. দারাকুৎনী হা/১৬৩৪-৩৫, সনদ ছহীহ।
২০৮. আহমাদ হা/২০৬৬; আবুদাঊদ হা/৮৮৩; মিশকাত হা/৮৫৯ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।
২০৯. আলোচনা দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ১৫১।

'অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৯৬)*। অর্থ سبح تسبيحًا مقرونًا باسم الله 'আল্লাহ্র নামসহ তাসবীহ পাঠ কর'। কেননা নাম ব্যতীত আল্লাহ্র নিকট দো'আ করা বা তাঁর তাসবীহ পাঠ করা সম্ভব নয়। কারণ কাফেররা মুখে আল্লাহকে স্বীকার করলেও অন্তরে স্বীকার করত না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 'যদি তুমি ওদের জিজ্ঞেস কর কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন? ওরা বলবে, আল্লাহ। তুমি বল সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু ওদের অধিকাংশ এবিষয়ে অজ্ঞ' *(লোকমান ৩১/২৫)*। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নাম ও নামীয় সত্তা (الاسم والمسمى) পৃথক নয়। যেটা মু'তাযিলাগণ ধারণা করে থাকেন। অতএব এখানে অর্থ হ'ল نزه ربك من كل عيب ونقص 'তোমার পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা কর যাবতীয় দোষ ও ত্রুটি হ'তে'। আর এই তাসবীহ কেবল অন্তরে নয়, বরং হৃদয় ও যবান দু'টি দিয়ে করবে।

سَبِّحِ বলে রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে এধরনের আদেশ তিন অর্থে এসেছে। ১. রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। যা পূর্বাপর বিষয়াদির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। যেমন أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ *(ইনশিরাহ ৯৪/১-২)*। وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ *(সাবা ৩৪/২৮)* ইত্যাদি। ২. রাসূল (ছাঃ) ও সকলের জন্য 'আম। যা পূর্বাপর বিষয়াদির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়। যেমন يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ *(তালাক ৬৫/১)*। এখানে নবী (ছাঃ)-কে আহ্বান করা সত্ত্বেও বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তালাক দানের বিধানটি তাঁর ও অন্য সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ৩. শাব্দিকভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'লেও মর্মগতভাবে সকলের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। এর উদাহরণ অসংখ্য। যেমন আলোচ্য আয়াত- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى *(আ'লা ৮৭/১)*। كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ- وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ *(রহমান ৫৫/২৬)* ইত্যাদি।

তাসবীহ পাঠ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হ'ল চারটি : *সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর'*।[২১০] তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার *সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী* পাঠ করে, তার সকল

---

২১০. মুসলিম হা/২১৩৭; মিশকাত হা/২২৯৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ।

(ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়'।[২১১] তিনি বলেন, *'আলহামদুলিল্লাহ'* মীযানের পাল্লা ভরে দেয়। *সুবহানাল্লাহ* ও *আলহামদুলিল্লাহ* আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে নেকী দিয়ে পূর্ণ করে দেয়'।[২১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* ও *আল্লাহু আকবর*...।[২১৩]

অত্র আয়াত দ্বারা 'আল্লাহ, আল্লাহ' যিকর করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। কেননা ঐরূপ যিকরের কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِى الأَرْضِ اللهُ اللهُ 'ক্বিয়ামত হবে না যতদিন পৃথিবীতে কেউ বলবে আল্লাহ আল্লাহ।[২১৪] এর ব্যাখ্যা একই রাবী আনাস (রাঃ) কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)*।[২১৫] অর্থাৎ যতদিন পৃথিবীতে একজন প্রকৃত তাওহীদবাদী মুসলিম বেঁচে থাকবে ততদিন ক্বিয়ামত হবে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন তাওহীদবাদী মুমিনের গুরুত্ব আল্লাহ্র নিকটে বিশ্বের সকল মানুষের চাইতে অধিক।

سَبِّحْ আদেশসূচক ক্রিয়া। এর মাছদার হ'ল تسبيح যার অর্থ تنزيه الشيئ عن السوء 'মন্দ থেকে কোন বস্তুকে উত্তমভাবে পবিত্র করা' বা কারু পবিত্রতা বর্ণনা করা। তানতাভী বলেন, আয়াতের অর্থ হল نزِّه ذاته عما لا يليق به 'তাঁর সত্তা যার উপযুক্ত নয়, তা থেকে তাঁকে পবিত্র কর'। অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তাকে তুমি যাবতীয় শিরকের কালিমা হ'তে পবিত্র কর। রাসূল (ছাঃ)-এর বাপ-দাদাদের মধ্যে শিরকের রেওয়াজ ছিল। তারা আল্লাহকে মানতেন। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন নেককার মৃত ব্যক্তিদের অসীলায় তারা আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতেন *(যুমার ৩৯/৩)*। ঐ মৃত ব্যক্তির প্রতীক হিসাবে তারা তার মূর্তি বানিয়ে সামনে রাখতেন ও তাকে আল্লাহ্র নিকট সুফারিশকারী ধারণা করতেন *(ইউনুস ১০/১৮)*। মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলত *(ইসরা ১৭/৪০)*। তারা আল্লাহ্র স্ত্রী সন্তান আছে বলত *(জিন ৭২/৩)*। এতদ্ব্যতীত চন্দ্র-সূর্য ও অন্যান্য বস্তুকে এবং অলি-আউলিয়া ও মৃত নেককার ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্র শরীক কল্পনা করত *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৭; তওবাহ ৯/৩০-৩১ প্রভৃতি)*। আল্লাহ এখানে তাঁর রাসূলকে সর্বপ্রথম এসব মিথ্যা ধারণা-কল্পনা থেকে যে আল্লাহ পবিত্র, সেকথা ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ 'তারা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব কথা বলে, সেসব থেকে তোমার প্রতিপালক পবিত্র। যিনি সকল সম্মানের অধিকারী' *(ছাফফাত ৩৭/১৮০)*।

---

২১১. বুখারী হা/৬৪০৫; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২২৯৬।
২১২. মুসলিম হা/২২৩, মিশকাত হা/২৮১।
২১৩. দারেমী হা/৬৫৩ 'তাহারৎ' অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/১৮৭৮১।
২১৪. মুসলিম হা/১৪৮, মিশকাত হা/৫৫১৬; ঐ, শায়খ আলবানীর টীকা-১ দ্রষ্টব্য।
২১৫. হাকেম, আহমাদ হা/১৩৮৬০, সনদ ছহীহ।

الْأَعْلَى অর্থ الأرفع সর্বোচ্চ। অর্থাৎ الأَرْفَعُ من كل شيئ قدرةً ومُلْكًا وسلطانًا 'শক্তি, রাজত্ব ও পরাক্রম সকল দিক দিয়ে তিনি সকল বস্তুর উপরে' *(ক্বাসেমী)*। আর এই সর্বোচ্চ তিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলী উভয় দিক দিয়ে। 'রহমান' ব্যতীত রব, রহীম, রঊফ, হাই, প্রভৃতি গুণাবলী বান্দার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। কিন্তু যখন এগুলি আল্লাহ্র জন্য বলা হয়, তখন তার অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ, যাতে কোনরূপ কমতি ও ত্রুটি নেই। যেমন 'হাই' কোন জীবিত বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বান্দা মরণশীল। অথচ আল্লাহ্র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হ'লে এর অর্থ হবে চিরঞ্জীব। আল্লাহ বলেন, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'তাঁর জন্যই সর্বোচ্চ উপমা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এবং তিনিই মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(রূম ৩০/২৭; নাহল ১৬/৬০)*।

এখানে আল্লাহ্র বিশেষণ হিসাবে তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য হ'তে الأَعْلَى বা 'সর্বোচ্চ' নামটি কেন আনা হ'ল? কেননা এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জ্ঞান, শক্তি, ক্ষমতা, পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা সবদিক দিয়ে তিনি সর্বোচ্চ। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সবকিছু তাঁর সৃষ্টি, অনুগত ও অধীনস্ত। সবাই তার হুকুম পালনে সদা তৎপর ও সদা প্রস্তুত। মানুষের পক্ষে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বা অনুভবযোগ্য অথবা তাদের অনুভবের বাইরে সকল শক্তি, ক্ষমতা ও জ্ঞান সম্ভারের সবকিছুর সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ কেন্দ্রবিন্দু হ'লেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى 'আর তোমার পালনকর্তার নিকটেই রয়েছে সবকিছুর সমাপ্তি' *(নাজম ৫৩/৪২)*।

এখানে الأَعْلَى শব্দের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা সালাফে ছালেহীন আল্লাহ্র 'উচ্চতার' (فى إثبات العلوّ) প্রমাণ গ্রহণ করেছেন কোনরূপ প্রকৃতি ও আকৃতি (بلا تكييف ولا تمثيل) কল্পনা ছাড়াই। তিনি (সাত আসমানের উপরে) আরশে সমুন্নীত *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম (রাঃ) বলেন, আমার একটা দাসী ছিল যে ওহোদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমার দুম্বা চরাতো। একদিন খোঁজ নিয়ে দেখি একটা দুম্বা নেই। সে বলল, নেকড়ে নিয়ে গেছে। তখন রাগে আমি তাকে একটা চড় মারলাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললে তিনি এটাকে গুরুতর অন্যায় মনে করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার উপর (যেহারের) একটি গোলাম আযাদ করা বাকী আছে। আমি দাসীটিকে মুক্ত করে দেব? তখন তিনি বললেন, ওকে ডেকে আনো। আমি তাকে নিয়ে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, أَيْنَ اللهُ؟ আল্লাহ কোথায়? সে বলল, فِى السَّمَاءِ 'আসমানে'। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, مَنْ أَنَا আমি কে? সে বলল,

أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ আপনি আল্লাহ্র রাসূল'। তখন তিনি বললেন, ওকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে মুমিন নারী'।[২১৬]

অতএব আল্লাহ 'মুমিনের কলবে' আছেন, 'যত কল্লা তত আল্লাহ' তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তিনি নিরাকার ও শূন্য সত্তা' 'স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই' ইত্যাদি ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

এখানে الأَعْلَى (আ'লা) বা 'সর্বোচ্চ' গুণবাচক নামটি আনার মাধ্যমে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ যেমন সর্বোচ্চ, সৃষ্টি হিসাবে মানুষ তেমনি সেরা সৃষ্টি। আর সৃষ্টিজগতে মানুষ সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হ'তে পারবে যদি নাকি সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে ও তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলে। যদি নাকি সে আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে ও সৃষ্টিনিচয়কে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্র সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, কেন আল্লাহ সর্বোচ্চ এবং কেন তাঁর সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করতে হবে।

উপরোক্ত আয়াতটির নিগূঢ় তত্ত্বের কারণেই সম্ভবতঃ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এটাকে সিজদায় গিয়ে দো'আ রূপে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২১৭] কেননা সিজদা অবস্থায় মুছল্লী তার প্রভুর সর্বাপেক্ষা নিকটে পৌঁছে যায়।[২১৮] ফলে আয়াতটি পরোক্ষভাবে সিজদার দো'আ হিসাবে দৈনিক কোটি কোটি মুসলিম নর-নারী পাঠ করে থাকে।

এক্ষণে যখনই *সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা* বলা হবে, তখনই ধারণা করতে হবে যে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ সকল কিছুর উপরে এবং সর্বপ্রকার গুণাবলীতে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ।

দো'আ হ'ল ইবাদত'।[২১৯] আর ইবাদত হ'ল জ্ঞান ও সূক্ষ্মদৃষ্টি অর্জনের দরজা বিশেষ। পূর্ণ বুঝ ও অনুভূতি সহকারে মানুষ যত বেশী আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও তাসবীহ পাঠ করবে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে, সে তত বেশী আল্লাহ্র নিকটবর্তী হবে ও তার অন্তরচক্ষু খুলে যাবে। রুকূতে *সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম* এবং সিজদাতে *সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা* বলার নির্দেশ দানের[২২০] মধ্যে এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যত বেশী আল্লাহ্র অনুগত হবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার মর্যাদা তত বেশী উন্নত হবে।

(২-৩) الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدَى 'যিনি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বিন্যস্ত করেছেন' 'যিনি পরিমিত করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন'।

এখানে خَلَقَ অর্থ أوجد من العدم 'যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, যার কোন পূর্ব নমুনা ছিল না'। যা করতে মানুষ একেবারেই অক্ষম। এর তুলনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

২১৬. মুসলিম হা/৫৩৭ 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়; মালেক হা/২৮৭৫; আবুদাঊদ হা/৯৩০।
২১৭. তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮ মিশকাত হা/৮৮১ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ।
২১৮. মুসলিম হা/৪৮২, মিশকাত হা/৮৯৪,৮৭৩।
২১৯. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/১৪৭৯, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৩০।
২২০. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৮১।

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ- مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ 'হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে আহ্বান কর, তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, উক্ত উদ্দেশ্যে সকলে একত্রিত হ'লেও। মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সেটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। পূজারী ও দেবতা কতই না দুর্বল'। 'তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী' *(হজ্জ ২২/৭৩-৭৪)*।

সকল প্রাণী সৃষ্টির মূল উপাদান হ'ল প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)। আর এটাই হ'ল জীবনের প্রথম একক (Unit)। জনৈক বিজ্ঞানী ১৫ বছর ধরে চেষ্টা করেও এই প্রোটোপ্লাজম তৈরী করতে ব্যর্থ হন। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, উক্ত জীবন কণা সৃষ্টি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় *(স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ৪০৮ পৃঃ)*।

অত্র আয়াতদ্বয়ে চারটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সৃষ্টি করা, বিন্যস্ত করা, পরিমিত করা এবং পথ প্রদর্শন করা। মানুষসহ প্রাণীকুলের সৃষ্টির মধ্যে এ চারটি বিষয় মওজুদ রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল ও সামঞ্জস্য বিধান করে আল্লাহ তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সাথে সাথে যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে পরিমাণ মত সে কাজের যোগ্যতা দান করেছেন ও সেই কাজের জন্য পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি প্রত্যেক সৃষ্টিকে এক ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন *(ত্বোয়াহা ২০/৫০)*। যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা হ'তে অনেক নিম্নস্তরের।

আল্লাহ এক এক প্রাণীকে এক একভাবে সৃষ্টি করেছেন। কেউ ভূগর্ভে বসবাস করে। যেমন কেঁচো ও পোকা-মাকড়। কেউ মাটির উপরে চলাফেরা করে। তবে তার মধ্যেও রয়েছে শ্রেণীভেদ। যেমন কেউ বুকে চলে। যেমন সাপ ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। কেউ দু'পায়ে চলে, যেমন মানুষ ও হাঁস-মুরগী। কেউ চারপায়ে চলে। যেমন গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি চতুষ্পদ পশু *(নূর ২৪/৪৫)*। কেউ আকাশে উড়ে চলে। যেমন পাখি, মশা-মাছি ইত্যাদি। কেউ পানিতে বাস করে। যেমন মাছ, কুমীর ইত্যাদি। প্রত্যেক প্রাণী স্ব স্ব অবয়বে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত এবং স্বভাবে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের রুচি ও আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ও চাল-চলন পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যাকে যেকাজে যেভাবে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, সে প্রাণী সেভাবেই সেকাজ করে। গরু সবুজ ঘাস ও শুকনো বিচালী চিবিয়ে খায়। অথচ মানুষ ধানের খোসা ছাড়িয়ে চাউল বের করে রান্না করে খায়। মাছ পানির নীচে বেঁচে থাকে ও খেলে বেড়ায়। মানুষ ভূপৃষ্ঠে বেঁচে থাকে ও পানিতে ডুবলে মরে যায়। পাখি সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় ও সন্ধ্যায় পেট ভরে বাসায় ফেরে। অথচ

বৃক্ষ সারা জীবন একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে ও সেখানেই আল্লাহ তার রূযী পৌঁছে দেন। এভাবে প্রতিটি প্রাণীর সৃষ্টিকৌশল, তার বিন্যস্তকরণ, পরিমিতকরণ, পথপ্রদর্শন সবই স্বতন্ত্র ধারায় রচিত ও পূর্বনির্ধারিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে সৃষ্টিকুলের তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন'।[২২১]

প্রত্যেক প্রাণী আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত তথা স্বভাবধর্ম অনুযায়ী চলে। মানুষও সেভাবে চলে। কিন্তু অন্য সৃষ্টিকে যে বিশেষ নে'মতটি দেওয়া হয়নি, সেই অমূল্য নে'মত তথা জ্ঞান সম্পদ আল্লাহ কেবল মানুষকে দান করেছেন। যা দিয়ে সে স্বাধীনভাবে সঠিক পথ ও ভুল পথ বেছে চলতে পারে *(দাহর ৭৬/৩)* এবং সৃষ্টিকুলের উপরে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭০; লোকমান ৩১/২০)*। অতঃপর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

হেদায়াত-এর অর্থ : 'হেদায়াত' শব্দটি পবিত্র কুরআনে মোটামুটি চারটি অর্থে এসেছে। যেমন-

(১) সাধারণভাবে পথ প্রদর্শন। যা সকল সৃষ্টি জগতকে দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে জিন, ইনসান, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত, সৌরজগত সবই শামিল রয়েছে। যেমন আল্লাহ আলোচ্য সূরার বর্তমান আয়াতে বলেছেন। তাছাড়া অন্যত্র বলেছেন الَّذِيْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى– 'যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন' *(ত্বোয়াহা ২০/৫০)*। সেজন্যই দেখা যায়, প্রত্যেক প্রাণী ও প্রতিটি বস্তু স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। নাক, কান, চোখ তথা দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু আল্লাহ্র হেদায়াত মোতাবেক স্ব স্ব কাজ করে যাচ্ছে। আকাশের সূর্য, চন্দ্র, মেঘমালা ও বায়ুমণ্ডল একই হেদায়াত মতে চলছে। হেদায়াতের এ স্তরটি সাধারণ ও ব্যাপক।

(২) প্রকাশিত হওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ– 'তাদের নিকটে কি প্রকাশিত হয়নি যারা পূর্বের লোকদের পরে যমীনের উত্তরাধিকারী হয়েছে একথা যে, আমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের পাপের কারণে পাকড়াও করে ফেলতাম'? *(আ'রাফ ৭/১০০)*। তিনি বলেন, وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ 'অতঃপর ছামূদ জাতি। তাদেরকে আমরা পথ প্রদর্শন করেছিলাম। কিন্তু তারা

২২১. মুসলিম হা/২৬৫৩, মিশকাত হা/৭৯।

সৎপথের বিপরীতে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ লাঞ্ছনাকর শাস্তি তাদের গ্রেফতার করে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৭)*। হেদায়াতের এ স্তরটি অবাধ্য ও হঠকারী মানুষের জন্য।

(৩) মানুষকে সরল পথ প্রদর্শন করা। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِراً وَّإِمَّا كَفُوْراً– 'আমরা মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হৌক, না হয় অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহর ৭৬/৩)*। এখানে বর্ণিত হেদায়াতটি সকল মানুষের জন্য, যারা জ্ঞান সম্পদের অধিকারী।

(৪) সত্য গ্রহণ ও তা অনুসরণের ক্ষমতা। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ– 'তুমি যাকে পসন্দ কর তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সৎপথে আনেন। কে সৎপথ প্রাপ্ত হবে, সেবিষয়ে তিনিই সর্বাধিক অবগত' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*। হেদায়াতের এ স্তরটি জিন-ইনসান, নবী-অলী ও ছোট-বড় সকল স্তরের নর-নারীর জন্য উন্মুক্ত। এটি হেদায়াতের সর্বোচ্চ স্তর। এখানে যিনি যত চেষ্টা করবেন, তিনি তত হেদায়াতপ্রাপ্ত হবেন। সেকারণ নবীদেরকেও আমল করতে হয় ও আল্লাহ্র নিকট হেদায়াত প্রার্থনা করা করতে হয়। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ 'যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে আমাদের পথসমূহ প্রদর্শন করে থাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

হেদায়াতের এই তাওফীক প্রার্থনার জন্য সূরা ফাতিহায় সকল মুমিনের প্রতি নির্দেশ এসেছে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর' *(ফাতিহা ৫)*। সম্ভবতঃ একারণেই ইমাম-মুক্তাদী সকল মুছল্লীর জন্য সর্বাবস্থায় সূরায়ে ফাতিহা পাঠ ফরয করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করে না, তার ছালাত সিদ্ধ হয় না'।[২২২]

(৪-৫) وَالَّذِيْ أَخْرَجَ الْمَرْعَى، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى 'যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন'। 'অতঃপর তাকে শুষ্ক-কালো বর্জ্যে পরিণত করেন'।

الْمَرْعَى অর্থ النبات والكلأ الأخضر উদ্ভিদ ও সবুজ ঘাস *(কুরতুবী)*। غُثَاء অর্থ ما يقذف به السيل على جوانب الوادى من الحشيش والنبات والقُماش 'পানির স্রোত যেসব ঘাসপাতা, উদ্ভিদ ও ময়লা-আবর্জনা কিনারায় নিক্ষেপ করে- অর্থাৎ বর্জ্য। الأَحْوَى অর্থ

২২২. বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪, মিশকাত হা/৮২২।

–الأسود أى النبات يضرب إلى السواد من شدة اليبس أو الاحتراق 'অতীব শুষ্ক হওয়ায় বা পুড়ে যাওয়ার কারণে সবুজ ঘাসপাতা যখন কৃষ্ণাভ রং ধারণ করে' *(কুরতুবী)*।

এখানে আল্লাহ তৃণাদি বলে সকল প্রকারের উদ্ভিদ ও শস্যাদি বুঝিয়েছেন। অতঃপর সেই সবুজ উদ্ভিদ ক্রমে হলুদ অতঃপর এক সময় শুকিয়ে কৃষ্ণাভ হয়ে আবর্জনার রূপ ধারণ করে। এর মাধ্যমে মানুষকে তার ভবিষ্যৎ করুণ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, তার যৌবনের সৌন্দর্য ও সজীবতা, স্ফূর্তি ও চটুলতা আল্লাহ্‌র এক বিশেষ দান। এগুলি সব এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। মূল্যহীন আবর্জনা যেমন ঘরের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তাকেও তার মৃত্যুর পরে তার সন্তান ও নিকটত্মীয়েরা অতি সাধের ঘর হ'তে কবরে ফেলে আসবে। যে মহান সত্তার অমোঘ নির্দেশে মানুষের জীবনে এই উত্থান-পতন ঘটে, হে মানুষ সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা কর- *সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা*।

(৬-৭) سَنُقْرِؤُكَ فَلاَ تَنْسَى، إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى 'সত্বর আমরা তোমাকে পাঠ করাবো (কুরআন)। অতঃপর তুমি তা আর ভুলবে না'। 'তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়'।

অত্র আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলকে কুরআন মুখস্থ করানোর গুরুদায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ওয়াদা করেছেন যে, তিনি এটা ভুলবেন না। এর মাধ্যমে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে আশ্বস্ত করেছেন। কেননা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হ'ল ভুলে যাওয়া। কিন্তু কুরআন এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যা বর্তমান ও অনাগত মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নাযিল হয়েছে। যার একমাত্র মাধ্যম হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অতএব উক্ত গ্রন্থের একটি বাক্য, শব্দ বা বর্ণ ভুলে যাবার উপায় নেই। তাই জিব্রীল (আঃ) চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারবার আয়াতগুলি পাঠ করতেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে অত্র আয়াত নাযিল হয় *(কুরতুবী)*। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তাঁর জন্য অন্যতম প্রধান মু'জেযা।

অনুরূপ সান্ত্বনাসূচক আয়াত সূরা ক্বিয়ামাহ-তেও নাযিল হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, –لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ،إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 'তুমি তোমার জিহ্বাকে সঞ্চালিত করবে না দ্রুত অহী মুখস্থ করার জন্য'। 'নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমাদেরই দায়িত্বে'। 'অতএব যখন আমরা তা পাঠ করি, তখন তুমি তার অনুসরণ কর' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৮)*। সেযুগে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছিল না। তাই অহীর সংরক্ষণ করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এবং পরে ছাহাবায়ে কেরামের স্মৃতিতে। বিস্ময়কর স্মৃতিধর এই মহান ব্যক্তিগণের মাধ্যমেই জগদ্বাসী কুরআন ও হাদীছের অমূল্য ভাণ্ডার লাভে ধন্য হয়েছে।

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে দু'টি মু'জেযা রয়েছে। (১) রাসূল (ছাঃ) উম্মী ছিলেন। তিনি পড়তে বা লিখতে জানতেন না। অথচ কুরআন তিনি মুখস্ত রাখতেন

কোনরূপ লিখন ও পঠন-পাঠন ছাড়াই। তিনি ভুলতেন না। (২) সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিককার সূরা। অথচ অত্র আয়াতের মধ্যে গায়েবী খবর ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা পরে বাস্তবায়িত হয়েছে *(তাফসীর ক্বাসেমী)*।

আল্লাহ বলেন, إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ অর্থাৎ যেটুকু আল্লাহ উঠিয়ে নিতে চান বা স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চান, সেটুকু ব্যতীত। যেমন কোন আদেশ রহিত করে নতুন আদেশ নাযিল হওয়া এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট আয়াতটি রহিত করা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্মৃতি হ'তে সেটা মুছে দেওয়া। এ বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا– 'আমরা যখন কোন আয়াত রহিত করি অথবা তোমার স্মৃতি থেকে মুছে দেই, তখন তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার অনুরূপ আয়াত আনয়ন করি' *(বাক্বারাহ ২/১০৬)*।

অবশ্য সাময়িকভাবে কোন আয়াত হঠাৎ বিস্মৃত হওয়া উক্ত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়। যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِىْ كَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنْتُ أَسْقَطْتُهُنَّ 'অমুক ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করুন! সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলে বাদ দিয়ে গিয়েছিলাম'।[২২৩] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَىْ كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও। অতএব যখন আমি ভুলে যাই, তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো'।[২২৪]

আয়াতে বর্ণিত فَلاَ تَنْسَى-এর لاَ নিষেধাজ্ঞাসূচক নয়, বরং 'খবর' অর্থে এসেছে। অর্থাৎ তুমি আর ভুলবে না। তোমার হেফয অক্ষুন্ন থাকবে। বলা বাহুল্য, এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে তথা মানবজাতির উপরে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ ও অসীম দয়ার এক অনন্য নিদর্শন। কেননা কুরআন ভুলে না যাওয়ার বিষয়টিতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। বরং এটি ছিল আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। যেমন তিনি বলেন, وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلاً 'আমরা চাইলে তোমার প্রতি আমরা যা কিছু প্রত্যাদেশ করেছি, সব প্রত্যাহার করে নিতাম। আর তখন তুমি এ বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোন তত্ত্বাবধায়ক পেতে না' *(ইসরা ১৭/৮৬)*।

---

২২৩. বুখারী হা/২৬৫৫।
২২৪. বুখারী হা/৪০১; মুসলিম হা/৫৭২।

(৭) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى অর্থাৎ প্রকাশ্য কুরআনের যা কিছু তোমার বুকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং যা গোপনে সেখান থেকে মুছে যায় বা স্মৃতি বিভ্রম ঘটে, সবই আল্লাহ জানেন। এটাকে جملة معترضة বা অপ্রাসঙ্গিক বাক্য হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায় মানুষের প্রতি হুঁশিয়ারী হিসাবে। অর্থাৎ তিনি মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন সকল কথা ও কর্ম সম্পর্কে অবহিত। মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু তিনি আগে থেকে জানেন এবং সেভাবেই অহী নাযিল হয় ও সংরক্ষিত হয়। অতঃপর তাকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন।

(৮) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى অর্থ نُوَفِّقُكَ لِلطَّرِيقَةِ الْيُسْرَى 'আমরা তোমাকে সরল পথে চলার তাওফীক দান করব' *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ আমরা তোমার মন-মানসিকতাকে ইসলামী শরী'আত প্রতিপালনের জন্য অনুগত করে দেব। উত্তম কথা ও কাজ তোমার স্বভাবে পরিণত হবে। নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। অত্র আয়াতে যার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। এতে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী বিধান সকল মানুষের জন্য সহজে পালনযোগ্য। ইসলামের পথ হ'ল সরল পথ। এ পথে কোন কাঠিন্য ও বক্রতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا 'নিশ্চয়ই এ দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি এতে কঠোরতা করবে, এটি তাকে পরাভূত করবে। অতএব তোমরা দৃঢ়ভাবে সৎকর্ম কর, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর ও মানুষকে সুসংবাদ প্রদান কর'।[২২৫] তিনি বলেন, بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا 'তোমরা মানুষকে সুসংবাদ শুনাও, তাড়িয়ে দিয়ো না। সহজ কর, কঠিন করো না'।[২২৬] অন্য হাদীছে এসেছে, يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا 'তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না। শান্ত কর, তাড়িয়ে দিও না'।[২২৭]

আল্লাহ তাঁর এই অনুগ্রহ কেবল তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ করেননি; বরং অন্যান্য নেককার বান্দার জন্যও উন্মুক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى– 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় ও উত্তম কালেমাকে সত্য মনে করে, সত্বর তাকে আমরা সরল পথের জন্য সহজ করে দেব' *(লায়েল ৯২/৫-৭)*। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কালেমা *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* পাঠ করবে,

---

২২৫. বুখারী হা/৩৯, মিশকাত হা/১২৪৬ 'কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ।
২২৬. বুখারী হা/৬৯, মুসলিম হা/১৭৩২; মিশকাত হা/৩৭২২ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।
২২৭. বুখারী হা/৬১২৫, মুসলিম হা/১৭৩৪;, মিশকাত হা/৩৭২৩।

তথা খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাসী হবে ও নেক আমল করবে, আমরা তার জন্য ইসলামের সরল পথ সহজ করে দেব।

এখানে সকল তাওহীদবাদী মুসলমানের জন্য আল্লাহ্র বিশেষ রহমতকে উদার করে দেয়া হয়েছে। আর একারণেই দেখা যায় আরবের অন্ধকার যুগের লোকেরা স্বচ্ছ হৃদয়ে কালেমা পাঠ করার সাথে সাথে তাদের জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। অন্ধকারের মানুষগুলি কেবল আলোর পথে আসেনি, বরং বিশ্বসেরা মানুষে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্র এই রহমত সকল যুগে তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। অন্য হাদীছে এসেছে, اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ 'তোমরা কাজ করে যাও। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ কাজ সহজ হবে, যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।[২২৮] এতে বুঝা যায় যে, জান্নাতের জন্য সৃষ্ট বান্দারা ঐকাজ সহজে করবে, যে কাজে জান্নাত পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামের জন্য সৃষ্ট লোকেরা এর বিপরীত আচরণ করবে।

অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, ইসলামী শরী'আত তোমার জন্য সহজ করা হবে, যা তোমার স্বভাবধর্মে পরিণত হবে। ইসলাম বিরোধী কোন কথা বা কাজ তোমার দ্বারা সম্পাদিত হবে না। এক সময় হাদীছ লেখক তরুণ ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে কুরায়েশ নেতাদের কেউ কেউ বলেন যে, রাসূল (ছাঃ) অনেক সময় রাগে বা আবেগে অনেক কথা বলেন। অতএব তুমি তাঁর সব কথা লিখো না। বরং ঠাণ্ডা মাথায় যখন কথা বলেন, তখন সেটা লিখো'। তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أُكْتُبْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّى إِلاَّ حَقٌّ وَأَشَارَ إِلَى فَمِهِ 'তুমি লেখ। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমার থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই বের হয় না'- এ সময় তিনি নিজের মুখের দিকে আঙ্গুলের ইশারা করেন'।[২২৯]

বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিসত্তাকে হক কবুলের জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে এবং হক-এর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আর এজন্যেই তিনি হ'তে পেরেছেন পৃথিবীব্যাপী সকল আল্লাহভীরু মানুষের জন্য উত্তম নমুনা। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً– 'যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে কামনা করে এবং আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা' *(আহযাব ৩২/২১)*।

---

২২৮. বুখারী হা/৪৯৪৯; মুসলিম হা/২৬৪৭; মিশকাত হা/৮৫।

২২৯. মুস্তাদরাক হাকেম ১/১০৫-০৬, হা/৩৫৯, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ হা/৩৬৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৩২।

(৯) فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ‘অতএব তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়’।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবুঅতের গুরুদায়িত্ব পালনে আল্লাহ প্রদত্ত সুবিধাদি বর্ণনা করার পর অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে নবুঅতের প্রধান কর্তব্য জনগণের প্রতি উপদেশ প্রদানের আদেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, فَذَكِّرْ ‘অতএব তুমি উপদেশ দাও’। إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ‘যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়’। إِنْ এসেছে قَدْ অর্থে, شرطية অর্থে নয়। অর্থাৎ এখানে কথাটি শর্ত হিসাবে বলা হয়নি। বরং আদেশকে যোরদার করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়, যদি তুমি মানুষ হও, তবে একাজ তোমাকে করতে হবে। অর্থাৎ একাজ তোমাকে করতেই হবে। অনুরূপভাবে এখানে বলা হয়েছে, তোমাকে উপদেশ দিতেই হবে এবং তা নিশ্চিতভাবে ফলপ্রসূ হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ‘তুমি উপদেশ দাও। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকার করে’ *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতেই মক্কা-মদীনার লোকেরা ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যারা মনে করেন, তরবারির জোরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এযুগে একমাত্র অস্ত্রের জোরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, তারা আয়াতটি অনুধাবন করুন!

إِنْ যদি شرطية ধরা হয়, তাহ'লে ঐসব লোকদের নিন্দা করা বুঝাবে, যারা দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, কাফের-মুনাফিক ও ফাসিক নেতাদের প্রতি উপদেশ ফলপ্রসূ হবেনা। সেক্ষেত্রে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার হুকুম রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ،... وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِباً وَّلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا.. (الأنعام ٦٨، ٧٠)-

‘আর যখন তুমি দেখ যে, তারা আমাদের আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর যালেমদের সাথে আর বসবে না’। ... ‘আর তুমি তাদেরকে পরিত্যাগ কর যারা নিজেদের ধর্মকে খেল-তামাশা মনে করেছে এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে’.. *(আন‘আম ৬/৬৮,৭০)*।

এতে বুঝা যায় যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উপদেশ দান কখনো ফরয, কখনো মুস্তাহাব ও কখনো হারাম হয়। তবে সাধারণ নির্দেশ হ'ল সকলকে উপদেশ দেওয়া। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدِّيْنُ النَّصِيحَةُ ‘দ্বীন হ'ল নছীহত’।[২৩০] এক্ষণে উপদেশ-পরবর্তী লোকদের আল্লাহ দু'ভাগে ভাগ করে বলেন,

২৩০. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬।

(১০) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشَى ‘ সত্বর উপদেশ গ্রহণ করবে, যে ব্যক্তি ভয় করে’। অর্থাৎ প্রমাণ নাযিল হওয়ার পরে এবং দলীল প্রকাশিত হওয়ার পরে যারা তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার পরিণামে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করে, তারা সত্বর উপদেশ গ্রহণ করবে। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহভীরুতার গুণটি মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবজাত বিষয়। প্রতিটি মানুষের অবচেতন মনে আল্লাহকে স্বীকার করার ও তাঁর আদেশ পালন করার যোগ্যতা রয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ‘আল্লাহ প্রদত্ত ফিৎরাত (বা যোগ্যতা) সেটাই, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যার কোন পরিবর্তন নেই’ *(রূম ৩০/৩০)*। হাদীছে এসেছে, كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِه أَوْ يُنَصِّرَانِه أَوْ يُمَجِّسَانِه– ‘প্রত্যেক মানবশিশু ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাছারা বা মজূসী বানায়’।[২৩১] অতঃপর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ‘যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দিলে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না’ *(ফুরক্বান ২৫/৭৩)*। কিন্তু হতভাগ্য যারা তারা শয়তানের কুহকে পড়ে নিজের স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তাঁর অবাধ্যতা করে। যেমন পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন।-

(১১) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ‘আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগা’। বিষয়টি আল্লাহ্র ইলমের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কে হতভাগ্য, আর কে সৌভাগ্যবান সেটা মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে এখানে হতভাগ্যদের লক্ষণ বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীছের উপদেশ উপেক্ষা করবে ও স্বেচ্ছাচারীসূলভ আচরণ করবে। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ ‘অতঃপর যারা হতভাগ্য হবে, তারা জাহান্নামে থাকবে...’ *(হূদ ১১/১০৬)*। وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ ‘পক্ষান্তরে যারা সৌভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে থাকবে চিরকাল...’ *(হূদ ১১/১০৮)*।

(১২) الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ‘যে প্রবেশ করবে মহা অগ্নিতে’ অর্থাৎ জাহান্নামের বিশাল অগ্নিকুণ্ডে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ‘তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ মাত্র’।[২৩২] অর্থাৎ দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৬৯ গুণ বেশী উত্তাপের অধিকারী এবং সে কারণে এখানে জাহান্নামের আগুনকে (النار الكبرى) বা ‘মহা অগ্নি’

---

২৩১. বুখারী হা/১৩৮৫; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৯০।
২৩২. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬৫ ‘জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ।

বলা হয়েছে। এখানে الْعُظْمَى أَلَمًا وَعَذَابًا الْكُبْرَى অর্থ 'যন্ত্রণা ও শাস্তির দিক দিয়ে বড়'। হাসান বাছরী বলেন, النار الكبرى نار جهنم والصغرى نار الدنيا 'মহা অগ্নি হ'ল জাহান্নামের আগুন এবং ছোট আগুন হ'ল দুনিয়ার আগুন' *(কুরতুবী)*। নিঃসন্দেহে জাহান্নামের আগুনের তাপ দুনিয়ার আগুনের চাইতে বহুগুণ বেশী এবং জাহান্নামের শাস্তি দুনিয়ার সকল প্রকার শাস্তির চাইতে যন্ত্রণাদায়ক ও মর্মন্তুদ।

(১৩) ثُمَّ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَى 'অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না'। অর্থ لا يهلك فيستريح، ولا يحيى حياة تنفعه 'সে মরবে না যাতে স্বস্তি পায় এবং বাঁচবে না যাতে উপকৃত হয়'। বরং সেখানে তার জন্য কেবল কষ্ট আর কষ্ট। কঠিন বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে আরবরা বলে থাকে لا هو حى ولا ميت 'সে না জীবিত, না মৃত'। তাদের পরিচিত ভাষাতেই আল্লাহ এখানে জাহান্নামীদের শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন। আয়াতের শুরুতে ثُمَّ এসেছে শাস্তির তারতম্য বুঝানোর জন্য। যাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, জাহান্নামে প্রবেশের শাস্তির চাইতে সেখানে স্থায়ী হওয়ার শাস্তি আরও ভয়ংকর *(ক্বাসেমী)*। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন জাহান্নামীরা তাদের দাররক্ষী (خازن) 'মালেক' ফেরেশতাকে চিৎকার দিয়ে ডেকে বলবে, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ- لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ 'হে মালেক! (এর চাইতে বরং) তোমার প্রতিপালক আমাদের মেরে ফেলে দিন। জবাবে সে বলবে, তোমরা তো এখানেই অবস্থান করবে'। '(আল্লাহ বলবেন,) আমরা তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ ছিলে সত্যকে অপসন্দকারী' *(যুখরুফ ৪৩/৭৭-৭৮)*। তাদের শাস্তি বিষয়ে আল্লাহ বলেন, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْداً غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ 'যখন তাদের চামড়াগুলো দগ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমরা তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে' *(নিসা ৪/৫৬)*। তিনি বলেন, لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ 'তাদেরকে মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি' *(ফাত্বির ৩৫/৩৬)*।

তবে পাপের স্তরভেদের কারণে জাহান্নামে শাস্তির স্তরভেদ রয়েছে। আয়াতে বর্ণিত اَلْأَشْقَى অর্থাৎ 'সর্বাধিক হতভাগা' বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাঅগ্নি। তাহ'লে কম পাপীদের জন্য রয়েছে কম অগ্নি। হাদীছেও এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সবচাইতে হালকা আযাব

হবে আবু তালিবের। তার দু'পায়ে দু'টি আগুনের জুতা পরানো হবে। তাতেই তার মাথার মগয ফুটতে থাকবে।[২৩৩] তিনি আরও বলেন, জাহান্নামীদের উপর আগুন কারু পায়ের টাখনু পর্যন্ত, কারু হাঁটু পর্যন্ত, কারু কোমর পর্যন্ত ও কারু কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছবে'।[২৩৪] অতএব যার পাপ যত বেশী তার অগ্নি-উত্তাপ তত বেশী হবে। তাছাড়া অনেককে আল্লাহ শাস্তি শেষে জান্নাতে পাঠাবেন। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِينَ يُرِيدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِخْرَاجَهُمْ يُمِيتُهُمْ فِيهَا إِمَاتَةً حَتَّى يَصِيرُوْا فَحْماً ثُمَّ يُخْرَجُوْنَ ضَبَائِرَ فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ أَوْ يُرَشُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيْلِ السَّيْلِ-

'আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নেবার ইচ্ছা করবেন, তাদেরকে সেখানে মৃত্যু দান করবেন এবং তারা পোড়া কয়লার মত হয়ে যাবে। (অতঃপর তাদের জন্য সুফারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে' -*মুসলিম*)। অতঃপর তাদের বের করা হবে দলে দলে। অতঃপর তাদের জান্নাতের নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। অথবা তাদের উপর উক্ত পানি ছিটিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তারা শস্যদানা হ'তে উদ্গত অংকুরের মত সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২৩৫]

(১৪) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'নিশ্চয়ই সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে পরিশুদ্ধ হয়'। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয় সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে পরিশুদ্ধি অর্জন করে। এই শুদ্ধিতা হ'ল প্রথমে হৃদয়জগতকে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করা হ'তে পরিশুদ্ধ করা ও নিজের আমলকে বিদ'আত হ'তে পবিত্র করা। সঙ্গে সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া ও অহংকারের মত ধ্বংসকারী রোগসমূহ হ'তে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা এবং পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও সর্বদা আল্লাহ্র হুকুম মান্য করা। আর্থিক শুদ্ধিতা অর্জনের জন্য আয়-উপার্জনকে হালাল করা ও যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং যাকাত, ওশর, ছাদাক্বাতুল ফিৎর ও অন্যান্য নফল ছাদাক্বাসমূহ আদায়ের মাধ্যমে নিজেকে কৃপণতার কালিমা হ'তে পরিশুদ্ধ করা বুঝায়। অর্থাৎ বিশ্বাসে ও কর্মে, কথায় ও আচরণে শুদ্ধাচারী হওয়া।

(১৫) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى 'এবং তার প্রভুর নাম স্মরণ করে, অতঃপর ছালাত আদায় করে'। অত্র আয়াত দ্বারা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবুল 'আলিয়াহ প্রমুখ প্রথমে ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায় করা, অতঃপর ঈদুল ফিৎরের ছালাত আদায় করার অর্থ নিয়েছেন। কোন কোন বিদ্বান এই আয়াত দ্বারা ছালাত শুরুর প্রাক্কালে তাকবীরে তাহরীমা ফরয হওয়ার দলীল নিয়েছেন *(কুরতুবী)*। খলীফা ওমর বিন

---

২৩৩. বুখারী হা/৬৫৬২; মিশকাত হা/৫৬৬৮।
২৩৪. মুসলিম হা/২৮৪৫; মিশকাত হা/৫৬৭১।
২৩৫. আহমাদ হা/১১১৬৭; মুসলিম হা/১৮৫ প্রভৃতি।

আব্দুল আযীয জনগণকে ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং উপরোক্ত আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করতেন *(ইবনু কাছীর)*।

তবে এটা ঠিক যে, অত্র আয়াত ছাদাক্বাতুল ফিৎর ও ঈদুল ফিৎরের ছালাত বিষয়ে নাযিল হয়নি। কেননা এটি মাক্কী সূরা। আর মক্কাতে ঈদও ছিল না, ছাদাক্বাতুল ফিৎরও ছিল না। বরং রামাযানের ফরয ছিয়াম, যাকাত ও ঈদ মদীনাতে ২য় হিজরী সনে নির্দেশিত হয়। কুশায়রী বলেন, এটা মোটেই গৌণ নয় যে, এখানে ঐসব লোকদের আগাম প্রশংসা করা হয়েছে, যারা পরবর্তীতে যাকাতুল ফিৎর ও ঈদের ছালাত আদায় করবে। আবুল 'আলিয়াহ বলেন, মদীনাবাসীগণ যাকাতুল ফিৎরকে সর্বোত্তম ছাদাক্বা মনে করতেন' *(কুরতুবী)*। যদি বলা হয় যে, সাধারণভাবে কুরআনে সর্বত্র ছালাতকে যাকাতের আগে আনা হয়। যেমন وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩ প্রভৃতি)*। কিন্তু এখানে যাকাতকে আগে আনা হ'ল কেন? জবাবে বলা চলে যে, এরূপ আগ-পিছ কোন দোষের নয়। এতদ্ব্যতীত এর মাধ্যমে যাকাত ও ছাদাক্বার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর তোমরা সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

মোদ্দাকথা আয়াত দু'টির প্রকাশ্য অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তি সফলকাম হবে, যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি অর্জন করবে। যা শিরক ও নিফাক হ'তে আত্মার পরিশুদ্ধি এবং ফরয যাকাত ও নফল ছাদাক্বাসমূহ আদায়ের মাধ্যমে মালের পরিশুদ্ধি সবকিছুকে শামিল করে। অতঃপর বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করবে এবং ছালাত আদায় করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ 'তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪)*। এই ছালাত ফরয, সুন্নাত, নফল সকল প্রকার ছালাতকে শামিল করে। যা স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে। কোনরূপ রিয়া বা শ্রুতির উদ্দেশ্যে নয়।

(১৬) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 'বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক'। অর্থ بل تقدمون الدنيا على أمر الآخرة 'বরং তোমরা আখেরাতের কর্ম সমূহের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক'। الدُّنْيَا অর্থ 'বর্তমান জীবন'। মাদ্দাহ الدُّنُوُّ অর্থ 'নিকটবর্তী'। الآخِرَةُ অর্থ 'পরকালীন জগত'। মাদ্দাহ الآخِرُ 'পশ্চাদ্বর্তী'। দুনিয়াটা মানুষের নাগালের মধ্যে। কিন্তু আখেরাত মানুষের নাগালের বাইরে, তার মৃত্যুর পরে চোখের অগোচরে। তাই মানুষ তাকে অনেক দূরের ভাবে। অথচ তা যে কোন সময়ে তার জীবনে এসে যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا 'তারা

এটাকে দূরে মনে করে'। 'কিন্তু আমরা একে নিকটে দেখি' *(মা'আরিজ ৭০/৬-৭)*। বস্তুতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সর্বদা মৃত্যু ও আখেরাতকে সামনে রেখেই কাজ করে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ইহকালীন জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছেন। আয়াতটি ধিক্কার ও তিরষ্কারমূলক। بَلْ এসেছে পূর্বের প্রসঙ্গ থেকে পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্য (للإضراب الانتقالى)। অর্থাৎ সফলকাম লোকদের প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার হতভাগ্য লোকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলছেন, তোমাদের জাহান্নামী হবার কারণ এই যে, তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে পরকালীন জীবনের উপরে অগ্রাধিকার দিয়েছ। আর সেকারণে তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলে মত্ত থাকো। অথচ আখেরাতের চিরস্থায়ী স্বার্থ উপেক্ষা কর।

ইবনু জারীর আরফাজা ছাক্বাফী হ'তে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) অত্র সূরাটির শুরু থেকে পাঠ করে এখানে এসে থেমে যান এবং বলেন, أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ 'তোমরা কি জানো কেন আমরা দুনিয়াবী জীবনকে আখেরাতের উপরে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি? কেননা দুনিয়া তার খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য লোভনীয় সম্পদরাজি নিয়ে আমাদের সামনে হাযির থাকে এবং যা আমরা দ্রুত হাতের নাগালের মধ্যে পাই। فأخذنا العاجل و تركنا الآجل 'ফলে আমরা নগদটা গ্রহণ করি, আর বাকীটা পরিত্যাগ করি'।[২৩৬]

অনুরূপ এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা একদা হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সবাইকে বললেন, تَعَالِ نذكر ربنا ساعة 'এসো কিছুক্ষণ আমরা আমাদের পালনকর্তাকে স্মরণ করি'। অতঃপর তিনি বললেন, হে আনাস! তুমি কি জানো مَا ثَبَرَ النَّاسَ কোন বস্তু মানুষকে (আখেরাত থেকে) আটকে রাখে? আমি বললাম, দুনিয়া, শয়তান ও প্রবৃত্তি। তিনি বললেন, না। বরং দুনিয়া নগদ পাওয়া যায় এবং আখেরাত অদৃশ্যে থাকে। أما والله لو عاينوها ماعَدَلوا ولا ميَّلوا 'আল্লাহ্র কসম! যদি তারা আখেরাতকে চোখের সামনে দেখতে পেত, তাহ'লে তারা পিঠ ফিরাতো না বা ইতস্তত করত না *(কুরতুবী)* । বস্তুতঃ দুনিয়ায় যত অশান্তির মূল কারণ হ'ল দুনিয়াপূজা এবং আখেরাতকে ভুলে থাকা। আল্লাহ বলেন,

(১৭) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى 'অথচ আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী'। অর্থ ثوابُ الله فِي الدار الآخرة خير من الدنيا وأَبْقَى 'আখেরাতে আল্লাহ প্রদত্ত ছওয়াব দুনিয়ার চাইতে উত্তম ও চিরস্থায়ী *(ইবনু কাছীর)*।

---

২৩৬. ত্বাবারাণী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৭৭৩৭, ইবনু জারীর ৩০/১০০; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।

আল্লাহ বলেন, لاَ يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ‘সেখানে তাদের কোনরূপ বিষণ্ণতা স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না’ *(হিজর ১৫/৪৮)*।

ইবনু কাছীর বলেন, فَإِنَّ الدُّنْيَا دَنِيَّةٌ فَانِيَةٌ، وَالْآخِرَةَ شَرِيفَةٌ بَاقِيَةٌ، فَكَيْفَ يُؤْثِرُ عَاقِلٌ مَا يَفْنَى عَلَى مَا يَبْقَى ‘দুনিয়া হ’ল নিকৃষ্ট ও ধ্বংসশীল এবং আখেরাত হ’ল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। অতএব কিভাবে একজন জ্ঞানী মানুষ ধ্বংসশীল বস্তুকে চিরস্থায়ী বস্তুর উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে’? কিভাবে ঐবস্তুকে গুরুত্ব দিতে পারে যা সত্বর বিলীন হয়ে যাবে। আর কিভাবে গুরুত্বহীন ভাবতে পারে চিরস্থায়ী নিবাসকে? *(তাফসীর ইবনে কাছীর)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالْآخِرَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا، فَأَضِرُّوْا بِالْفَانِيْ لِلْبَاقِيْ ‘যে ব্যক্তি দুনিয়ার (ভোগ-বিলাস) অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, আখেরাতকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পাথেয় অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব তোমরা চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত কর।[২৩৭] আখেরাতের সুখ-সম্ভার দুনিয়ার চাইতে কত উত্তম সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ‘কেউ জানে না তার কর্মের প্রতিদান হিসাবে কি কি চক্ষু শীতলকারী বস্তু তাদের জন্য লুকিয়ে আছে’ *(সাজদাহ ৩২/১৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ‘আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সুখ-সম্ভার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি’।[২৩৮] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ‘জান্নাতের একটি চাবুক রাখার স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সবকিছু থেকে উত্তম’।[২৩৯]

অতঃপর আখেরাতের দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী জীবন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুলনায় কেমন, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ– ‘আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া অনুরূপ তুচ্ছ, যেরূপ তোমাদের কেউ সাগরে আঙ্গুল ডুবালে তাতে যৎসামান্য পানি উঠে আসে’।[২৪০]

২৩৭. আহমাদ, মিশকাত হা/৫১৭৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৮৭।
২৩৮. বুখারী হা/৭৪৯৮, মুসলিম হা/২৮২৪ মিশকাত হা/৫৬১২ ‘জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ।
২৩৯. বুখারী হা/৩২৫০, মিশকাত হা/৫৬১৩।
২৪০. মুসলিম হা/২৮৫৮, মিশকাত হা/৫১৫৬ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়।

মালেক ইবনু দীনার বলেন, সোনার তৈরী দুনিয়া যদি ধ্বংসশীল হয়, আর ঝুপড়িসর্বস্ব আখেরাত যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহ'লে ঐ ঝুপড়ীকে অগ্রাধিকার দেওয়াই ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি আখেরাত স্বর্ণ নির্মিত হয়, আর দুনিয়াটা ঝুপড়ি সদৃশ হয়, তখন কেমনটা হবে? *(কুরতুবী)*।

মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও মানুষ কিভাবে দুনিয়ার জন্য পাগলপরা হয়? কবর ও জাহান্নামের আযাবের কথা বিশ্বাস করেও মানুষ কিভাবে হাসি-খুশীতে মত্ত থাকে? বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেলের অস্থায়ী নিবাসের চাইতে কি নিজের মাটির ঘরের স্থায়ী নিবাস উত্তম ও অগ্রাধিকারযোগ্য নয়? অতএব দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ঠিকানার উপরে পরকালের চিরস্থায়ী ঠিকানাকে অগ্রাধিকার দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

(১৮) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلَى 'নিশ্চয় এটা লিপিবদ্ধ ছিল পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে'। অর্থাৎ ثابت فيها معناه 'সেখানে এর মর্মসমূহ মওজুদ রয়েছে'।

ইবনু কাছীর বলেন যে, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى থেকে (১৪-১৭) বর্ণিত আয়াতসমূহের বক্তব্য হ'ল বিগত ইলাহী ধর্ম ও কিতাবসমূহের শিক্ষাসমূহের সারনির্যাস'। যা মানুষকে দুনিয়াবী লোভ-লালসার কলুষ-কালিমা হ'তে মুক্ত করে এবং আখেরাতের স্বচ্ছ গুণাবলীতে আলোকিত করে। অতঃপর তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। আল্লাহ বলেন, এসব কথা ইবরাহীম ও মূসার কিতাব ও পুস্তিকাসমূহে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

(১৯) صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى 'ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে'। বাক্যটি পূর্বের বাক্য হ'তে بدل হয়েছে। এর মাধ্যমে পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাথে সাথে ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-এর ছহীফার উচ্চ মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে' *(ক্বাসেমী)*। এখানে الصُّحُفُ বলতে الكتب السماوية الماضية 'বিগত আসমানী কিতাবসমূহ' বুঝানো হয়েছে। প্রসিদ্ধ চারটি কিতাবের বাইরেও পুস্তিকা সমূহ ছিল। সবগুলিকে এখানে الصُّحُفُ অর্থাৎ 'ছহীফাসমূহ' বলা হয়েছে। 'ছহীফা' অর্থ, পুস্তিকা। সেইসব কিতাবে আলোচ্য সূরার মর্মসমূহ বর্ণিত হয়েছে, শব্দে শব্দে নয়। এখানে هَذَا-এর 'উদ্দেশ্য' (مرجع) কোন্টি, এবিষয়ে আবুল 'আলিয়াহ বলেন, পুরা সূরাটি। ইবনু জারীর বলেন, قَدْ أَفْلَحَ থেকে শেষ পর্যন্ত। ইবনু কাছীর বলেন, এটাই সুন্দর ও শক্তিশালী (حسن قوى) *(ইবনু কাছীর)*।

সারকথা :

আখেরাতের উপরে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়াই হ'ল পার্থিব জীবনে সকল অশান্তির মূল। বস্তুতঃ আল্লাহভীরু ও বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী লোকেরাই কেবল দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয়ে থাকে।

সূরা গাশিয়াহ (আচ্ছন্নকারী)

সূরা যারিয়াতের পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮৮, আয়াত ২৬, শব্দ ৯২, বর্ণ ৩৭৮।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী দিবসের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? — هَلۡ اَتٰىكَ حَدِیۡثُ الۡغَاشِیَۃِ ؕ﴿۱﴾

(২) যেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ভীত-নমিত — وُجُوۡہٌ یَّوۡمَئِذٍ خَاشِعَۃٌ ۙ﴿۲﴾

(৩) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। — عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ ۙ﴿۳﴾

(৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে — تَصۡلٰی نَارًا حَامِیَۃً ۙ﴿۴﴾

(৫) ফুটন্ত ঝর্ণা হ'তে তাদের পান করানো হবে — تُسۡقٰی مِنۡ عَیۡنٍ اٰنِیَۃٍ ؕ﴿۵﴾

(৬) বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত শুকনা যরী' ঘাস ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য জুটবে না। — لَیۡسَ لَہُمۡ طَعَامٌ اِلَّا مِنۡ ضَرِیۡعٍ ۙ﴿۶﴾

(৭) যা তাদের পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না। — لَّا یُسۡمِنُ وَ لَا یُغۡنِیۡ مِنۡ جُوۡعٍ ؕ﴿۷﴾

(৮) যেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উৎফুল্ল — وُجُوۡہٌ یَّوۡمَئِذٍ نَّاعِمَۃٌ ۙ﴿۸﴾

(৯) স্ব স্ব কর্মফলে সন্তুষ্ট। — لِّسَعۡیِہَا رَاضِیَۃٌ ۙ﴿۹﴾

(১০) তারা থাকবে সুউচ্চ বাগিচায় — فِیۡ جَنَّۃٍ عَالِیَۃٍ ﴿ۙ۱۰﴾

(১১) যেখানে শুনবে না কোন অসার বাক্য — لَّا تَسۡمَعُ فِیۡہَا لَاغِیَۃً ﴿ؕ۱۱﴾

(১২) যেখানে থাকবে প্রবহমান ঝরণাসমূহ — فِیۡہَا عَیۡنٌ جَارِیَۃٌ ﴿ۘ۱۲﴾

(১৩) থাকবে সমুচ্চ আসনসমূহ — فِیۡہَا سُرُرٌ مَّرۡفُوۡعَۃٌ ﴿ۙ۱۳﴾

(১৪) এবং রক্ষিত পানপাত্রসমূহ — وَّ اَکۡوَابٌ مَّوۡضُوۡعَۃٌ ﴿ۙ۱۴﴾

(১৫) ও সারিবদ্ধ বালিশসমূহ — وَّ نَمَارِقُ مَصۡفُوۡفَۃٌ ﴿ۙ۱۵﴾

(১৬) এবং বিস্তৃত গালিচাসমূহ। — وَّ زَرَابِیُّ مَبۡثُوۡثَۃٌ ﴿ؕ۱۶﴾

(১৭) তারা কি দেখে না উষ্ট্রের প্রতি, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? — اَفَلَا یَنۡظُرُوۡنَ اِلَی الۡاِبِلِ کَیۡفَ خُلِقَتۡ ﴿۱۷﴾

(১৮) এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উচ্চ করা হয়েছে? — وَ اِلَی السَّمَآءِ کَیۡفَ رُفِعَتۡ ﴿۱۸﴾

(১৯) এবং পাহাড় সমূহের প্রতি, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩
(২০) এবং পৃথিবীর প্রতি, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?	وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠
(২১) অতএব তুমি উপদেশ দাও। তুমি তো কেবল উপদেশদাতা মাত্র।	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١
(২২) তুমি তাদের উপরে দারোগা নও।	لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢
(২৩) তবে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অবিশ্বাসী হয়,	إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝٢٣
(২৪) আল্লাহ তাকে সবচাইতে বড় শাস্তি প্রদান করবেন।	فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝٢٤
(২৫) নিশ্চয় আমাদের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন।	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝٢٥
(২৬) অতঃপর আমাদের দায়িত্বে রয়েছে তাদের হিসাব গ্রহণ।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۝٢٦

গুরুত্ব :

নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই ঈদ ও জুম'আর ছালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ পাঠ করতেন। এমনকি জুম'আ ও ঈদ একদিনে হ'লেও তিনি উক্ত দু'টি সূরাই পাঠ করতেন'।[২৪১]

বিষয়বস্তু :

অত্র সূরায় ক্বিয়ামত দিবসে জান্নাতী ও জাহান্নামী দু'দল মানুষের দু'রকমের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে *(১-১৬ আয়াত)*। অতঃপর মরুচারী আরবদের পথ প্রদর্শনের জন্য তাদের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শন উল্লেখ করে এসবের সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্র অপার কুদরতের বিষয় চিন্তা-গবেষণা করার আহ্বান জানানো হয়েছে *(১৭-২০ আয়াত)*। সবশেষে রাসূল (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তুমি তাদের উপর শাসক নও। বরং তোমার দায়িত্ব কেবল উপদেশ দেওয়া। অতঃপর তাদের যথাযথ প্রতিফল দানের দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত *(২১-২৬ আয়াত)*।

তাফসীর :

(১) هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ 'তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী দিবসের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি'? هَلْ أَتَاكَ বাক্যে هَلْ প্রশ্নবোধক অব্যয় হ'লেও প্রকৃত অর্থ হবে قد অর্থাৎ 'অবশ্যই

২৪১. মুসলিম হা/৮৭৮, মিশকাত হা/৮৪০ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।

তোমার নিকট ক্বিয়ামতের খবর পৌঁছেছে'। যেমন هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ *(দাহর ৭৬/১)*-এর অর্থ قد أتى 'অবশ্যই এসেছে'। বক্তব্যকে শ্রোতার হৃদয়ে প্রোথিত করার জন্য এটি আরবদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাকরীতি।

'গাশিয়াহ'-এর আভিধানিক অর্থ (الداهية) 'আচ্ছন্নকারী'। এখানে অর্থ হবে 'ক্বিয়ামত'। সেদিনের ভয়াবহতা ও ভয়ংকর অবস্থা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ ও ইবনু যায়েদ বলেন, 'গাশিয়াহ' হ'ল ক্বিয়ামত দিবসের অন্যতম নাম' *(ইবনু কাছীর)*। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে জাহান্নামী লোকদের অবস্থা কেমন হবে সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন-

(২-৩) وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ، عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ 'যেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ভীত-নমিত'। 'ক্লিষ্ট, ক্লান্ত'। এখানে وُجُوهٌ অর্থ أصحاب الوجوه 'চেহারার মালিকগণ' অর্থাৎ জাহান্নামী ব্যক্তিগণ। কুরতুবী বলেন, وجوه عاملة ناصبة فى الدنيا خاشعة فى الآخرة 'দুনিয়াতে বহু আমলকারী ক্লান্ত-শ্রান্ত ব্যক্তিগণ আখেরাতে হবে ভীত-নমিত'। ইবনু কাছীর বলেন, أى قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه 'তারা বহু আমল করেছে ও তাতে পরিশ্রান্ত হয়েছে' *(ইবনু কাছীর)*।

কাফের-মুশরিক ও বিদ'আতী লোকদের আমলসমূহ আল্লাহ্র নিকটে অগ্রাহ্য হবে। দুনিয়াতে নেক আমল ভেবে তারা অনেক বাড়তি কাজ করে থাকে। পোপ-পাদ্রী ও যোগী-সন্ন্যাসীরা এমনকি মুমিন নামধারী ভণ্ড তপস্বীরা তাদের দাবী মতে আল্লাহকে পাবার জন্য কৃচ্ছ্র সাধনার নামে নিজেদের জীবনের উপরে অযথা কষ্ট ডেকে আনে। সংসার-ধর্ম ত্যাগ করে দেশে দেশে ও বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। গীর্জা, মঠ-মন্দির ও খানক্বাহে তথাকথিত ধ্যানে ও ভজনে জীবন কাটায়। উত্তম খানাপিনা ও পোষাকাদি পরিত্যাগ করে নোংরা পোষাক, চট ও জটাধারী হয়। কখনোবা উলংগ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এইভাবে একসময় সে মারা যায়। মূর্খরা তাকে 'কামেল ব্যক্তি' ভেবে 'বাবা' বলে। তার কবরকে 'মাযার' বানায় ও সেখানে নযর-নেয়ায দেয়া শুরু করে। কেউবা মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করে। জীবনে সে ছিল নফসরূপী শয়তানের পূজারী। মরার পরে মানুষ হয় তার মূর্তি, প্রতিকৃতি বা কবরের পূজারী। অথচ তার অনুসারীরা ভাবে যে, তারাই সর্বাধিক উত্তম আমলকারী। এদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً– 'তুমি বল, আমরা কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের বিষয়ে খবর দিব?' 'পার্থিব জীবনে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে,

তারা সৎকর্ম করেছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*। আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا 'অনন্তর আমরা তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে অগ্রসর হব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

হাসান বাছরী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) শাম সফরে এলে তাঁর কাছে একজন জীর্ণ-শীর্ণ খ্রিষ্টান পাদ্রী দেখা করতে আসেন। ওমর (রাঃ) তার ক্লিষ্ট-করুণ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, هذا المسكين طلب أمراً فلم يصبه، ورجا رجاء فأخطأه وقرأ : وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ– 'এই হতভাগা মিসকীন যা চেয়েছিল তা পায়নি, যা আকাংখা করেছিল তাতে সে ব্যর্থ হয়েছে। অতঃপর তিনি অত্র আয়াতটি পাঠ করেন –وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً 'বহু চেহারা সেদিন হবে ভীত-নমিত'। 'ক্লিষ্ট, ক্লান্ত'। 'তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে' *(কুরতুবী)*।

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, এই লোকেরা হ'ল খারেজী দল *(কুরতুবী)*। যাদের কঠোর দ্বীনদারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,

تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ–

'তোমরা তোমাদের ছালাত, ছিয়াম ও অন্যান্য আমলসমূহকে তাদের মুকাবিলায় হীন মনে করবে। অথচ তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে এমনভাবে, যেরূপ তীর বেরিয়ে যায় ধনুক হ'তে'।[২৪২] ইসলামের ইতিহাসে এরাই ছিল ইসলামের নামে সর্বপ্রথম চরমপন্থী জঙ্গীদল। যারা হযরত আলী (রাঃ)-কে কাফের বলে ও তাঁর খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যাদের হাতে হযরত আলী (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন। উন্নত চরিত্র ও উত্তম আমলে সমৃদ্ধ হ'লেও চরমপন্থী আক্বীদার কারণে এদের কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয়নি। ক্বিয়ামতের দিন শিরক ও বিদ'আতপন্থী সকল আমলকারীর অবস্থা অত্র আয়াতে বর্ণিত (وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ) লোকদের ন্যায় হবে। যা সেদিন কোনই কাজে লাগবে না।

(৪) تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً 'তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে'। অর্থাৎ তারা এমন অগ্নিতে প্রবেশ করবে, যা চূড়ান্তভাবে উত্তপ্ত। যে আগুনকে যুগ যুগ ধরে উত্তপ্ত করা হয়েছে, যার

২৪২. বুখারী হা/৬৯৩১; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪ 'মু'জেযাসমূহ' অনুচ্ছেদ।

সমতুল্য উত্তাপ আর নেই। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِذَا أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقاً وَّهِيَ تَفُوْرُ، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ، 'যখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে'। 'তখন মনে হবে জাহান্নাম যেন ক্রোধে ফেটে পড়ছে' *(মুল্‌ক ৬৭/৭-৮)*। কেননা ঐ সময় জাহান্নামকে আরো বেশী উত্তপ্ত করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ 'যেদিন জাহানামকে উত্তপ্ত করা হবে' *(তাকভীর ৮১/১২)*। অর্থাৎ এখানে نَاراً حَامِيَةً বলতে ناراً منتهى حارة او متناهية فى الحرارة 'চূড়ান্ত ভাবে উত্তপ্ত অগ্নি' বুঝানো হয়েছে।

(৫) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ 'ফুটন্ত ঝর্ণা হ'তে পান করানো হবে' অর্থাৎ এমন ঝর্ণার পানি, যা চূড়ান্তভাবে উত্তপ্ত (قد انتهى حرها)। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ آنٍ 'তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে' *(রহমান ৫৫/৪৪)*। آنِيَة অর্থ 'চূড়ান্তভাবে উত্তপ্ত'।

(৬) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ 'বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত শুকনা যরী' ঘাস ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য জুটবে না'। ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেন, যরী' এমন একপ্রকার কাঁটাযুক্ত ঘাস, যা মাটির সঙ্গে লেগে থাকে'। যতক্ষণ তা কাঁচা থাকে ততক্ষণ তা উটে খায়। কিন্তু তৃপ্ত হয় না। এসময় একে 'শিবরিক্ব' (الشبرق) বলা হয়। কিন্তু যখন শুকিয়ে যায়, তখন বিষাক্ত ও প্রাণ সংহারী হয়ে যায় এবং তখন একে 'যরী' (الضريع) বলা হয়। ঐ সময় উট বা কোন পশু এ ঘাস খায় না বা এর ধারে-কাছেও যায় না'। আরবদের নিকটে এটা হ'ল أخبث الطعام وأشنعه 'সবচাইতে খবীছ ও নিকৃষ্ট খাদ্য'। খলীল বলেন, এই ঘাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (منتن الريح) *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

এখানে إِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ 'যরী ব্যতীত' বলা হয়েছে। অথচ অন্যত্র বলা হয়েছে, إِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنٍ 'তাদের কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত-নিঃসৃত রক্ত-পূঁজ ব্যতীত' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩৬)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, এধরনের আয়াত সমূহের মধ্যে সমন্বয় এই যে, জাহান্নামীদের অনেকগুলি স্তর থাকবে। এক এক স্তরের পাপীকে এক এক ধরনের খাদ্য দেওয়া হবে। কাউকে রক্ত-পূঁজ, কাউকে উত্তপ্ত পানি, কাউকে যরী' ঘাস, কাউকে যাক্কূম বৃক্ষ ইত্যাদি'। আরবদের বুঝানোর জন্য তাদের পরিচিত এইসব নিকৃষ্ট বৃক্ষের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে জাহান্নামের সবকিছু হবে জাহান্নামের মতই। যা হবে কঠিন কষ্টদায়ক ও নিকৃষ্টতম। দুনিয়াতে যার কোন তুলনা নেই।

(৭) لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ 'যা তাদের পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না'। পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে যে, যরী' এমন ঘাস যা খেয়ে জাহান্নামীরা পুষ্ট হবে না বা তাদের ক্ষুধাও মিটবে না। অথচ প্রচুর ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে ওটাই তারা খাবে গোগ্রাসে। নিঃসন্দেহে এটি হবে আরও কষ্টদায়ক।

(৮-৯) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ 'যেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উৎফুল্ল'। 'স্ব স্ব কর্মফলে সন্তুষ্ট'।

১ হ'তে ৭ আয়াত পর্যন্ত হতভাগ্যদের পরিণতি বর্ণনা শেষে এবার সৌভাগ্যবানদের বর্ণনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন তাদের চেহারা হবে সুন্দর, সজীব ও প্রফুল্ল। স্বীয় কর্মফলে সন্তুষ্ট। দুনিয়ায় তারা যে সৎকর্মাদি করেছিল, জান্নাত হবে তারই প্রতিদান। যেমন আল্লাহ সেদিন তাদের ডেকে বলবেন, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ' *(যুখরুফ ৪৩/৭২)*। তিনি বলবেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'তোমরা এখানে খুশীমনে খাও ও পান কর তোমাদের কর্মের বিনিময় স্বরূপ' *(মুরসালাত ৭৭/৪৩)*। তিনি বলেন, أَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান' *(সাজদাহ ৩২/১৯)*।

তবে কেবল আমলই যথেষ্ট নয়, যদি না তার সাথে আল্লাহ্র রহমত শামিল থাকে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ، قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللهُ بِرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا– 'তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে নাজাত দিবে না। তারা বললেন, আপনাকেও নয় হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, আমাকেও না। যদি না আল্লাহ আমাকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা আবৃত করেন। অতএব তোমরা দৃঢ়ভাবে সৎকর্ম করে যাও এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর'।[২৪৩]

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلاَ يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللهِ 'তোমাদের কাউকে তার কর্ম জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না বা তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না, এমনকি আমাকেও নয়, আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত'।[২৪৪]

২৪৩. মুসলিম হা/২৮১৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।
২৪৪. বুখারী হা/৬৪৬৩, মুসলিম হা/২৮১৬, মিশকাত হা/২৩৭২।

(১০) فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ 'তারা থাকবে সুউচ্চ বাগিচায়'। কুরতুবী বলেন, এটা এজন্য বলা হয়েছে যে, জান্নাত হবে আসমানসমূহের উপরে (لأنها فوق السماوات)'। বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে একশত স্তর থাকবে। প্রতিটি স্তরের মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায় হবে'। ফেরদৌস হ'ল সর্বোচ্চ স্তর। সেখান থেকেই প্রবাহিত হয় চারটি ঝর্ণাধারা। আর তার উপরেই রয়েছে আল্লাহ্র আরশ। অতএব যখন তোমরা চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে'।[২৪৫] উক্ত চারটি ঝর্ণাধারা হ'ল : নির্মল পানি, দুধ, শারাব ও মধু *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

(১১) لاَّ تَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً 'যেখানে শুনবে না কোন অসার বাক্য'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْواً وَّلاَ تَأْثِيْماً، إِلاَّ قِيْلاً سَلاَماً سَلاَماً 'সেখানে তারা কোন অবান্তর বা গুনাহের কথা শুনবে না'। 'কেবল শুনবে সালাম আর সালাম' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২৫-২৬)*। একই ধরনের বক্তব্য অন্য সূরাতেও এসেছে *(যেমন মারিয়াম ১৯/৬২; তূর ৫২/২৩; নাবা ৭৮/৩৫)*।

(১২) فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ 'যেখানে থাকবে প্রবহমান ঝরণাসমূহ'। অর্থ لا انقطاع لها 'যা কখনো বন্ধ হবে না'। عَيْنٌ একবচন এলেও অর্থ বহুবচন হবে। কেননা عَيْنٌ এখানে জাতিবোধক। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, –أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَفَجَّرُ مِنْ تَحْتِ تِلاَلِ أَوْ مِنْ تَحْتِ جِبَالِ الْمِسْكِ 'জান্নাতের নদীসমূহ মিশকের টিলা অথবা মিশকের পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়।[২৪৬]

(১৩) فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ 'থাকবে সমুচ্চ আসনসমূহ'- অর্থাৎ সুউচ্চ ও সুসজ্জিত নরম গদিযুক্ত চেয়ারসমূহ। যাতে আল্লাহ্র বন্ধুগণ আল্লাহ্র বিশাল রাজত্ব ও বিস্তৃত নে'মতসমূহ স্বচক্ষে দেখতে পান *(কুরতুবী)*। তারা বসতে চাইলেই চেয়ারগুলি নীচু হয়ে তাদেরকে বসিয়ে নিবে *(ইবনু কাছীর)*।

(১৪) وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ 'এবং রক্ষিত পানপাত্রসমূহ'। অর্থ مَوْجُوْدَةٌ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ 'তাদের সম্মুখে সদা প্রস্তুত থাকবে। যখনই সে পানি পান করতে চাইবে, তখনই তা পূর্ণ পেয়ালা সহ তার হাতের কাছে পাবে।

---

২৪৫. তিরমিযী হা/২৫৩০, মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাত ও তার অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/২৭৯০, মিশকাত হা/৩৭৮৭ 'জিহাদ' অধ্যায়।
২৪৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৬২২, সনদ হাসান।

(১৫) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ‘সারিবদ্ধ বালিশসমূহ’। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, نَمَارِق অর্থ وَسَائِد তাকিয়া বা বালিশসমূহ, যাতে ঠেস দিয়ে বসা হয় বা শোওয়া হয়। একবচনে نُمْرُقَةٌ *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ বিছানার চারপাশে এগুলি মওজুদ থাকবে।

(১৬) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ‘এবং বিস্তৃত গালিচাসমূহ’। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, الزَّرَابِيُّ অর্থ الْبُسُط গালিচা বা কার্পেটসমূহ, যা مَبْثُوثَةٌ অর্থাৎ مفروشه বিছানো ও বিস্তৃত থাকে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, الطنافس التي لها خَمْل رقيق ‘পাতলা মিহি ঝালরযুক্ত গালিচা’। একবচনে الزُّرْبية *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ জান্নাতের যেখানেই তারা অবস্থান করবে সেখানেই তারা বালিশ, বিছানা, তাকিয়া, চেয়ার, পানপাত্র- সবকিছু হাতের নাগালের মধ্যে পাবে। যা সংখ্যায় একটি নয়। বরং مَبْثُوثَةٌ অর্থাৎ كثيرة متفرقة বহু এবং বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে। যেখানেই তারা যাবে, সেখানেই পাবে সবকিছু প্রস্তুত।

(১৭) أَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ‘তারা কি দেখে না উষ্ট্রের প্রতি, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে’?

أَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ তারা কি দেখে না? শুরুতে প্রশ্নবোধক ‘হামযাহ’ (أ) এসেছে অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দেওয়ার জন্য। অতঃপর ‘ফা’ (ف) এসেছে প্রশ্ন ও পরবর্তী ক্রিয়াপদের মধ্যে সংযোগের (عطف) জন্য। كَيْفَ خُلِقَتْ (কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?) বাক্যটি পূর্ববর্তী يَنْظُرُوْنَ ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত (متعلق)। যা الْإِبِلِ (উট) থেকে بدل الاشتمال বা পূর্ণ স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

এক্ষণে অর্থ হবে, তারা কি দেখেনা এইসব সৃষ্টির প্রতি, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর অসীম ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ স্বরূপ। যাতে তারা পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতাকে অস্বীকার না করে। অতঃপর তারা যেন রাসূল (ছাঃ)-এর ভয় প্রদর্শনের প্রতি মনোযোগী হয় এবং আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনে ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। الْإِبِلُ শব্দটি اسم الجموع বা বহুত্ববোধক শব্দ, যার কোন একবচন নেই এবং এটি সর্বদা স্ত্রীলিঙ্গ হয় *(কুরতুবী)*।

জাহান্নামীদের দুরবস্থা ও জান্নাতীদের সুখ-শান্তির বর্ণনা শেষে আল্লাহ এবার জ্ঞানী লোকদের প্রতি চিন্তা-গবেষণার আহ্বান জানাচ্ছেন। মরুচারী আরবদের সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ হ’ল উট। দূরের সফরে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে উট তাদের প্রধান বাহন। যারা কম খায় অথচ অধিক বোঝা বহন করে। উঠের পিঠের কুঁজোতে পানি সঞ্চিত

থাকে। ফলে একাধারে দশদিনের অধিক সময় পানি না পেলেও সে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে না। তাবূক অভিযানে যাওয়ার পথে পিপাসায় কাতর হয়ে বাহনের কমতি থাকা সত্ত্বেও ছাহাবীগণ উট যবহ করে তার কুঁজোর পানি পান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মরুভূমির বালুঝড়ে সে বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকতে পারে। তার গোশত ও দুধ অতীব উপাদেয় খাদ্য ও পানীয়। তার পেশাব কঠিন রোগের ঔষধ। তার পশম খুবই উপকারী। সে অত্যন্ত শক্তিশালী। অথচ মনিবের প্রতি অতীব অনুগত ও অতিশয় প্রভুভক্ত। মরুভূমির একমাত্র বাহন হিসাবে উটকে سَفِيْنَةُ الْبَرِّ বা 'মরু জাহায' বলা হয় *(কুরতুবী)*। আরবরা যখন নির্জন মরুতে একাকী সফরে বের হয়, তখন তার একমাত্র সাথী হয় তার বাহন উট। উপরে নিঃসীম নীলাকাশ, নীচে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি ও পার্শ্বে ভাবগম্ভীর আকাশছোঁয়া পর্বতমালা। সর্বদা এগুলি দেখে তারা ছিল অভ্যস্ত এবং এগুলি ছিল তাদের অত্যন্ত প্রিয়। জাহেলী আরবের শ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্তি 'ঝুলন্ত ক্বাছীদা সপ্তকে'ই (সাব'আ মু'আল্লাক্বাত) কেবল উটের বর্ণনায় ৩০টি চরণ লিখিত হয়েছে *(তানতাভী ২৫/১৪৫)*। জুরজী যায়দান (১৮৬১-১৯১৪খৃঃ) বলেন, উটের আরবী শব্দ ১০০টির মত এবং উষ্ট্রীর আরবী শব্দ ২৫৫টি।[২৪৭] এতেই বুঝা যায়, উট তাদের কত প্রিয়। সেকারণ এখানে চারটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ উটকে আগে এনেছেন এবং আরবদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান জানিয়েছেন।

(১৮) وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ 'এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উচ্চ করা হয়েছে'?

سَمَا يَسْمُوْ سُمُوًّا 'উচ্চ হওয়া'। সেখান থেকে سَمَاءٌ আকাশ, সকল বস্তুর ছাদ। বহুবচনে سَمَاوَاتٌ। উটের পরে আল্লাহ আকাশের প্রতি বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের দেওয়া হিসাব থেকে একটা ধারণা করা যায় আকাশ কত উচ্চ। বিজ্ঞান বলছে যে, আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবীর নিকটতম উপগ্রহ চাঁদ হ'তে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ১ মিঃ ৩ সেকেণ্ড। যা পৃথিবী থেকে ৪,৮৪,৪০৩ কি.মি. দূরে এবং পৃথিবীর চেয়ে ৫০ গুণ ছোট। আর সূর্য থেকে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড। যা পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। অথচ সূর্যের চাইতে দূরে ও তার চাইতে অন্যূন দশহাযার গুণ বড় এমন অগণিত তারকা ও নক্ষত্ররাজি রয়েছে, যাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে মিলিয়ন বা তার চাইতে অধিক আলোকবর্ষ সময় লাগবে *(তানতাভী)*। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ৪২ আলোকবর্ষ দূরে ৬টি গ্রহ সমৃদ্ধ আরেকটি পৃথিবী (Super Earth)-এর সন্ধান পেয়েছেন এবং আমাদের সৌরজগতের বাইরে ১১০০ কোটি মাইল দূরে আরেকটি

---

২৪৭. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিইয়াহ (সম্পাদনা ও টীকা সংযোজনে : ড. শাওক্বী যাইয়েফ; কায়রো : দারুল হেলাল ১৯৫৭) পৃঃ ১/৫৪।

সৌরজগতের সন্ধান পেয়েছেন। এতেই বুঝা যায় মহাকাশ কত বড়, কত উচ্চ ও কত বিশাল। আর সে তুলনায় আমাদের পৃথিবী কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য ও কত তুচ্ছ।

আল্লাহ বলেন, أَفَلَمْ يَنْظُرُوْا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ, 'তারা কি দেখে না তাদের মাথার উপরে আকাশের দিকে, কিভাবে আমরা তাকে নির্মাণ করেছি এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি এবং তাতে নেই কোন ফাটল' *(ক্বাফ ৫০/৬)*।

(১৯) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ 'এবং পাহাড় সমূহের প্রতি, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে'?

جِبَالٌ، أَجْبَالٌ، أَجْبُلُ একবচনে جَبَلٌ অর্থ পাহাড়। প্রাণীজগতে উট, নভোজগতে আকাশ, অতঃপর ভূ-জগতে পাহাড় আল্লাহ্র এক একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। এখানে সেদিকেই বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

পাহাড়ের সৃষ্টি, অবস্থান ও উপযোগিতা রীতিমত তাক লাগানোর বিষয়। পৃথিবীতে বড় বড় পাহাড়গুলির সৃষ্টি হয়েছে সাগরের তলদেশ থেকে। আনুমানিক ৬.৬ সেক্সটিলিয়ন টন ওযনের এই পৃথিবীটাকে যদি একটা ডিমের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে ভূগর্ভ হ'ল ডিমের কুসুমের মত গ্যাসীয় পিণ্ড। ডিমের খোসাটি হ'ল ভূপৃষ্ঠ। যার পুরুত্ব কমবেশী সাগরের নীচে গড়ে ৬ কি.মি এবং স্থলভাগে ৩০-৫০ কি.মি.। যা রয়েছে ছয়টি শিলালিক প্লেটের উপরে। এইসব দৃঢ় ও অতীব শক্ত প্লেট সমূহের উপরে রয়েছে ভূপৃষ্ঠ। যেখানে রয়েছে চার ভাগের তিনভাগের মত পানি রাশি। যা ছয়টি মহাসাগরে বিভক্ত। এছাড়াও রয়েছে সাগর-উপসাগর ও নদী-নালা। প্রত্যেকটির গভীরতায় কমবেশী রয়েছে। যেমন বলা হয় যে, আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতা ৬ মাইল তথা প্রায় ১০ কিলোমিটার। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা ৫ মাইল তথা ৮ কি. মি. বঙ্গোপসাগরের গভীরতা ২ মাইল তথা ৩ কি. মি.। এক্ষণে ভূপৃষ্ঠের নীচে শিলালিক প্লেট সমূহের ঘর্ষণে যেমন সমুদ্রতলে মাঝে-মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং যাতে সাগরের পানিতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে ভূপৃষ্ঠ ডুবিয়ে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়, যাকে 'সুনামি' (Tsunami) বলা হয়। অমনিভাবে কখনো সাগরের তলদেশ থেকে ভূভাগ উঁচু হয়ে সাগর ভেদ করে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যায়। এটাকেই বলা হয় পাহাড়। একইভাবে সৃষ্টি হয় সাগরের বুকে দ্বীপসমূহ।

আজকের ভারতবর্ষ ও আরব ভূখণ্ড এক সময় একত্রিত ছিল। কিন্তু ভারত মহাসাগর ভেদ করে হিমালয় পর্বতমালার উত্থান ঘটায় দু'টি ভূখণ্ড পৃথক রূপ ধারণ করে। একইভাবে আজকের নিউজিল্যান্ড একসময় সাগর ছিল। যা পরে মাথা উঁচু করে ভূভাগে পরিণত হয়েছে। 'ইউরোপ ভূখণ্ড একসময় আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের সাথে এবং আফ্রিকার অনেক স্থানের সাথে মিলিত ভূখণ্ড ছিল। আজকের এশিয়া মহাদেশ একসময় উত্তর আমেরিকার সঙ্গে মিলিত ছিল' *(তানতাভী)*।

পাহাড়সমূহ মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত। **এক-** পাথরের পাহাড়। এতে কোন গাছ-পালা জন্মে না। সঊদী আরবের তেহামাসহ অনেক স্থানে এরূপ পাহাড় দেখা যায়। প্রচণ্ড দাবদাহের সময় এগুলি এমন উত্তপ্ত হয় যে, সেদিকে তাকানো যায় না। **দুই-** ভূমিজ পাহাড়। যাতে গাছ-পালা, তরু-লতা ইত্যাদি জন্মে। যেমন ফিলিস্তীন, তাবারিস্তান, দার্জিলিং ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়সমূহ। যাতে অসংখ্য বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছ বান্দার উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা চলে যে, বিশ্বের অধিকাংশ পাহাড়-পর্বত এই শ্রেণীভুক্ত।

তিন- বরফাবৃত পাহাড়। যেমন হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ, দামেষ্ক পাহাড়, আলপস পর্বতমালা এবং পৃথিবীর অন্যান্য বিশাল পর্বতশৃঙ্গ সমূহ। এই সব পর্বতশৃঙ্গের বরফ গলেই সৃষ্টি হয়েছে দেশে দেশে বড় বড় নদী। যেমন বাংলাদেশের গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি।

চার- আগ্নেয়গিরি। ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে এরূপ পাহাড় রয়েছে। তবে উপমহাদেশে এরূপ পাহাড়ের সন্ধান মেলেনি। এসব পাহাড় দিয়ে ভূগর্ভস্থ গ্যাসীয় চাপ অনেক সময় লাভাস্রোত আকারে বেরিয়ে যাওয়াতে ভূপৃষ্ঠ সুস্থির থাকে।

পাহাড়সমূহ পৃথিবীকে দৃঢ় ও স্থিত রাখে, যাতে তা টলতে না পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيْدَ بِهِمْ ‘পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন করেছি যাতে জীবকুল নিয়ে পৃথিবী হেলে না পড়ে’.... *(আম্বিয়া ২১/৩১)*। এছাড়া মেঘমালাকে আটকে দিয়ে এইসব পাহাড় বৃষ্টি ঝরাতে সাহায্য করে। নিজের বুক থেকে ঝর্ণা ঝরিয়ে আল্লাহ্র হুকুমে পাহাড় আমাদেরকে পানি সরবরাহ করে ও বৃক্ষরাজি উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদের রূযির ব্যবস্থা করে। এছাড়াও পাহাড়ের গর্ভে রয়েছে অসংখ্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ এবং এর নীচে রয়েছে গ্যাসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সবই মানুষের ভোগ ও সেবার জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً وَّمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيْرٍ-

‘তোমরা কি দেখ না নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নে‘মতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? অথচ মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে’ *(লোকমান ৩১/২০)*।

(২০) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ‘এবং দেখ পৃথিবীর দিকে, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে’?

এখানে আল্লাহ পৃথিবী থেকে উপদেশ হাছিলের নির্দেশ দিয়েছেন। যা আল্লাহ্র এক অপরূপ নিদর্শন। أَرَضَ أَرْضًا أو أَرُضَ أَرَاضَةً অর্থ সবুজ-শ্যামল হওয়া, সুদৃশ্য হওয়া। সেখান থেকে أَرْضٌ অর্থ পৃথিবী। বহুবচনে أَرْضُوْنَ।

বান্দার বসবাস ও সহজ বিচরণের জন্য পৃথিবীকে আল্লাহ বিস্তৃত করে দিয়েছেন। মাটিকে তিনি সর্বংসহা করেছেন এবং বান্দার রূযির জন্য শস্য উৎপাদনের উপযোগী করেছেন। পাহাড়ের মত ভূপৃষ্ঠ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। **এক-** ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ এলাকা। যেমন আফ্রিকার ঘন জঙ্গল বেষ্টিত অঞ্চলসমূহ। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক দেশেই কিছু না কিছু এলাকায় বনভূমি আছে। যার পরিমাণ কমপক্ষে ২৫ শতাংশ হওয়া উচিৎ। নইলে আবহাওয়া বিরূপ হয়ে যায়। **দুই-** সাগর-নদী বেষ্টিত এলাকা। যেমন বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য এলাকা। **তিন-** পাহাড়, মরুভূমি ও উপত্যকা বেষ্টিত এলাকা। যেমন আরব উপদ্বীপ ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি এলাকা। **চার-** তৃণভূমি বেষ্টিত এলাকা। যেমন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য এলাকা। এছাড়া আবহাওয়ার হিসাবে পৃথিবী ৬টি অঞ্চলে বিভক্ত। যেমন তুন্দ্রা অঞ্চল, উষ্ণ অঞ্চল, মৌসুমী অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, তুষার অঞ্চল ও নিরক্ষীয় অঞ্চল। এভাবে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলকে আল্লাহ এক একভাবে সাজিয়েছেন। যাতে প্রত্যেক এলাকার বাসিন্দা অন্য এলাকার বাসিন্দা থেকে উপকৃত হ'তে পারে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপরে নির্ভরশীল থাকে। যাতে এর ফলে মানবজাতি আপোষে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে এবং আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতে পারে। আল্লাহ বলেন, أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِياًّ وَّرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ- 'তারা কি তোমার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে? আমরা তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি এবং তাদের একের মর্যাদাকে অন্যের উপরে উন্নীত করেছি, যাতে তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে। বস্তুতঃ তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে তোমার পালনকর্তার রহমত অনেক উত্তম' *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*।

উপরে বর্ণিত চারটি আয়াতে আল্লাহ আরবদের উদ্দেশ্যে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান জানালেও এর মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয় যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে এবং এসব মহান সৃষ্টির সৌন্দর্য ও গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করবে। অতঃপর আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর বিধানসমূহ মেনে জীবন পরিচালনা করবে।

বিগত চারটি আয়াতে (১৭-২০) উটের বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল, আকাশের সীমাহীন উচ্চতা, পাহাড়ের বিশালায়তন সুদৃঢ় স্থাপনা এবং ধরিত্রীর বিপুলা বিস্তৃতি ও তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের পর আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

(২১) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ‘অতএব তুমি উপদেশ দাও। কেননা তুমি উপদেশদাতা মাত্র’।

তোমার দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া এবং আমাদের দায়িত্ব হিসাব নেওয়া (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب)। এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির সাহায্যে আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা আবশ্যক।

(২২) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ‘তুমি তাদের উপরে দারোগা নও’। অর্থাৎ ঈমান আনার বিষয়ে তুমি লোকদের উপর চাপ প্রয়োগকারী কোন শাসক নও। المصيطر و المسيطر অর্থাৎ ছোয়াদ ও সীন উভয় বর্ণে পড়া যায়। অর্থ المسلَّط على الشيئ ‘কোন বস্তুর উপরে যবরদস্তি চেপে বসা ব্যক্তি’। سَيْطَرَهُ অর্থ صَرَعَهُ ‘সে তাকে পাছড়ে ফেলল’ *(কুরতুবী)*। سَيْطَرَ او صَيْطَرَ অর্থ দারোগা হওয়া, তত্ত্বাবধায়ক হওয়া। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ– ‘তারা যা বলে তা আমরা সম্যক অবগত আছি। তুমি তাদের উপর যবরদস্তিকারী নও। অতএব যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে তুমি কুরআন দ্বারা উপদেশ দাও’ *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*। এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত জ্ঞানী যারা, তারা সহজেই তাওহীদের দাওয়াত কবুল করে। এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, চাপ দিয়ে কারু হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করানো সম্ভব নয়।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ)– ‘আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যখন তারা এটা বলবে, তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ হবে, তবে ন্যায্য হক ব্যতীত। তাদের হিসাব থাকবে আল্লাহ্র উপরে। অতঃপর তিনি অত্র আয়াত দু’টি পাঠ করেন’।[২৪৮] বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ... ‘এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা এগুলো করবে, তখন...।[২৪৯]

২৪৮. তিরমিযী হা/৩৩৪১; নাসাঈ কুবরা হা/১১৬৭০ সনদ হাসান ছহীহ।
২৪৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২।

অত্র হাদীছে কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের শর্ত ও সীমারেখা বর্ণিত হয়েছে। এখানে أُقَاتِلَ (পরস্পরে যুদ্ধ করা) বলা হয়েছে, أَقْتُلَ (হত্যা করা) বলা হয়নি। আর লড়াই দু'পক্ষে হয়ে থাকে। কিন্তু হত্যা এক পক্ষ থেকে হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধে এলে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যেকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফের-মুশরিক পেলেই তাকে হত্যা করবে, এর অর্থ সেটা নয়। তাছাড়া উক্ত হাদীছে 'যারা কালেমার স্বীকৃতি দিবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল' বলা হয়েছে। এত স্পষ্ট যে, আমাদের দায়িত্ব মানুষের বাহ্যিক আমল দেখা। কারু অন্তর ফেড়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে এর অসংখ্য নযীর রয়েছে। হাদীছটি বর্ণনা শেষে রাসূল (ছাঃ) প্রমাণস্বরূপ সূরা গাশিয়াহ ২১ ও ২২ আয়াত দু'টি পাঠ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে যে, 'নিশ্চয়ই তুমি উপদেশদাতা মাত্র'। 'তুমি তাদের উপর দারোগা নও'।

অত্র হাদীছের রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ৭ম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের সময় মুসলমান হন। তখন জিহাদ চালু ছিল। কিন্তু কোন নিরস্ত্র ও নিরপরাধ অমুসলিমের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ কখনো অস্ত্র প্রয়োগ করেননি।

অত্র হাদীছে শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। যারা বলে যে, ঈমানের জন্য মৌখিক স্বীকৃতি বা আমল শর্ত নয়। কেবল হৃদয়ের বিশ্বাসই যথেষ্ট। একইভাবে চরমপন্থী খারেজীদের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা বলে যে, আমল ঈমানের অপরিহার্য অংশ। যা না থাকলে সে কাফির হবে ও তার রক্ত হালাল হবে। অথচ সঠিক আক্বীদা এই যে, ঈমান হ'ল মূল, আমল হ'ল তার শাখা। যা না থাকলে কেউ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না। আমলহীন মুমিন ফাসেক হ'তে পারে। কিন্তু কাফের নয় এবং তার রক্ত হালাল নয়।

(২৩) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ 'তবে যে ব্যক্তি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অবিশ্বাসী হয়ে যায়'। এখানে إِلاَّ অর্থ لكن এবং এটি استثناء منقطع হয়েছে। যা পূর্বে বর্ণিত বিষয়বস্তু (مستثنى منه) থেকে পৃথক। অর্থাৎ لكن من تولى وكفر 'কিন্তু যে ব্যক্তি উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' এবং কুরআনকে অস্বীকার করে বিশ্বাসে, কথায় ও কর্মে, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। পক্ষান্তরে إلا-কে استثناء متصل হিসাবে ধরলে مستثنى منه ও استثناء একই বিষয়ভুক্ত (جنس) হবে। তখন অর্থ হবে, لست بمسلط إلا من تولى وكفر فانت

عليهم مصيطر 'তুমি তাদের উপরে চাপ প্রয়োগকারী নও। তবে তারা ব্যতীত, যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অস্বীকার করে, তখন তুমি তাদের উপর চাপ প্রয়োগকারী'। কিন্তু এ অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়। কেননা কেউ ঈমান না আনলে তার উপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই ভ্রষ্টতা হ'তে সুপথ স্পষ্ট হয়ে গেছে'... *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। এজন্য তার পরকালীন শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। অতএব যদি কেউ কুফরী করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*।

(২৪) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ 'অতঃপর আল্লাহ তাকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন'। অর্থ لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله العذاب الأكبر 'তুমি উপদেশ দেওয়ার পরেও যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অস্বীকার করে, আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বড় শাস্তি প্রদান করবেন'।

অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আর সেটাই হ'ল সবচেয়ে বড় শাস্তি। এখানে الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ বলার অর্থ এইসব হঠকারী কাফেররা দুনিয়াতে মূর্খতা, হঠকারিতা, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, কারা যন্ত্রণা, হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে যে কষ্ট পায়, তা খুবই নগণ্য। এর বিপরীতে জাহান্নামের শাস্তি হ'ল বড় শাস্তি। তবে এর দ্বারা জাহান্নামে শাস্তির তারতম্য বুঝানো হ'তে পারে পাপের তারতম্য হিসাবে। কেননা জান্নাতের ন্যায় জাহান্নামেরও বহু স্তর থাকবে পাপীদের স্তর হিসাবে।

(২৫) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ 'নিশ্চয় আমাদের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন'। অর্থ رجوعهم ومعادهم إلينا بالموت والبعث 'মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে তারা আমাদের কাছে ফিরে আসবে'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ 'তোমরা সেদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকে পূর্ণরূপে ফলাফল প্রাপ্ত হবে, যা তারা (দুনিয়াতে) অর্জন করেছিল। আর সেদিন তারা কেউ অত্যাচারিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ২১ দিন বা ৭ দিন পূর্বে অবতীর্ণ কুরআনের এটিই সর্বশেষ আয়াত *(কুরতুবী)*।

آبَ يَؤُوْبُ اَوْبًا مَآبًا অর্থ رجع ফিরে আসা। যেমন কবি আবীদ (عبيد) বলেন,

وكـــــل ذى غَيْبة يَـــــــؤوبُ + وغـــــــائبُ الموتِ لا يَـــــؤُوبُ

'প্রত্যেক নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে আসে। কিন্তু মৃত্যুর কারণে হারানো ব্যক্তি ফিরে আসে না' *(কুরতুবী)*।

(২৬) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 'অতঃপর আমাদের দায়িত্বে রয়েছে তাদের হিসাব গ্রহণ'। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তাদের জীবনব্যাপী কর্মের হিসাব আমরা নেব। অতঃপর সে অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেব। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَّرَهُ– 'যে ব্যক্তি এক সরিষাদানা পরিমাণ সৎকর্ম করবে, তা দেখা হবে'। 'এবং যে ব্যক্তি এক সরিষাদানা পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, তাও দেখা হবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন এক ছালাতে পড়তে শুনলাম اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا 'হে আল্লাহ তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ কর'। সালাম ফিরানোর পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ما الحسابُ اليسيرُ 'সহজ হিসাব কি'? তিনি বললেন, أَنْ يَنْظُرَ فِى كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ 'বান্দার আমলনামা দেখা হবে। অতঃপর তা উপেক্ষা করা হবে। কেননা হে আয়েশা! ঐদিন যার হিসাব যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবে'।[২৫০]

অনেক বিদ্বান অত্র সূরার শেষে অত্র দো'আটি পাঠ করাকে উত্তম বলেন। যদিও আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনায় সূরার নাম নেই এবং কোন সূরার শেষে রাসূল (ছাঃ) অত্র দো'আটি পড়েছিলেন, তার উল্লেখ নেই। তবে এটা বুঝা যায় যে, কুরআনের যেসব আয়াতে হিসাব-এর কথা আছে, তা পাঠের পর এ দো'আ পড়া মুস্তাহাব।

সারকথা :

অত্র সূরায় আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান-গবেষণা সহকারে পূর্ণ সচেতনতার সাথে ঈমান আনার এবং দুনিয়াতে আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে আখেরাতে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

২৫০. আহমাদ হা/২৪২৬১; মিশকাত হা/৫৫৬২ 'হিসাব ও মীযান' অনুচ্ছেদ; ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছ ছহীহ।

সূরা ফজর (প্রভাতকাল)

সূরা লায়েল-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৮৯, আয়াত ৩০, শব্দ ১৩৯, বর্ণ ৫৭৩।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

وَالۡفَجۡرِ ۙ﴿۱﴾

(১) শপথ ফজরের

وَلَيَالٍ عَشۡرٍ ۙ﴿۲﴾

(২) শপথ দশ রাত্রির

وَّالشَّفۡعِ وَالۡوَتۡرِ ۙ﴿۳﴾

(৩) শপথ জোড় ও বেজোড়ের

وَالَّيۡلِ اِذَا يَسۡرِ ۚ﴿۴﴾

(৪) শপথ রাত্রির, যখন তা অতিক্রান্ত হ'তে থাকে।

هَلۡ فِىۡ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىۡ حِجۡرٍ ؕ﴿۵﴾

(৫) নিশ্চয়ই ঐসবের মধ্যে বড় ধরনের শপথ রয়েছে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য।

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ﴿۶﴾

(৬) তুমি কি জানো না তোমার প্রভু কি আচরণ করেছিলেন 'আদ গোত্রের সাথে?

اِرَمَ ذَاتِ الۡعِمَادِ ۙ﴿۷﴾

(৭) ইরম বংশের। যারা ছিল উঁচু স্তম্ভসমূহের মালিক।

الَّتِىۡ لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِى الۡبِلَادِ ۙ﴿۸﴾

(৮) যাদের ন্যায় কাউকে জনপদসমূহে সৃষ্টি করা হয়নি।

وَثَمُوۡدَ الَّذِيۡنَ جَابُوا الصَّخۡرَ بِالۡوَادِ ۙ﴿۹﴾

(৯) এবং (কি আচরণ করেছিলেন) ছামূদ গোত্রের সাথে? যারা পাথর কেটে উপত্যকায় গৃহ নির্মাণ করেছিল।

وَفِرۡعَوۡنَ ذِى الۡاَوۡتَادِ ۙ﴿۱۰﴾

(১০) এবং (কি আচরণ করেছিলেন) ফেরাউনের সাথে? যে ছিল বহু কীলকের অধিপতি।

الَّذِيۡنَ طَغَوۡا فِى الۡبِلَادِ ۙ﴿۱۱﴾

(১১) যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল।

فَاَكۡثَرُوۡا فِيۡهَا الۡفَسَادَ ۙ﴿۱۲﴾

(১২) অতঃপর সেখানে তারা বহু অনাচার করেছিল।

فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ۚۙ﴿۱۳﴾

(১৩) ফলে তোমার পালনকর্তা তাদের উপরে শাস্তির কশাঘাত হানেন।

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالۡمِرۡصَادِ ؕ﴿۱۴﴾

(১৪) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা ঘাঁটিতে সদা সতর্ক থাকেন।

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ؕ

(১৫) কিন্তু মানুষ এরূপ যে, যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মানিত করেন ও সুখ-সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে যে, আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۚ

(১৬) পক্ষান্তরে যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রূযী সংকুচিত করেন, তখন সে বলে যে, আমার প্রভু আমাকে হেয় করেছেন।

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۙ

(১৭) কখনোই এরূপ নয়। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না।

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ

(১৮) এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ

(১৯) আর তোমরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যথেচ্ছভাবে ভক্ষণ করে থাক,

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ

(২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস।

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ

(২১) এটা কখনই ঠিক নয়। (স্মরণ কর) যেদিন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে,

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ

(২২) এবং তোমার পালনকর্তা আসবেন ও ফেরেশতামণ্ডলী সারিবদ্ধভাবে থাকবে,

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ؕ

(২৩) যেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। যেদিন মানুষ (তার কৃতকর্ম) স্মরণ করবে। কিন্তু তখন এই স্মৃতিচারণ তার কি কাজে আসবে?

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۚ

(২৪) সেদিন সে বলবে, হায়! যদি আমার এই (পরকালীন) জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু (নেক আমল) পাঠিয়ে দিতাম!

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۙ

(২৫) অতঃপর সেদিন আল্লাহ্র শাস্তির ন্যায় শাস্তি কেউ দিবে না।

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ؕ

(২৬) এবং তাঁর বাঁধনের ন্যায় শক্ত বাঁধন কেউ দিবে না।

يَآيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝

(২৭) হে প্রশান্ত আত্মা!

ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝

(২৮) ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়।

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝

(২৯) অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে।

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝

(৩০) এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।

গুরুত্ব :

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায়ের পর নিজ মহল্লায় (বনু সালেমাহ) এসে পুনরায় এশার জামা'আতে ইমামতি করার সময় সূরা বাক্বারাহ দিয়ে ক্বিরাআত শুরু করেন। এতে জনৈক রাখাল ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে পৃথকভাবে ছালাত আদায় করে চলে যায়। একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি মু'আযকে ডেকে বলেন, أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ 'মু'আয তুমি কি ফিৎনাকারী? তুমি কি সূরা আ'লা, ফজর, শাম্স, লায়েল, যোহা পড়তে পারো না'?[২৫১]

বিষয়বস্তু :

সূরাটিতে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। **(১)** পাঁচটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি বান্দার সকল বিষয়ে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এর প্রমাণ হিসাবে তিনি বিগত যুগের দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী তিনটি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার কাহিনী পেশ করেছেন *(১-১৪ আয়াত)*। **(২)** সম্পদের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্যের মধ্যে কারু সম্মান বা অসম্মান নির্ভর করে না। বরং বান্দাকে সৎকাজের তাওফীক দান করাই হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাকে সম্মানিত করা এবং এর বিপরীতটার অর্থ হ'ল তাকে অসম্মানিত করা । অতঃপর

২৫১. নাসাঈ হা/৯৮৪, বুখারী হা/৭০৫; মুসলিম হা/৪৬৫ 'এশার ছালাত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৮৩৩। এখানে 'সূরা বাক্বারাহ দিয়ে ক্বিরাআত শুরু করেন' অর্থ সূরা ফাতিহার পরে বাক্বারাহ্র কিছু অংশ পাঠ করেন। কিন্তু উক্ত মুক্তাদী ভেবেছিল ইমাম পুরাটা পাঠ করবেন। সেই ভয়ে সে জামা'আত ছেড়ে দেয়। কেননা সে দিনের বেলায় উট চরাতো। ফলে সে ছিল ক্লান্ত। দীর্ঘ ক্বিরাআতকেই এখানে ফিৎনা বলা হয়েছে। জামা'আতে যা করতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। উল্লেখ্য যে, মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) এশার ছালাত রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আদায়ের পর নিয়মিতভাবে নিজ মহল্লা বনু সালেমাহ্র মসজিদে গিয়ে পুনরায় এশার ছালাতে ইমামতি করতেন। এটা তাঁর জন্য নফল হ'ত। ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে এশার ছালাতের (عشاء الآخرة) কথা এসেছে। এক্ষণে নাসাঈ-র বর্ণনায় যে মাগরিবের ছালাতের কথা এসেছে, সেটা ভাবার্থে এশা হবে (مجازًا)। কেননা বুখারী-মুসলিমের বর্ণনা সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং মু'আয-এর এই অভ্যাসটি ছিল এশার ছালাতে *(মির'আত হা/৮৩৯-এর ব্যাখ্যা ৪/১৩৮-১৩৯)*। এতদ্ব্যতীত মাগরিবের ছালাতে সূরা বাক্বারাহ বা সূরা নিসা সবটা পড়বেন, এরূপ ধারণা কোন মুক্তাদী করতে পারে না।

অকৃতজ্ঞ লোকদের চারটি মন্দ আচরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে *(১৫-২০ আয়াত)*। **(৩)** সম্মানিত ও অসম্মানিত ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে যাচাই হবে ক্বিয়ামতের দিন। যেদিন আল্লাহ সকলের সম্মুখে উপস্থিত হবেন এবং বান্দাকে তার কর্মের যথাযোগ্য প্রতিদান ও প্রতিফল দান করবেন *(২১-৩০ আয়াত)*।

তাফসীর :

(১) وَالْفَجْرِ 'শপথ ফজরের'।

فَجْرٌ অর্থ প্রভাতরশ্মি। যা দু'প্রকার : ছুবহে কাযেব (মিথ্যা প্রভাত), যা অতি ভোরে পূর্বাকাশে সরু ও দীর্ঘ শুভ্ররেখা হিসাবে দেখা যায়। অতঃপর ছুবহে ছাদেক (সত্য প্রভাত), যা ছুবহে কাযেব-এর পরে দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত হয়ে উদিত হয়। এটি মৌসুমভেদে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট পূর্বে হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে ছুবহে ছাদিক-এর সপথ করা হয়েছে। কারণ রাত্রির অন্ধকার শেষ করে ফজরের প্রভাতরশ্মি আনার একমাত্র মালিক আল্লাহ। এর মধ্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতির বৈজ্ঞানিক উৎসের সন্ধানও বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ 'বল! তোমরা ভেবে দেখেছ কি আল্লাহ যদি রাত্রিকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন্ উপাস্য আছে, যে তোমাদের নিকট আলো এনে দিতে পারে? এরপরেও কি তোমরা কথা শুনবে না? *(ক্বাছাছ ২৮/৭১)*।

সূরার শুরুতে বর্ণিত পাঁচটি শপথের প্রথম হ'ল ফজরের শপথ। কেননা প্রতিদিনের ছুবহে ছাদেক ঘুমন্ত বান্দার সম্মুখে জাগৃতির নতুন বারতা নিয়ে হাযির হয়। যে আল্লাহ তাকে ৫/৬ ঘণ্টা ঘুমের মৃত্যুর পরে তাযা দেহমন নিয়ে জাগিয়ে তুললেন, সেই মহান সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে ফজরের ছালাতের মাধ্যমে সারাদিন তাঁর হুকুম মেনে চলার তাওফীক কামনা করে বান্দা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে নানাবিধ কাজে। তাই প্রতিদিনের ফজর বান্দার জন্য প্রতি রাতের মৃত্যুর পর ক্বিয়ামত স্বরূপ। সেকথার ইঙ্গিত রয়েছে অত্র শপথের মধ্যে ।

কেবল ফজর নয়। বরং প্রতিটি ঘুম বান্দার জন্য মৃত্যুস্বরূপ ও প্রতিটি জাগরণ বান্দার জন্য ক্বিয়ামত স্বরূপ। আর এই স্বাভাবিক নিদ্রা ও জাগরণে বান্দার কোন হাত নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তাঁর ইচ্ছা হ'লে যেকোন সময়ের নিদ্রা বান্দার জন্য চিরনিদ্রায় পরিণত হতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ 'আর তাঁর নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'ল তোমাদের রাত্রি ও দিবসের নিদ্রা এবং (এর মাধ্যমে) তোমাদের আল্লাহ্র কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে (মনোযোগ দিয়ে) শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য' *(রূম ৩০/২৩)*।

(২) وَلَيَالٍ عَشْرٍ 'শপথ দশ রাত্রির'। ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবায়ের, মুজাহিদ, সুদ্দী, কালবী প্রমুখ বিগত ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ বিদ্বান এর দ্বারা যুলহিজ্জাহ্র প্রথম দশদিন অর্থ নিয়েছেন। তবে কেউ কেউ রামাযানের শেষ দশকের কথাও বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، يَعْنِى الْعَشْرَ- قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ- 'এই দশদিনের (অর্থাৎ যুলহিজ্জাহ্র প্রথম দশদিনের) আমলের চাইতে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও কি নয়'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়েছে। কিন্তু কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনি'। অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছে।[২৫২]

উক্ত দশ দিনের ফযীলত বেশী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল এই যে, ঐ সময় মুমিনগণ হজ্জের প্রস্তুতি ও ইবাদতসমূহ পালনে লিপ্ত থাকেন। যারা হজ্জে আসেন না, তারা আরাফার দিনে নফল ছিয়াম পালন করেন, যা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে। যাতে তাদের বিগত এক বছরের ও আগত একবছরের ছগীরা গোনাহসমূহ মাফ করা হয়।[২৫৩] এতদ্ব্যতীত এ সময় হাজী ছাহেবদের সফরের প্রস্তুতিতে সহযোগিতা ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে মুমিন বান্দাগণ প্রচুর নেকী উপার্জনে লিপ্ত থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা ফজরের পরে সকল মানুষ স্ব স্ব কর্মস্থলে সমবেত হয়। হজ্জের মৌসুমে ও উক্ত দশদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহ্র মেহমানগণ 'লাব্বায়েক' বলতে বলতে বায়তুল্লাহতে সমবেত হন। এর মধ্যে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, হজ্জের মওসুমের যাবতীয় ইবাদত বান্দা যেমন শরী'আতের বিধান মোতাবেক পালন করে থাকে, অনুরূপভাবে ফজরের পর থেকে সারাদিন বান্দা তার কর্মস্থলে যেন শরী'আতের বিধান মেনে অতিবাহিত করে এবং শয়তানের পায়রবী থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

(৩) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ 'শপথ জোড় ও বেজোড়ের'। الْوَتْرُ وَالْوِتْرُ অর্থ বেজোড়। মুজাহিদ বলেন, الشفع الزوج والوتر الله عز وجل অর্থাৎ الشفع হ'ল সকল জোড়া এবং বিতর হ'লেন আল্লাহ'। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى 'আল্লাহ হ'লেন বেজোড় এবং তাঁর সৃষ্টি হ'ল জোড়া, যা নারী ও পুরুষ সমন্বিত'। ইবনু

২৫২. বুখারী হা/৯৬৯; ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে 'ঈদায়েন' অধ্যায়, তাশরীক্বের দিনগুলিতে আমলের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/৭৫৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; মিশকাত হা/১৪৬০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ।

২৫৩. মুসলিম হা/১১৬২, মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।

আব্বাস (রাঃ)ও অনুরূপ বলেন *(ইবনু কাছীর)*। তানতাভী বলেন, অত্র আয়াতটি কুরআনের শ্রেষ্ঠ মু'জেযা সমূহের অন্যতম (من أكبر معجزات القرآن) । কেননা এর মধ্যে রয়েছে গণিতশাস্ত্রের মূল উৎসের সন্ধান। যা প্রাচীনকালে পিথাগোরাস (৫৭০-৪৯৫ খৃঃ পূঃ) প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানীরা জানতেন। কিন্তু ঐসময় তা আরবদের জানা ছিল না। অথচ এত বড় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সংখ্যাতত্ত্বের খবর নিরক্ষর রাসূলের মুখ দিয়ে সর্বপ্রথম আরবরা জানলো। এ তত্ত্বটি কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে অন্যভাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً 'আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়' *(নাবা ৭৮/৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ 'আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা উপদেশ লাভ কর' *(যারিয়াত ৫১/৪৯)*। অর্থাৎ তোমরা জানতে পার যে, সকল জোড়ার সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন, যিনি বেজোড়' *(ইবনু কাছীর)*।

'জোড়া' নানা ধরনের হ'তে পারে। যথা (ক) সত্তাগত। যেমন নারী-পুরুষ। (খ) বস্তুগত। যেমন কাঁচা-পাকা। (গ) গুণগত। যেমন সত্য-মিথ্যা, ঈমান-কুফর ইত্যাদি। এমনিভাবে সর্বত্র আমরা জোড়া দেখতে পাই। বস্তুতঃ সকল বস্তুর মূল সত্তায় রয়েছে নেগেটিভ ও পজেটিভ তথা ইলেকট্রন ও প্রোটন নামক দু'টি অণুর মিলন। এসবের বিপরীতে বেজোড় কেবলমাত্র আল্লাহ্র সত্তা। আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ– 'তুমি বল, তিনি আল্লাহ এক'। 'তিনি মুখাপেক্ষীহীন'। 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারু জন্মিত নন' 'এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/১-৪)*।

বস্তুতঃ 'এক' এমন একটি সংখ্যা যার কোন যৌগ নেই, যার কোন শরীক নেই। বরং সমস্ত সংখ্যা তারই মুখাপেক্ষী। একের সাথে যোগ করলে অন্য সংখ্যা হয়। কিন্তু একেকে বাদ দিলে কোন সংখ্যাই হয় না। যেমন হাদীছে এসেছে বিতর ছালাতের মূল হ'ল এক রাক'আত (اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ)।[২৫৪] তিন, পাঁচ, সাত, নয় রাক'আতকে বিতর বলা হ'লেও তা সবই এক-এর সঙ্গে জোড় সংখ্যা যুক্ত হয়েই তবে বেজোড় হয়েছে। অমনিভাবে হাদীছে আল্লাহকে 'বিতর' বলা হয়েছে। যেমন- إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ 'আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন।[২৫৫]

অতএব অত্র সূরায় اَلْوَتْرِ অর্থাৎ বেজোড় বলে আল্লাহ স্বীয় সত্তার একত্বের শপথ করেছেন, যা তাওহীদের মূল বিষয়। অতঃপর وَالشَّفْعِ অর্থাৎ জোড় বলে আল্লাহ তাঁর

২৫৪. নাসাঈ হা/১৬৯৩, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে; সনদ ছহীহ।
২৫৫. বুখারী হা/৬৪১০; মুসলিম হা/২৬৭৭; তিরমিযী হা/৪৫৩, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৬৬।

সৃষ্টিজগতের শপথ করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এক ও দুই সংখ্যাগত দিক দিয়ে যেমন পৃথক, সত্তাগত দিক দিয়েও তেমনি পৃথক। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি তাই কখনো এক নয় বা একটি অপরটির অংশ নয়। যেমন কথিত ছূফীবাদী ও অদ্বৈতবাদী দর্শনের অনুসারী কিছু লোক মনে করে থাকেন যে, সৃষ্টি সবই সৃষ্টিকর্তার অংশ। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব 'যত কল্লা, তত আল্লা' (নাঊযুবিল্লাহ)।

وَالْوَتْرِ অর্থ বেজোড়, যেমন আল্লাহ্‌র সত্তা, যা সকল সংখ্যার মূল (أصل العدد)। الشفع অর্থ জোড়, তেমনি সৃষ্টির সত্তা, যা সকল সংখ্যার উৎস (مبدأ العدد)। বাকী অন্যান্য সংখ্যা দুইয়ের সাথে যোগ করেই তৈরী হয়ে থাকে। অংক শাস্ত্র, হিসাব বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান তথা সকল বিজ্ঞানের মূল উৎস লুকিয়ে রয়েছে এই দু'টি সংখ্যার মধ্যে, যা বর্ণিত হয়েছে বিজ্ঞানময় কুরআনের অত্র আয়াতে মাত্র দু'টি শব্দের মাধ্যমে। *সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী*।

(৪) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ 'শপথ রাত্রির, যখন তা অতিক্রান্ত হ'তে থাকে'।

এটি হ'ল পঞ্চম শপথ। سَرَى يَسْرِى سَرْيَةً অর্থ السير فى الليل 'রাত্রিতে চলা'। এখানে الليل يسير 'রাত্রি চলে' অর্থ সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবিরতভাবে চলে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِذَا يَسْرِ অর্থ إذا ذهب 'যখন চলে যায়'। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, حتى يذهب بعضه بعضا 'যখন রাত কিছু কিছু করে চলে যেতে থাকে'। يَسْرِ আসলে ছিল يَسْرِىْ কিন্তু হালকা করার জন্য শেষের ى বর্ণটি ফেলে দেওয়া হয়েছে।

(৫) هَلْ فِيْ ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ 'নিশ্চয়ই ঐসবের মধ্যে বড় ধরনের শপথ রয়েছে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য'। মুক্বাতিল বলেন, এখানে هل অর্থ إنَّ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই' *(কুরতুবী)*। هل প্রশ্নবোধক অব্যয় (الاستفهام) আনা হয়েছে মূলতঃ নিশ্চয়তাবোধক (للتقرير) অর্থ বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ এগুলির মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য যথাযোগ্য শপথ রয়েছে। আত্মভোলা মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য এটা আরবদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাকরীতি।

لِذِىْ حِجْرٍ অর্থ لِذِى عَقْلٍ وَلُبٍّ 'জ্ঞানী ও বিবেকবান'। الحِجْرُ অর্থ المنع 'বাধা'। যে ব্যক্তি নিজেকে সংযত রাখে তাকে ذو حجر বলা হয়' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। জ্ঞান ও

বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধা দান করে। সেকারণ এখানে ‘হিজর’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ذِيْ حِجْرٍ অর্থ বাধা দানকারী অর্থাৎ বিবেক। যাকে অন্যত্র النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ ‘তিরষ্কারকারী আত্মা’ বলা হয়েছে *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২)*।

জ্ঞানী সমাজকে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ বা لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ইত্যাদি শব্দে বলা হয়েছে। কিন্তু ذِيْ حِجْرٍ শব্দটি কেবল এখানেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং শপথের মধ্যে জ্ঞান-কে কেবল এখানেই আনা হয়েছে। এর গোপন রহস্য কি? তানতাভী বলেন, সেটা কেবল এটাই হ’তে পারে যে, এর দ্বারা কুরআনের পাঠক ও অনুসারীদেরকে আল্লাহ্র সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান-গবেষণায় লিপ্ত হবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যা কেবল ব্যাকরণ ও বালাগাত শিক্ষার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়’ *(তাফসীর তানতাভী ২৫/১৫৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, কুরআনে ফিক্বহ বিষয়ক আয়াতের সংখ্যা দেড়শ’র বেশী হবে না। অথচ সৃষ্টিতত্ত্ব (علوم الكائنات) বিষয়ক প্রকাশ্য আয়াতের সংখ্যা সাড়ে সাতশ’। এছাড়াও রয়েছে ‘প্রায় প্রকাশ্য’ অন্যান্য আয়াতসমূহ, যা থেকে কোন একটি সূরাও খালি নেই’ *(সূরা আবাসা ২৪-৩২ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য ২৫/৫৫-৫৬)*। তিনি বলেন, একটি প্রসিদ্ধ বিধান হ’ল, مالا يتم به الواجب إلا به فهو واجب ‘যা ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেটাও ওয়াজিব’। অতএব সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে যথার্থভাবে জানতে গেলে তাঁর সৃষ্টিকৌশল ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞান অর্জন করাটাও ওয়াজিব’ *(ঐ, পৃঃ ৫৪)*। আর তখনই হাছিল হবে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র মা‘রিফাত বা পরিচয়।

উপরে বর্ণিত পাঁচটি শপথের জওয়াব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَيُعَذِّبَنَّ ‘অবিশ্বাসীরা অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে’ *(ক্বাসেমী, তানতাভী)*। যা পরবর্তী আয়াত সমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ- **(৬-৮)**
‘তুমি কি জানো না তোমার প্রভু কিরূপ আচরণ করেছিলেন ‘আদে ইরম (১ম ‘আদ) গোত্রের সাথে’? ‘যারা ছিল উঁচু স্তম্ভসমূহের মালিক’। ‘যাদের ন্যায় কাউকে জনপদসমূহে সৃষ্টি করা হয়নি’।

‘আদ হ’ল দক্ষিণ আরবের একটি বিখ্যাত গোত্রের নাম। যারা ছিল নূহ (আঃ)-এর পরবর্তী যুগের মানুষ। আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য হূদ (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা হঠকারিতা করে এবং বলে যে, مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟ ‘আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে? *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। ফলে তারা আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যায়।

যালেমরা আখেরাতে জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করবে, এটা তো নিশ্চিত। কিন্তু তারা যে দুনিয়াতেও আল্লাহ্র কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়ে থাকে, এবিষয়ে বিগত যুগে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত তিনটি বড় বড় দুর্ধর্ষ জাতির কাহিনী বর্ণনা করে তুলনামূলকভাবে ছোট যালেমদের আল্লাহ এখানে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন এবং তাঁর শেষনবী ও উম্মতে মুহাম্মাদীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। উক্ত তিনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি হ'ল আদ, ছামূদ ও ফেরাঊন। যাদের প্রত্যেকটি ছিল স্ব স্ব যুগের সেরা শক্তিশালী ও সেরা অত্যাচারী। এই তিনটি কওমের কাছে আল্লাহ স্বীয় তিনজন প্রসিদ্ধ নবীকে পাঠিয়েছিলেন তাদের হেদায়াতের জন্য। তারা হ'লেন যথাক্রমে হযরত হূদ, ছালেহ ও মূসা (আঃ)। কিন্তু ঐ তিনটি কওমের নেতারা কেউ তাঁদের কথা শোনেনি এবং উপদেশবাণীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। তারা অহংকারে মদমত্ত হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাদের উপরে নেমে আসে এলাহী গযব। যা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এখানে বিশেষভাবে উক্ত তিনটি জাতির বর্ণনার কারণ হ'ল এই যে, 'আদ ও ছামূদ আরব এলাকায় হওয়ায় এদের ধ্বংস কাহিনী আরবদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল। অনুরূপভাবে মিসর আরব সন্নিহিত এলাকা হওয়ায় ফেরাঊনের ধ্বংস কাহিনী লোক মুখে তাদের নিকটে পৌঁছেছিল।

উক্ত কাহিনীত্রয়ের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে তথা সকল মানুষকে লক্ষ্য করে বলছেন, أَلَمْ تَرَ অর্থাৎ ألم تعلم 'তুমি কি জানো না'? বস্তুতঃ নিরক্ষর নবীর কাছে এসব কাহিনী ছিল অভিনব, যা তিনি কখনোই জানতেন না। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ কেবল কুরআনের মাধ্যমেই বিগত যুগের এসব অকাট্য সত্য ঘটনা সমূহের এবং হারানো সভ্যতা সমূহের সন্ধান পেয়েছে।

প্রথমেই বর্ণনা এসেছে 'আদ জাতি সম্পর্কে। 'আদ হ'ল হযরত নূহ (আঃ)-এর অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ। 'আদ বিন ইরম বিন আওছ (عَوص) বিন সাম বিন নূহ (আঃ)। তবে কেউ কেউ 'আদ বিন আওছ বিন ইরম বলেছেন। এখানে 'আদ' বলে 'আদ জাতি বুঝানো হয়েছে। যেমন হাশেম বলে বনু হাশেম বুঝানো হয় *(কুরতুবী)*। 'আদ জাতিকে 'কওমে হূদ' (قوم هود) বলা হয়। কেননা হযরত হূদ (আঃ) নবী হিসাবে এই জাতির নিকটে প্রেরিত হয়েছিলেন।

(৭) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ এখানে 'ইরম' বলে سِبْط إرم অর্থাৎ ইরমের নিকটতম অধঃস্তন পুরুষদের বুঝানো হয়েছে। অত্র সূরার عاد إرم-কে অন্য সূরায় عاد الأولى অর্থাৎ প্রথম 'আদ সম্প্রদায় বলা হয়েছে *(নাজম ৫৩/৫০)*। যারা পরবর্তী 'আদ সম্প্রদায় থেকে আলাদা। নূহ (আঃ)-এর কওমের পরে সর্বপ্রথম 'আদ-এর কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়।

ذَات الْعِمَاد অর্থ 'স্তম্ভসমূহের মালিক'। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়। যেমন কবি খানসা তাঁর প্রশংসিত ব্যক্তির প্রশংসায় বলেন, كثير الرماد رفيع العماد 'অধিক ছাইওয়ালা ও উঁচু স্তম্ভওয়ালা' অর্থাৎ অধিক অতিথিবৎসল এবং উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী (ذات الرفعة والثبات)। যাহহাক বলেন, অধিক ক্ষমতা ও কঠোরতার মালিক (ذات القوة والشدة)। পূর্বের আয়াতে বর্ণিত عاد-এর উপরে অত্র আয়াতে বর্ণিত إِرَمَ শব্দটি عطف بيان হয়েছে। অর্থাৎ 'আদে ইরম বা ইরম বংশীয় 'আদ।

ইবনু কাছীর বলেন, তারা সে সময় উঁচু উঁচু প্রাসাদসমূহে বসবাস করত এবং দৈহিক আকৃতি ও বস্তুগত ক্ষমতায় ছিল সেযুগের সেরা শক্তিশালী জাতি। হযরত হূদ (আঃ) তাদেরকে দেওয়া আল্লাহ্র এই অমূল্য নে'মতকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যয় করার আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করে। ফলে তাদের উপরে নেমে আসে আল্লাহ্র গযব। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاَءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- 'আদ কওমের নবী হূদ (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেন, 'তোমরা স্মরণ কর যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পরে ভূপৃষ্ঠের মালিক বানিয়েছেন এবং তোমাদের দৈহিক আকৃতিতে বিশালতা দান করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/৬৯)*। কিন্তু তারা হঠকারিতা করল এবং বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রেওয়াজের দোহাই দিয়ে শিরকের উপরে অটল রইল। অতঃপর নিজেদের শক্তির বড়াই দেখালো। যেমন আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ- 'অতঃপর আদ সম্প্রদায়, যারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার দেখাল এবং বলল, আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে? তারা কি দেখে না যে আল্লাহ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী। বস্তুতঃ তারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১৫)*।

অতঃপর তাদের অহংকার ও হঠকারিতার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদের প্রতি প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেন। যা ৮ দিন ও ৭ রাত্রি স্থায়ী হয় এবং সবকিছুকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এই সময় আল্লাহপাক স্বীয় নবী হূদ ও তাঁর অনুসারী মুমিনদের সরিয়ে নেন। উক্ত গযবের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوْماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ

أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ؟ 'অতঃপর আদ জাতি, যাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা'। 'যা তাদের উপরে তিনি প্রবাহিত করেছিলেন একটানা সাত রাত্রি ও আট দিবস ব্যাপী। তখন তুমি থাকলে তাদেরকে দেখতে যে তারা ভূপাতিত হয়ে পড়ে আছে খর্জুর বৃক্ষের অসার কাণ্ডসমূহের ন্যায়'। 'তুমি কি এখন তাদের কোন চিহ্ন দেখতে পাও?' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৬-৮)*।

(৮) الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ 'যাদের ন্যায় কাউকে জনপদসমূহে সৃষ্টি করা হয়নি'। অর্থাৎ 'আদ গোত্রের ন্যায় শক্তিশালী কোন গোত্র তৎকালীন বিশ্বে সৃষ্টি করা হয়নি। তারা দৈহিক আকৃতিতে যেমন বিশালকায় ছিল, বৈষয়িক শক্তিতেও তেমনি অতুলনীয় ছিল।

শাদ্দাদ কে ছিলেন?

তাফসীর কুরতুবীতে সূত্রহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আদ-এর দুই পুত্র ছিল, শাদ্দাদ ও শাদীদ। শাদীদের মৃত্যু হ'লে শাদ্দাদ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক হন। তিনি নয়শ' বছর বেঁচে ছিলেন। জান্নাতের কথা শুনে তিনি আদনের (صحارى عدن) মরুভূমিতে তিনশ' বছর ধরে বিশাল শহর নির্মাণ করেন ও তাকেই জান্নাত নামকরণ করেন। যেখানে সোনা-রূপা ও মনি-মাণিক্য দিয়ে বড় বড় ইমারত নির্মাণ করা হয় ও বিভিন্ন জাতের বৃক্ষসমূহ লাগানো হয়। নির্মাণ শেষ হ'লে শাদ্দাদ তার দলবল নিয়ে সেখানে পৌঁছবার একদিন ও একরাতের পথ বাকী থাকতেই এক ভীষণ আসমানী বজ্র নিনাদে সব ধ্বংস হয়ে যায় *(কুরতুবী, অত্র আয়াতের তাফসীর ২০/৪৩-৪৪)*। এভাবে ত্বাবারী, ছা'আলবী, যামাখশারী প্রমুখ মুফাসসিরগণ স্ব স্ব তাফসীর গ্রন্থে ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন ক্বিলাবাহ্‌র নামে শাদ্দাদের বেহেশতের যেসব কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, هذا كله من خرافات الإسرائيليين ما وضع بعض زنادقهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى جميع ذلك– 'এসবই ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কিছু ধর্মদ্রোহী লোকের বানোয়াট কাহিনী মাত্র। তারা এর দ্বারা মূর্খ লোকদের জ্ঞানের পরিধি যাচাই করতে চায়। যাতে তারা তাদের সবকিছুকে বিশ্বাস করে নেয়'। তিনি বলেন, ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত ধন অনুসন্ধানের নামে ধনী লোকদের ও বোকা লোকদের কাছ থেকে বাতিলপন্থায় অর্থ হাতিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তারা এসব কল্পকাহিনী তৈরী করে থাকতে পারে *(মর্মার্থ; ঐ, তাফসীর)*। বর্তমানে যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বর্ণখনির অংশীদার বানানোর লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশে কিছু এনজিও লোকদের পকেট হাতিয়ে নিচ্ছে। ইবনু খালদূন (রহঃ) বলেন, هذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ فى شيئ من بقاع الارض 'ভূপৃষ্ঠের কোথাও এরূপ কোন মহানগরীর নাম কেউ কখনো শোনেনি'। তিনি বলেন,

وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي تمحلت لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي يتزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة ؟

ذات العماد 'স্তম্ভওয়ালা'-এর দূরতম ব্যাখ্যা দেবার জন্য এই ধরনের উদ্ভট কাহিনী অবতারণা করার কি প্রয়োজন ছিল? যেখানে আল্লাহ্র কিতাব এইরূপ সকল অশুদ্ধ বিষয় থেকে পবিত্র? *(মুক্বাদ্দামা ইবনে খালদূন পৃঃ ১৩-১৫)*। অতএব 'শাদ্দাদের বেহেশত' বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট মাত্র।

(৯) وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ 'এবং ছামূদ কওমের সাথে? যারা পাথর কেটে উপত্যকায় গৃহ নির্মাণ করেছিল'। অর্থাৎ তুমি কি জানো না ছামূদ জাতির সাথে আল্লাহ কিরূপ আচরণ করেছিলেন? যারা বিগত যুগে পাহাড়ের বুকে পাথর খোদাই করে গৃহ নির্মাণ করত। এছাড়া পাথরকে সাইজ করে কেটে উপত্যকায় বড় বড় ইমারত নির্মাণ করত। এর মাধ্যমে ছামূদ জাতির ধ্বংসকাহিনী বর্ণনার সাথে সাথে বিগত যুগে তাদের উন্নত সভ্যতা ও অতুল্য স্থাপত্যশৈলীর বর্ণনাও পাওয়া যায়।

جَابَ يَجُوْبُ جَوْبًا অর্থ قطع 'কর্তন করা'। জামার পকেটকে جَيْبٌ বলা হয়। কেননা এটি জামার একটি কর্তিত অংশ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, جَابُوا الصَّخْرَ অর্থ ينحتونها ويخرقونها 'তারা পাথর খোদাই করত ও ছিদ্র করত' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ কেবল পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা নয় বরং পাথর সুন্দর করে কেটে তারা উপত্যকায় গৃহ নির্মাণ করত। যেমন ছামূদ জাতির নবী হযরত ছালেহ (আঃ) স্বীয় কওমকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتاً فَارِهِيْنَ 'আর তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকপূর্ণ গৃহসমূহ নির্মাণ করে থাক' *(শো'আরা ২৬/১৪৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتاً آمِنِيْنَ 'আর তারা পাহাড় কেটে নির্মাণ করত নিরাপদ গৃহসমূহ' *(হিজর ১৫/৮২)*। এতে বুঝা যায় যে, সে যুগের লোকেরা কারিগরী বিদ্যা ও স্থাপত্য শিল্পে অনেক উন্নত ছিল।

'ছামূদ' গোত্র হ'ল 'ইরম' বংশের অন্যতম শাখা। কালবী বলেন, 'আদ ও ছামূদ উভয় গোত্রের মূল দাদা হ'লেন 'ইরম'। এজন্যেই বলা হয় عاد إرم ও ثمود إرم। কালবী আরও বলেন, ইরমের বংশধররা আম্মান (عمان) ও হাযারামাউত (حضر موت) এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজর' (حجر)। আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় শাম হ'তে মক্কার পথে অবস্থিত এই শহরকে এখন 'মাদায়েনে ছালেহ' (مدائن صالح) বলা হয় *(তানতাভী)*। সুলায়মান নাদভী 'আরযুল কুরআনে' বলেন

যে, তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনসমূহ আজও বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও ছামূদী বর্ণমালার শিলালিপি রয়েছে।[২৫৬]

তাবূক যুদ্ধে যাবার পথে মুসলিম বাহিনী যখন 'হিজর' এলাকা অতিক্রম করে, যা ছিল খায়বরের অদূরে 'ওয়াদিল ক্বোরা' (وادى القرى) এলাকায় অবস্থিত এবং এটাই ছিল ছামূদ জাতির গযবের এলাকা- তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা গযবপ্রাপ্ত ছামূদ জাতির বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করবে না। এখানকার কোন কূয়ার পানি পান করবে না। তোমরা কাঁদতে কাঁদতে মাথা নীচু করে দ্রুত এই স্থান ত্যাগ কর' *(সংক্ষেপায়িত : বুখারী হা/৪৩৩, ৪৪১৯)*।

(১০) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ 'এবং ফেরাঊনের সাথে, যে ছিল বহু কীলকের অধিপতি'।

'আওফী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, এখানে 'বহু কীলক' অর্থ 'বহু সৈন্য-সামন্ত' যাদের মাধ্যমে ফেরাঊন তার শাসনকে মযবুত করেছিল *(ইবনু কাছীর)*। তবে শাব্দিক অর্থেও এটা হ'তে পারে। কেননা বলা হয়ে থাকে যে, ফেরাঊন মানুষের হাতে ও পায়ে লোহার কীলক মেরে নির্যাতন করত। ছাবেত আল-বুনানী হযরত আবু রাফে' হ'তে বর্ণনা করেন যে, ফেরাঊনকে 'কীলকওয়ালা' বলা হয় এ কারণে যে, সে তার স্ত্রী আসিয়ার হাতে-পায়ে চারটি কীলক মেরে তার পিঠের উপর দিয়ে বিশাল এক লোহার চাকি গড়িয়ে দেয়। যাতে তাঁর মৃত্যু হয় *(ইবনু কাছীর)*। উল্লেখ্য যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত কবুল করে আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনার অপরাধে (?) ফেরাঊন তার স্ত্রী আসিয়া ও (পালিত) কন্যা মাশেত্বাহকে এভাবে নিষ্ঠুর পন্থায় হত্যা করেছিল *(কুরতুবী)*।

(১১) الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ 'যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল'। অর্থাৎ আদ, ছামূদ, ফেরাঊন এরা সবাই স্ব স্ব অঞ্চলের লোকদের উপরে যুলুম ও অত্যাচারে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

(১২) فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ 'অতঃপর সেখানে তারা বহু অনাচার করেছিল'। অর্থাৎ আদ, ছামূদ ও ফেরাঊন স্ব স্ব অঞ্চলে সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল।

(১৩) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ 'ফলে তোমার পালনকর্তা তাদের উপরে শাস্তির কশাঘাত হানেন'।

২৫৬. বঙ্গানুবাদ তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৪৫৬; আ'রাফ ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

صَبَّ অর্থ اَلْقَى 'নিক্ষেপ করা'। سَاطَ يَسُوطُ سَوْطًا অর্থ ضرب بسوطه 'চাবুক দিয়ে মারা'। কুরতুবী বলেন, سَوْطَ عَذَابٍ অর্থ نصيب عذاب 'শাস্তির অংশ'। এর দ্বারা শাস্তির কঠোরতা বুঝানো হয়েছে। কেননা السوط শব্দ দ্বারা আরবদের নিকটে কঠোরতম শাস্তিকে বুঝানো হয়। ফার্রা বলেন, আরবরা একথাটি সকল প্রকার কঠোরতম শাস্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। ক্বাতাদাহ বলেন, আল্লাহ প্রেরিত প্রতিটি শাস্তিই سوط عذاب বা শাস্তির কশাঘাত *(কুরতুবী)*।

উক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের উপরে ইতিহাসের কঠোরতম শাস্তিই নাযিল হয়েছিল। 'আদ ও ছামূদ জাতি যেমন প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু এবং প্রচণ্ড নিনাদসহ ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ফেরাঊন তেমনি তার সৈন্য-সামন্ত ও লোক-লশকরসহ চোখের নিমিষে সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। অন্যদিকে মযলূম বনু ইসরাঈলগণ মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে মুক্তি পেয়েছিল *(বাক্বারাহ ২/৪৯-৫০; ইউনুস ১০/৯০-৯২)*।

আল্লাহ বলেন, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا- ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ 'তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম'। 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। আর অবিশ্বাসীদের কোন অভিভাবক নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১০-১১)*।

(১৪) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ 'নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা ঘাঁটিতে সদা সতর্ক থাকেন'। رَصَدَ يَرْصُدُ رَصَدًا ওঁৎ পেতে থাকা'। সেখান থেকে مَرصد ও مرصاد অর্থ সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি যা সাধারণতঃ কোন উঁচু স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে'। আল্লাহপাক নিজেকে সেই ঘাঁটিতে অবস্থানকারী বলেছেন। এর দ্বারা তিনি বান্দাকে সাবধান করেছেন। হাসান বাছরী ও ইকরিমা বলেন, এর অর্থ يرصُدُ عَملَ كلِّ إنسان حتى يجازيه به 'তিনি প্রতিটি মানুষের কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, যাতে তাকে যথার্থ প্রতিদান ও প্রতিফল দিতে পারেন' *(কুরতুবী)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ يَسْمَعُ وَيَرَى 'তিনি শোনেন ও দেখেন'। অর্থাৎ আল্লাহ বান্দার সকল গোপন ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ দেখেন ও শোনেন ও সে হিসাবে তার প্রতিফল দিয়ে থাকেন। ইমাম কুরতুবী জনৈক আরব থেকে বর্ণনা করেন, একবার তাকে বলা হ'ল أين ربك 'তোমার প্রভু কোথায়?' জওয়াবে তিনি বলেন, لبالمرصاد 'ঘাঁটিতে'। আমর ইবনু ওবায়েদ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি এই সূরাটি

আব্বাসীয় খলীফা আবু জা'ফর মানছূরের (১৩৬-১৫৭হিঃ/৭৫৪-৭৭৫ খৃঃ) সামনে পাঠ করেন। যখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন, তখন মানছূর বলে ওঠেন يا ابا جعفر 'হে আবু জাফর'! যামাখশারী বলেন, মানছূরের এই চিৎকার ধ্বনির মধ্যে তীব্র ভয় প্রকাশ পায়। কেননা এর মধ্যে অহংকারী শাসকদের জন্য দারুণ ধমকি রয়েছে *(কুরতুবী)*। এযুগের শাসকরা কি এতে ভয় পাবেন?

(১৫-১৬) فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَهَانَنِ- 'কিন্তু মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মানিত করেন ও ধন-সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে যে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মানিত করেছেন'। 'পক্ষান্তরে যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার উপরে তার রূযী সংকুচিত করেন, তখন সে বলে যে, আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন'।

পরপর বর্ণিত দু'টি আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষকে দেয়া সম্মান ও অসম্মান, সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতা আল্লাহ্র নিকটে কারু প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার নিদর্শন নয়। বরং সবকিছু হয়ে থাকে বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র ফায়ছালা ও তাঁর পূর্ব নির্ধারণ (قضاء وقدر) অনুযায়ী। প্রকৃত মুমিন বান্দা সচ্ছল ও অসচ্ছল, কষ্ট ও আনন্দ উভয় অবস্থায় ছবর করে ও আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

যেমন আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ 'প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। বস্তুতঃ আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমাদের কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ- 'আমি আশ্চর্য হই মুমিনের উপর যখন তার কল্যাণ লাভ হয়, তখন সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও শুকরিয়া আদায় করে। আবার যখন সে কষ্টে পতিত হয়, তখনও সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও ছবর করে।[২৫৭] অন্য হাদীছে এসেছে, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ- 'মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার সকল কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারটা এরূপ নয়। তার জন্যে

২৫৭. আহমাদ হা/১৪৯২, মিশকাত হা/১৭৩৩; সনদ ছহীহ।

আনন্দের কিছু ঘটলে সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। এতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কিছু ঘটলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[২৫৮] বরং এসবই আল্লাহ্‌র পরীক্ষা মাত্র। যেমন তিনি বলেন, الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ– 'তিনি সেই মহান সত্তা যিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন কে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমল করে সেটা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুল্‌ক ৬৭/২)*। অতএব ধনিক ও শাসকশ্রেণী যেন অহংকারে স্ফীত হয়ে একথা না ভাবে যে, এসবকিছুই তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ মাত্র এবং তারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র বিশেষ প্রিয়পাত্র। এদেরকে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِيْنَ– نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لاَّ يَشْعُرُوْنَ– 'তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করছি'। 'আর আমরা তাদের জন্য সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা (আসল তাৎপর্য) বুঝে না' *(মুমিনূন ২৩/৫৫-৫৬)*।

পক্ষান্তরে ঈমানদার বান্দাগণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيْبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـــا إِلَيْهِ رَاجِعوْنَ– 'অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু কিছু ভয়, ক্ষুধা, মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। তবে তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের'। 'যাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হ'লে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই নিকটে ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)*।

অতএব দুনিয়াতে কাউকে সম্মানিত করার অর্থ আল্লাহ্‌র নিকটে তার সম্মানিত হওয়া নয় এবং দুনিয়ায় কাউকে অসম্মানিত করার অর্থ আল্লাহ্‌র নিকটে তার অসম্মানিত হওয়া নয়। বরং উভয় অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকটে সম্মানিত হওয়ার মানদণ্ড হ'ল আল্লাহভীরুতা ও আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য (طاعة الله)। কখনো সম্মানিত কখনো অসম্মানিত করে, কখনো সচ্ছল কখনো অসচ্ছল করে আল্লাহ তার বান্দাকে পরীক্ষা করেন, সে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপরে টিকে থাকে কি-না। এক্ষণে পরীক্ষায় ভীত হয়ে যদি সে শয়তানের ফাঁদে পা না দেয় এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি দৃঢ় থাকে, তবে তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সুসংবাদ হ'ল, أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ 'তারা হ'ল ঐ সকল ব্যক্তি যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত আশীষ ও অনুগ্রহ রয়েছে এবং এরাই হ'ল সুপথপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ২/১৫৭)*।

২৫৮. মুসলিম হা/২৯৯৯, মিশকাত হা/৫২৯৭।

(১৭) كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ‘কখনোই এরূপ নয়’। ‘বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না’। كَلاَّ শব্দটি كلمة ردع ‘প্রত্যাখ্যানকারী অব্যয়’।

সম্মানিত ও সচ্ছল ব্যক্তির নিজেকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র ভাবা এবং অসম্মানিত ও অসচ্ছল ব্যক্তির নিজেকে আল্লাহ্র অপ্রিয় ভাবার বিষয়টিকে পরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ বলেন, كَلاَّ ‘কখনোই এরূপ নয়’। দু’টি ভাবনার কোনটাই সঠিক নয়। বরং উভয় অবস্থায় সঠিক মানদণ্ড হ’ল আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল থাকা। অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক ও অপরিমেয় সম্পদের মালিক হয়েও কেবল আল্লাহ্র আনুগত্যশীল না হওয়ার কারণে অহংকারী ফেরাঊনের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে তারই স্ত্রী আসিয়া তার হাতে মর্মান্তিক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেও এবং তারই ঘরে লালিত-পালিত মূসা তার কারণে দেশান্তরী হয়েও দুনিয়া ও আখেরাতে মহা সম্মানিত হয়েছেন। অতএব সম্মান ও অসম্মানের মাপকাঠি হ’ল আল্লাহ্র আনুগত্য। লোকেরা যা ভেবেছে, তা নয়।

মানুষের উক্ত ভুল চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করার পর এক্ষণে আল্লাহ অকৃতজ্ঞ লোকদের চারটি বদভ্যাসের কথা উল্লেখ করছেন। যার প্রথমটি হ’ল এই যে, তারা ইয়াতীমকে সম্মান করে না। পিতৃহীন অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশুকে ‘ইয়াতীম’ বলা হয়। তাদেরকে সম্মান না করাটা হ’ল কাফের ও অকৃতজ্ঞ মানুষের লক্ষণ। এখানে ‘সম্মান করা’ কথাটি বলার মাধ্যমে ইয়াতীমের যথাযথ হক আদায় করা ও তার প্রাপ্য অধিকার বুঝে দেওয়ার প্রতি ইয়াতীমের অভিভাবক এবং সমাজের প্রতি যেমন নির্দেশ রয়েছে, তেমনি নিজের সন্তানের চাইতে ইয়াতীম সন্তানের প্রতি যেন কোনরূপ হীন আচরণ না করা হয়, তার প্রতিও কঠোর নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্র প্রকৃত মুমিন বান্দা সর্বদা ইয়াতীমকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। বিশ্বের সেরা ইয়াতীম ও সেরা মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ، وَقَرَنَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ– ‘শ্রেষ্ঠ মুসলিম গৃহ হ’ল সেটি, যেখানে একজন ইয়াতীম রয়েছে এবং যার প্রতি সুন্দর ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট মুসলিম গৃহ সেটি, যেখানে একজন ইয়াতীম রয়েছে। কিন্তু তার প্রতি মন্দ আচরণ করা হয়। এরপর তিনি বলেন, আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক জান্নাতে এইরূপ পাশাপাশি থাকব’- একথা বলার সময় তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলী দু’টি মিলিত করেন’।[২৫৯] মুক্বাতিল বলেন, আয়াতটি উমাইয়া বিন খালাফের কাছে পালিত ইয়াতীম

২৫৯. আবুদাঊদ হা/৫১৫০; তিরমিযী হা/১৯১৮; বুখারী হা/৫৩০৪; তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান ছহীহ; মিশকাত হা/৪৯৫২, ৪৯৭৩ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ১৫ অনুচ্ছেদ।

শিশু কুদামা বিন মায‘ঊন সম্পর্কে নাযিল হয়’ *(কুরতুবী)*। তবে মর্মার্থ সকলের জন্য। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ, وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ‘আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক, নিজের বা অন্যের, জান্নাতে এইরূপ একসাথে থাকব’ -একথা বলে তিনি মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলী দু’টি দিয়ে ইশারা করেন’।[২৬০]

(১৮) وَلاَ تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ‘এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করে না।’

এটা হ’ল কাফেরদের দ্বিতীয় বদভ্যাস। তারা নিজেরা তো মিসকীনদের খাদ্য দান করে না। এমনকি অন্যকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। এর মধ্যে ধনীদের প্রতি যেমন দান করার নির্দেশ রয়েছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না তাদের প্রতিও নির্দেশ রয়েছে, যেন তারা সক্ষম ব্যক্তিদেরকে এব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে।

(১৯) وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّماًّ ‘আর তোমরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যথেচ্ছভাবে ভক্ষণ করে থাক’।

التُّرَاثُ অর্থ ما يورثه الله العبد من المال ‘আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে যেসব ধন-সম্পদের অধিকারী করেন’। কুরতুবী এখানে تُرَاثٌ বলতে ميراث اليتامى ‘ইয়াতীমের মীরাছ’ বুঝিয়েছেন। تُرَاثٌ আসলে ছিল وُرَاثٌ। যেমন وَرِثَ يَرِثُ وَرْثًا وَتُرَاثًا। পরে واو-কে تاء দ্বারা বদল করা হয়েছে। যেমন تجاه، تقاة ইত্যাদি *(কুরতুবী)*। তবে আয়াতের বক্তব্য সকল প্রকার মীরাছকে শামিল করে। যা মানুষ প্রাপ্ত হয় মৃতের উত্তরাধিকার হিসাবে কিংবা নিজের ও অন্যের যেকোন উপার্জন হ’তে। মন্দ লোকেরা তাদের আয়-উপার্জনে হালাল-হারাম বিচার করে না। অত্র আয়াতে তাদের ধিক্কার দেওয়া হয়েছে।

এটি হ’ল কাফিরদের তৃতীয় বদভ্যাস। তারা তাদের বাপ-দাদাদের রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তিতে হালাল-হারাম বাছ-বিচার না করে দু’হাতে ভোগদখল করে। দুর্বল ওয়ারিছদের তারা সাধ্যমত বঞ্চিত করে। ইবনু যায়েদ বলেন, আরবরা নারী ও শিশুদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিত না *(ক্বাসেমী)*। কারণ তারা যুদ্ধ করতে পারত না এবং যুদ্ধে পরাজিত হ’লে তারা বিজয়ীদের দখলে চলে যেত।

বস্তুতঃ দুর্বল শরীককে ফাঁকি দেওয়ার এ বদভ্যাস কেবল সে যুগের কাফিরদের মধ্যে ছিল না, এযুগের কাফের ও মুসলমান ফাসেকদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ

---

২৬০. বুখারী হা/৬০০৫, মিশকাত হা/৪৯৫২।

أَرَضِيْنَ 'যে ব্যক্তি কারু এক বিঘত যমীন অন্যায়ভাবে ভোগ-দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে'।[২৬১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন জমি দখল করল, তাকে ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা বহন করে চলতে বাধ্য করা হবে'।[২৬২] অতঃপর এই মীরাছ যদি ইয়াতীমের হয়, তাহ'লে তার অন্যায় ভোগ-দখল হবে আরো বেশী মারাত্মক।

أَكْلاً لَّمًّا অর্থ সুদ্দী বলেন, أكلاً شديدًا 'দারুণভাবে ভোগ দখল করা'। ইবনু কাছীর বলেন, من أى جهة حصل لهم من حلال أو حرام. 'হারাম-হালাল যেকোন পন্থায় হৌক হাছিল করা'। বকর বিন আব্দুল্লাহ বলেন, اللَّمُّ অর্থ الاعتداء فى الميراث ، يأكل ميراثه وميراث غيره 'মীরাছ ভোগ-দখলে বাড়াবাড়ি করা। সে নিজের অংশটাও খায়, অন্যের অংশটাও খায়' *(ক্বাসেমী)*। আসলে لَمَّ يَلُمُّ لَمًّا অর্থ جمع জমা করা। আরবদের পরিভাষায় لمتَ الطعامَ لَمًّا إذا اكلتَه جمعًا 'তুমি খাদ্য পুরোপুরি খেয়েছ তখনই বলা হয়, যখন তুমি সবটুকু খেয়ে ফেল' *(কুরতুবী)*। এখানে অর্থ, কোনরূপ বাছ-বিচার না করে দু'হাতে শরীকের মাল লোপাট করা।

(২০) وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا 'এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস'।

কাফেরদের ৪র্থ বদভ্যাস হ'ল সীমাহীন ধনলিপ্সা। তারা যত পায়, তত চায়। তাদের চাহিদার শেষ থাকে না। হাদীছে এসেছে, কাফের সাত পেটে খায়, মুমিন এক পেটে খায়।[২৬৩] এতে ইঙ্গিত রয়েছে তাদের অত্যধিক দুনিয়াপূজা ও ধনলিপ্সার প্রতি। অন্য হাদীছে এসেছে, لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ 'আদম-সন্তান যদি দুই ময়দান ভর্তি সম্পদ পায়, সে তৃতীয় আরেক ময়দান চাইবে। মুখে মাটি ভরা (অর্থাৎ কবরে যাওয়া) ব্যতীত তার চাহিদা শেষ হবে না। আর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন যে তওবা করে'।[২৬৪] বস্তুতঃ আখেরাতভোলা মানুষ যেই-ই হৌক না কেন ধনলিপ্সার আগুন তাকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেবে। সে কিছুতেই শান্তি ও স্বস্তি পাবে না। কেবল আল্লাহভীতি ও আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি এবং জান্নাত লাভের আকাংখা মানুষকে ধনলিপ্সার বাড়াবাড়ি

---

২৬১. বুখারী হা/৩১৯৮, মুসলিম হা/১৬১০, মিশকাত হা/২৯৩৮।
২৬২. আহমাদ হা/১৭৫৯৪, ১৭৬০৫; মিশকাত হা/২৯৫৯ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/২৪২।
২৬৩. বুখারী হা/৫৩৯৩, মুসলিম হা/২০৬১; মিশকাত হা/৪১৭৩।
২৬৪. বুখারী হা/৬৪৩৬, মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।

থেকে মুক্তি দিতে পারে। অবিশ্বাসী ও বস্তুবাদীদের মধ্যে এই লিপ্সা সীমাহীন হওয়াটাই স্বাভাবিক।

جَمَّ يَجُمُّ جُمُوْماً وجَمًّا অর্থ সঞ্চিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। এখানে অর্থ চূড়ান্ত কৃপণ ও ধনলিপ্সু হওয়া।

(২১) كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا 'কখনই না। যেদিন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে'।

পূর্বে বর্ণিত চারটি মন্দ অভ্যাসের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, এগুলি কখনই ঠিক নয়। কেননা ইয়াতীমকে সম্মান না করা, মিসকীনকে অন্নদান না করা, অন্যের হক না দিয়ে ওয়ারিছী সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে ভক্ষণ করা ও অত্যধিক ধনলিপ্সার লজ্জাকর পরিণতি হবে সেদিন, যেদিন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। অর্থাৎ যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

دُكَّ الشيئُ إِذَا هُدِمَ دَكَّ يَدُكُّ دَكًّا অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, ভেঙ্গে-চুরে সমান হওয়া। 'বিধ্বস্ত হওয়া' *(কুরতুবী)*। ইবনু কাছীর বলেন, ঘর-বাড়ি-পাহাড় ভেঙ্গে-চুরে একাকার হয়ে পৃথিবী সমতল হয়ে যাবে এবং প্রাণীকুল সব স্ব স্ব কবর থেকে উঠে স্বীয় পালনকর্তার দিকে সমবেত হবে'। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হয়ে যাবে এবং আকাশমণ্ডলীও। আর সকলে উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে, যিনি এক ও পরাক্রান্ত' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*।

কুরতুবী বলেন, دَكًّا دَكًّا অর্থ مرة بعد مرة 'একের পর এক কম্পন আসা ও সবকিছু সমান করে ফেলা'। دكًا بعد دك حتى عادت هباءً منثورًا 'এক ধাক্কার পর আরেক ধাক্কা। অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত হবে' *(ক্বাসেমী)*। বাংলায় যে আমরা 'ধাক্কা' বলি, তারও উৎস এখানে। অতএব যখনই আমরা কাউকে অন্যায়ভাবে দেহে ধাক্কা মারি বা অন্তরে আঘাত দেই, তখন যেন ক্বিয়ামতের দিনের চূড়ান্ত ধাক্কার কথা স্মরণ করি।

(২২) وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاًّ صَفاًّ 'এবং তোমার পালনকর্তা আসবেন ও ফেরেশতামণ্ডলী সারিবদ্ধভাবে থাকবে'।

ইবনু কাছীর বলেন, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক মাক্বামে মাহমূদে প্রথম শাফা'আত (الشفاعة العظمى) কবুল হবার পর সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচার ও ফায়ছালা দেওয়ার জন্য আল্লাহপাক যেভাবে ইচ্ছা আগমন করবেন। এসময় ফেরেশতাকুল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকবে' *(ইবনু কাছীর)*।

'আল্লাহ কিভাবে আগমন করবেন, তার প্রকৃতি কেমন হবে। এজন্য আরশ খালি হয়ে যাবে কি-না ইত্যাদি বিষয় তিনি ব্যতীত কেউ জানে না'। কেননা لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই, তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আগমন, প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ[২৬৫] ইত্যাদি সেভাবেই হবে, যেভাবে তিনি চান এবং যা তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত (ما يليق بشأنه)। ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রা (রাঃ), যাহহাক প্রমুখ হ'তে এরূপ ব্যাখ্যা এসেছে। যারা এতে অবিশ্বাস করে, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِيْ ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ 'তারা কি কেবল (সেদিনের) অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ সাদা মেঘমালার ছায়াতলে তাদের নিকট আগমন করবেন, আর ফেরেশতারাও আসবে এবং সমস্ত কাজের নিষ্পত্তি করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকটেই সমস্ত কার্য প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে' *(বাক্বারাহ ২/২১০; ক্বাসেমী)*।

উক্ত বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের স্পষ্ট আক্বীদা এই যে, এ সকল গায়েবী বিষয়ের খবর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে ও সেভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এসব ব্যাপারে কোনরূপ কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। এগুলি হবে সেভাবে যা তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত। যা কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয় এবং যা মানুষের লৌকিক জ্ঞানের অতীত।

নির্গুণবাদী মু'তাযেলী মুফাসসিরগণ ও তাদের অনুসারীগণ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় দূরবর্তী কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন অত্র আয়াতের তাফসীরে তাদের কেউ বলেছেন, أى جاء أمره وقضاؤه 'আল্লাহ আসবেন' অর্থ 'তাঁর হুকুম ও ফায়ছালা আসবে'। কেউ বলেছেন, ظهرت قدرته واستولّت 'তাঁর শক্তি প্রকাশিত হবে এবং তা সবকিছু অধিকার করে নেবে'। কেউ অর্থ করেছেন, وجاء ربك أى زالت الشُّبَهُ ذلك اليوم 'ঐদিন আল্লাহ সম্পর্কে সকল সন্দেহ দূরীভূত হবে' *(কুরতুবী)*। এধরনের নানা ব্যাখ্যা তারা দিয়েছেন। কিন্তু কোন ব্যাখ্যায় তারা একমত হ'তে পারেননি। কুরতুবী অত্র আয়াতের তাফসীরে এসব উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এর বিপরীতে কিছু না বলায় মনে হয় তিনি নিজেও মু'তাযেলী যুক্তিবাদের বেড়াজালে আটকে গিয়েছেন। যেমন সূরা মুত্বাফফেফীন ১৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন।[২৬৬] অথচ নিয়ম

---

২৬৫. বুখারী হা/১১৪৫, মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩ ।

২৬৬. সেখানে 'অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র দর্শন লাভে বঞ্চিত হবে'-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, عن كرامته ورحمته ممنوعــون 'তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ হ'তে তারা বঞ্চিত হবে'। অথচ এই ব্যাখ্যা আহলে সুন্নাত-এর আক্বীদার বিপরীত এবং মু'তাযেলী আক্বীদার অনুরূপ। (১) আলোচ্য সূরার ২২ আয়াতের ব্যাখ্যায় যামাখশারী (মৃঃ

(قاعدة) হ'ল এই যে, كل ما أسنده الله الى نفسه فهو له لا لغيره 'যে বিষয়টি আল্লাহ নিজের দিকে সম্বন্ধ করেন, সেটি কেবল তাঁরই, অন্যের জন্য নয়'। অত্র আয়াতে 'আগমন'-এর বিয়ষটি আল্লাহ নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। অতএব তিনি কিভাবে আসবেন, সেটা একান্তই তাঁর ব্যাপার। এখানে কল্পনার কোন অবকাশ নেই। অথচ উক্ত মুফাসসিরগণ বিনা দলীলে প্রকাশ্য অর্থ থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন ও কল্পনার ফাঁদে আটকে গিয়েছেন। তিনি সেদিন কিভাবে আসবেন, এধরনের প্রশ্ন করাটাও বিদ'আত ও আল্লাহ্র প্রতি আদবের খেলাফ।

(২৩) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى 'এবং যেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ (তার কৃতকর্ম) স্মরণ করবে। কিন্তু তখন এই স্মৃতিচারণ তার কি কাজে আসবে'?

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَّرَى 'জাহান্নামকে সেদিন দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে' *(নাযে'আত ৭৯/৩৬)*। বস্তুতঃ জাহান্নামকে সবাই দেখবে এবং জাহান্নাম পেরিয়েই জান্নাতে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا 'তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (পুলছিরাত) অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত' *(মারিয়াম ১৯/৭১)*। জান্নাতীরা চোখের পলকে পার হয়ে যাবে। কিন্তু জাহান্নামীরা পড়ে যাবে।

ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের ভয়ংকর রূপ দেখে পাপীদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে এবং তারা তাদের বিগত জীবনের পাপসমূহের কথা স্মরণ করবে ও হায় হায় করতে থাকবে। কিন্তু তখন এই বিলাপে কোন কাজ হবে না। আগামীতে যেটা হবে, সেটা আগেই আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন, যাতে পাপীরা মৃত্যুর আগেই পাপ থেকে ফিরে আসে ও তওবা করে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চায়।

جِيْءَ মাজহূলের ছীগাহ আনা হয়েছে। যার অর্থ 'আনা হবে'। এতে বুঝা যায়, জাহান্নাম আগে থেকেই সৃষ্ট ছিল এবং সেদিন তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হুকুমেই তাকে আনা হবে। সে নিজে আসবে না এবং সে ক্ষমতাও তার হবে না। এক্ষণে কিভাবে ঐদিন

---

৫৩৮ হিঃ) বলেছেন جاء آثار قهره وسلطانه 'তাঁর প্রতাপ ও রাজত্বের নিদর্শনসমূহ উপস্থিত হবে' (২) বায়যাভী (মৃঃ ৬৯১ হিঃ) ও আবুস সঊদ (মৃঃ ৯৮৩ হিঃ) একই ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন (৩) জালালায়েন (মাহাল্লী মৃঃ ৮৬৪ হিঃ) ব্যাখ্যা করেছেন جاء امره 'তাঁর নির্দেশ আসবে' (৪) সাইয়িদ কুতুব (মৃঃ ১৯৬৬ খৃঃ) প্রথমে গায়েবী বিষয় স্বীকার করে নিয়েও শেষে বলেছেন بالجلال والهول 'আসবে তাঁর মহিমা ও ভয়ংকরতা' (৫) মাওলানা মওদূদী (মৃঃ ১৯৭৯ খৃঃ) সঠিক শাব্দিক অনুবাদ করার পরে ব্যাখ্যায় গিয়ে রূপক অর্থ করে পূর্ববর্তী মু'তাযেলী পণ্ডিতদের অনুসারী হয়েছেন।

জাহান্নামকে আনা হবে, সে বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا– 'জাহান্নামকে সত্তর হাযার লাগামে বেঁধে আনা হবে। প্রতিটি লাগামে সত্তর হাযার ফেরেশতা থাকবে। যারা ওটাকে টেনে আনবে'।[২৬৭]

এই ফেরেশতারা কেমন হবে? আল্লাহ বলেন, عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 'যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদের আদেশ করেন এবং তারা তাই করে যা করতে তারা আদিষ্ট হয়' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

এক্ষণে এই টেনে আনার প্রকৃতি কেমন হবে, সে বিষয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। যদি বলা হয়, কোটি কোটি টন বজ্র-বিদ্যুৎ আর লক্ষ কোটি গ্যালন পানিভরা মেঘ কে কিভাবে লাগাম ধরে টেনে এনে আপনার ফসলের ক্ষেতে বর্ষণ করে? এর জওয়াব দিতে পারবেন কি? দুনিয়াতেই আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত যদি এটা সম্ভব হয়, তাহ'লে আখেরাতে এটা কি আরও সহজ নয়? মহাশক্তিধর আল্লাহ্র জন্য সবই করা সম্ভব। অতএব আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া এসব গায়েবী খবরে কেবল বিশ্বাস করে যেতে হবে। সবকিছু চর্মচক্ষুতে দেখে বিশ্বাস করার হঠকারী দাবী অভিশপ্ত ইহুদীদের স্বভাব। কেননা তারা আল্লাহকে সশরীরে প্রকাশ্যে সামনে দেখতে চেয়ে গযবপ্রাপ্ত হয়েছিল *(বাক্বারাহ ২/৫৫)*। অথচ মুত্তাক্বীদের ৬টি গুণের প্রধান গুণ হ'ল, গায়েবে বিশ্বাস *(বাক্বারাহ ২/৩)*।

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ অর্থাৎ যেদিন অবিশ্বাসী মানুষ তার ফেলে আসা জীবনের কৃতকর্ম সমূহ স্মরণ করবে এবং স্বীয় অবিশ্বাস ও পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে।

وَأَنَّى لَهُ الذِكْرَى অর্থাৎ তাদের এই স্মৃতিচারণ কিভাবে তাদের উপকারে আসবে? কেননা কর্মক্ষেত্র ছিল দুনিয়ায়। আর আখেরাত তো কর্মফল লাভের ক্ষেত্র। অতএব সেখানে অনুতাপ-অনুশোচনায় কোন কাজ হবে না।

আল্লাহ বলেন, قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ 'তুমি বল, বিচার দিবসে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস আনয়ন তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের কোন অবকাশ দেয়া হবে না' *(সাজদাহ ৩২/২৯)*।

---

২৬৭. মুসলিম হা/২৮৪২; মিশকাত হা/৫৬৬৬।

আরবদের লিখনরীতি :

(১) আয়াতের শুরুতে جآىءَ (জীআ) যেভাবে লিখিত হয়েছে, তাতে হরকত না থাকলে 'জাআ' পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এটাই রীতি হয়ে আছে।

(২) যেমন সূরা নমলের ২১ আয়াতটির একটি শব্দ লিখিত হয়েছে أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ 'অথবা আমি তাকে অবশ্যই যবহ করব' *(নমল ২৭/২১)*। এখানে 'হামযাহ' ও 'যাল'-এর মাঝখানে একটি 'আলিফ' রয়েছে। যেটি অতিরিক্ত। সাধারণভাবে পড়লে لا أذبحنه পড়তে হয়। যার অর্থ হবে 'আমি তাকে যবহ করব না'। ফলে অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাবে। অথচ এভাবে লেখাই রীতি।

(৩) সূরা কাহফের ৯৭ আয়াতে এসেছে, فَمَا اسْطَاعُوْا أَنْ يَظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا 'ফলে ইয়াজূজ-মাজূজ তা অতিক্রম করতে পারল না এবং ভেদ করতেও সক্ষম হলো না' *(কাহফ ১৮/৯৭)*। এখানে প্রথমটি فَمَا اسْطَاعُوْا লেখা হয়েছে। অথচ ছরফের নিয়মানুযায়ী হওয়া উচিৎ ছিল فَمَا اسْتَطَاعُوْا কিন্তু সেটা হয়নি। অতএব এখানে এটাই রীতি।

(৪) অমনিভাবে أَكْرَمَنِ وَأَهَانَنِ-এর *(ফজর ১৫, ১৬)* শেষে نِيْ-এর বদলে نِ লেখাই রীতি। অতএব কুরআনের ব্যাখ্যা জানার আগে আরবদের লিখন রীতি ও উচ্চারণ পদ্ধতির জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। ইমাম কুরতুবী বলেন, والسنة ألا يخالف خط المصحف لأنه إجماع الصحابة 'সুন্নাত হ'ল কুরআনের লিখন রীতির কোনরূপ পরিবর্তন না করা। কেননা এটা হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের ইজমা অর্থাৎ সর্বসম্মত রীতি' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা ফজর ১৫-১৬)*।

(২৪) يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ 'সেদিন মানুষ বলবে, হায়! যদি আমার এই জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু (নেক আমল) পাঠিয়ে দিতাম'!

এই সময় কাফের ও পাপী মানুষ কেবলই অনুতাপ করবে, আর বলবে হায়! দুনিয়ায় থাকতে যদি দৃঢ় বিশ্বাস করতাম ও সে অনুযায়ী নেক আমল করতাম, তাহ'লে আজ তার সুফল পেতাম। উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাসী কাফেরও দুনিয়াতে অনেক সময় সৎকর্ম করে থাকে। কিন্তু তা আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হবে না। কারণ সে তো আল্লাহকেই বিশ্বাস করত না। তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করতো না। তাঁর প্রেরিত ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করত না। অতএব সে কিভাবে আল্লাহ্র রহমত পেতে পারে? ফলে অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে তার কোন সৎকর্ম ঐদিন কবুল করা হবে না' *(তওবা ৯/১৭; কাহফ ১৮/১০৩-১০৫)*। যেমন পিতাকে অস্বীকারকারী পুত্রের কোন সৎকর্ম পিতার নিকটে গৃহীত হয় না।

(২৫) فَيَوْمَئِذ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ 'অতঃপর সেদিন আল্লাহ্র শাস্তির ন্যায় শাস্তি কেউ দিবে না'। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন অবাধ্যদের শাস্তি আল্লাহ যেভাবে দিবেন, তার চাইতে কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কারু নেই। কেননা দুনিয়ার যেকোন কঠোরতম শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় কিছুই নয়। এখানে عذاب অর্থ تعذيب 'কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়া'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ 'আমার বান্দাদের সংবাদ দাও যে, নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। 'এবং আমার শাস্তিও অতীব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(হিজর ১৫/৪৯-৫০)*।

(২৬) وَلاَ يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ 'এবং তাঁর বাঁধনের চাইতে শক্ত বাঁধন কেউ দিবে না'। অর্থাৎ কাফের, ফাসেক, অত্যাচারী ও পাপীদের লৌহ-শৃংখলে কঠিনভাবে বেঁধে যে শাস্তি দেওয়া হবে, অতঃপর জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে, সে শাস্তির কোন তুলনা নেই। দুনিয়ার কঠিন বাঁধন ক্বিয়ামতের দিনের ঐ শক্ত বাঁধনের শাস্তির তুলনায় কিছুই নয়। এখানে وَثَاقٌ অর্থ إِيْثَاقٌ 'কঠিনভাবে বাঁধা'।

(২৭) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ 'হে প্রশান্ত আত্মা'।

الْمُطْمَئِنَّةُ অর্থ الآمنة 'শান্ত'। যে অন্তর কোন ভীতি বা দুঃখে দিশাহারা হয় না। বরং আল্লাহকে স্মরণ করে সর্বদা স্থির, প্রশান্ত ও দৃঢ়চিত্ত থাকে।

পূর্বের আয়াতগুলিতে (২৩-২৬) অবিশ্বাসী কাফের-মুনাফিকদের কঠিন শাস্তির বর্ণনা শেষে এবার (২৭-৩০ আয়াতে) প্রকৃত বিশ্বাসী মুমিন নর-নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে মুমিনদের হৃদয়কে 'নফ্সে মুত্বমাইন্নাহ' বা প্রশান্ত আত্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ অবিশ্বাসীরা যতই দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস ও বিত্ত-বৈভবের মধ্যে জীবন যাপন করুক না কেন, তারা হৃদয়ের প্রশান্তি হ'তে বঞ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি সুখে-দুখে সর্বদা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকেন। এই সকল ঈমানদারগণের আলোকিত হৃদয়কে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ এখানে 'প্রশান্ত আত্মা' বলে সম্বোধন করেছেন। যা ঈমানদার নর-নারীর জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এক অতীব স্নেহময় আহ্বান। এর চাইতে মূল্যবান উপঢৌকন মুমিনের জন্য আর কি হ'তে পারে?

বস্তুতঃ দুনিয়াপ্রেমের শয়তানী ধোঁকার অন্ধকার কেটে গিয়ে আল্লাহপ্রেমের জ্যোতি যখন হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হয়, তখন ঈমানের দ্যুতিতে মুমিন এতই শক্তি লাভ করে যে, জীবনকে সে তুচ্ছ মনে করে। প্রেমাস্পদ আল্লাহ্র সাথে মিলনের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফেরাঊনের কঠোরতম শাস্তিকে তাই তুচ্ছ জ্ঞান করে তার সতীসাধ্বী স্ত্রী আসিয়া মৃত্যুর

আগে আকুল কণ্ঠে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন, رَبِّ ابْنِ لِيْ عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ– 'হে আমার পালনকর্তা! আমার জন্য তোমার নিকটে জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে ফেরাঊন ও তার দুষ্কর্ম হ'তে এবং এই যালেম কওমের হাত থেকে মুক্তি দান কর' *(তাহরীম ৬৬/১১)*।

আল্লাহ্র ভালোবাসার নিকটে স্বামীর ভালোবাসা ও তার বিশাল বিত্ত-বৈভব ও প্রাসাদসমূহ আসিয়ার নিকটে তুচ্ছ মনে হয়েছিল। তাই উপুড় করে শুইয়ে চার হাত-পায়ে মোটা মোটা লোহার পেরেক মেরে পিঠের উপর বিশালকায় ভারি লোহার চাকি গড়িয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে দেয়ার মত নিষ্ঠুরতম শাস্তিকে তিনি হাসিমুখে বরণ করে নেন। কেননা এই শাস্তি তো কয়েক মিনিটের জন্য। তারপরেই তো জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি আর শান্তি।

একই ধরনের উক্তি দেখতে পাওয়া যায় ফেরাঊনের জাদুকরদের মুখে। যখন মূসা (আঃ)-এর মু'জেযার কাছে জাদুবিদ্যা পরাস্ত হয় এবং তারা আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনে। অতঃপর ফেরাঊন তাদেরকে কঠোর হুমকি দিয়ে বলেন, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ– 'আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব টুকরা টুকরা করে। অতঃপর তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করব' *(আ'রাফ ৭/১২৪)*। জওয়াবে সদ্য মুমিন জাদুকরগণ বলে ওঠেন, قَالُوْا لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ 'কোন ক্ষতি নেই। আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের নিকটেই ফিরে যাচ্ছি' *(শো'আরা ২৬/৫০)*। তারা সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে তোমার নিকটে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসাবে মৃত্যু দান কর' *(আ'রাফ ৭/১২৬)*।

কিছুক্ষণ আগেও যারা ফেরাঊনকে 'রব' বলতো, তারাই এখন ফেরাঊনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রকৃত 'রব' আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করল। এটাই হ'ল মা'রেফাত বা অন্তর্দৃষ্টি। যা তারা অর্জন করেছিল মূসা (আঃ)-এর প্রদর্শিত মু'জেযার মাধ্যমে ও আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে। একইভাবে যা দেখতে পেয়েছিলেন ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া। জাদুকরদের প্রতি ফেরাঊনের কঠোর শাস্তিদানের কথা শোনার পরপরই ঈমানী তেজে তেজিয়ান এই মহীয়সী মহিলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ্র উপরে তাঁর ঈমান ঘোষণা করেন। ফলে তাঁর উপরে নেমে আসে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম শাস্তি, যাতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর তাঁর পালিত কন্যা মাশেত্বাকেও একই অপরাধে একই শাস্তি বরণ করতে হয় *(কুরতুবী)*।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবী ইয়াসির ও তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া, খোবায়েব ও আছেমসহ যুগে যুগে বহু ঈমানদার মহান ব্যক্তির মর্মান্তিক শাহাদত বরণের মধ্যে আমরা এই অতুলনীয় ঈমান ও মা'রেফাতের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। যেকারণে তাঁরা আল্লাহ্র শাস্তির মোকাবেলায় দুনিয়ার শাস্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শক্তি ও সাহস দাও এবং তোমার জন্য আমাদেরকে কবুল করে নাও-আমীন!

উল্লেখ্য যে, 'নফস' তিন প্রকার। এক- নফসে মুত্বমাইন্নাহ- প্রশান্ত হৃদয়। দুই- নফসে লাউয়ামাহ- তিরষ্কারকারী আত্মা অর্থাৎ বিবেক এবং তিন- নফসে আম্মারাহ অর্থাৎ অন্যায় কাজে প্ররোচনা দানকারী অন্তর। শেষোক্ত অন্তরটি সর্বদা শয়তানের তাবেদারী করে। এর সঙ্গে সর্বদা লড়াই করেই টিকে থাকতে হয়। বান্দাকে তাই সর্বদা এমন পরিবেশে থাকতে হয় যাতে নফসে আম্মারাহ উত্তপ্ত হ'তে না পারে। সরকার ও সমাজনেতাদের পক্ষ থেকে এরূপ শান্ত সামাজিক পরিবেশ তৈরী করতে হয়, যাতে রিপুর তাড়নে মানুষ বিপথে না যায়।

বস্তুতঃ রিপুকে দাবিয়ে রাখাই হ'ল নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। এই জিহাদে জিততে পারলেই বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হয়। আর শয়তানকে দাবিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হ'ল আল্লাহকে স্মরণ করা। কেননা আল্লাহকে স্মরণ করলেই শয়তান পালিয়ে যায় এবং আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ– 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্র স্মরণ দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখো কেবল আল্লাহ্র স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে থাকে' *(রা'দ ১৩/২৮)*।

(২৮) اِرْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 'ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়'। অর্থাৎ যেখান থেকে হে আত্মা! তুমি এসেছিলে, সেখানেই ফিরে চল প্রশান্তচিত্তে। এটি নেককার ব্যক্তির মৃত্যুকালে বলা হবে।

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً অর্থ راضية بما أوتيت 'যা তাকে দেওয়া হয়েছে, তাতে সে সন্তুষ্ট'। مرضية عند ربها 'তার প্রভুর নিকটে সে সন্তোষভাজন বা প্রিয়পাত্র' *(ক্বাসেমী)*।

ইবনু যায়েদ বলেন, প্রশান্ত হৃদয় এজন্য বলা হয়েছে যে, তা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয় মৃত্যুকালে, পুনরুত্থানকালে এবং হাশরের দিবসে'*(কুরতুবী)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুমিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার নিকটে রহমতের ফেরেশতারা আসে। যাদের সঙ্গে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা এসে মুমিনের রূহকে বলেন, اُخْرُجِى أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 'বেরিয়ে এসো হে পবিত্র আত্মা! সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়'। তখন রূহ বেরিয়ে আসে মিশকে আম্বরের সুগন্ধিযুক্ত সাদা

রেশমের রুমালে নেওয়া অবস্থায়। এমতাবস্থায় আসমানের দরজায় পৌঁছলে সেখানকার ফেরেশতারা তাকে অতি আনন্দের সাথে সম্ভাষণ জানায় ও দরজা খুলে দেয়। পক্ষান্তরে কাফির-মুনাফিকের রূহ বের করার জন্য আল্লাহ দু'জন আযাবের ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন। তারা শক্ত চট দিয়ে তার দুর্গন্ধযুক্ত রূহ টেনে বের করে এবং বলে, তুমি বেরিয়ে এসো অসন্তুষ্ট ও অসন্তোষভাজন (ساخطة مسخوطة) অবস্থায় আল্লাহ্র আযাবের দিকে। অতঃপর তাকে যমীনের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, কি বিশ্রী দুর্গন্ধ এটি! অতঃপর তা কাফিরদের রূহের মধ্যে নেওয়া হয় (সিজ্জীনে)।[২৬৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াত দু'টি যখন নাযিল হয়, তখন আবুবকর (রাঃ) সেখানে বসা ছিলেন। তিনি বলে ওঠেন, ما أَحْسَنَ هذا يا رسولَ الله! 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এটি কতই না সুন্দর কথা'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمَلَكَ سَيَقُوْلُ لَكَ هَذَا عِندَ الْمَوْتِ 'ফেরেশতা সত্বর এটা তোমাকে বলবেন মৃত্যুকালে হে আবুবকর'! ইবনু কাছীর বর্ণনাটিকে 'মুরসাল হাসান' বলেছেন।

اِرْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ 'ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে' বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, রূহটি তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছিল এবং তার কাছেই তাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে নফস বা রূহ হ'ল ভিডিও ক্যামেরার মত। যা আল্লাহ মানবদেহের অভ্যন্তরে ফিট করে দিয়েছেন। যতক্ষণ মানুষ জেগে থাকে, ততক্ষণ তার ভিতর-বাহির সকল কর্মের ছবি ঐ সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়। যদি বান্দা খালেছ অন্তরে তওবা করে, তাহ'লে আল্লাহ ঐ পাপের রেকর্ডটুকু মুছে দেন। নইলে ওটা থেকে যায়। অতঃপর যখন আল্লাহ্র হুকুমে রূহ মানুষের দেহ পিঞ্জর ছেড়ে ইল্লিয়ীন অথবা সিজ্জীনে ফিরে যায়, তখন পচনশীল দেহটা দুনিয়ায় পড়ে থাকে। কিন্তু তার সারা জীবনের কর্মের রেকর্ড তার রূহের সাথে আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যায়। যেমন বিমান ধ্বংস হয়ে গেলেও তার ব্ল্যাক বক্স (Black Box) থেকে তার সব রেকর্ড পাওয়া যায়। রূহের কোন মৃত্যু নেই। ক্বিয়ামতের দিন নেককার রূহগুলি নেককার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করে জান্নাতে স্থায়ী হয়ে যাবে।

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ্র উপরে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্র নিকটে বান্দা সন্তোষভাজন। যেমন বলা হয়েছে, رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

২৬৮. আহমাদ, নাসাঈ হা/১৮৩৩, মিশকাত হা/১৬২৯ 'জানায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩।

'আল্লাহ তাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র উপরে সন্তুষ্ট হয়েছে। এই সন্তুষ্টি কেবল তার জন্য যে তার পালনকর্তাকে ভয় করেছে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৮)*।

(২৯-৩০) فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ، وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ 'অতঃপর (সেখানে গিয়ে) প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে'। 'এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে'। এটি ক্বিয়ামতের দিন বিচার শেষে বলা হবে।

فِيْ عِبَادِيْ 'আমার বান্দাদের মধ্যে' অর্থ فى الصالحين من عبادى 'আমার নেককার বান্দাগণের মধ্যে' *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِيْنَ- 'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমরা তাদের প্রবেশ করাবো সৎকর্মশীলদের মধ্যে' *(আনকাবূত ২৯/৯)*।

বিগত নবীগণের অনেকে এজন্য দো'আ করে গেছেন। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেন, رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْماً وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ 'হে প্রভু! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(শো'আরা ২৬/৮৩)*। একই দো'আ হযরত ইউসুফ (আঃ) করেছিলেন, تَوَفَّنِيْ مُسْلِماً وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ 'আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(ইউসুফ ১২/১০১)*। অনুরূপ দো'আ হযরত সুলায়মান (আঃ) করেছেন, وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ 'এবং আমাকে স্বীয় অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নমল ২৭/১৯)*।

এতে বুঝা যায় যে, সৎসঙ্গ একটি বিরাট নে'মত, যা নবীগণও কামনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 'ক্বিয়ামতের দিন ব্যক্তি তার সঙ্গেই থাকবে, যাকে সে দুনিয়াতে ভালবাসতো'।[২৬৯] কবি শেখ সা'দী বলেন,

صحبت صالح ترا صالح كند + صحبت طالح ترا طالح كند

'সৎসঙ্গ তোমাকে সৎ বানাবে। আর অসৎ সঙ্গ তোমাকে অসৎ বানাবে'।

অতএব এখানে فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ বলে আল্লাহপাক ক্বিয়ামতের দিন পবিত্র আত্মাগুলিকে নেককার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করতে বলবেন। অতঃপর বলবেন,

২৬৯. বুখারী হা/৬১৬৯, মুসলিম হা/২৬৪০; মিশকাত হা/৫০০৮।

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ 'তুমি আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'। অর্থাৎ নেককার বান্দাগণের সাথে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর *(কুরতুবী)*। এখানে 'আমার জান্নাত' বলা হয়েছে জান্নাতের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য। কেননা এটা কেবল একটি শান্তির বাগিচা নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির স্থল।

ইবনু কাছীর বলেন, একথাগুলি ফেরেশতাগণ বলবেন নেককার বান্দার মৃত্যুকালে, পুনরুত্থানকালে এবং ক্বিয়ামতের পর জান্নাতে প্রবেশকালে' *(ইবনু কাছীর)*। 'আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর'- আমীন!

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমনসব বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি। যদি তোমরা চাও তবে পাঠ কর, فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ 'কেউ জানেনা তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ চক্ষু শীতলকারী কত বস্তু তাদের জন্য লুক্কায়িত আছে'।[২৭০] আল্লাহ বলেন, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ 'যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হ'ল এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হ'ল, সে সফলকাম হ'ল' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

সারকথা :

পার্থিব জীবনের বিত্ত-বৈভব, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না। প্রকৃত সুখী কেবল তিনি, যিনি সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে সন্তুষ্ট থাকেন এবং আল্লাহ তাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখেন।

২৭০. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১২; সাজদাহ ৩২/১৭।

সূরা বালাদ (নগরী)

সূরা ক্বাফ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৯০, আয়াত ২০, শব্দ ৮২, বর্ণ ৩৩৫।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴿١﴾

(১) আমি শপথ করছি এই নগরীর;

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴿٢﴾

(২) এমতাবস্থায় যে তুমি এই নগরীতে অবস্থানকারী।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ﴿٣﴾

(৩) শপথ জনকের ও যা সে জন্ম দেয়।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۗ﴿٤﴾

(৪) নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রমনির্ভর রূপে।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ﴿٥﴾

(৫) সে কি মনে করে যে, তার উপরে কেউ কখনো ক্ষমতাবান হবে না?

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۗ﴿٦﴾

(৬) সে বলে যে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۗ﴿٧﴾

(৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ﴿٨﴾

(৮) আমরা কি দেইনি তাকে দু'টি চোখ?

وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۙ﴿٩﴾

(৯) এবং জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট?

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ﴿١٠﴾

(১০) আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দু'টি পথ ।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۖ﴿١١﴾

(১১) কিন্তু সে তো গিরিসংকটে প্রবেশ করেনি।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۗ﴿١٢﴾

(১২) তুমি কি জানো গিরিসংকট কি?

فَكُّ رَقَبَةٍ ۙ﴿١٣﴾

(১৩) তা হ'ল দাসমুক্তি।

اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۙ﴿١٤﴾

(১৪) অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান করা

يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ﴿١٥﴾

(১৫) ইয়াতীম নিকটাত্মীয়কে।

اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۗ﴿١٦﴾

(১৬) অথবা ভূলুণ্ঠিত অভাবগ্রস্তকে।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ⑰

(১৭) অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দেয় ও পরস্পরের প্রতি দয়ার উপদেশ দেয়।

أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑱

(১৮) এরাই হ'ল ডান সারির মানুষ।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ⑲

(১৯) আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারা হ'ল বাম সারির লোক।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ⑳

(২০) তাদের উপরে থাকবে পরিবেষ্টিত অগ্নি।

বিষয়বস্তু :

সূরাটিতে প্রধানতঃ দু'টি বিষয় আলোচিত হয়েছে।-

১- তিনটি বিষয়ে শপথ করে আল্লাহ বলছেন যে, মানুষকে অবশ্যই শ্রমনির্ভর প্রাণী হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব তাকে কষ্ট করে জীবনের ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করতে হবে *(১-১৬ আয়াত)*।

২- কষ্টের ফলাফল হিসাবে হয় সে সৌভাগ্যবান হবে, নয় হতভাগ্য হবে *(১৭-২০ আয়াত)*।

তাফসীর :

(১) لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ 'আমি শপথ করছি এই নগরীর'। অর্থ أنا أقسم بهذا البلد 'আমি এই নগরীর শপথ করে বলছি'।

বাক্যের শুরুতে لاَ 'না' বোধক নয়। বরং 'অতিরিক্ত' হিসাবে আনা হয়েছে তম্বীহ ও তাকীদের জন্য এবং প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য। অর্থাৎ তোমরা যা বলছ, তা ঠিক নয়। বরং আমি শপথ করে যা বলছি, সেটাই ঠিক। শপথের সাথে لاَ -এর ব্যবহার আরবী বাকরীতিতে খুবই প্রসিদ্ধ।

'এই নগরী' বলতে মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ 'শপথ এই নিরাপদ নগরীর' *(তীন ৯৫/৩)*। অন্যত্র এই শহরকে সরাসরি 'মক্কা' বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ 'নিশ্চয়ই প্রথম গৃহ যা মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা হ'ল

ঐ গৃহ যা মক্কায় অবস্থিত। যা বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক' *(আলে ইমরান ৩/৯৬)*। প্রথম গৃহ বলতে কা'বা গৃহকে বুঝানো হয়েছে।[২৭১] 'বাক্কা' মক্কার প্রসিদ্ধ নামসমূহের অন্যতম। لأنها تَبُكُّ أعناق الجبابرة 'কেননা এই গৃহ অত্যাচারীদের ঘাড় মটকায়, মানুষ এখানে মুখাপেক্ষী হয়, ক্রন্দন করে, ভিড় করে *(ইবনু কাছীর)*। অন্য আয়াতে মক্কাকে 'উম্মুল ক্বোরা' বা সকল নগরীর উৎস বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 'এভাবে আমরা তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি। যাতে তুমি মক্কা ও তার চতুষ্পার্শ্বের লোকদের সতর্ক করতে পারো... *(শূরা ৪২/৭; আন'আম ৬/৯২)*। এই শপথের দ্বারা পৃথিবীর নাভীমূল হিসাবে মক্কা নগরীর উচ্চমর্যাদাকে আরও সমুন্নত করা হয়েছে। কেননা শপথকারীর নিকট শপথকৃত বস্তুর মর্যাদা অবশ্যই উন্নত থাকে।

(২) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ 'এমতাবস্থায় যে তুমি এই নগরীতে অবস্থানকারী'। অর্থাৎ আমি এই মহান নগরীর শপথ করছি যার হুরমত ও উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে তুমি অবগত। সেই সাথে তুমি এখানকার বাসিন্দা হওয়ায় এর সম্মান আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতের শপথকে অত্র আয়াতের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদাকে আরও উন্নত করা হয়েছে। যেন তাঁর জন্যই শপথ করা হয়েছে। এর মধ্যে কুরায়েশ নেতাদের মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর মহান মর্যাদাকে বুঝতে পারেনি। বরং তারা উল্টা তাঁকে বহিষ্কার করার ষড়যন্ত্র করছে। অথচ তিনিই এ নগরীতে বসবাসের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁর মাধ্যমেই এ নগরীর মর্যাদা পূর্ণতা পেয়েছে' *(ক্বাসেমী)*।

الحِلُّ শব্দটি صفت অথবা مصدر যার অর্থ اَلْحَالُّ 'অবস্থানকারী'। এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কুরতুবী ও ইবনু কাছীর সহ অনেক বিদ্বান حِلٌّ অর্থ مُحِلٌّ 'হালালকারী' বলেছেন। তখন এর ব্যাখ্যা হবে محل في المستقبل 'তুমি ভবিষ্যতে হালালকারী হবে'। যেমন বলা হয়েছে, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে। যেমন তারাও মৃত্যুবরণ করেছে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। এক্ষণে অর্থ হবে ভবিষ্যতে[২৭২] মক্কা বিজয়ের দিন কয়েকজন কাফেরের রক্তপাত তোমার জন্য কিছুসময়ের জন্য হালাল করা হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) ঐদিন বলেছিলেন, অতঃপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই নগরীতে সকল প্রকার রক্তপাত, বৃক্ষকর্তন, পশু শিকার ইত্যাদি হারাম করা হ'ল।[২৭৩] এর মাধ্যমে

---

২৭১. আহমাদ হা/২১৩৭১, বুখারী হা/৩৩৬৬, মুসলিম হা/৫২০।
২৭২. ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মোতাবেক ৬৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মঙ্গলবার সকালে।
২৭৩. বুখারী হা/১৮৩৪, মুসলিম হা/১৩৫৩, মিশকাত হা/২৭১৫ 'মানাসিক' অধ্যায়-১০, 'মক্কার হারাম' অনুচ্ছেদ-১৪।

রাসূল (ছাঃ)-কে আগাম মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এর মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা নিহিত রয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি দূরবর্তী। যেদিকে চিন্তা দ্রুত ধাবিত হয় না *(ক্বাসেমী)*।

(৩) وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ 'শপথ জনকের ও যা সে জন্ম দেয়'।

এখানে পিতা ও সন্তান বলতে আদম ও বনু আদমকে বুঝানো হতে পারে। যেমন প্রথমে সকল নগরীর উৎস বা উম্মুল ক্বোরা হিসাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে। তেমনি মানবজাতির উৎস বা আদি পিতা হিসাবে আদম (আঃ)-এর শপথ করা হয়েছে। অতঃপর বিগত ও অনাগত সকল আদম সন্তানের শপথ করা হয়েছে। অথবা সকল যুগের পিতা ও সন্তানদের শপথ করে বলা হচ্ছে-

(৪) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِيْ كَبَدٍ 'নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রমনির্ভর রূপে'।

এটি পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের জওয়াব। আল্লাহ তাঁর যেকোন সৃষ্টির শপথ করে থাকেন। আর এর দ্বারা উক্ত সৃষ্টির মর্যাদা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সূরার শুরুতে মক্কা নগরী, অতঃপর আদম ও বনু আদম বা পিতা ও সন্তানদের শপথ করে, অতঃপর لَ ও قَدْ সহ মোট তিনটি তাকীদ সহযোগে আল্লাহ বলছেন যে, আমরা অবশ্যই মানুষকে ক্লেশনির্ভর প্রাণীরূপে সৃষ্টি করেছি।

كَبَدٍ অর্থ نصب ومشقة 'কষ্ট ও ক্লেশ'। মানুষ তার মায়ের গর্ভ থেকেই নানাবিধ কষ্ট ও রোগ-পীড়ার সম্মুখীন হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানারূপ বিপদাপদ ও কায়-ক্লেশের মধ্য দিয়ে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। যদিও দৈহিক কষ্ট-দুঃখ অন্য প্রাণীর জীবনেও হয়ে থাকে। তথাপি মানুষের বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে বলার কারণ হ'ল সম্ভবতঃ এই যে, (১) মানুষ হ'ল সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি। যাকে কথা বলার ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। (২) মানুষ একমাত্র প্রাণী যাকে জ্ঞান সম্পদ দান করা হয়েছে। সেকারণ তাকে তার প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। (৩) মানুষের উপলব্ধি ও চেতনাবোধ অন্য সকল প্রাণীর চাইতে বেশী। তাছাড়া যার জ্ঞান ও বিবেকশক্তি যত প্রখর তার চেতনা ও দূরদৃষ্টি তত প্রখর। ফলে পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। (৪) মানুষকে তার সারা জীবনের কর্মের হিসাব ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে দিতে হয়। যা অন্য প্রাণীকে দিতে হয় না। (৫) মানুষের জন্য তার পার্থিব জীবনটা হ'ল পরীক্ষাগার। প্রতি পদে পদে তাকে পরীক্ষা দিয়ে চলতে হয়। তাই মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে এবং তার দায়িত্ববোধকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই এখানে মানুষকে মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে পেশ করা হয়েছে।

হাসান বাছরী অত্র আয়াতটি পাঠ করে বলেন, يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة 'মানুষ দুনিয়াবী মুছীবত সহ্য করে এবং আখেরাতের কষ্ট সমূহের সম্মুখীন হয়'। তিনি একথাও বলেন যে, আনন্দে শুকরিয়া আদায় করা ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করা- এ দু'টি পরীক্ষার কোন একটি থেকে সে কখনো মুক্ত থাকে না *(কুরতুবী)*। পরিশ্রমের বিষয়টি যদি মানুষের এখতিয়ারে থাকত, তাহ'লে সে কখনোই সেটা চাইত না। এতে বুঝা যায় যে, তার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন। যার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার ক্ষমতা মানুষের নেই।

(৫) أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ 'সে কি মনে করে যে, তার উপরে কেউ কখনো ক্ষমতাবান হবে না'?

শক্তিগর্বে স্ফীত অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ ধমকের সুরে কথাগুলি বলেছেন। যেমন বিগত যুগে 'আদ জাতি বলেছিল, مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً 'কে আছে আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী'? *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। অর্থাৎ সেকি ভেবেছে তাকে দমন করার কেউ নেই? অথবা সেকি ভেবেছে ক্বিয়ামত হবে না এবং তার অত্যাচারের বদলা নেওয়া হবে না? কালবী বলেন, বনু জুমাহ (بنو جُمَحٍ) গোত্রের আবুল আশাদ্দায়েন (ابو الأشدين) নামে খ্যাত জনৈক ব্যক্তি দৈহিকভাবে দারুণ শক্তিশালী ছিল। সে একাই দশজনের সমান শক্তি রাখতো। সে ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর ঘোরতর শত্রু। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, وكان من أشد رجال قريش 'ঐ লোকটি ছিল কুরায়েশদের সেরা শক্তিশালী পুরুষদের অন্যতম'। এতদ্ব্যতীত আরও একজন শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচাতো ভাই রুকানা বিন হাশেম বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব। وكان مثلا في البأس والشدة 'যিনি শক্তি ও কঠোরতায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন' *(কুরতুবী)*। অনেকে ধনশালী অলীদ বিন মুগীরাহ প্রমুখের নামও বলেছেন *(তানতাভী)*। যারা নিজেদের শক্তির বড়াই ও ক্ষমতার অহংকারে অন্ধ ছিল এবং রাসূল (ছাঃ)-কে বেতোয়াক্কা করত। এদের সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হ'লেও আয়াতের বক্তব্য সকল যুগের সকল শক্তি মদমত্ত অহংকারী মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতের সারকথা এই যে, বনু আদম কি ভেবেছে যে, তার যুলুম প্রতিরোধের কেউ নেই? সেকি ভেবেছে যে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না? যদিও তার নিজের মধ্যকার কষ্ট ও তা থেকে বাঁচতে না পারার দুর্বলতাই তাকে এবিষয়ে হুঁশিয়ার করার জন্য যথেষ্ট।

(৬) يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً 'সে বলে যে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি'।

لُبَداً অর্থ كَثِيرًا 'বহু'। تَلَبَّدَ الشَّيْئُ অর্থ اجتمع 'জমা হওয়া'। এখানে অর্থ, 'যখন সে ব্যয় করে গর্ব, অহংকার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে' *(ক্বাসেমী)*। এই ব্যয় ইহকাল ও পরকালে তার কোন কাজে আসে না। এটি স্রেফ অপচয় মাত্র। সেকারণ أَهْلَكْتُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ 'আমি ধ্বংস করেছি'। কেননা এই ব্যয় সম্পূর্ণটাই তার বৃথা গেছে। কারণ নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যয় আল্লাহ্র নিকটে উৎকৃষ্ট দান হিসাবে গৃহীত হয় না।

সাধারণতঃ ধনিক শ্রেণীর মধ্যে যারা কৃপণ ও অহংকারী স্বভাবের, তারা যৎকিঞ্চিত খরচ করে বড়াই করে বলে যে, বহু ধন-সম্পদ ব্যয় করলাম। লোক দেখানো ও লোককে শুনানোর উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত এইসব দান আল্লাহ্র নিকটে গৃহীত হয় না। বরং হাদীছে বলা হয়েছে যে, এইসব লোক দেখানো দানশীল ব্যক্তিদের উপুড় করে ফেলে মাটি ঘেঁষে পা ধরে টানতে টানতে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।[২৭৪] কেননা তারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করেনি। বরং দুনিয়াবী স্বার্থে দান করেছিল।

(৭) أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ 'সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?'

অর্থাৎ ধনশালী অহংকারী ব্যক্তিটি কত সম্পদ ব্যয় করেছে এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছে, সে কি ভেবেছে যে কেউ তা দেখেনি? অবশ্যই তা আল্লাহ দেখেছেন। তিনি তার ভিতর-বাহির সব খবর জানেন এবং সবকিছুর হিসাব তিনি নেবেন। তিনি বলেন, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُواْ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র জন্য। তোমাদের মনের মধ্যে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ করো বা গোপন করো, তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ নিবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

ধন-সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ। বান্দাকে তিনি দেন, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতএব মালিকের নির্দেশমত আয়-ব্যয় না করলে সে খেয়ানতকারী হিসাবে উত্থিত হবে এবং যথাযথ শাস্তি ভোগ করবে।

(৮-৯) أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، وَلِسَاناً وَّشَفَتَيْنِ 'আমরা কি তাকে দেইনি দু'টি চোখ'? 'এবং জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট'?

---

২৭৪. মুসলিম হা/১৯০৫, মিশকাত হা/২০৫।

আল্লাহ এখানে মানুষকে দেওয়া তিনটি অত্যন্ত মূল্যবান নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদের চাইতে বহু বহু গুণ মূল্যবান। আর তা হ'ল মানুষের 'দু'টি চোখ', যা দিয়ে সে দেখে ও সৌন্দর্য উপভোগ করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আল্লাহ্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৃষ্টিসমূহ সে পর্যবেক্ষণ করে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ-কোটি মাইল দূরে লুক্কায়িত নক্ষত্ররাজি অবলোকন করে। সাগরগর্ভে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা উত্তোলন করে। এভাবে সে তার দু'চোখের মাধ্যমে আকাশ ও পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টিরাজি স্বচক্ষে দেখে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে ও সেখান থেকে কল্যাণ আহরণ করে।

'জিহ্বার' সাহায্যে সে কথা বলে, খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করে এবং দুই মাড়ির দাঁতের মাঝে খাদ্য ঠেলে দেয়। যাতে তা ভালোভাবে চিবিয়ে হযম করা সহজ হয়। সর্বক্ষণ সরস জিহ্বার সাহায্যে মানুষ তার মনের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে। এছাড়া জিহ্বার লালা তার খাদ্য হযমে সাহায্য করে এবং চর্মের উপরের ক্ষত ও বিষ নাশ করে।

'দু'টি ঠোঁট' মানুষের মুখগহ্বরের দু'টি কপাট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যা তার পর্দা করে ও চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যা মুখের ভিতরে খাদ্যের সঞ্চালন করে এবং শব্দ ও বর্ণের যথাযথ উচ্চারণে সাহায্য করে। যদি ঠোঁট বা জিহ্বা ক্ষণিকের জন্য অসাড় হয়ে যায়, তাহ'লে সে বুঝতে পারে এ দু'টির মূল্য কত বেশী!

উক্ত নে'মতগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা পরীক্ষা করা যে, বান্দা এগুলিকে কল্যাণের পথে ব্যয় করে, না অকল্যাণের পথে ব্যয় করে। সে এগুলিকে আল্লাহ্র পথে পরিচালিত করে, না শয়তানের পথে পরিচালিত করে। এজন্যেই বলা হয়, একটা মানুষ পূর্ণ মুমিন হয় তখনই, যখন তার হাত-পা, চোখ-কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণভাবে মুসলমান হয়। অর্থাৎ ইসলামী শরী'আতের অনুসারী হয়। ইঞ্জিন ভাল থাকলেও পার্টস খারাব হ'লে যেমন ইঞ্জিন চলে না, অনুরূপভাবে ঈমান যত মযবুত হৌক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি শয়তানের তাবেদার হয়, তাহ'লে হৃদয়ের ঐ ঈমানের জ্যোতিটুকুও এক সময় নিভে যাবে। অতএব চোখ কান ইত্যাদিকে কঠোরভাবে হেফাযত করতে হবে, যেন ঐ দু'টি খোলা জানালা দিয়ে কোন নাপাক চিন্তা ভিতরে প্রবেশ না করে এবং তা হৃদয়কে কলুষিত না করে। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً– 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*।

(১০) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দু'টি পথ'।

এখানে দু'টি পথ বলতে ভাল ও মন্দের দু'টি পথ বুঝানো হয়েছে। النجد অর্থ العلو 'উচ্চভূমি'। তেহামা অঞ্চলের চাইতে উঁচু এলাকা হওয়ার কারণে হেজাযের 'নাজদ' প্রদেশকে 'নাজদ' (النجد) বলা হয় *(কুরতুবী)*। অতএব النجدان অর্থ الطريقان العاليان

‘উঁচু দু’টি পথ’। অর্থাৎ ভাল ও মন্দের দু’টি পথই বান্দার সামনে উন্মুক্ত থাকে। কোনটাই গোপন নয়। সে যেটা ইচ্ছা অবলম্বন করতে পারে।

اَلنَّجْدَيْنِ বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ভাল ও মন্দ দু’টি পথেই কষ্ট ও মুছীবত রয়েছে। এটা নয় যে, মন্দ পথ ভাল পথের চাইতে সহজ। যেমনটি ধারণা করা হয়ে থাকে। দু’টি পথের মধ্যে উত্তমটি বেছে নেবার মত জ্ঞান-ক্ষমতা আল্লাহ মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِراً وَّإِمَّا كَفُوْرًا ‘আমরা মানুষকে রাস্তা বাৎলে দিয়েছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ বান্দা হ’তে পারে, অথবা অকৃতজ্ঞ হ’তে পারে’ *(দাহর ৭৬/৩)*।

(১১) فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ‘কিন্তু সে তো গিরিসংকটে প্রবেশ করেনি?’

الْعَقَبَةَ অর্থ الطريق الوعرة فى الجبل ‘দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা’ *(ক্বাসেমী)*। الاقتحام এসেছে القحمة থেকে। অর্থ الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة ‘অনেক কষ্টে প্রবেশ করা ও অতিক্রম করা’ *(তানতাভী)*। আয়াতে اقتحام العقبة বা ‘গিরিসংকটে প্রবেশ করা’ কথাটি প্রবাদ (ضرب مَثَل) হিসাবে এসেছে। যার দ্বারা ‘মহৎ কর্ম’ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শত্রুতার পিছনে পয়সা ব্যয় না করে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছে? *(কুরতুবী)*। আর মহৎ কর্ম সবসময় কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। সেকারণ আল্লাহ প্রতিটি সৎকর্মের নেকী ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করেন।[২৭৫] এমনকি আল্লাহ যাকে খুশী অধিক অধিক বর্ধিত করে থাকেন *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*।

কাফের-ফাসেকরা নিজেদের বিলাস-ব্যসনে ও স্রেফ বাজে আমোদ-ফূর্তির পিছনে পানির মত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। অথচ মানবকল্যাণে তারা ব্যয় করতে কার্পণ্য করে। যদি তারা মহৎ কর্ম সাধন করত, তাহ’লে নেক আমলের বিনিময়ে তারা জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ লাভে ধন্য হ’ত। সৎকর্ম সম্পাদন করাকে উঁচু পাহাড়ী পথ অতিক্রম করার সাথে তুলনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমল করা কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ফলাফল সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী হয়। এতে কেবল লাভ আর লাভ। লোকসানের কোন সুযোগ নেই। নেক আমল করতে গেলে নফসরূপী শয়তানের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়। উঁচু পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে গেলেও তেমনি কঠোর অভিযান করতে হয়। কিন্তু কাফের ও দুনিয়াপূজারী লোকেরা এটা করতে চায় না। সেকারণ আল্লাহ বলেন, فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ‘তারা তো গিরিসংকটে প্রবেশ করেনি’।

---

২৭৫. বুখারী হা/৫৯২৭, ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮; মিশকাত হা/১৯৫৯।

لاَ এখানে একবার এসেছে। অথচ فعل ماضى (অতীত ক্রিয়া)-এর পূর্বে বা এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পুনরায় আসে। যেমন فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩১)*, فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ *(বাক্বারাহ ২/৩৮)* প্রভৃতি। তবে আরবরা একবার এনে থাকে সমার্থবোধক আরেকটি বাক্য বুঝানোর জন্য। অতএব পরবর্তী বাক্য এর ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে বলা যেতে পারে। তখন فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ অর্থ হবে, لاَ فَكَّ رَقَبَةً وَلاَ أَطْعَمَ مِسْكِيْنًا وَلاَ آمَنَ فَكَيْفَ يُجَاوِزُ الْعَقَبَةَ؟ 'তারা দাস মুক্ত করেনি, মিসকীনকে খাওয়ায়নি বা ঈমান আনেনি, তাহ'লে কিভাবে তারা গিরিসংকট অতিক্রম করবে'? *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*।

(১২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 'তুমি কি জানো গিরিসংকট কি?

وَمَا أَدْرَاكَ অর্থ وَمَا أَعْلَمَكَ 'কোন্ বস্তু তোমাকে জানাবে'?। এর মাধ্যমে দ্বীনী আমলের উচ্চ মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। مَا الْعَقَبَةُ অর্থ مَا اقْتِحَامُ الْعَقَبَةِ؟ 'গিরিসংকটে প্রবেশ করাটা কী?' প্রশ্নের আকারে বলার উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্র নিকট সৎকর্মের উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি শ্রোতার হৃদয়ে প্রোথিত করে দেওয়া *(ক্বাসেমী)*। সুফিয়ান বিন ওয়ায়না বলেন, 'যখন কোন বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَدْرَاكَ তখন তিনি সে বিষয়টি জানিয়ে দেন। আর যখন বলেন, وَمَا يُدْرِيْكَ তখন সে বিষয়টি জানিয়ে দেন না' *(কুরতুবী)*। যেমন এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা 'আবাসা ৩ আয়াতে জানিয়ে দেননি।

অতঃপর উদাহরণ স্বরূপ এখানে পরপর তিনটি ঘাঁটি তথা নেক আমলের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্র নিকট খুবই মর্যাদাপূর্ণ। যেমন-

(১৩) فَكُّ رَقَبَةٍ 'তা হ'ল দাসমুক্তি'।

অর্থ هِيَ فَكُّ رَقَبَةٍ 'তা হ'ল দাসমুক্তি'। এখানে هِيَ 'মুবতাদা' উহ্য রয়েছে। 'দাসমুক্তি' দু'ধরনের হ'তে পারে। এক- ক্রীতদাসমুক্তি। দুই- কয়েদীমুক্তি। যেমন আল্লাহ সৎকর্মশীলদের গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন, وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا 'তারা আল্লাহ্র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও কয়েদীদের আহার্য প্রদান করে' *(দাহর ৭৬/৮)*।

আলোচ্য আয়াতে উদাহরণ স্বরূপ প্রথম ঘাঁটির কথা বলা হয়েছে। আর তা হ'ল 'দাসমুক্তি'। জাহেলী আরবে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হ'ত। এতে তাদের স্বাধীন সত্তা বিলীন হয়ে যেত। সারা জীবন তাদের ও তাদের সন্তানাদিকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ

থাকতে হ'ত। এই অবস্থা তৎকালীন বিশ্বে প্রায় সর্বত্র চালু ছিল। ইসলাম এটাকে সেযুগে মানবতার বিরুদ্ধে এক নম্বরের অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছে এবং এটিকে সমাজ থেকে উৎখাতের চেষ্টা করেছে। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এই নিবর্তনমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে এক হুকুমে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ইসলাম একে সুকৌশলে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে এবং দাস-দাসী মুক্ত করাকে সর্বাধিক পুণ্যের কাজ হিসাবে ঘোষণা করেছে। ফলে ইসলাম কবুলকারীদের পরিবারসমূহ যেমন দাস-দাসী থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তেমনি হযরত আবুবকর, হযরত ওছমান প্রমুখ সচ্ছল ছাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের ঘরে নির্যাতিত বহু দাস-দাসীকে অর্থের বিনিময়ে খরিদ করে নিঃস্বার্থভাবে স্রেফ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুক্ত করে দেন। এটি যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও আয়াসসাধ্য নেক আমল, তাই এটাকেই পাহাড়ের প্রথম উঁচু ঘাঁটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার সোপান বেয়ে মুমিন নর-নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِه– 'যে ব্যক্তি একজন গোলামকে মুক্ত করল, আল্লাহ তাকে তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে একটি অঙ্গকে, এমনকি তার গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে গুপ্তাঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন'।[২৭৬] বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল عَلِّمْنِى عَمَلاً يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ 'আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, যদি তুমি কথা সংক্ষেপ কর, তাহ'লে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। তুমি একটি দাস মুক্ত কর'।[২৭৭]

কোন কোন দেশে আজও দাসপ্রথা চালু আছে। অন্যত্র প্রকাশ্যভাবে চালু না থাকলেও বেনামীতে চালু আছে। তাছাড়া বিদেশে যেসব নারী গৃহকর্মী হিসাবে চাকুরী নিয়ে যায়, তাদের অধিকাংশ ক্রীতদাসীর মত ব্যবহৃত হয় বলে জানা যায়। স্বদেশেই কত গৃহকর্মী এভাবে নির্যাতিতা হচ্ছে, তার খবর কে রাখে?

দাসপ্রথা হারাম করা হয়নি কেন?

ইসলাম দাসপ্রথা কেন এক কথায় হারাম ঘোষণা করেনি? তার জবাব এই যে, **প্রথমতঃ** সে যুগে এটা ছিল গোটা দুনিয়ার স্বীকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক রীতি। এটাকে কেউ অবাঞ্ছিত বলে ধারণা করত না। যুদ্ধ ও হানাহানির কারণে সবলদের হাতে দুর্বলরা সর্বদা নির্যাতিত ও গৃহহারা হ'ত। মরু অঞ্চলে সহজে আশ্রয় ও রূযি পাওয়া দুষ্কর ছিল। তাই গোলামীকেই তারা নিরাপদ মনে করত। প্রধানতঃ পশু পালনে ও ফসল উৎপাদনে তারা

২৭৬. বুখারী হা/২৫১৭, ৬৭১৫, মুসলিম হা/১৫০৯; মিশকাত হা/৩৩৮২।
২৭৭. বায়হাক্বী-শো'আব; মিশকাত হা/৩৩৮৪, সনদ ছহীহ।

ব্যবহৃত হ'ত। ফলে ধনী ও দরিদ্র উভয়ের স্বার্থ এখানে যুক্ত ছিল। তাই মদ নিষিদ্ধের চাইতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন ছিল এটা নিষিদ্ধের জন্য। সেকারণ ইসলাম এমন মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কিংবা মুক্তিপণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে সব দাসই মুক্ত হয়ে যায় এবং পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সমস্যাটি মানব সমাজ থেকে কোনরূপ যবরদস্তি ছাড়াই চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। **দ্বিতীয়তঃ** ইসলাম দাস ও মনিবে যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে, তাতে মানবিক ও সামাজিক উভয় দিক দিয়ে দাসমুক্তির স্থায়ী ভিত রচিত হয়েছে। এভাবে ইসলাম কার্যতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে দাসপ্রথা বিলুপ্তির সূচনা করেছে স্রেফ মানবিক তাকীদে। অথচ এর **১১শ'** বছর পরে **১৮শ'** শতকে ভূমি দাসপ্রথার পূর্ণ বিলুপ্তির পর ইউরোপে তা অনুসৃত হয় কোন মানবিক কারণে নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে। কেননা দাসদের মাধ্যমে মনিবরা যা আয় করত, তার চেয়ে বেশী খরচ হ'ত তাদের ভরণ-পোষণে। তাছাড়া দাসেরা যতদিন বিদ্রোহ-বিপ্লব করে ইউরোপকে বাধ্য না করেছে, ততদিন কর্মক্ষম দাসদের মুক্তি হয়নি। অথচ ইসলাম এটি করেছে মানুষের মানবাধিকার সমুন্নত করার স্বার্থে পরকালীন মুক্তির অনুভূতি জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে। আলোচ্য আয়াত ও বর্ণিত হাদীছ সমূহ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(১৪) أَوْ إِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ 'অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান করা'।

জান্নাতে প্রবেশের জন্য দ্বিতীয় ঘাঁটি হ'ল ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করা। বিশেষ করে যখন খাদ্য-শস্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। مَسْغَبَةٍ অর্থ مجاعة ক্ষুধা। السَغَب والساغب অর্থ ক্ষুধা ও ক্ষুধার্ত *(কুরতুবী)*। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, في يومٍ الطعامُ فيه عزيزٌ 'এমন দিনে যখন খাদ্য থাকে আক্রা বা দুষ্প্রাপ্য' *(ইবনু কাছীর)*। যেকোন সময়ে ক্ষুধার্তকে অন্নদান অত্যন্ত নেকীর কাজ। কিন্তু মঙ্গার সময় এটা আরও অধিক নেকীর কারণ হয়। হাদীছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান করাকে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম বলা হয়েছে।[২৭৮]

(১৫) يَتِيْماً ذَا مَقْرَبَةٍ 'ইয়াতীম নিকটাত্মীয়কে'। অর্থ يتيما ذا قرابة من مات أبوه من قبل أن يبلغ 'ঐ নিকটাত্মীয় শিশু সন্তান, সাবালক হওয়ার আগেই যার পিতা মারা গেছে'।

সাধারণভাবে ইয়াতীমকে অন্নদান করা ও তার প্রতিপালন করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। কিন্তু যখন সে ইয়াতীমটি অসহায় ও নিকটাত্মীয় হয় এবং সময়টি দুর্ভিক্ষের হয়, তখন তার ছওয়াব হয় বর্ণনাতীত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ– 'মিসকীনকে দান করায় ছাদাক্বার নেকী।

---

২৭৮. فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَأَطْعِمِ الجَائِعَ বায়হাক্বী-শো'আব; মিশকাত হা/৩৩৮৪, সনদ ছহীহ।

আর নিকটাত্মীয় হ'লে দ্বিগুণ নেকী: ছাদাক্বার এবং আত্মীয়তার'।[২৭৯] তিনি বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক, নিজের বা অন্যের, জান্নাতে এইরূপ একসাথে থাকব' -একথা বলে তিনি মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলী দু'টি দিয়ে ইশারা করেন'।[২৮০]

(১৬) أَوْ مِسْكِيْناً ذَا مَتْرَبَةٍ 'অথবা ভূলুণ্ঠিত মিসকীনকে'।

المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوتَ عِيَاله 'মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলে যে তার নিজের বা তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারে না'। ذَا مَتْرَبَةٍ অর্থ ذا فقر شديد لاصق بالتراب 'ধূলি ধুসরিত হত দরিদ্র'।

অর্থাৎ এমন অভাবগ্রস্ত যে, মাটিতেই তার বসবাস। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, هو المطروح على الطريق الذى لا بيت له- 'রাস্তায় পতিত ব্যক্তি, যার নিজস্ব কোন ঘর-বাড়ি নেই' *(কুরতুবী)*। ইকরিমা বলেন, هو الفقير المديون المحتاج 'সে হ'ল ঋণগ্রস্ত পরমুখাপেক্ষী ফকীর'। ক্বাতাদাহ বলেন, هو ذو العِيَال 'বড় পরিবারওয়ালা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি'। ইবনু কাছীর বলেন, 'সবগুলি অর্থই কাছাকাছি মর্মের'।

অর্থাৎ সর্বস্বান্ত, ছিন্নমূল, দিশেহারা ব্যক্তি ও পরিবারকে অন্নদান করা হ'ল জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, যা উত্তরণ করা খাঁটি মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

(১৭) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ 'অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দেয় ও পরস্পরের প্রতি দয়ার উপদেশ দেয়'।

অর্থাৎ দাসমুক্তির মাধ্যমে এবং দুর্ভিক্ষের সময় নিরন্নকে অন্নদানের মাধ্যমে কেউ ঘাঁটিতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে যথার্থ বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা যেকোন সৎকর্ম আল্লাহ্র নিকটে কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হ'ল তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা। ঈমানহীন আমল বা আমলহীন ঈমান কোনটাই কাজে আসবে না। বরং ঈমান ও আমল একত্রিত হওয়া আবশ্যক। যেমন মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ- 'তাদের অর্থব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন

২৭৯. আহমাদ, মিশকাত হা/১৯৩৯; তিরমিযী হা/৬৫৮; নাসাঈ হা/২৫৮১; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; সনদ ছহীহ।
২৮০. বুখারী হা/৬০০৫, মিশকাত হা/৪৯৫২।

কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী। তারা ছালাতে আসে অলসতার সাথে, আর ব্যয় করে অনিচ্ছুক মনে' *(তওবা ৯/৫৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ 'মুমিন অবস্থায় যে পুরুষ বা নারী সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের কাজের সর্বোত্তম পুরস্কার দেব' *(নাহল (১৬/৯৭)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوْرًا– 'যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তাদের চেষ্টাসমূহ কবুল হয়ে থাকে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৯)*।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, মুমিন অবস্থায় দাসমুক্তি বা মিসকীনকে অন্নদান প্রভৃতি সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সে ঘাঁটিতে প্রবেশ করে। অতঃপর আজীবন সে তার ঈমান ও সদুপদেশ দান কার্যের উপরে অবিচল থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى 'আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি তওবা করে ও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে। অতঃপর সৎপথে অটল থাকে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮২)*।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ঈমানের পরে এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আমলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হ'ল পরস্পরকে ছবর ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। ছবর তিন প্রকার। এক- বিপদে ধৈর্য ধারণ করা (الصبر فى المصيبة)। ঈমানদার ব্যক্তির উপরে নানাবিধ বিপদ এসে থাকে তাকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অথবা তার ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্য। এমতাবস্থায় ঈমানদার নিজে যেমন ছবর করবে, অন্যকেও তেমনি ছবরের উপদেশ দিবে, যাতে সেও ঈমানের উপরে দৃঢ় থাকতে পারে। দুই- পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা (الصبر عن المعصية)। পাপের সহজ সুযোগ এসে যাওয়া সত্ত্বেও মুমিনকে তার ঈমান ঐ পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে। এটা হ'ল গুরুত্বপূর্ণ ছবর, যার পুরস্কার অনেক বেশী। তিন- আল্লাহ্র আনুগত্যের উপরে দৃঢ় থাকা (الصبر على الطاعة)। সাময়িকভাবে পাপ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্র আনুগত্যে ফিরে আসা অনেক সময় সম্ভব হ'লেও স্থায়ীভাবে তার উপরে দৃঢ় থাকা নিঃসন্দেহে কঠিন এবং অবশ্যই তা সর্বোচ্চ ধৈর্য ধারণের অন্তর্ভুক্ত। যার পুরস্কারের কোন শেষ নেই। প্রথমটি সাধারণ, দ্বিতীয়টি 'উত্তম' (حسن) এবং শেষেরটি 'সর্বোত্তম' (أحسن)।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ 'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। তিনি বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'ধৈর্যশীলদের বেহিসাব

পুরস্কার দান করা হবে' *(যুমার ৩৯/১০)*। তিনি আরও বলেন, أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلاَماً 'ছবরের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতে বিশেষ কক্ষ দান করা হবে এবং তাদেরকে সেখানে মুবারকবাদ ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫)*। তিনি বলেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيْرًا 'ধৈর্যধারণের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন' *(দাহর ৭৬/১২)*।

জনৈক ব্যক্তি মারা গেলে একজন বলল, লোকটি খুবই সৌভাগ্যবান। কেননা তার বড় কোন রোগ-পীড়া হয়নি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, একথা তুমি জানলে কিভাবে? যদি আল্লাহ তাকে কোন রোগ দ্বারা পরীক্ষা করতেন, তাহ'লে এর মাধ্যমে তিনি তার পাপ মোচন করতেন'।[২৮১]

আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তাকে আগেভাগে দুনিয়ায় কষ্ট দান করেন। কিন্তু যখন কোন বান্দার অকল্যাণ চান, তার পাপের শাস্তি দানে বিরত থাকেন। অবশেষে ক্বিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ শাস্তি দিয়ে দেন'।[২৮২]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ 'মুসলমান দুনিয়াতে যেসব বিপদ, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট বা মনোবেদনা ভোগ করে, এমনকি যদি তার শরীরে কোন কাঁটাও ফুটে, (আর সে যদি তাতে আল্লাহ্র উপরে সন্তুষ্ট থাকে), তাহ'লে এর দ্বারা তার পাপসমূহ মোচন করে দেন'।[২৮৩] অন্য হাদীছে এসেছে, حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ 'অবশেষে সে আল্লাহ্র সাথে মুলাক্বাত করবে এমন অবস্থায় যে, তার কোন গোনাহ থাকবে না'।[২৮৪]

এতে বুঝা যায় যে, রোগ-শোক, বিপদাপদ মানব জীবনের স্থায়ী সাথী। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই। যে মানুষ যত বেশী কষ্ট-মুছীবতের সম্মুখীন হয়, তার অভিজ্ঞতা ও ধৈর্যশক্তি তত বৃদ্ধি পায়। তার অন্তরজগত পরিশুদ্ধ হয়। আগুনে পোড়া ঝকঝকে স্বর্ণের ন্যায় ছবরের আগুনে পোড়া মুমিন এভাবে দুনিয়া থেকে নিষ্কলুষ হয়ে তার পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে চলে যায়। -*সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী*।

২৮১. মালেক হা/৩৪৬৮, মুরসাল ছহীহ; মিশকাত হা/১৫৭৮।
২৮২. তিরমিযী হা/২৩৯৬; মিশকাত হা/১৫৬৫; ছহীহাহ হা/১২২০।
২৮৩. বুখারী হা/৫৬৪১, মুসলিম হা/২৫৭২, মিশকাত হা/১৫৩৭।
২৮৪. তিরমিযী হা/২৩৯৯; ছহীহাহ হা/২২৮০; মিশকাত হা/১৫৬৭।

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্মটি হ'ল পরস্পরকে দয়া ও অনুগ্রহের উপদেশ দান করা।

নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে দয়াগুণের চাইতে বড় গুণ আর নেই। ছবর ও দয়াগুণ মুমিনের সবচেয়ে বড় দু'টি গুণ হিসাবে অত্র আয়াতে উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ অত্র গুণ দু'টির বড়ত্ব ও মর্যাদাকে আরো সমুন্নত করেছেন। 'রহম' বা দয়াগুণ হ'ল আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় গুণ। তিনি বলেন, سَبَقَتْ رَحْمَتِى عَلَى غَضَبِى 'আমার দয়া আমার ক্রোধের উপরে জয়লাভ করে'।[২৮৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوْا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ 'দয়াশীলদের উপরে দয়াময় আল্লাহ দয়া করে থাকেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপরে দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপরে দয়া করবেন'।[২৮৬] তিনি বলেন, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ 'আল্লাহ দয়া করেন না ঐ ব্যক্তির উপরে, যে মানুষকে দয়া করে না'।[২৮৭] অন্যত্র আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا– 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের হক বুঝে না, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২৮৮] বস্তুতঃ পরস্পরকে দয়া করা এবং ছবর ও সৎকাজের উপদেশ দেয়া ঈমানের অন্যতম প্রধান দাবী। এর মাধ্যমে সমাজে সর্বদা মানবিক আবহ বিরাজ করে।

অত্র আয়াতের শুরুতে ثُمَّ (অতঃপর) শব্দ আনার মাধ্যমে পূর্বের তিনটি বস্তুর উপর পরবর্তী বস্তুগুলির উচ্চতর মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। যেখানে ঈমান, ছবর ও দয়াশীলতার কথা বর্ণিত হয়েছে। কেননা ঈমান হ'ল সবকিছুর মূল। ছবর হ'ল বীরত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপ। আর দয়াশীলতা হ'ল আল্লাহ্র বিশেষ গুণ, যা সবকিছুর উপরে। কারু মধ্যে যখন এই গুণগুলি অর্জিত ও বিকশিত হয়, তখন তিনি হন সত্যিকারের মানুষ বা ইনসানে কামেল।

(১৮) أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ 'এরাই হ'ল ডান সারির মানুষ'।

أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ অর্থ أصحابُ الْيُمْنِ أو جهة اليمين 'সৌভাগ্যবান অথবা ডান দিকের লোকেরা, যারা ক্বিয়ামতের দিন ডান হাতে আমলনামা পাবেন'।

২৮৫. বুখারী হা/৭৫৫৪, মুসলিম হা/২৭৫১; মিশকাত হা/৫৭০০।
২৮৬. আবুদাউদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪; হাদীছ হাসান ছহীহ, মিশকাত হা/৪৯৬৯।
২৮৭. বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/৬৬ 'ফাযায়েল' অধ্যায় মিশকাত ৪৯৪৭।
২৮৮. আবুদাউদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯২০; আহমাদ হা/৬৭৩৩, সনদ ছহীহ।

অর্থাৎ উপরে বর্ণিত গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ ক্বিয়ামতের দিন সৌভাগ্যশালীদের জন্য নির্ধারিত ডান সারিতে স্থান পাবে। ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে তিন সারিতে ভাগ করা হবে। একটি হবে অগ্রগামী দল, একটি হবে দক্ষিণ সারির দল এবং একটি হবে বাম সারির দল। প্রথম দু'টি দল জান্নাতী হবে এবং বাম সারির লোকেরা জাহান্নামী হবে *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭-১২)*। জান্নাতীদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে এবং তাদের সহজ হিসাব নেওয়া হবে *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭১; ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৭-৮)*।

(১৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 'আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারা হ'ল বাম সারির লোক'।

أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ অর্থ أصحابُ الشُؤْمِ أو جهة الشمال 'হতভাগা অথবা বাম দিকের লোকেরা, যাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে'।

পাপিষ্ঠ কাফের-ফাসেক-মুনাফিকদের ক্বিয়ামতের দিন বাম সারিতে দাঁড় করানো হবে *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৯,৪১)*। এদের পিঠের পিছন দিয়ে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/১০)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এরাও ডান হাত বাড়িয়ে দেবে। বাম হাত বাড়াতে চাইবে না। ফলে পিছন দিক দিয়ে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে *(কুরতুবী)*।

(২০) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ 'তাদের উপরে থাকবে পরিবেষ্টিত অগ্নি'।

অর্থাৎ আগুন তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করবে। কোনদিক দিয়ে তারা পালাবার পথ পাবে না। الوِصاد أو الإصاد অর্থ 'বন্ধ' أوصدتُ البابَ أى أغلقته 'আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছি' *(কুরতুবী)*। অতএব مُّؤْصَدَةٌ অর্থ نار مغلقة চারদিক দিয়ে বন্ধ বা পরিবেষ্টিত। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ، فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ 'প্রজ্বলিত অগ্নি তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে, উঁচু উঁচু স্তম্ভসমূহে' *(হুমাযাহ ১০৪/৮-৯)*।

أجارنا الله منها بفضله وكرمه (আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে ও দয়ায় আমাদেরকে উক্ত শাস্তি থেকে রক্ষা করুন!)।

সারকথা :

মানুষের জীবন কষ্টের আধার। শত কষ্টেও আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস দৃঢ় রাখতে হবে। সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং মানুষের প্রতি দয়াশীল থাকতে হবে। তারাই হবে সৌভাগ্যশালী বান্দা। এর বিপরীত যারা, তারা হবে হতভাগা।

সূরা শাম্স (সূর্য)

সূরা ক্বদর-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৯১, আয়াত ১৫, শব্দ ৫৪, বর্ণ ২৪৯।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ۝١

(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝٢

(২) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝٣

(৩) শপথ দিবসের যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে দেয়

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝٤

(৪) শপথ রাত্রির যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়,

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٥

(৫) শপথ আকাশের ও তার নির্মাণের

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٦

(৬) শপথ পৃথিবীর ও তার বিস্তৃতির

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧

(৭) শপথ মানুষের ও তার বিন্যস্ত করণের,

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨

(৮) অতঃপর তার মধ্যে তিনি দুষ্কৃতির ও সুকৃতির প্রেরণা নিক্ষেপ করেছেন।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩

(৯) সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করে।

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠

(১০) এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে কলুষিত করে।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١

(১১) ছামূদ জাতি মিথ্যারোপ করেছিল অবাধ্যতা বশে

اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٢

(১২) যখন তাদের সর্বাধিক দুরাচার ব্যক্তিটি তৎপর হয়ে উঠেছিল।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣

(১৩) অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্র রাসূল বলেছিল, আল্লাহ্র উষ্ট্রী ও তার পানি পান করার ব্যাপারে সাবধান হও!

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۝

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝١٤

(১৪) কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। অতঃপর উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। ফলে তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের সমূলে ধ্বংস করে জনপদকে

একাকার করে দিলেন।

(১৫) আর তিনি এর মন্দ পরিণতিকে ভয় করেন না।

বিষয়বস্তু :

সূরাটির আলোচ্য বিষয় হ'ল দু'টি : **এক-** বড় বড় আটটি সৃষ্টবস্তুর শপথ করে আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নফসকে পবিত্র করেছে এবং সর্বোত্তম চরিত্রমাধুর্য দ্বারা তাকে পরিচ্ছন্ন করেছে, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় নফসকে অপবিত্র করেছে এবং মূর্খতা ও নিকৃষ্ট কর্মসমূহের মাধ্যমে তাকে কলুষিত করেছে, সে ব্যক্তি ব্যর্থকাম হয়েছে *(১-১০ আয়াত)*।

দুই- ব্যর্থকাম লোকদের উদাহরণ দিতে দিয়ে বিগত দিনে ছামূদ জাতির ধ্বংসের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে *(১১-১৫ আয়াত)*।

গুরুত্ব :

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায়ের পর নিজ মহল্লায় (বনু সালেমাহ) এসে পুনরায় এশার জামা'আতে ইমামতি করার সময় সূরা বাক্বারাহ দিয়ে ক্বিরাআত শুরু করেন। এতে জনৈক রাখাল ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে পৃথকভাবে ছালাত আদায় করে চলে যায়। একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি মু'আযকে ডেকে বলেন, أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ 'মু'আয তুমি কি ফিৎনাকারী? তুমি কি সূরা আ'লা, ফজর, শাম্স, লায়েল, যোহা পড়তে পারো না'?[২৮৯]

তাফসীর :

(১) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 'শপথ সূর্যের ও তার কিরণের'। অর্থ أقسم بالشمس وإشراقها 'আমি শপথ করছি সূর্যের ও তার প্রভাতরশ্মির। এখানে দু'টি শপথ একসাথে করা হয়েছে। সূর্যের শপথ এজন্য যে, এটি একটি বিশাল সৃষ্টি, যা তাপ ও আলোর উৎস। অতঃপর তার কিরণের শপথ করা হয়েছে। কেননা তা জীবন ও জাগরণের উৎস। এর আগমনে মানুষ ও সৃষ্টিজগত ঘুম থেকে জেগে উঠে যার যার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এর উদয়, উত্থান ও অস্তের সাথে দিবসে কর্মের সূচনা, ব্যস্ততা ও সমাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে। তাই সৃষ্টিজগতের কর্মচাঞ্চল্যে সূর্যকিরণের অবদান সবচেয়ে বেশী। সেটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই আল্লাহ এখানে পৃথকভাবে 'কিরণে'র শপথ করেছেন। যেদিন সূর্য আলোহীন হবে, সেদিন কিয়ামত হবে।

২৮৯. নাসাঈ হা/৯৮৪, বুখারী হা/৭০৫; মুসলিম হা/৪৬৫; মিশকাত হা/৮৩৩; বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : সূরা ফজর।

واو এখানে শপথসূচক অব্যয় হয়েছে। সূরার শুরুতে পরপর আটটি বড় বড় সৃষ্টবস্তুর শপথের মধ্যে প্রথম দু'টি হ'ল সূর্য ও তার কিরণের শপথ। এই শপথের মাধ্যমে সূর্য ও সূর্যরশ্মির গুরুত্ব ও মানবকল্যাণে তার অনন্য অবদানের প্রতি চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ضُحَى বলতে 'চাশত' বা সূর্যোদয়ের পরবর্তী অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন, والمعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس وبُعَيْدَ ذلك قليلاً 'আরবদের নিকটে প্রসিদ্ধ হ'ল এই যে 'যোহা' অর্থ যখন সূর্য উদিত হয় এবং তার অত্যল্প পরের সময়কাল'। একারণেই ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই পড়া সুন্নাত, কখনোই বেলা ১০/১১টায় নয়। যা এখন বড় বড় শহরে প্রায়শঃ দেখা যাচ্ছে। অনেকে ضحي থেকে পূরা দিন অর্থ নিয়েছেন সূর্যের অবস্থিতির কারণে *(কুরতুবী)*। মূলতঃ সূর্যকিরণ সর্বদা একইরূপ থাকে। কিন্তু রাত্রি শেষে পৃথিবীতে সূর্যোদয়ের সূচনাপর্বকে 'যোহা' বা প্রভাতরশ্মি বলা হয়। যা সাধারণতঃ এক বর্শা পরিমাণ বা সাড়ে ছয় হাত উদয়কালকে বুঝানো হয়। এখানে সূর্যের শপথ করা হয়েছে দিবসের নিদর্শন হিসাবে।

(২) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا 'শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে'।

تَلاَ অর্থ تَبِعَ 'পিছে পিছে আসা'। ফার্রা বলেন, এর অর্থ أخذ منها 'সূর্য থেকে আলো নেওয়া' *(কুরতুবী)*। সূর্য ডোবার সাথে সাথে চন্দ্র তার জ্যোতি নিয়ে বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে শুক্লপক্ষে যা স্পষ্ট দেখা যায়।

'সূর্যের পশ্চাতে আসে' বলার মধ্যে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। বরং সূর্য যখন পৃথিবীর আড়ালে চলে যায়, তখন তার কিরণ চন্দ্রের উপর প্রতিফলিত হয় বলেই তাকে আলোকিত দেখা যায়। আর তাই সূর্য কিরণের জ্বালা চন্দ্রের আলোয় থাকে না। সূর্য কিরণে প্রাণীদেহ ও বৃক্ষকুল শক্ত-সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে চন্দ্রের প্রভাবে সাগর ও নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়। সূর্য ও চন্দ্র তাই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এখানে চন্দ্রের শপথ করা হয়েছে রাত্রির নিদর্শন হিসাবে।

(৩) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا 'শপথ দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে দেয়'।

جَلَّى অর্থ كشف الظلمة 'অন্ধকার দূরীভূত করা'। অর্থাৎ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য যখন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। আর সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হ'লে তার খরতাপ বৃদ্ধি পায়, যা দেহে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এই শপথের মাধ্যমে সূর্য যে অফুরন্ত জ্বালানীর উৎস, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৪) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا **'শপথ রাত্রির যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়'।**

সদা চলমান ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্যের দিকে থাকে, তখন সে অংশে দিন হয় এবং অপর অংশে রাত হয়। 'সূর্যকে ঢেকে দেয়' অর্থ সূর্য থেকে পৃথিবী আড়ালে চলে যায়। সূর্য ওঠা, সূর্য ডোবা, সূর্য মাথার উপরে আসা প্রভৃতি কথার মধ্যে সূর্য ও পৃথিবী উভয়ে যে নিজ নিজ কক্ষপথে সদা চলমান, তার প্রমাণ বহন করে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান রয়েছে এই আয়াতে এবং অন্য আয়াতসমূহে। সূর্যের আসা-যাওয়া ও উত্তাপের কমবেশী হওয়া এবং রাত্রিতে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র এক অপূর্ব পালন কৌশল। সূর্যতাপ সর্বদা একইরূপ থাকলে এবং দিবারাত্রির আগমন-নির্গমন না থাকলে পৃথিবী প্রাণীকুলের বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেত।

বস্তুতঃ পৃথিবী অন্ধকারের চাদরে ঢেকে যাওয়ার এই সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় চলমান বিমান থেকে। কেননা বিমান তখন সূর্য্যের আলোর মধ্যে থাকে। আর পৃথিবী থাকে অন্ধকারের পর্দার মধ্যে।

(৫) وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا **'শপথ আকাশের ও তার নির্মাণের'।**

এখানে ما مصدرية وموصولة দু'টিই হ'তে পারে। ما مصدرية হ'লে অর্থ হবে وَالسَّمَآءِ وَبِنَاءِهَا 'শপথ আকাশের ও তার নির্মাণের'। আর ما موصولة হ'লে অর্থ হবে وَالسَّمَآءِ وَمَنْ بَنَاهَا 'শপথ আকাশের ও তার নির্মাতার'। দু'টি অর্থই পরস্পরের পরিপূরক। পূর্বাপর বিবেচনায় আমরা প্রথম অর্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। কেননা 'নির্মাতা' বলতে আল্লাহকে বুঝায়। অথচ আল্লাহ সাধারণতঃ সৃষ্টির কসম করে থাকেন। এখানেও আল্লাহ নিজের কসম না করে সৃষ্টির অর্থাৎ 'নির্মাণের' কসম করেছেন।

এই শপথের মাধ্যমে আকাশের বিশালত্ব ও তার অপূর্ব নির্মাণশৈলীর প্রতি চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে বিজ্ঞানী বান্দাদের প্রতি মহাকাশ গবেষণায় নিয়োজিত হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে। আকাশ সৃষ্টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ 'আর আসমানকে আমরা সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে এবং আমরা অবশ্যই একে প্রশস্তকারী' (*যারিয়াত ৫১/৪৭*)। আল্লাহ নিজ ক্ষমতাবলে সবই সৃষ্টি করেছেন। তা সত্ত্বেও আসমান সৃষ্টির বেলায় 'নিজ হাতে' বিশেষভাবে বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আকাশ একটি বিরাট সৃষ্টি। لَمُوْسِعُوْنَ বলার মধ্যে নভোমণ্ডল যে কত বড় ও বিস্তৃত এবং এটি যে সদা প্রসারমান, সেই বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তবে সবকিছু রয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ 'তাঁর নিকটে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে' (*রা'দ*

১৩/৮)। আর এর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় কোন খুঁত নেই। আল্লাহ বলেন, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ- 'তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। তুমি আবার তাকিয়ে দেখ, কোন খুঁত দেখতে পাও কি'? 'অতঃপর তুমি দু'বার করে দৃষ্টি ফিরাও। সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে' *(মুল্ক ৬৭/৩-৪)*। সৌরলোকের প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ মানুষকে ডেকে বলেন, أَفَلَمْ يَنْظُرُوْا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ 'তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে আমরা তা নির্মাণ করেছি ও সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনরূপ ফাঁক-ফোকর নেই' *(ক্বাফ ৫০/৬)*। অন্যত্র আল্লাহ হঠকারী মানুষকে লক্ষ্য করে বলছেন,-أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَآءُ؟ بَنَاهَا- رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا- 'তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি নির্মাণ করেছেন'। 'তিনি একে উচ্চ করেছেন, অতঃপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন' (*নাযে'আত ৭৯/২৭-২৮*)। আকাশকে তিনি সাতটি স্তরে বিভক্ত করেছেন (*নূহ ৭১/১৫*)। প্রতি আসমানে দরজা সন্নিবেশ করেছেন (*নাবা ৭৮/১৫*) ও সেখানে দাররক্ষী ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মে'রাজে যাওয়ার সময় প্রত্যেক দাররক্ষী ফেরেশতা প্রথমে তাঁর পরিচয় জেনে অতঃপর সাদর সম্ভাষণের মাধ্যমে দরজা খুলে দিয়েছিল।[২৯০]

পৃথিবীর উপরে আকাশকে নির্মাণ করেছেন 'সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে' (*আম্বিয়া ২১/৩২*)। প্রতিটি ছাদের মধ্যকার দূরত্ব কল্পনার অতীত। নিম্ন আকাশকে সাজিয়েছেন নক্ষত্ররাজি দ্বারা (*মুল্ক ৬৭/৫*)। যা অন্ধকার পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং তা দেখে মানুষ অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় *(নাহল ১৬/১৬)*।

কতই না বিস্ময়কর এই আকাশ, যা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ বিশিষ্ট (*রহমান ৫৫/৩৫*) হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই শান্ত স্নিগ্ধ অন্তহীন এক নিঃসীম নীলিমা। যার প্রতিটি নক্ষত্র অফুরন্ত দাহিকাশক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এবং সেগুলি আলোর গতিতে তীব্রবেগে ঘূর্ণায়মান ও চলমান হওয়ার সত্ত্বেও কারু সঙ্গে কারু সংঘর্ষ হয় না। সদা চলন্ত হওয়া সত্ত্বেও *(ইয়াসীন ৩৬/৪০)* আমরা ওগুলোকে সদা স্থির ও সমতল ছাদরূপে দেখতে পাই। সদা জ্বলন্ত হওয়া সত্ত্বেও রাতের আকাশে ওদেরকে আমরা মিটিমিটি উজ্জ্বল দেখতে পাই, যা জ্বলে আর নিভে। যেন সর্বদা আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। পৃথিবীর চাইতে লক্ষ-কোটি গুণ বড় ঐসব গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে আমরা ছোট ছোট দেখি। কোটি কোটি

২৯০. বুখারী হা/৩৮৮৭, মুসলিম হা/১৬৪, মিশকাত হা/৫৮৬২।

মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা ওদেরকে খুবই নিকটে দেখি। অগণিত তারকাশোভিত এই সুন্দর আকাশ দেখে চিন্তাশীল মানুষ কি আপনা থেকেই বলে উঠবে না- অবশ্যই এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি কুশলী নির্মাতা ও দূরদর্শী ব্যবস্থাপক! হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মুখে অনেক আগেই আমরা শুনেছি, إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ 'নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা যা চান অতীব সূক্ষ্ম কৌশলে তা করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (*ইউসুফ ১২/১০০*)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অসচেতন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কত অগণিত নিদর্শন রয়েছে। তারা এসবের উপর দৃষ্টি ফেলে চলে যায়। কিন্তু তারা এগুলো থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে *(ইউসুফ ১২/১০৫)*।

(৬) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا 'শপথ পৃথিবীর ও তার বিস্তৃতির'।

অর্থাৎ পৃথিবীকে আল্লাহ বিস্তৃত করেছেন বান্দার বসবাসের জন্য। পৃথিবীকে আল্লাহ নরম কাদার মত করেননি। আবার শক্ত পাথরের মত করেননি। বরং মধ্যম মানের সমভূমি করে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তা বান্দার কল্যাণে ব্যবহৃত হ'তে পারে। কোন কোন স্থান নরম ও শক্ত হ'লেও সেটা পৃথিবীর স্বাভাবিক গঠন নয়। উল্লেখ্য যে, এই আয়াত দিয়ে 'পৃথিবী গোলাকার নয়' প্রমাণের কোন অবকাশ নেই। পৃথিবী নিঃসন্দেহে গোলাকার। তবে তার বিস্তৃতি এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যে, আকারে গোল হ'লেও ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীরা কেউ পৃথিবী ছেড়ে ছিটকে পড়ে যায় না। গোলাকার হাড়ির গায়ে পিঁপড়া যেভাবে ছুটে বেড়ায়, গোলাকার ভূপৃষ্ঠে তেমনি মানুষ ও প্রাণীকুল স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করে। পৃথিবী সর্বদা তার অধিবাসীদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে। তাই দেখা যায়, ঢিল উপরে ছুঁড়ে মারলেও পুনরায় তা মাটিতে এসে পড়ে। রকেট বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বহু ঊর্ধ্বে চলে গেলেও আবার ফিরে আসে তার আগের স্থানে। পৃথিবীর বিস্তৃতিকে অন্য আয়াতে (*নাবা ৭৮/৬*) বিছানার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আপেক্ষিক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। আমাদের জন্য পৃথিবী বিছানা সদৃশ সমতল ভূমি হ'লেও প্রকৃত অর্থে পৃথিবী গোলাকার। আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে বলে তার দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। অন্যত্র دَحَاهَا বলা হয়েছে (*নাযে'আত ৭৯/৩০*)। অর্থ بسطها 'তাকে বিস্তৃত করেছেন'। طَحَاهَا ও دَحَاهَا মূলতঃ একই অর্থ বহন করে (*কুরতুবী*)।

(৭) وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا 'শপথ মানুষের ও তার বিন্যস্ত করণের'।

অর্থাৎ হাত-পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তিষ্ক ইত্যাদিসহ সুন্দর অবয়ব দিয়ে বিন্যস্ত করে যে মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার শপথ। এই শপথের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে

তার নিজের সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে চিন্তা করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

اَلَّذِيْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ-

'(তিনিই সেই সত্তা) যিনি তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন'। 'অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে'। 'অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ। (অথচ) তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক' (*সাজদাহ ৩২/৭-৯*)। বস্তুতঃ এই অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ নিহিত রয়েছে। ফেরাঊন যখন বলেছিল فَمَنْ رَّبُّكُمَا يَا مُوْسَى 'হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক কে'? জবাবে মূসা বলেছিলেন, رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 'আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তাকে পথপ্রদর্শন করেছেন' (*ত্বোয়াহা ২০/৪৯-৫০*)। এই পথপ্রদর্শন দু'ভাবে হ'তে পারে। এক- প্রত্যেকের পৃথক পৃথক আকৃতি এবং তার কর্ম ও আচরণ। যেমন মানুষ ও অন্য প্রাণীর আচরণ। দুই- নৈতিক পথপ্রদর্শন যা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে প্রথমটির অর্থ অধিকতর স্পষ্ট।

(৮) فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا 'অতঃপর তার মধ্যে তিনি দুষ্কৃতি ও সুকৃতির প্রেরণা নিক্ষেপ করেছেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে ভাল-মন্দ পথ চিনিয়ে দিয়েছেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ মানুষের নৈতিক হেদায়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِراً وَّإِمَّا كَفُوْراً 'আমরা তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ বান্দা হ'তে পারে কিংবা অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে' (*দাহ্‌র ৭৬/৩*)। তিনি বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আর আমরা তাকে দু'টি পথ দেখিয়েছি' (*বালাদ ৯০/১০*)। বস্তুতঃ এ দু'টি পরস্পর বিরোধী প্রেরণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে পরীক্ষা করা। সে মন্দ প্রেরণাকে দমন করে যদি তার সৎ প্রেরণাকে ঊর্ধ্বে রাখতে পারে, তাহ'লেই সে সফলকাম হবে। আল্লাহ প্রেরিত হেদায়াত তথা ইসলামী শরী'আত মানুষকে তার

অন্তরজগতে লালিত সৎ প্রেরণাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করার পথ প্রদর্শন করে থাকে। অত্র আয়াতে فُجُوْرٌ ও تَقْوَى-কে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অর্থে আনা হয়েছে।

(৯) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 'সফলকাম হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করে'।

পূর্বে বর্ণিত আটটি শপথের জওয়াব হিসাবে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ لقد أفلح من زكي نفسه 'অবশ্যই সে ব্যক্তি সফলকাম হয়, যে ব্যক্তি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

অত্র আয়াতে বর্ণিত التزكية অর্থ التزكية من الشرك وشوائب المعاصى 'শিরক ও পাপের কালিমা সমূহ হ'তে পবিত্র হওয়া'। এর অর্থ ঐ 'তাযকিয়া' (التزكية) নয়, যার অর্থ নিজেই নিজের ছাফাই গাওয়া। যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى 'অতএব তোমরা নিজেদের ছাফাই গেয়ো না। কেননা তিনিই ভাল জানেন কে প্রকৃত আল্লাহভীরু' *(নাজম ৫৩/৩২)*। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নীচুতা, অসততা ও সকল প্রকার অন্যায় ও অসৎকর্ম হ'তে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের নফসকে পবিত্র রাখে, সে ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে সফলকাম হয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'সফলকাম হ'ল সেই ব্যক্তি, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল' (*আ'লা ৮৭/১৪*)। অর্থাৎ যথাযোগ্য ইল্ম ও আমলের মাধ্যমে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শুদ্ধিতা হাছিল করল।

যায়েদ বিন আরক্বাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তেন। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন, আমরাও তোমাদেরকে শিখাচ্ছি। সেটি এই যে,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا-

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, অতি বার্ধক্য ও কবরের আযাব হ'তে। হে আল্লাহ! তুমি আমার নফসকে আল্লাহভীতি দান কর এবং তাকে পরিশুদ্ধ কর। কেননা তুমিই শ্রেষ্ঠ সত্তা, যে তাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন ইলম হ'তে, যা কোন ফায়েদা দেয় না। এমন অন্তর

হ'তে, যা ভীত হয় না। এমন নফস হ'তে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দো'আ হ'তে যা কবুল হয় না'।[২৯১]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সুপথের নির্দেশনা, পরহেযগারিতা, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি'।[২৯২]

(১০) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 'এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে কলুষিত করে'।

ক্বাতাদাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, وخاب من دس نفسه في المعاصى 'ঐ ব্যক্তি নিরাশ হয়েছে, যার নফস পাপে ডুবে গেছে' (*কুরতুবী*)। التدسيس অর্থ إخفاء الشئ في الشئ 'কোন বস্তুর মধ্যে কোন বস্তুর লুকানো' (*কুরতুবী*)। যেমন আল্লাহ বলেন, أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ '(কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তার পিতা ভাবত যে, অপমান সহ্য করে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে,) না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে' (*নাহল ১৬/৫৯*)। ইবনু কাছীর বলেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তি হেদায়াত বঞ্চিত হয়েছে, পাপে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ– 'হ্যাঁ যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮১)*।

আর নফসকে কলুষমুক্ত করার একমাত্র পথ হ'ল, আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা ও তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি অনুগত থাকা। কেননা আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ 'যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদের বলে দাও যে, আমি অতীব নিকটবর্তী। আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে, তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। অতএব তারা যেন আমাকে ডাকে এবং আমার উপরে বিশ্বাস রাখে। তাহ'লে তারা সঠিক পথ পাবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

---

২৯১. আহমাদ হা/১৯৩২৭; মুসলিম হা/২৭২২; মিশকাত হা/২৪৬০ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়া' অনুচ্ছেদ-৮।

২৯২. মুসলিম হা/২৭২১, মিশকাত হা/২৪৮৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।

(১১) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا 'ছামূদ জাতি মিথ্যারোপ করেছিল অবাধ্যতা বশে'।

এখানে بِطَغْوَاهَا-এর باء 'কারণসূচক' (سببية) হয়েছে। অর্থাৎ بسبب كونها طاغية 'তারা অবাধ্য হওয়ার কারণে'।

পূর্বের আয়াতে ব্যর্থ মনোরথ এবং পাপে ডুবে যাওয়া লোকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ এখানে বিগত দিনের দুর্ধর্ষ ও ক্ষমতাশালী জাতি ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ক্ষমতা ও শক্তিগর্বে স্ফীত হয়ে তারা আল্লাহ্র উপরে মিথ্যারোপ করেছিল এবং তাদের নবী ছালেহ (আঃ)-এর অবাধ্যতা করেছিল। ফলে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের উপরে নেমে আসে কঠিন আযাব। যাতে তারা সবাই নিমেষে ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত হওয়ার ফলে তাদের অন্তরসমূহ কলুষিত হয়ে গিয়েছিল।

(১২) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا 'যখন তাদের সর্বাধিক দুরাচার ব্যক্তিটি তৎপর হয়ে উঠেছিল'।

অর্থাৎ দুষ্ট যুবকটি নবীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আল্লাহ প্রেরিত উষ্ট্রীর পা কেটে দিয়েছিল। অবাধ্য কওমের দাবী অনুযায়ী নবী ছালেহ (আঃ)-এর প্রার্থনা মতে আল্লাহ স্বীয় নিদর্শন হিসাবে বড় একটি উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলেন, যে একদিন কূয়ার সব পানি খেয়ে নিত ও একদিন তাদের দুধ দিত। যা তাদের সকলের চাহিদা মিটাতো। কিন্তু দুষ্ট নেতারা চক্রান্ত করে উষ্ট্রীর পা কেটে হত্যা করে ফেলে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আহ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবার মধ্যে অত্র আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন যে, হত্যাকারী ঐ লোকটি তার সম্প্রদায়ের একজন পরাক্রমশালী সর্দার ছিল আবু যাম'আহ্র ন্যায়'।[২৯৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ লোকটি ছিল কঠোর হৃদয় ও দুশ্চরিত্র (رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ)।[২৯৪] ইবনু কাছীর ঐ ব্যক্তির নাম বলেছেন, কুদার বিন সালেফ (قُدار بن سالف) *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(১৩) فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا 'অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্র রাসূল বলেছিলেন, আল্লাহ্র উষ্ট্রী ও তার পানি পান করার ব্যাপারে সাবধান হও'।

অর্থ ذروا ناقة الله حرية 'ছাড় আল্লাহ্র উষ্ট্রীকে স্বাধীনভাবে'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ 'ছেড়ে দাও ওকে, আল্লাহ্র যমীনে খেয়ে বেড়াক'

২৯৩. বুখারী হা/৪৯৪২, মুসলিম, তিরমিযী হা/৩৩৪৩।
২৯৪. মুসলিম হা/২৮৫৫।

(আ'রাফ ৭/৭৩)। অথবা نَاقَةَ اللهِ অর্থ احذروا ناقة الله 'আল্লাহ্র উষ্ট্রী সম্পর্কে সাবধান হও'। অর্থাৎ তাকে যবেহ করো না বা তার পানি পান করায় বাধা দিয়ো না। তার জন্য নির্ধারিত পানি পানের দিনে তোমরা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না। এখানে 'আল্লাহ্র রাসূল' অর্থ হযরত ছালেহ (আঃ)। উল্লেখ্য যে, সম্প্রদায়ের লোকদের উটগুলোর জন্য এবং আল্লাহ্র উষ্ট্রীর জন্য একদিন অন্তর একদিন পালাক্রমে পানি পানের বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই নির্ধারিত ছিল (*শো'আরা ২৬/১৫৫; ক্বামার ৫৪/২৮*)। আরো উল্লেখ্য যে, কওমের লোকদের দাবী অনুযায়ী নবীর দো'আয় পাহাড়ের বুক ফেটে এই উষ্ট্রীর আবির্ভাব ঘটে। যা ছিল নবী ছালেহ (আঃ)-এর একটি জীবন্ত মু'জেযা। উষ্ট্রী যেদিন পানি পান করত, সেদিন কূয়ার পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। অবশ্য ঐদিন লোকেরা উষ্ট্রীর দুধ পান করত এবং বাকী দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভরে নিত। কিন্তু এই হতভাগাদের কপালে এত সুখ সহ্য হ'ল না। তারা একদিন পানি না পাওয়াকে অজুহাত হিসাবে খাড়া করে উষ্ট্রীকে হত্যা করল *(কুরতুবী)*। মূলতঃ এটি ছিল তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। যাতে তারা সফল হয়নি।

(১৪) فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا 'কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, অতঃপর উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। ফলে তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের সমূলে ধ্বংস করে জনপদকে একাকার করে দিলেন'।

এখানে بِذَنْبِهِمْ-এর باء 'কারণ সূচক অব্যয়' (سببية) হয়েছে। অর্থাৎ 'তাদের পাপের কারণে'।

উষ্ট্রীর পা কেটেছিল একজনের নেতৃত্বে মোট দু'জন। কওমের বাকীরা কেউ বাধা না দেওয়ায় একাজে তাদের সম্মতি ধরে নেয়া হয়। সেজন্য এখানে বহুবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। নবী ছালেহ (আঃ) তাদের বলেছিলেন, আল্লাহ্র এই উষ্ট্রীর ক্ষতি করলে তোমাদের উপরে নির্ঘাত আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি। বরং গযব ডেকে আনার ব্যাপারে নবীকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা উটকে যবেহ করে ফেলে। তখন তাদের উপরে বজ্রধ্বনির গযব নেমে আসে ও তারা সবাই একত্রে ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 'পানিতে ও ভূমিতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে মানুষের কৃতকর্মের ফলে। এজন্য যে, তিনি তাদের কিছু কর্মের স্বাদ আস্বাদন করাতে চান। যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*। আর এই বিপর্যয় সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দেয় সমাজনেতারা। যেমন

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا 'যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন আমরা তাদের নেতৃবর্গকে আদেশ করি। অতঃপর তারা সেখানে পাপাচার করে। তখন তাদের উপর আমাদের শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা সেটিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিই' *(ইসরা ১৭/১৬)*। এইসব নেতৃবর্গকে অন্যত্র أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا 'শীর্ষ পাপী' *(আন'আম ৬/১২৩)* বলা হয়েছে। আর সৎকর্মশীল জাতিকে আল্লাহ শাস্তি দেন না। যেমন তিনি বলেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 'তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে কোন জনপদকে ধ্বংস করবেন, এমতাবস্থায় যে তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল' *(হূদ ১১/১১৭)*।

ইবনু কাছীর বলেন, دَمْدَمَ عَلَيْهِمْ অর্থ غضب عليهم فدمَّر عليهم 'তাদের উপরে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন, অতঃপর তাদেরকে ধ্বংস করে দেন'। বস্তুতঃ কঠোরতম শাস্তির ক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখান থেকেই আমরা কামান-বন্দুকের আওয়াজকে দুম-দ্রুম ইত্যাদি বলি। কুরতুবী বলেন, فَسَوَّاهَا অর্থ سوَّى عليهم الارض 'তাদের উপরে যমীন সমান হয়ে যাওয়া' অর্থাৎ সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে একাকার হয়ে যাওয়া।

(১৫) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا 'আর তিনি এর মন্দ পরিণতিকে ভয় করেন না'।

অর্থাৎ যালেমদের ধ্বংস করার পর তাদের পক্ষ হ'তে কোনরূপ প্রতিরোধের ভয় তিনি করেন না। কেননা তাঁর ক্ষমতার সামনে অন্যের ক্ষমতা নিতান্তই তুচ্ছ। ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ, হাসান বাছরী, মুজাহিদ প্রমুখ বিদ্বান একথা বলেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। তিনি فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ 'যা চান তাই করেন' (*বুরূজ ৮৫/১৬*)। لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ 'তিনি যা করেন তাতে প্রশ্ন তোলার কেউ নেই। বরং তারাই জিজ্ঞাসিত হবে' (*আম্বিয়া ২১/২৩*)। একথার মাধ্যমে হঠকারী ব্যক্তিদের প্রচণ্ডভাবে ধমক দেওয়া হয়েছে।

সারকথা :

পবিত্র হৃদয়ের মানুষ সর্বদা কৃতকার্য হয় এবং কলুষিত হৃদয়ের মানুষ সর্বদা পর্যুদস্ত হয়।

সূরা লায়েল (রাত্রি)

সূরা আ'লা-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৯২, আয়াত ২১, শব্দ ৭১, বর্ণ ৩১২।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١
(২) শপথ দিবসের, যখন তা প্রকাশিত হয়	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢
(৩) শপথ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও মাদী	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰۤى ۝٣
(৪) নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী।	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤
(৫) অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয়,	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٥
(৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে,	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦
(৭) অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٧
(৮) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়,	وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٨
(৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে,	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝٩
(১০) অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١٠
(১১) তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।	وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ۝١١
(১২) নিশ্চয়ই আমাদের দায়িত্ব হ'ল পথ প্রদর্শন করা।	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝١٢
(১৩) নিশ্চয়ই আমাদের মালিকানায় রয়েছে পরকাল ও ইহকাল।	وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝١٣
(১৪) অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে ভয় প্রদর্শন করছি।	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝١٤

لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۙ﴿١٥﴾

(১৫) যাতে প্রবেশ করবে না হতভাগা ব্যতীত।

الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ﴿١٦﴾

(১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ﴿١٧﴾

(১৭) সত্বর এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে,

الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۚ﴿١٨﴾

(১৮) যে তার ধন-সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۙ﴿١٩﴾

(১৯) এবং কারু জন্য তার নিকটে কোনরূপ অনুগ্রহ থাকে না যা প্রতিদান যোগ্য।

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۚ﴿٢٠﴾

(২০) কেবলমাত্র তার মহান পালনকর্তার চেহারা অন্বেষণ ব্যতীত।

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۧ﴿٢١﴾

(২১) আর অবশ্যই সে অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।

বিষয়বস্তু :

তিনটি বিষয়ের শপথ করে আল্লাহ বলছেন যে, কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে পৃথিবীতে মানুষ দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের লোক তারাই, যাদের সত্তাকে সরলপথে চলার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এরাই সফলকাম এবং তাদের তিনটি গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে (১-৭ *আয়াত*)। আরেক ধরনের লোক আছে, যাদের সত্তাকে বক্রপথে চলার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এরা ব্যর্থকাম এবং এদের তিনটি দোষ চিহ্নিত করা হয়েছে। অতঃপর তাদের পরিণতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৮-১৬)। সবশেষে আল্লাহ্র সন্তোষভাজন ব্যক্তিদের চরিত্র ও তাদের প্রতিদান বিবৃত করা হয়েছে (১৭-২১ *আয়াত*)।

গুরুত্ব :

ইতিপূর্বে সূরা ফজরের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয বিন জাবালকে বলেন, তুমি কি ছালাতে সূরা আ'লা, ফজর, শাম্স, লায়েল, যোহা পড়তে পারো না'? [২৯৫]

শানে নুযূল :

ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণের বর্ণনামতে সূরাটি হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয় (*কুরতুবী*)। ইবনু কাছীর বলেন, কোন কোন বিদ্বান এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের ইজমা বর্ণনা করেছেন *(ইবনু কাছীর)*।

---

২৯৫. বুখারী হা/৬১০৬, মুসলিম হা/৪৬৫; মিশকাত হা/৮৩৩; বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : সূরা ফজর।

তাফসীর :

(১-২) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى **'শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে'। 'শপথ দিবসের, যখন তা প্রকাশিত হয়'।**

يَغْشَى অর্থ يُغَطِّى 'আচ্ছন্ন করে'। কাকে আচ্ছন্ন করে সেটা স্পষ্ট বিধায় উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সূর্য বা দিবসকে রাত্রি তার অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন করে *(কুরতুবী)*। تَجَلَّى অর্থ ظهر بزوال ظلمة الليل 'রাত্রির অন্ধকার দূর করে প্রকাশিত হওয়া'। প্রথমটি فعل مضارع হওয়ার কারণ এই যে, অন্ধকার এসে আলোটিকে ঢেকে দেয়। দ্বিতীয়টি فعل ماضى হওয়ার কারণ এই যে, দিবস হ'ল স্বয়ং প্রকাশমান এবং যেটি হ'ল মূল *(ক্বাসেমী)*।

এখানে রাত্রি ও দিবসের শপথ করার মাধ্যমে এ দু'টির গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। এখানে উভয়ের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। যে দু'টি বৈশিষ্ট্য সকলের নিকটে স্পষ্ট। অর্থাৎ রাত্রির বৈশিষ্ট্য হ'ল 'আচ্ছন্ন করা'। আর দিনের বৈশিষ্ট্য হ'ল 'অন্ধকার ঠেলে দিন প্রকাশিত হওয়া'। কিন্তু কেবল এটুকু বুঝানোর জন্য শপথ করা হয়নি। বরং এতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে গভীর তাৎপর্য এবং রয়েছে সৌরবিজ্ঞানের মূল্যবান উৎস। কেবল এখানেই নয়, বরং কুরআনে বর্ণিত সকল শপথই বিজ্ঞানের উৎস কেন্দ্র। যেমন এখানে রাত্রির শপথ করা হয়েছে 'আচ্ছন্নকারী' হিসাবে। এর তাৎপর্য কি?

প্রথমতঃ রাত্রি ও দিনের প্রতিটিই কিছু বস্তুকে আচ্ছন্ন করে ও কিছু বস্তুকে প্রকাশ করে। যেমন রাত্রি আকাশের চাঁদ ও নক্ষত্ররাজিকে প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে। পক্ষান্তরে দিন আকাশের নক্ষত্ররাজিকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে প্রকাশ করে দেয়। এর মধ্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতির বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান রয়েছে। যা ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজের অক্ষের উপরে ঘুরে থাকে। লাটিমের মত ঘূর্ণনের সময় পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে পড়ে, সেই অংশে দিন হয় এবং অপরাংশে রাত হয়। সেকারণ আচ্ছন্নকারী হ'ল রাত্রি, দিন নয়। কেননা দিন অর্থাৎ সূর্য সদা প্রকাশিত। বস্তুতঃ এটি কুরআনের বিস্ময়কর তথ্যসমূহের অন্যতম।

দ্বিতীয়তঃ রাতের বেলায় যা কিছু প্রকাশিত হয় ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হ'ল আল্লাহ্র বিশাল সৃষ্টিসমূহের সারৎসার মাত্র। কিন্তু দিনের বেলায় যা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, তা হ'ল ঐসব সৃষ্টির তুলনায় সরিষাদানা সমতুল্য। আর তা হ'ল পৃথিবী নামক এই ছোট্ট গ্রহটি। যার সবকিছু আমরা বড় ও স্পষ্ট দেখি হাতের কাছে থাকার কারণে। পক্ষান্তরে আকাশের বড় বড় নক্ষত্ররাজিকে আমরা ছোট দেখি, দূরে এবং নাগালের বাইরে থাকার কারণে।

দিবস ও রাত্রির এই আসা-যাওয়ার মধ্যে মানুষের দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনের দৃষ্টান্ত লুকিয়ে রয়েছে। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে, ততক্ষণ সে কূয়ার ব্যাঙের মত কেবল তার আশপাশের ছোট্ট দুনিয়াটুকু দেখে। কিন্তু মৃত্যুর পরে বিশাল এক জগতের দৃশ্য তার সামনে ভেসে ওঠে, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। যার সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। ঠিক যেমন সূর্যাস্তের পর রাতের পর্দা উন্মোচিত হ'লে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে লক্ষ-কোটি নক্ষত্রশোভিত সীমাহীন আকাশের এক অনিন্দ্যসুন্দর ক্যানভাস। একথাটাই আল্লাহ বলেছেন এভাবে- لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ 'তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন আমরা তোমার থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ' (*ক্বাফ ৫০/২২*)।

ঘুমের স্বপ্নজগত থেকে জেগে উঠে মানুষ যেমন সবকিছু নতুন দেখে, দুনিয়ার এ স্বপ্নজগত শেষে মৃত্যুর পরে সে দেখবে নতুন এক বিস্ময়কর জগত। সে তখন পরকালের অনন্ত জীবনের বাসিন্দা হবে। ইহকালের সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকবে না। যেমন সূর্য ডুবে গেলে দিনের সাথে রাতের কোন সম্পর্ক থাকে না। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَّرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُّبْعَثُوْنَ 'তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' (*মুমিনূন ২৩/১০০*)। কবরের ঐ জগতকে এজন্যই বলা হয় 'বরযখী জগত'। অর্থাৎ পর্দার জগত। ওখানে গিয়ে দুনিয়ার কারুর কোন উপকার বা ক্ষতি কেউ করতে পারে না। যারা ছবি-মূর্তি, প্রতিকৃতি বা কবরপূজা করে এবং মৃত ব্যক্তির নিকটে বা তার অসীলায় কিছু কামনা করে, তারা অলীক কল্পনার পিছনে ছুটে মাত্র। তারা কুরআনের বিরোধিতা করে এবং প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয়। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন- আমীন!

রাত্রির আচ্ছন্ন করা এবং দিবসের আলোকিত হওয়ার শপথ করে আল্লাহ এই দু'য়ের কল্যাণকারিতার বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার প্রতি যেমন বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তেমনি দুনিয়ায় নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতে মুক্তি হাছিলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

(৩) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى 'শপথ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও মাদী'।

কুরতুবী, ইবনু কাছীর ও ক্বাসেমীসহ প্রায় সকল মুফাসসির وَمَا خَلَقَ অর্থ وَمَنْ خَلَقَ (যিনি সৃষ্টি করেছেন) বলে 'আল্লাহ' অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে নিজেই নিজের সত্তার কসম করছেন। অথচ ইতিপূর্বে আল্লাহ রাত্রি ও দিবস দু'টি সৃষ্টির কসম করেছেন এবং প্রায় সকল সূরাতেই আল্লাহ্‌র এ নীতি বজায় রয়েছে। সেকারণ আমরা এখানে وَمَا خَلَقَ-এর প্রকাশ্য অর্থ (ما مصدرية) গ্রহণ করেছি। দূরতম অর্থ (ما موصولة) গ্রহণের কোন প্রয়োজন বোধ করিনি।

অর্থাৎ নর ও মাদীরূপে যে প্রাণীজগত এবং নেগেটিভ ও পজেটিভ তথা ইলেকট্রন ও প্রোটন নামক দু'টি বিপরীতধর্মী মৌলিক অণু দিয়ে যে বস্তুজগত আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সেই সবকিছুর শপথ। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর ক্বিরাআতে এসেছে, وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى অর্থাৎ 'শপথ নর ও মাদীর'।[২৯৬] এর দ্বারা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً 'আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়' (*নাবা ৭৮/৮*)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- 'আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ হাছিল করতে পারো' (*যারিয়াত ৫১/৪৯*)।

অন্য সব বাদ দিলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদমশুমারি সন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সব দেশেই পুরুষ ও নারীর সংখ্যা সর্বদা কাছাকাছি রয়েছে। যদি এটা না হয়ে এর বিপরীত হ'ত। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ কোন দেশে মোট লোকসংখ্যার তিনগুণ পুরুষ ও একগুণ নারী হ'ত অথবা তিনগুণ নারী ও একগুণ পুরুষ হ'ত, তাহ'লে সেই দেশের সামাজিক শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ত। বস্তুতঃ পুত্র বা কন্যাসন্তান জন্মের ব্যাপারে পিতা-মাতার কিছুই করার নেই। আর সারা দেশের বা সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা হিসাব করে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাও মানুষের হাতে নেই। অতি উৎসাহী কিছু বস্তুবাদী মানুষ অহেতুক চেষ্টা করে বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা মানুষ সহ সকল প্রাণী ও বস্তু জগতের সংখ্যা ও রূযী নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি আল্লাহ্র হাতে। তিনি বলেন, اَللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ- 'আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং যা গর্ভাশয়ে সংকুচিত ও বর্ধিত হয়। বস্তুতঃ তাঁর নিকটে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে' (*রা'দ ১৩/৮*)। সকল প্রাণী ও বস্তুজগতে নর ও মাদীর সমতা বিধান নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। যার মধ্যে একজন দূরদর্শী পরিকল্পক ও প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তার নিশ্চিত প্রমাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, اَللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ... يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ- 'আল্লাহ তিনি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন... । যিনি আকাশ হ'তে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন'... (*সাজদাহ ৩২/৪-৫*)।

২৯৬. বুখারী হা/৪৯৪৪; মুসলিম হা/৮২৪; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।

(৪) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ‘নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী’।

অত্র আয়াতটি পূর্বের তিনটি আয়াতে বর্ণিত শপথসমূহের জওয়াব হিসাবে এসেছে (*কুরতুবী*)। শপথের বিষয়বস্তু রাত্রি ও দিবস, নর ও নারী যেমন পরস্পরে বিপরীতধর্মী, শপথের জবাবটাও এসেছে পরস্পরে বিপরীতমুখী। অর্থাৎ মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা হ'ল দু'ধরনের। ভাল ও মন্দ, যা পরবর্তী আয়াতগুলিতে স্পষ্ট হয়েছে। আর সেখানে ভাল ও মন্দ প্রতিটি দলের তিনটি করে বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

(৫-৬) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ‘অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে’।

অত্র দু'টি আয়াতে সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের তিনটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এক- যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে। দুই- আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং তিন- ‘উত্তম বিষয়’ অর্থাৎ তাওহীদের কালেমা *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*-কে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আয়াত দু'টি আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়। আর এটাই সকল মুফাসসির বলেন *(কুরতুবী)*। ইবনু জারীর ‘আমের বিন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, আবুবকর (রাঃ) মক্কায় থাকাকালে ইসলাম কবুলকারী বৃদ্ধা ও নারীদের তাদের মনিবদের নিকট থেকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতেন। এতে আপত্তি করে তাঁর পিতা আবু ক্বোহাফা বলেন, বেটা! আমি দেখছি তুমি কেবল দুর্বলদের মুক্ত করছ। যদি তুমি শক্তিশালী ও সাহসী পুরুষ লোকদের মুক্ত করতে, তাহ'লে তারা তোমাকে সাহায্য করত ও তোমার পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতো। জবাবে আবুবকর (রাঃ) বলেন, أى أبت إنما أريد ما عند الله ‘হে পিতা! আমি তো কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাই’। রাবী ‘আমের বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি উক্ত প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছিল’।[২৯৭]

উল্লেখ্য, হযরত ‘আমের হলেন, হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)-এর পৌত্র এবং আবুবকর (রাঃ)-এর নাতি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর পুত্র।

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى অর্থ صدَّق بالكلمة الحسنى ‘উত্তম কালেমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা’। ইবনু আব্বাস, যাহহাক প্রমুখ বলেন, কালেমা *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*-কে সত্য বলে বিশ্বাস করে (*কুরতুবী*)। ক্বাতাদাহ বলেন, بالمجازاة على ذلك অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ব্যয় ও আল্লাহভীরুতার উত্তম প্রতিদানে বিশ্বাস পোষণ করে (*ইবনু কাছীর*)। সবগুলি কাছাকাছি

২৯৭. ইবনু জারীর ৩০/১৪২ পৃঃ; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।

মর্ম বহন করে। কেননা তাওহীদে বিশ্বাসী না হলে কেউ পরকালীন ছওয়াবে বিশ্বাসী হবে না এবং নিঃস্বার্থভাবে সৎকর্ম করবে না।

(৭) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى 'অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব'।

অর্থাৎ আমরা ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর পথ প্রদর্শন করব এবং সেপথে চলা তার জন্য সহজ করে দেব। যায়েদ বিন আসলাম বলেন, 'সরল পথের জন্য' অর্থ 'জান্নাতের জন্য' *(ইবনু কাছীর)*। কেননা জান্নাতের পথই সরল পথ বা ছিরাতে মুস্তাক্বীম। আর এ পথের শেষ ঠিকানাই হ'ল জান্নাত।

আয়াতে سَ অর্থ 'সত্বর' যা এসেছে تحقيق বা নিশ্চয়তা বুঝানো জন্য। অর্থাৎ তার দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কাজ আল্লাহ সহজ করে দিবেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ-কর্ম সহজ করে দেন' *(তালাক ৬৫/৪)*।

আলোচ্য আয়াতে যে তিনটি গুণের বিনিময়ে জান্নাতের পথ সহজ করে দেবার ওয়াদা করা হয়েছে, মূলতঃ ঐ গুণাবলী তারাই হাছিল করেন, যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে সৎকর্ম করা তাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হবে। এদের পক্ষে জাহান্নামের কাজ করাটাই কষ্টকর এমনকি অসম্ভব হবে।

(৮-১০) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়'। 'এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে'। 'অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব'।

পূর্বের আয়াতে জান্নাতী বান্দাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা শেষে এবার জাহান্নামীদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এক- তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার বিষয়ে কৃপণতা করবে। দুই- আল্লাহ্র অবাধ্যতায় বেপরওয়া হবে এবং তিন- তাওহীদের কালেমায় মিথ্যারোপ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর অবাধ্যতা করবে। তাদের জন্য কঠিন পথ অর্থাৎ জাহান্নামের পথ সহজ করে দেয়া হবে। অসৎকর্ম করা তখন তাদের মজ্জাগত হয়ে যাবে। এদের পক্ষে জান্নাতের কাজ করাটা কষ্টকর এমনকি অসম্ভব হবে।

উল্লেখ্য যে, শয়তান সর্বদা মুমিনদের এই বলে ধোঁকা দিয়ে থাকে যে, মন্দ লোকেরাই দুনিয়াতে সুখে আছে। অতএব দ্বীনদার হয়ে কি লাভ? এর জবাব এই যে, বাহ্যিকভাবে এদের সুখী দেখা গেলেও অন্তরজগতে এরা চরম অসুখী। দুনিয়াতে এটাই এদের জন্য আযাব। যেমন আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ 'আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, আর অন্তরকে সংকুচিত করে দেন, যেন সে আকাশে আরোহন করছে। এমনিভাবে যারা ঈমান আনে না, তাদের উপর আল্লাহ পংকিলতাকে বিজয়ী করে দেন' *(আন'আম ৬/১২৫)*। তিনি বলেন, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ- وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ- 'যারা আমার আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে, আমরা তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেও পারবে না'। 'আর আমি তাদের অবকাশ দেব। নিশ্চয়ই আমার কৌশল খুবই মযবুত' *(আ'রাফ ৭/১৮২-৮৩; ক্বলম ৬৮/৪৪-৪৫)*।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন বাক্বী' গারক্বাদে একটি জানাযায় ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে এলেন এবং বসলেন। আমরাও তাঁকে ঘিরে বসলাম। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁচছিলেন এবং বললেন, এমন কোন মানুষ নেই যার ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। অথবা সে হতভাগ্য না সৌভাগ্যবান সেকথা লিখিত হয়নি। তখন একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহ'লে আমরা কি অদৃষ্টের উপরে ভরসা করব এবং কাজ-কর্ম ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ 'তোমরা কাজ করে যাও। তোমরা প্রত্যেকে ঐ কাজ সহজে করবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।[২৯৮] অতঃপর তিনি বলেন,

أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}

'যারা সৌভাগ্যশালী হবে, তাদের জন্য সৌভাগ্যবানদের কাজ সহজ করে দেয়া হবে। আর যারা হতভাগ্য হবে, তাদের জন্য হতভাগাদের কাজ সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতগুলি পাঠ করলেন'।[২৯৯]

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) দু'টি খাতা হাতে করে এনে বললেন, এ দু'টি আল্লাহ্র কিতাব। এর মধ্যে ডান হাতের কিতাবটিতে জান্নাতীদের নাম ও বাম হাতেরটিতে জাহান্নামীদের নামের তালিকা আছে। এ তালিকায় কোন কাটছাট করা হবে না বা কমবেশী করা হবে না। তখন ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ যখন সবকিছু শেষ করে ফেলেছেন, তখন আর কাজ করা কেন? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, سَدِّدُوْا

২৯৮. বুখারী হা/৪৯৪৯; মুসলিম হা/২৬৪৭; মিশকাত হা/৮৫।
২৯৯. বুখারী হা/৪৯৪৫, ৪৭; মুসলিম হা/২৬৪৭; মিশকাত হা/৮৫ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

وَقَارِبُوْا 'তোমরা সৎকর্ম করে যাও এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন কর'। কেননা জান্নাতবাসী জান্নাতী কাজের উপরেই মৃত্যুবরণ করবে, ইতিপূর্বে সে যে কাজই করুক না কেন। আর জাহান্নামী ব্যক্তি জাহান্নামের কাজের উপরেই মৃত্যুবরণ করবে। ইতিপূর্বে সে যে কাজই করুক না কেন। এ সময় রাসূল (ছাঃ) হাত দিয়ে ইশারা করলেন ও খাতা দু'টি ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাদের পালনকর্তা তার বান্দাদের ব্যাপারে কাজ শেষ করে ফেলেছেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন, فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ 'একদল জান্নাতের জন্য ও একদল জাহান্নামের জন্য'।[৩০০]

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে মরফূ বর্ণনা এসেছে كُلُّ امْرِئٍ مُهَيَّأٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ 'প্রত্যেক মানুষকে প্রস্তুত করা হয়েছে, যেজন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।[৩০১]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। যাদের একজন বলেন, اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا 'হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও। অপরজন বলেন, اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস কর'।[৩০২] একই মর্মে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, দু'জন ফেরেশতা চিৎকার দিয়ে বলেন, যা জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্য সকলে শুনতে পায়। অতঃপর উক্ত বিষয়ে নাযিল হয় আলোচ্য ৫-১০ আয়াতগুলি (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى الخ)।[৩০৩]

(১১) وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى 'তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে'। رَدِىَ يَرْدَى وتَرَدَّى অর্থ هلك ومات وسقط فى جهنم ধ্বংস হওয়া, মৃত্যুবরণ করা, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

বখীলের ধন-সম্পদ যেমন তার জীবদ্দশায় কোন কাজে লাগে না, তার মৃত্যুর পরেও কোন কাজে লাগে না। কেননা মৃত্যুর পূর্বে সে মাল কমে যাওয়ার ভয়ে কোনরূপ ছাদাক্বায়ে জারিয়া করে যায় না। সে নিজের জন্য কিছু খরচ করে না, পরের জন্য তো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে মৃত্যুর পরে সে কিছুই পায় না। তার আমলনামা শূন্য থাকে। আল্লাহ বলেন, سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছিল, ক্বিয়ামতের দিন সেগুলিই তাদের গলায় বেড়ী হবে...' (*আলে ইমরান ৩/১৮০*)।

---

৩০০. শূরা ৪২/৭; তিরমিযী হা/২১৪১, মিশকাত হা/৯৬।
৩০১. আহমাদ হা/২৭৫২৭, সনদ ছহীহ; ছহীহাহ হা/২০৩৩।
৩০২. বুখারী হা/১৪৪২, মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০ 'যাকাত' অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ।
৩০৩. ইবনু জারীর ৩০/১৪২ পৃঃ; ইবনু কাছীর।

ক্বিয়ামতের দিন সে আফসোস করে বলবে, مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ- هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ- 'আমার মাল আমার কোন কাজে আসল না'। 'আমার রাজনৈতিক ক্ষমতা ধ্বংস হয়েছে' *(হা-ক্কাহ ৬৯/২৮-২৯)*। আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) কা'বা গৃহের ছায়ায় বসেছিলেন। এমন সময় আমাকে দেখে তিনি বললেন, هُمُ الأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 'কা'বার মালিকের কসম! অধিক ধনশালীরা ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি বলেন, এরা ক্বিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। কেবল তারা ব্যতীত, যারা নেকীর কাজে ছাদাক্বা করেছে'।[৩০৪] তিনি বলেন, তুমি ছাদাক্বা কর যখন তুমি সুস্থ, লোভী, দারিদ্র্যভীরু ও ধনী হওয়ার আকাংখী থাক। মৃত্যু ওষ্ঠাগত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো না।[৩০৫] তিনি আরও বলেন, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا 'কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনো একত্রিত হ'তে পারে না'।[৩০৬] আল্লাহ বলেন, أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ 'হে আদম সন্তান! তুমি দান কর। আমি তোমাকে দান করব'।[৩০৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْفِقِى وَلاَ تُحْصِى فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِى فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ 'তুমি দান কর। গণনা করো না। তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে দান করার সময় গণনা করবেন। ধরে রেখ না। তাহ'লে আল্লাহ তোমার ব্যাপারে (রহমতকে) ধরে রাখবেন। অতএব অল্প হলেও তুমি সাধ্যমত দান কর'।[৩০৮] তিনি বলেন, তোমরা ছাদাক্বা কর। কেননা এমন একটি যামানা তোমাদের নিকট আসছে, যখন মানুষ ছাদাক্বা নিয়ে ঘুরবে। কিন্তু তা নেওয়ার মত লোক পাবে না। তারা বলবে, গতকাল পেলে নিতাম, আজ আমার প্রয়োজন নেই'।[৩০৯]

(১২) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى 'নিশ্চয়ই আমাদের দায়িত্ব হ'ল পথ প্রদর্শন করা'।

অর্থাৎ আমাদের দায়িত্ব হ'ল ভ্রান্ত পথ হ'তে সঠিক পথ বাৎলে দেয়া। হারাম-হালাল ব্যাখ্যা দেয়া। ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ পথ সুস্পষ্ট করে দেয়া। যেমন আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَات مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ 'রামাযান মাস যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসাবে এবং হেদায়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে...' (*বাক্বারাহ ২/১৮৫*)। অন্যত্র

৩০৪. বুখারী হা/২৩৮৮, মুসলিম হা/৯৪; মিশকাত হা/১৮৬৮; কুরতুবী হা/১৫৩০।
৩০৫. বুখারী হা/১৪১৯, মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭ 'যাকাত' অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ।
৩০৬. নাসাঈ হা/৩১১০; মিশকাত হা/৩৮২৮ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৩০৭. বুখারী হা/৪৬৮৪, মুসলিম হা/৯৯৩; মিশকাত হা/১৮৬২ 'যাকাত' অধ্যায়।
৩০৮. বুখারী হা/২৫৯১, মুসলিম হা/১০২৯; মিশকাত হা/১৮৬১।
৩০৯. বুখারী হা/১৪১১, মুসলিম হা/১০১১; মিশকাত হা/১৮৬৬।

তিনি বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِراً وَّإِمَّا كَفُوْرًا– 'আমরা তাকে পথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে' (*দাহ্র ৭৬/৩*)।

বস্তুতঃ পথ প্রদর্শনের জন্যই আল্লাহ যেমন রাসূল পাঠিয়েছেন, তেমনি তাঁর সাথে কুরআন ও হাদীছ প্রেরণ করেছেন (*নাজম ৫৩/৩-৪; ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯*)। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) এ দু'টি বস্তুকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকার জন্য উম্মতে মুহাম্মাদীকে অছিয়ত করে গেছেন।[৩১০] কুরআন ও সুন্নাহ তাই রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া দুই জীবন্ত মু'জেযা হিসাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে অন্ধকারে চলার পথে ধ্রুবতারার ন্যায় সঠিক পথ প্রদর্শন করে যাবে।

অত্র আয়াতে একথা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্র দেখানো পথই প্রকৃত সুপথ এবং মানুষের জ্ঞান কখনোই চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না বা সত্যিকারের সুপথ প্রদর্শন করতে পারে না। এজন্য আল্লাহ নিজেই মানুষের হেদায়াতের দায়িত্ব নিয়েছেন। 'হেদায়াত' দু'প্রকারের। ১. তাওফীক লাভের হেদায়াত (هدى التوفيق)। যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র হাতে। ২. পথ দেখানোর হেদায়াত (هدى إرشاد)। যা আল্লাহ এবং নবী-রাসূল ও আলেমগণের পক্ষ হ'তে হয়ে থাকে। প্রথমটির দলীল, যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ 'নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি পসন্দ কর। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত দিয়ে থাকেন' (*ক্বাছাছ ২৮/৫৬*)। দ্বিতীয়টির দলীল, যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন করে থাকো' (*শূরা ৪২/৫২*)। আর আল্লাহ প্রদত্ত এই হেদায়াত মানুষের বিশ্বাস ও কর্মজগতের সর্বত্র রয়েছে। ইবাদাত ও মু'আমালাত সবকিছুতেই কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে তিনি মানবজাতির জন্য হেদায়াত প্রেরণ করেছেন। একবার জনৈক মুশরিক সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে বলে যে, قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ 'তোমাদের নবী তোমাদেরকে এমনকি পায়খানার আদবও শিখিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদের এটাও শিখিয়ে থাকেন'।[৩১১] কেননা ইসলামই কেবলমাত্র পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (*আলে ইমরান ৩/১৯*)। এতে কোন কিছুরই অপূর্ণতা নেই। আল্লাহ বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 'আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সকল বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ' (*নাহল ১৬/৮৯*)।

---

৩১০. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬।
৩১১. মুসলিম হা/২৬২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৭০।

(১৩) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى 'নিশ্চয়ই আমাদের মালিকানায় রয়েছে পরকাল ও ইহকাল'।

এখানে 'আখেরাত'কে আগে আনা হয়েছে তার গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য। তাছাড়া দুনিয়াতে কর্তৃত্ব অনেকের থাকতে পারে। কিন্তু আখেরাতে কর্তৃত্ব এককভাবে আল্লাহ্র। যেমন তিনি বলেন, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ '(আল্লাহ সেদিন জিজ্ঞেস করবেন) আজ কর্তৃত্ব কার? কেবলমাত্র আল্লাহ্র; যিনি একক ও পরাক্রমশালী' *(মুমিন/গাফের ৪০/১৬)*।

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক মালিকানা কেবলমাত্র আল্লাহ্র হাতে। এই মালিকানায় কেউ সামান্যতম শরীক নয়। আল্লাহ বলেন, فَسُبْحَانَ الَّذِيْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ 'অতএব পবিত্র তিনি, যার হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' (*ইয়াসীন ৩৬/৮৩*)। বস্তুতঃ সুপথে চলা ও পথভ্রষ্ট হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্র কোন লাভ-ক্ষতি নেই। বরং এতে কেবল বান্দারই কল্যাণ ও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(১৪) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى 'অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে ভয় প্রদর্শন করছি'।

تَلَظَّى لَظَى تَلْظِيَةً অর্থ تَشْتَعِلُ 'প্রজ্বলিত হওয়া'। 'জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৭০ গুণ বেশী দাহিকা শক্তি সম্পন্ন'।[৩১২] যার সর্বনিম্ন শাস্তি হ'ল, পাপীকে আগুনের জুতা ও ফিতা পরানো হবে, তাতেই তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটবে'।[৩১৩] জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে বহু বর্ণনা এসেছে।

এখানে আল্লাহ নিজেই জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করছেন। এর মধ্যে তিনটি বিষয় প্রতিভাত হয়। (১) জাহান্নাম যে অবধারিত সত্য সেটা দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে (২) এর দ্বারা জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে (৩) রাসূল (ছাঃ)-এর ভয় প্রদর্শন মূলতঃ আল্লাহ্রই ভয় প্রদর্শন, সেকথা বলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি নিজে কখনো সশরীরে মানুষের কাছে এসে ভয় দেখান না। অন্যত্র 'আমরা' বহুবচনের পদ ব্যবহার করলেও আল্লাহ এখানে 'আমি' একবচন পদ ব্যবহার করেছেন দৃঢ়ভাবে একথা বলে দেওয়ার জন্য যে, রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখ দিয়ে কুরআনের যে সকল বাণী মানবজাতির উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়, তা সবই সরাসরি আল্লাহ্র বাণী।

---

৩১২. বুখারী হা/৩২৬৫, মুসলিম হা/২৮৪৩; মিশকাত হা/৫৬৬৫ 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

৩১৩. বুখারী হা/১৪১১, মুসলিম হা/৬৫৬১; মিশকাত হা/৫৬৬৭।

এমনকি যে সকল হাদীছ তিনি বর্ণনা করেন, মর্মগত দিক দিয়ে সেগুলিও আল্লাহ্র বাণী। কেননা শারঈ বিষয়ে তিনি নিজে থেকে কোন কথা বলেন না, যতক্ষণ না তাকে 'অহি' করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحَى- 'তিনি নিজ থেকে কোন কথা বলেন না'। 'যা বলেন তা 'অহি' ব্যতীত কিছুই নয়, যা তাঁর নিকটে করা হয়' (*নাজম ৫৩/৩-৪*)।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন মানবজাতিকে জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে।[৩১৪] সেমতে মক্কায় নবুঅতী জীবনের শুরুতে যখন আল্লাহ্র হুকুম হ'ল, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর' (*শো'আরা ২৬/২১৪*), তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম স্বীয় আত্মীয়-পরিজনকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন। ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে সবাইকে ডেকে তিনি বলেন,

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ هَاشِمٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا -

'হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা'ব বিন লুআই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কবল থেকে কোনই কাজে আসব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহ্র পাকড়াও হ'তে রক্ষা করতে পারব না'। তবে তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ وَلاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا 'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী নাও। কিন্তু আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না'।[৩১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِلاَّ أَنْ

৩১৪. আহযাব ৩৩/৪৫; বুখারী হা/২১২৫, মিশকাত হা/৫৭৫২।
৩১৫. বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৪, ২০৬; আহমাদ হা/৮৭১১; মিশকাত হা/৫৩৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-২৬।

تَقُوْلُوْا لَآ إِله إِلا الله 'তবে যদি তোমরা বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ১/৬৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই ভয় প্রদর্শন মাদানী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সর্বদা তিনি মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার আহ্বান জানাতেন। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে (জুম'আর) খুৎবায় বলতে শুনেছি أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ 'আমি তোমাদের জাহান্নামের ভয় দেখাচ্ছি, আমি তোমাদের জাহান্নামের ভয় দেখাচ্ছি, আমি তোমাদের জাহান্নামের ভয় দেখাচ্ছি'। রাবী বলেন, তিনি কথাগুলি এত জোরে জোরে বলেন যে, لَوْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِالسُّوْقِ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِيْ هَذَا 'যদি কোন লোক বাজারে থাকে, তাহ'লে আমার এই স্থান থেকে সে শুনতে পেত'। তিনি বলেন, এই সময় তাঁর কাঁধের চাদর নীচে পায়ের কাছে পড়ে যায়। রাবী বলেন, ঐ খুৎবায় রাসূল (ছাঃ) একথাও বলেন,

إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا-

'জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তারাই, যাদের দু'পায়ের জুতা ও ফিতা আগুনের হবে। যার কঠিন তাপে তার মস্তিষ্কের ঘিলু টগবগ করে ফুটবে, যেমনভাবে উত্তপ্ত ডেগের ফুটন্ত পানি টগবগ করে ফুটে থাকে। সে ভাববে যে তার চাইতে কঠিন শাস্তি কারু হচ্ছে না। অথচ এটাই হ'ল সবচেয়ে হালকা শাস্তি'।[৩১৬]

(১৫-১৬) لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الْأَشْقَى، الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى 'যাতে প্রবেশ করবে না হতভাগা ব্যতীত'। 'যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়'।

পূর্বের আয়াতে الْأَتْقَى-এর বিপরীতে এখানে الْأَشْقَى এসেছে। অর্থাৎ সর্বাধিক হতভাগা। যাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে আছে। তাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল كَذَّبَ بالخبر وَتَوَلَّى عن الأمر 'সে প্রথমে অহি-র বিধানে মিথ্যারোপ করে, অতঃপর বিধান মান্য করা থেকে পিঠ ফিরিয়ে নেয়'।

আবু জাহল, উমাইয়া বিন খালাফ ও তাদের ন্যায় দুষ্ট লোকদের উদ্দেশ্যে আয়াতটি নাযিল হয় (*কুরতুবী*)। কেননা এরা ছিল মক্কার সবচেয়ে দুরাচার নেতৃবৃন্দ। যারা রাসূল

৩১৬. মুসলিম হা/২১৩, বুখারী হা/৬৫৬১, হাকেম ১/২৮৭ 'জুম'আ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৬৬৭ 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

(ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং তাঁকে সত্য জেনেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তবে আয়াতটির মর্ম সকল যুগের হতভাগাদের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ 'অতঃপর যারা দুর্ভাগা হবে, তারা জাহান্নামে যাবে' (*হূদ ১১/১০৬*)। وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ 'পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে' (*হূদ ১১/১০৮*)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى– 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল তারা ব্যতীত যারা অস্বীকার করে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কারা অস্বীকার করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যারা আমার আনুগত্য করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা আমার অবাধ্যতা করে, তারাই অস্বীকার করে'।[৩১৭]

আবু ইসহাক আয-যাজ্জাজ বলেন, মুর্জিয়াগণ এই আয়াতকে দলীলরূপে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, لا يدخل النار إلا كافر 'জাহান্নামে কেবল কাফেররাই প্রবেশ করবে'। মুমিনরা নয়। কেননা তাদের নিকট হৃদয়ে বিশ্বাস অথবা মুখে স্বীকৃতিই মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমল শর্ত নয়। কারণ আমল ঈমানের অংশ নয়'। অথচ এই আয়াত থেকে তাদের দলীল নেবার কোন সুযোগ নেই। কেননা জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'ল মুনাফিকদের জন্য। যারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে (*নিসা ৪/১৪৫*)। আল্লাহপাক জাহান্নামীদের নানাবিধ শাস্তির কথা বলেছেন। আল্লাহ যার জন্য যেরূপ শাস্তি নির্ধারণ করবেন, তাকে সেভাবেই শাস্তি দিবেন। আল্লাহ বলেছেন, শিরকের গোনাহ তিনি মাফ করবেন না। এছাড়া বাকী সকল গোনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন (*নিসা ৪/৪৮,১১৬*)। এক্ষণে ঐসব পাপী যারা শিরক করেনি, তাদের কারু যদি পাপের শাস্তি তিনি না দিবেন, তাহ'লে 'তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন' বলার তো কোন অর্থ হয় না' (*কুরতুবী*)। অতএব প্রকৃত কথা এই যে, কবীরা গোনাহগার মুমিন যদি তওবা না করে মারা যায়, তাহ'লে পাপের শাস্তিস্বরূপ সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আতে এবং আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে তারা পরবর্তীতে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে তাদের খালেছ ঈমানের বদৌলতে, যদি সেটা থাকে।

---

৩১৭. বুখারী হা/৭২৮০ 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৪৩।

ক্বাতাদাহ বলেন, كَذَّبَ وَتَوَلَّى অর্থ كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله ‘সে আল্লাহ্র কিতাবে মিথ্যারোপ করে ও আল্লাহ্র আনুগত্য হ’তে মুখ ফিরিয়ে নেয়’। ফার্রা বলেন, لم يكن كذب بردّ ظاهر، ولكن قصر عما أمر به من الطاعة ‘প্রকাশ্যে রদ করার মাধ্যমে সে মিথ্যারোপ করে না। বরং আল্লাহ্র আদিষ্ট বিষয়সমূহ মান্য করতে কছূর করার ফলে তা মিথ্যারোপ হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে যায়’ (*কুরতুবী*)। বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিম সরকার ও সমাজনেতাগণ এটাই করে থাকেন।

(১৭) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ‘সত্বর এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে’।

الْأَتْقَى আধিক্য জ্ঞাপক বিশেষ্য (اسم تفضيل) হয়েছে تقوى থেকে। যার অর্থ সর্বাধিক আল্লাহভীরু। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে শুদ্ধ চরিত্র সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে। এতে বুঝা যায় যে, কেবল ঈমান আনলেই সে জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে না। বরং তাকে যথার্থভাবে মুত্তাক্বী হ’তে হবে। সেকারণ ঈমানদারগণকে ডাক দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যথার্থ ভয়। আর অবশ্যই তোমরা মরো না সত্যিকারের মুসলিম না হয়ে’ (*আলে ইমরান ৩/১০২*)।

বিশ্বাস, আল্লাহভীতি ও কর্মে বাস্তবায়ন- তিনটি বিষয়কে এখানে একত্রিত করে বলা হয়েছে। যাতে বুঝা যায় যে, শুধু বিশ্বাস দিয়ে আমল হয় না, বরং আমলের জন্য চাই আল্লাহভীতি। বিশ্বাস আছে কিন্তু আল্লাহভীতি নেই, সে ব্যক্তির আমলে খুলূছিয়াত নেই। অতএব তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে না।

(১৮) الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكَّى ‘যে তার ধন-সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য’।

زَكَّى تَزْكِيَةً ‘পবিত্র করা’ সেখান থেকে يَتَزَكَّى ‘সে পবিত্রতা অর্জন করে’। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার মাল-সম্পদ খরচ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই দেখানো পথে আত্মশুদ্ধি ও মালশুদ্ধির জন্য। এর মধ্যে কোনরূপ শ্রুতি বা লোক দেখানো উদ্দেশ্য থাকে না। আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ‘(হে রাসূল!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হ’তে যাকাত গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে এবং তুমি তাদের জন্য দো‘আ কর। নিশ্চয়ই তোমার দো‘আ তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(তওবা ৯/১০৩)*। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি অপচয় করে না বা কার্পণ্য করে না। বরং মালশুদ্ধির জন্য আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে। যেমন আল্লাহ

বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 'আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্য করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যম পন্থায় থাকে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*।

(১৯) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى 'এবং কারু জন্য তার নিকটে কোনরূপ অনুগ্রহ থাকে না যা প্রতিদান যোগ্য'।

جَزَى يَجْزِى جَزَاءً 'বদলা দেওয়া, যথেষ্ট হওয়া'। অর্থাৎ কারু কোনরূপ অনুগ্রহ বা দানের প্রতিদান হিসাবে তিনি দান করেন না বা কারু প্রতি কোন অনুগ্রহের দায়বদ্ধতা তার মধ্যে থাকে না।

ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবায়ের ও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে আয়াতগুলি আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা বলেন যে, উমাইয়া ইবনে খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন বেলাল বিন রাবাহ। ইসলাম কবুলের অপরাধে তাঁর উপরে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হ'ত। প্রচণ্ড রোদে স্ফুলিঙ্গ সদৃশ মরু বালুকার উপরে হাত-পা বেঁধে তাকে নগ্নদেহে চিৎ করে ফেলে বুকের উপরে ভারি পাথর চাপিয়ে দেয়া হ'ত। আর বলা হ'ত لاَ تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى تَمُوْتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ 'তোকে এভাবেই থাকতে হবে, যতক্ষণ না তুই মরবি অথবা মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবি'। কিন্তু ঐ অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যেও বেলালের মুখ থেকে কেবলি বের হ'ত 'আহাদ' 'আহাদ'। একদিন রাসূল (ছাঃ) পাশ দিয়ে যাবার সময় এই দৃশ্য দেখলেন এবং বললেন, أَحَدٌ يُنْجِيْكَ 'নিশ্চয়ই 'আহাদ' অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবেন'। তিনি আবুবকরকে যেয়ে বললেন, يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ بِلاَلاً يُعَذَّبُ فِي اللهِ 'হে আবুবকর! নিশ্চয়ই বেলাল আল্লাহ্র পথে শাস্তি ভোগ করছে'। আবুবকর ইঙ্গিত বুঝলেন। অতঃপর তিনি উমাইয়া বিন খালাফের কাছ থেকে তার দাবী অনুযায়ী নিজের 'কাফের' গোলাম 'নিসতাস' (نسطاس) -এর বিনিময়ে এবং একটি মূল্যবান চাদর ও ১০টি স্বর্ণমুদ্রার (উক্বিয়া) বিনিময়ে বেলালকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। তখন কাফেররা বলতে থাকে যে, আবুবকরের উপরে বেলালের অনুগ্রহ ছিল, যার প্রতিদান হিসাবে তিনি তাকে মুক্ত করেছেন। তখন অত্র আয়াতদ্বয় নাযিল হয়।[৩১৮] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলতেন, أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا. يَعْنِى بِلاَلاً 'আমাদের নেতা আবুবকর মুক্ত করেছেন আমাদের নেতাকে'। এর দ্বারা তিনি বেলালকে বুঝাতেন'।[৩১৯]

৩১৮. কুরতুবী হা/৬৩৫৮; হাকেম ২/৫২৫; তাফসীর তানতাভী ২৫/২০৪।
৩১৯. বুখারী হা/৩৭৫৪; মিশকাত হা/৬২৫০ 'মর্যাদা সমষ্টি' অনুচ্ছেদ।

বেলালসহ বহু দাস-দাসীকে মুক্ত করার প্রশংসা করে আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) যে কবিতা রচনা করেন, তার প্রথম লাইন ছিল নিম্নরূপ :

جَزَى اللهُ خَيْرًا عَنْ بِلاَل وَصَحْبِهِ + عَتِيْقًا وَأَخْزَىْ فَاكِهًا وَأَبَا جَهْلٍ

'বেলাল ও তার সাথীদের পক্ষ হ'তে আল্লাহ উত্তম জাযা দান করুন আবুবকরকে এবং তিনি লজ্জিত করুন উমাইয়া বিন খালাফ ও আবু জাহলকে' *(তানতাভী)*। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, নাযিলের কারণ যেটাই হৌক না কেন, এর বক্তব্য সকল নিঃস্বার্থ দানশীল মুমিনের জন্য।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ওমর ফারূক (রাঃ) এখানে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং কৃষ্ণাঙ্গ দাস বেলাল (রাঃ) উভয়কে 'সাইয়িদুনা' (আমাদের নেতা) বলেছেন। এতেই বুঝা যায়, ইসলাম মানুষের অন্তরে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, নিমেষে মনিব ও ক্রীতদাসকে এক আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সমান মর্যাদায় আসীন করে দিয়েছিল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

(২০) إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى 'কেবলমাত্র তার মহান পালনকর্তার চেহারা অন্বেষণ ব্যতীত'।

জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখবেন, এখানে সেকথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমর্মে কুরআনে বহু আয়াত ও বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৩২০]

ইবনু কাছীর বলেন, أَيْ طَمَعًا فِي أَنْ يَحْصُلَ لَهُ رُؤْيَتُهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ 'অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি দান করে কেবলমাত্র এই আকাংখায় যেন আখেরাতে জান্নাতের বাগিচায় তার জন্য আল্লাহ্র দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়'। পক্ষান্তরে কুরতুবী ব্যাখ্যা করেছেন, أى ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَمَا يُقَرِّبُ مِنْهُ 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে'।

জালালায়েন ব্যাখ্যা করেছেন, طَلَبَ ثَوَابِ اللهِ 'আল্লাহ্র ছওয়াব লাভের জন্য'।[৩২১]

বলা আবশ্যক যে, ইবনু কাছীর-এর তাফসীরে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা এবং কুরতুবী ও জালালায়েন-এর তাফসীরে ভ্রান্ত ফের্কা মু'তাযেলী আক্বীদার প্রতিফলন ঘটেছে। যারা

---

৩২০. তাফসীর দ্রঃ সূরা মুত্বাফফেফীন ১৫ আয়াত।

৩২১. 'জালালায়েন' অর্থ দুই জালাল। অর্থাৎ জালালুদ্দীন সৈয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হিঃ), যিনি সূরা বাক্বারাহ্র শুরু থেকে সূরা বনু ইস্রাঈলের শেষ পর্যন্ত তাফসীর করেছেন। দ্বিতীয়জন হ'লেন জালালুদ্দীন মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হিঃ), যিনি সূরা কাহফের শুরু থেকে সূরা নাস পর্যন্ত তাফসীর করেছেন। উভয়ে মিসরীয় শাফেঈ ছিলেন। দু'জনের তাফসীরের ধারা একই এবং আল্লাহ্র গুণাবলীর ক্ষেত্রে উভয়ের আক্বীদা মু'তাযেলীদের অনুরূপ। যদিও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) জান্নাতে আল্লাহ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।

আল্লাহ্র নিরেট একত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করেন। তাদের মতে আল্লাহ্র নাম ও নামীয় সত্তা পৃথক। আল্লাহ্র সাথে তাঁর গুণাবলীকে ক্বাদীম বা সনাতন মনে করলে সেটা 'শিরক' হবে। এইসব বক্তব্যের পিছনে তাদের কাছে কোন দলীল নেই, যুক্তিও নেই। কেননা ফুল থেকে তার সুগন্ধিকে যেমন পৃথক করা যায় না, আল্লাহ্র সত্তা থেকে তাঁর গুণাবলীকে তেমনি পৃথক করা যায় না। আর এটা শিরক হবার প্রশ্নই ওঠে না। তারা 'আল্লাহ্র চেহারা'-কে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হিসাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতী মুমিনগণ আল্লাহকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন। যেমন মেঘমুক্ত রাতে পূর্ণিমার চাঁদকে স্পষ্ট দেখা যায়- মর্মের ছহীহ হাদীছসমূহকে তারা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দূরতম ব্যাখ্যা করেন। একইভাবে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র হাত, পা, চেহারা ইত্যাদিসহ অন্যান্য গুণবাচক আয়াতসমূহের বিভিন্ন কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাদের এই যুক্তিবাদের বেড়াজালে আটকে গেছেন বিগত ও বর্তমান যুগের অসংখ্য মুফাসসিরে কুরআন। অথচ এ বিষয়ে বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের আক্বীদা। আর তা হ'ল এই যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহে আল্লাহ্র গুণবাচক বিষয়সমূহ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই প্রকাশ্য অর্থে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ আল্লাহ্র চেহারা ও তাঁর আকৃতি তেমন, যেমন তাঁর মহান সত্তার উপযুক্ত এবং যা তিনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন (ما يليق بشأنه وما يختص لنفسه)। এটি গায়েবী বিষয়। এখানে কল্পনার কোন সুযোগ নেই। ইবনু কাছীরের তাফসীরের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সকল তাফসীরে আল্লাহ্র গুণবাচক আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় মু'তাযেলীদের অনুসরণ করা হয়েছে।[৩২২]

(২১) وَلَسَوْفَ يَرْضَى 'আর অবশ্যই সে অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে'।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূর্বে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করবে, সে ব্যক্তি সত্বর আল্লাহ্র সন্তোষ লাভে ধন্য হবে। আর তা হ'ল- (ক) সর্বাধিক আল্লাহভীরু হওয়া এবং (খ) স্রেফ আত্মশুদ্ধি ও মালশুদ্ধির জন্য আল্লাহ্র ওয়াস্তে ব্যয় করা'। এখানে سوف এসেছে تحقيق বা নিশ্চয়তাবোধক অর্থে। অর্থাৎ অবশ্যই সে অচিরে আল্লাহ্র সন্তোষভাজন হবে অশেষ ছওয়াব লাভের মাধ্যমে। যেমন তিনি বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ

---

৩২২. (ক) মাওলানা মওদূদী *তাফহীমুল কুরআনে* অত্র আয়াতের অনুবাদ করেছেন, اپنے رب تركي رضاجوئ كيلئے (নিজের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য)। (খ) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা এবং (গ) মাওলানা মহিউদ্দীন খান *মা'আরেফুল কুরআনে* একই মর্মের অনুবাদ করেছেন, যা ভুল। (ঘ) ড. মুজীবুর রহমান *তাফসীর ইবনু কাছীরে* অনুবাদ করেছেন, মহান প্রতিপালকের মুখমণ্ডল (সন্তোষ) লাভের আশায়'। এখানে তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন।

–وَاسِعٌ عَلِيمٌ 'যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, যা থেকে উৎপন্ন হ'ল সাতটা শিষ, প্রত্যেক শিষে উৎপন্ন হ'ল একশ' শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে আরো বর্ধিত করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রশস্ত দাতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*। বস্তুতঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার চূড়ান্ত প্রতিদান হ'ল আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ইবনু কাছীর বলেন, একাধিক মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতগুলি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর শানে নাযিল হয়েছে। অনেকে এ বিষয়ে 'ইজমা' দাবী করেছেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, তিনি এর মধ্যে শামিল আছেন। যদিও আয়াতের মর্ম ব্যাপক এবং সর্বযুগীয়। নিঃসন্দেহে আবুবকর (রাঃ)-এর মহান চরিত্রে উপরোক্ত গুণাবলীর একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। আল্লাহভীরুতা ও নিঃস্বার্থ দানশীলতায় তিনি ছিলেন উম্মতের সেরা ব্যক্তিত্ব। ছাক্বীফ গোত্রের নেতা ওরওয়া ইবনে মাসঊদের মত আরবের কাফের নেতারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে প্রকাশ্যে সেকথা স্বীকার করেছিলেন *(ইবনু কাছীর)*। এটা যদি হয় শত্রুপক্ষের নেতাদের স্বীকারোক্তি, তাহ'লে অন্যদের স্বীকৃতি কেমন ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

শেষের আয়াতটিতে যেন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর জন্য জান্নাতের অগ্রিম সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ دُعِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় কোন বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে (যেমন মুছল্লী, মুজাহিদ, দাতা ও ছায়েমদের দরজা)। আবুবকর বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহ্বানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজাই যথেষ্ট)। তবে আসলে কি কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ 'হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৩২৩] আল্লাহ আমাদেরকে ঐ সকল পবিত্রাত্মাগণের সাথে জান্নাতের অধিবাসী করুন -আমীন!

সারকথা :

আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য দু'ধরনের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ফলে প্রত্যেকে সেই কাজ সহজে করে, যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

---

৩২৩. বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ 'যাকাত' অধ্যায়-৬, 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ-৬।

সূরা যোহা (পূর্বাহ্ন)

সূরা ফজরের পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৯৩, আয়াত ১১, শব্দ ৪০, বর্ণ ১৬৪।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ পূর্বাহ্নের,

وَالضُّحٰى ①

(২) শপথ রাত্রির, যখন তা নিথর হয়;

وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ②

(৩) তোমার পালনকর্তা তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার উপরে বিরূপ হননি।

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ③

(৪) নিশ্চয়ই পরকাল তোমার জন্য ইহকালের চাইতে শ্রেয়।

وَلَلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰى ④

(৫) তোমার পালনকর্তা সত্বর তোমাকে দান করবেন। অতঃপর তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيۡكَ رَبُّكَ فَتَرۡضٰى ⑤

(৬) তিনি কি তোমাকে ইয়াতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।

اَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيۡمًا فَاٰوٰى ⑥

(৭) তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত। অতঃপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন।

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ⑦

(৮) তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন নিঃস্ব। অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغۡنٰى ⑧

(৯) অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবে না।

فَاَمَّا الۡيَتِيۡمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ⑨

(১০) এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ধমকাবে না।

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ⑩

(১১) অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর ॥

وَاَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ⑪

বিষয়বস্তু :

এই সূরাতে দু'টি বিষয়বস্তু রয়েছে। (১) দিবস ও রাত্রির কসম করে আল্লাহ বলছেন যে, তিনি তাঁর রাসূলের সাথে কখনোই সম্পর্কচ্ছেদ করেননি বা তাঁর প্রতি রুষ্ট হননি। বরং আশ্বাস রয়েছে এই মর্মে যে, পূর্বের চাইতে আগামীতে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ এবং অহি-র অবতরণ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে তিনি আরও খুশী হবেন (১-৫ *আয়াত*)।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে বিগত দিনে কৃত কয়েকটি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, আগামী দিনেও তা অব্যাহত থাকবে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে উক্ত নে'মতসমূহের শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (৬-১১ *আয়াত*)।

গুরুত্ব :

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয বিন জাবালকে বলেন, তুমি কি ছালাতে সূরা আ'লা, ফজর, শাম্স, লায়েল, যোহা পড়তে পারো না'?[৩২৪]

শানে নুযূল :

হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ বিন সুফিয়ান আল-বাজালী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থতার কারণে দু'রাত বা তিনরাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। তাতে জনৈকা মহিলা[৩২৫] এসে বলল, يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ 'হে মুহাম্মাদ! আমি মনে করি তোমার শয়তানটা তোমাকে ছেড়ে গেছে'। তখন এই সূরাটি নাযিল হয়'।[৩২৬] উল্লেখ্য যে, জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) মাদানী ছাহাবী ছিলেন। এখানে বর্ণিত ঘটনাটি মক্কার। তিনি এটি অন্য ছাহাবী থেকে শুনে বর্ণনা করে থাকবেন। হাদীছের পরিভাষায় একে 'মুরসাল ছাহাবী' বলা হয়। যা গ্রহণযোগ্য। কেননা হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল ছাহাবী ন্যায়নিষ্ঠ।

একটি প্রথা :

ক্বিরাআত শাস্ত্রের ইমাম বলে খ্যাত আবুল হাসান আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু কাছীর আবু বাযা আল-মুক্বরী হ'তে একক সূত্রে বর্ণিত একটি প্রথা এই যে, সূরা যোহা থেকে আম্মাপারার সর্বশেষ সূরা নাস পর্যন্ত ক্বারী প্রতিটি সূরা শেষে 'আল্লাহু আকবর' বলবেন। কেউ বলেছেন ঐ সাথে যোগ করবেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর'। কেউ বলেছেন, সূরা লায়েল-এর শেষ থেকে তাকবীর বলতে হবে।[৩২৭]

ক্বারীগণ বলে থাকেন, সাময়িক বিরতি শেষে জিব্রীল যখন এই সূরাটি নিয়ে আগমন করেন এবং শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন, তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুশীতে 'আল্লাহু আকবর' বলে ওঠেন'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এই বর্ণনার পক্ষে তাঁরা কোন সনদ

---

৩২৪. বুখারী হা/৬১০৬, মুসলিম হা/৪৬৫; মিশকাত হা/৮৩৩; বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : সূরা ফজর।

৩২৫. ইনি নিকটতম প্রতিবেশী চাচা আবু লাহাবের স্ত্রী ও আবু সুফিয়ানের বোন উম্মে জামীল 'আওরা বিনতে হারব *(ইবনু কাছীর)*।

৩২৬. বুখারী হা/৪৯৫০,৪৯৫১; মুসলিম হা/১৭৯৭; নাসাঈ হা/১১৬৮১; ত্বাবারী হা/৩৭৫০৩।

৩২৭. হাকেম ২/২৩০ হা/২৯০৫ উবাই বিন কা'ব হ'তে; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৩৩; বাগাভী, ইবনু কাছীর, কুরতুবী হা/৬৩৮১ ও ৬৩৮২।

উল্লেখ করেননি, যার ভিত্তিতে ছহীহ বা যঈফ নির্ধারণ করা যেতে পারে *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।[৩২৮]

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনের প্রতিটি সূরা, আয়াত ও বর্ণ মুতাওয়াতির যা অবিরত ধারায় বর্ণিত হয়েছে। তাতে কোনরূপ কমবেশী হওয়ার সুযোগ নেই। অতএব বর্ণিত 'তাকবীর' কখনোই কুরআনের অংশ নয়। 'বিসমিল্লাহ' যেখানে প্রতি সূরার শুরুতে প্রথম থেকেই লিখিত থাকা সত্ত্বেও তা কুরআনের অংশ নয়। তাহ'লে 'তাকবীর' কিভাবে কুরআনের অংশ হবে, যা লিখিত নেই? এটি এককভাবে বর্ণিত একটি প্রথা হিসাবে চালু হয়েছে, যা ক্বারী আব্দুল্লাহ ইবনু কাছীর পসন্দ করেছেন। তিনি এটাকে ওয়াজিব বলেননি, যা পরিত্যাগ করা অন্যায় হবে (*কুরতুবী*)। অতএব এই প্রথা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

তাফসীর :

(১-২) وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى 'শপথ পূর্বাহ্নের'। 'শপথ রাত্রির, যখন তা নিথর হয়'।

আরবদের পরিভাষায় সূর্যোদয়ের স্বল্পকালীন পরবর্তী সময়কে 'যোহা' বলা হয় (*কুরতুবী*)। অনেকে পুরা দিবসকে 'যোহা' বলেছেন (*কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তানতাভী*)। যেমন আল্লাহ বলেন, أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ– 'আর জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আমার আযাব এসে পড়বে দিনের বেলায়, যখন তারা থাকবে খেলাধুলায় মত্ত' (*আ'রাফ ৭/৯৮*)।

سَجَا يَسْجُوْ سَجْوًا 'রাত্রি নিথর হওয়া'। إِذَا سَجَى অর্থ إذا سكن أهله وأصواتهم فيه 'যখন এর অধিবাসীগণ ও তাদের আওয়াযসমূহ নীরব হয়ে যায়' (*তানতাভী*)। অর্থাৎ রাত্রি যখন গভীর হয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا 'এবং রাতকে করেছেন নিথর' (*আন'আম ৬/৯৬*)।

আল্লাহ এখানে সূর্য করোজ্জ্বল দিবসের এবং তার বিপরীত নিকষ কালো আঁধারে ঢাকা নিষুতি রাতের শপথ করার মাধ্যমে একদিকে যেমন তাঁর অসীম কুদরত ও ক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তেমনি বান্দাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তোমার শব্দমুখর যবান ও কর্মমুখর জীবনের যখন অবসান হবে, তখন নীরব ও নিঃশব্দ রাতের

---

৩২৮. তাফসীর ইবনু কাছীরের দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ (বৈরূত : ১৪১৯/১৯৯৮ খৃঃ) সংস্করণে কুর্রা (القراء) লেখা হয়েছে। কিন্তু দারুল হাদীছ (কায়রো : ১৪২৩/২০০২ খৃঃ) সংস্করণে ফার্রা (الفراء) লেখা হয়েছে। প্রথমটাই সঠিক। কেননা বক্তব্যের শেষদিকে ইবনু কাছীর বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহার করে বলেছেন, ولم يرو ذلك باسناد 'তারা এব্যাপারে কোন সনদ উল্লেখ করেননি'। সম্ভবতঃ মুদ্রণকালে ভুলক্রমে ক্বাফ-এর বদলে 'ফা' লেখা হয়েছে। সেকারণ القراء-এর বদলে الفراء হয়ে গেছে।

মত তোমার শক্তিহীন, শব্দহীন ও প্রাণহীন লাশটি পড়ে থাকবে অসহায়ভাবে দাফনের অপেক্ষায়। অতএব হে বান্দা! প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এবং দিবস ও রাত্রির আগমন ও নির্গমন থেকে শিক্ষা নাও। মহাশক্তিধর আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর উপরে মিথ্যারোপ বন্ধ কর।

(৩) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى 'তোমার পালনকর্তা তোমাকে ত্যাগ করেননি বা তোমার উপরে বিরূপ হননি'।

অর্থাৎ কাফেরদের মিথ্যাচার ও অপপ্রচার অনুযায়ী তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার উপরে রুষ্ট হননি। এখানে ইবনু আব্বাস ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ) 'তাশদীদ' ছাড়াই مَا وَدَعَكَ পড়েছেন। যার অর্থ مَا تَرَكَكَ 'তোমাকে পরিত্যাগ করেননি'। তবে অন্য সবাই ما وَدَّعَكَ তাশদীদযুক্ত পড়েছেন। যার অর্থ مَا قَطَعَكَ قَطْعَ المودِّع 'তোমাকে ছাড়েননি বিদায় দানকারীর বিদায়ের ন্যায়' *(কুরতুবী)*।

وَمَا قَلَى অর্থ وما أبغضك 'তোমার প্রতি রুষ্ট হননি'। আসলে হওয়া উচিত ছিল وَمَا قَلاَكَ কিন্তু পূর্বের ক্রিয়ায় كَ উল্লেখিত হওয়ায় এবং আয়াতের শেষে হওয়ায় অলংকার শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী এখানে كَ কর্মপদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْراً وَّالذَّاكِرَاتِ 'আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও নারীগণ' (*আহযাব ৩৩/৩৫*)। এখানে শেষে الله কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি পূর্বে উল্লেখিত হওয়ার কারণে।

এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যখন থেকে আল্লাহ তোমাকে ভালবেসেছেন এবং তোমার উপরে 'অহি' নাযিল শুরু হয়েছে, তখন থেকে আল্লাহ কখনোই তোমার উপরে রুষ্ট বা বিরূপ হননি। বরং সর্বদা তোমার উপরে তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হ'তে থাকবে। দিবস ও রাত্রির শপথের মধ্যে এ গূঢ় রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যে, যে রাসূল সারা দিন কঠিন বিরোধিতার মুখে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং রাতের বেলায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে তাহাজ্জুদের ছালাতে মগ্ন থাকেন, দয়ালু আল্লাহ কি কখনো সেই রাসূলকে পরিত্যাগ করতে পারেন?

(৪) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُوْلَى 'নিশ্চয় পরকাল তোমার জন্য ইহকালের চাইতে শ্রেয়।

এটি পৃথক বক্তব্য হিসাবে এসেছে এবং শুরুতে لام تاكيد এনে বাক্যটিকে নিশ্চয়তা বোধক করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আখেরাত নিশ্চিতভাবে দুনিয়ার চাইতে উত্তম।

কেননা আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কর্ণ কখনো শোনেনি, মানুষের হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি'। 'কোন মানুষ জানেনা তার কৃতকর্মের পুরস্কার হিসাবে তার জন্য চক্ষু শীতলকারী কত বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে'।[৩২৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জান্নাতের একটি চাবুক রাখার স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চাইতে উত্তম'।[৩৩০]

মিথ্যারোপ, অপবাদ, গালি, ছিদ্রান্বেষণ- এগুলি সব ইহকালীন জীবনের অনুষঙ্গ। এগুলিতে ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে পরকালে রয়েছে অফুরন্ত শান্তি। ইহকালের ক্ষণস্থায়ী কষ্টকর জীবনের বিপরীতে পরকালের চিরস্থায়ী শান্তির জীবন নিঃসন্দেহে উত্তম। অতএব আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হে রাসূল! কাফেরদের দেয়া অপবাদে দুঃখিত ও মর্মাহত হবেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি চাটাইয়ের উপরে শুয়েছিলেন। তাতে তাঁর পিঠে দাগ পড়ে যায়। তিনি জেগে উঠলে আমি তাঁর পিঠে হাত বুলাতে লাগলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি আমাদের অনুমতি দিতেন, যাতে আমরা আপনার চাটাইয়ের উপর (নরম) কিছু বিছিয়ে দেই। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا– 'আমার জন্যই বা কি? আর দুনিয়ার জন্যই বা কি? আমিই বা কি? আর দুনিয়াই বা কি? আমার ও দুনিয়ার তুলনা তো একজন সওয়ারীর ন্যায়, যে গাছের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। অতঃপর রওয়ানা হ'ল ও তাকে ছেড়ে গেল'।[৩৩১]

(৫) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 'তোমার পালনকর্তা সত্বর তোমাকে দান করবেন। অতঃপর তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে'।

سوف তাকীদ ও নিশ্চয়তার জন্য এসেছে। যা আখেরাতে হবে। ইবনু কাছীর বলেন, আখেরাতে তাঁকে উচ্চ সম্মান প্রদান করা হবে এবং তাঁর উম্মতের ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্ট করা হবে'। আখেরাতে দেওয়া সম্মানসমূহের মধ্যে প্রধান হ'ল হাউয কাওছার দান ও সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফা'আতের অনুমতি প্রদান। যাকে কুরআনে 'মাক্বামে মাহমূদ' বা 'সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান' বলা হয়েছে।[৩৩২]

---

৩২৯. বুখারী হা/৩২৪৪, মুসলিম হা/২৮২৪, মিশকাত হা/৫৬১২; সাজদাহ ৩২/১৭।
৩৩০. বুখারী হা/৩২৫০, মিশকাত হা/৫৬১৩।
৩৩১. তিরমিযী হা/২৩৭৭; আলবানী, মিশকাত হা/৫১৮৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৪৩৯।
৩৩২. বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯; বুখারী হা/৭৪৪০, মুসলিম হা/১৯৩; মিশকাত হা/৫৫৭২।

ইবনু ইসহাক বলেন, যার অর্থ হ'ল الفَلْج فى الدنيا والثواب فى الآخرة 'দুনিয়াতে সফলতা ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান' (*কুরতুবী*)। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনে দুনিয়াতেও সফলতা ছিল এবং আখেরাতে তো সফলতা আছেই।

(৬) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْماً فَآوَى 'তিনি কি তোমাকে ইয়াতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন'।

এখান থেকে পরপর তিনটি আয়াতে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাঁকে দুনিয়াতে যেসব নে'মত ইতিমধ্যে দান করেছেন, সেগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম যে বড় অনুগ্রহ তাঁর উপর তিনি করেছিলেন, সেটি এই যে, তিনি পিতৃহীন ইয়াতীমরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর মাতৃহারা হন। সেই অসহায় অবস্থায় আল্লাহ তাঁর বৃদ্ধ দাদা ও পরে তাঁর চাচা আবু তালেবের আশ্রয়ে তাঁকে লালন-পালন করেন। দাদা ও চাচার অন্তরে আল্লাহ এমন মহব্বত ঢেলে দিয়েছিলেন যে, নিজের সন্তানের চাইতে ইয়াতীম মুহাম্মাদের প্রতি তাদের স্নেহ ছিল অপার ও অপরিসীম। এমনকি নবুঅত লাভের পরে প্রচণ্ড বিপদ-মুছীবতের মধ্যেও বৃদ্ধ চাচা আবু তালেব-এর মধ্যে সেই স্নেহের সামান্যতম ঘাটতি দেখা যায়নি। কেবলমাত্র ভাতিজার মহব্বতে চাচা আবু তালেব তিনটি বছর কুরায়েশদের কঠিন বয়কট ও অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহ্য করেছেন। তথাপি ভাতিজাকে ছাড়েননি। সেই সাথে বনু হাশেম গোত্র ইসলাম কবুল না করা সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ)-এর নিরাপত্তায় তারা ছিল অটুট দেওয়ালের মত। বস্তুতঃ এসবই ছিল আল্লাহ্র অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার ফল। এখানে কোন যুক্তি বা বস্তুগত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

(৭) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى 'তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত। অতঃপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন'।

এখানে ضَالاًّ অর্থ غير عالم 'অনবহিত'। কেননা অহি নাযিলের পূর্বে রাসূল (ছাঃ) শরী'আতের কিছুই জানতেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ 'এবং তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন, যা তুমি জানতে না' (*নিসা ৪/১১৩*)। فَهَدَى অর্থ فَأَرْشَدَكَ 'অতঃপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন' (*কুরতুবী*)।

অর্থাৎ ইতিপূর্বে তুমি ইসলামী শরী'আত বিষয়ে অবগত ছিলে না। অতঃপর আল্লাহ তোমাকে নবুঅতের মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ 'তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি?' (*শূরা ৪২/৫২*)। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা ইউসুফের শুরুতে উক্ত কাহিনী বর্ণনার সূচনায় আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলকে বলছেন, وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ 'যদিও তুমি ইতিপূর্বে ছিলে এ বিষয়ে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত' (ইউসুফ ১২/৩)। অর্থাৎ তুমি এ বিষয়ে কিছু জানতে না।

অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতে وَوَجَدَكَ ضَالاًّ অর্থ তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন সঠিক পথ সম্পর্কে অনবহিত। অতঃপর তিনি তোমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেন।

এখানে ضَالاًّ অর্থ 'পথভ্রষ্ট' নয়। কেননা পথভ্রষ্ট সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি পথ পেয়েও পথ হারান। কোন রাসূলের জীবনে এমন কিছু ঘটার প্রশ্নই ওঠে না।

فَهَدَى অর্থ فَهَدَاكَ 'অতঃপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন'। তবে এর অর্থ আরও ব্যাপক। فَهَدَاكَ وَهُدِىَ بِكَ 'তিনি তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন ও তোমার মাধ্যমে অন্যকে পথ দেখিয়েছেন'। ফলে তিনি هَادٍ وَمَهْدِىٌّ 'পথ প্রদর্শক ও পথপ্রাপ্ত'।

(৮) وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى 'তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন নিঃস্ব। অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রিক্তহস্ত পেয়েছিলেন। অতঃপর তোমাকে অভাবমুক্ত করেন। প্রথমে খাদীজার ব্যবসায়ে অংশীদারী কারবারের মাধ্যমে এর সূচনা হয়। অতঃপর বিবাহের পর খাদীজা (রাঃ)-এর সমস্ত ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে উৎসর্গিত হয়।

ক্বাতাদাহ বলেন, উপরে বর্ণিত তিনটি অবস্থা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত-পূর্বকালের তিনটি স্তর বিশেষ *(ইবনু কাছীর)*। তবে নবুঅত-পরবর্তীকালে জিহাদে গণীমত লাভের ফলে তিনি ও মুসলমানগণ অভাবমুক্ত হয়েছিলেন।

(৯) فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ 'অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবে না'।

قَهَرَ يَقْهَرُ قَهْرًا অর্থ 'বিজয়ী হওয়া'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ 'তিনি তাঁর বান্দাদের উপরে পরাক্রান্ত। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১৮)*। এখানে فَلاَ تَقْهَرْ অর্থ لاَ تَسَلَّطْ عَلَيْهِ بِالظُّلْمِ وَلاَ تَحْتَقِرْ 'যুলুমের মাধ্যমে তার উপর চেপে বসো না বা তাকে লাঞ্ছিত করো না' *(কুরতুবী)*। আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য কঠোরতা এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পূর্বের তিনটি আয়াতে তিনটি নে'মতের বর্ণনা দেওয়ার পর এক্ষণে রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যার প্রথমটি হ'ল, তুমি কোন ইয়াতীমের উপরে কঠোর হবে না। কেননা তুমি নিজেই ইয়াতীম ছিলে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মা-বাপ হারানোর শূন্যতা ভালভাবে বুঝতেন। যদিও এর বেদনা তাঁকে বুঝতে দেননি তাঁর স্নেহময় দাদা ও চাচাগণ। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক,

তার বা অন্যের, জান্নাতে পাশাপাশি থাকব এই দু'টি আঙ্গুলের মত। এসময় তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলী দু'টি পাশাপাশি রেখে ইশারা করেন।[৩৩৩]

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি নিজের কঠোর হৃদয়ের অভিযোগ পেশ করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْيِيْنَ قَلْبَكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ 'যদি তুমি তোমার হৃদয়কে নরম করতে চাও, তাহ'লে মিসকীনকে খাওয়াও এবং ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও'।[৩৩৪] ইবনু ওমর (রাঃ) কোন ইয়াতীমকে দেখলে মাথায় হাত বুলাতেন এবং তাকে কিছু উপহার দিতেন *(কুরতুবী)*। ক্বাতাদাহ বলেন,– كُنْ لِلْيَتِيْمِ كَالْأَبِ الرَّحِيْمِ 'ইয়াতীমের জন্য তুমি হও দয়াশীল পিতার মত' *(ইবনু কাছীর)*।

(১০) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ 'এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ধমকাবে না'।

السَّائِلَ– 'প্রার্থীকে ধমকানো'। সেখান থেকে نَهَرَ يَنْهَرُ نَهْرًا অর্থ لاَ تَنْهَرْ লاَ تَزْجُرْ 'ধমকাবে না'। এটি হ'ল দ্বিতীয় বিষয়।

সাহায্যপ্রার্থী ফকীর-মিসকীন অসহায় কিংবা বিপদগ্রস্ত যেই-ই হৌক না কেন, তার প্রতি কঠোর আচরণ করা যাবে না। সে মনে ব্যথা পায় এমন ব্যবহার করা যাবে না। সাহায্য দু'ধরনের হ'তে পারে জ্ঞানগত ও বস্তুগত। যদি কেউ শরী'আত বা আখেরাতের বিষয় জানতে চায়, তাহ'লে তার প্রতি সদয় হওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে সূরা 'আবাসায় বিশেষভাবে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে, চরম ক্রুদ্ধ অবস্থায়ও তিনি নিজেকে সংযত রাখতেন। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ كُنْتَ فَظاًّ غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ 'যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয় হতে, তাহ'লে লোকেরা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' (*আলে ইমরান ৩/১৫৯*)।

অপারগ অবস্থায় কিছু দিতে না পারলে সে অবস্থায় আল্লাহ বলেন, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْراً– 'তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তা'হলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো' (*বনী ইস্রাঈল ১৭/২৮*)। ক্বাতাদাহ বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, رد المسكين برحمة ولين '(বাধ্যগত অবস্থায়)

৩৩৩. বুখারী হা/৫৩০৪, ৬০০৫; আবুদাঊদ হা/৫১৫০ মিশকাত হা/৪৯৫২ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া' অনুচ্ছেদ-১৫।

৩৩৪. আহমাদ হা/৭৫৬৬; ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/৮৫৪।

মিসকীনকে ফিরাও দয়া ও নম্রতার সাথে' (*ইবনু কাছীর*)। তবে সংশোধন ও কল্যাণের স্বার্থে কঠোর হওয়াটা এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(১১) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ 'অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর'।

অর্থ اشكر لنعمة ربك عليك 'তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ সমূহের শুকরিয়া আদায় কর'। এটি হ'ল তৃতীয় বিষয়, যা আল্লাহ আদেশ করেছেন।

এখানে নির্দেশ নবীর প্রতি হ'লেও তা সকলের প্রতি প্রযোজ্য। আল্লাহ্র অনুগ্রহে মানুষ দুনিয়াতে এসেছে ও চলাফেরা করছে। মানুষের উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহের শেষ নেই। অতএব প্রত্যেক মানুষের উপরে অবশ্য কর্তব্য হ'ল প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা।

মুজাহিদ বলেন, এখানে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হ'ল- নবুঅত ও কুরআন (*ইবনু কাছীর*), যা কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম নে'মত। এই নে'মতের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করাই হ'ল আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা বর্ণনা। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ– 'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তোমার নিকটে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তুমি পৌঁছে দাও। যদি তুমি তা না কর, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না' (*মায়েদাহ ৫/৬৭*)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শেখায়'।[৩৩৫] তিনি আরও বলেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত জানলেও তা তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও'।[৩৩৬]

কুরআন ও হাদীছ ছাড়াও অন্যান্য নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা যরূরী। আমর বিন মায়মূন তার কোন বিশ্বস্ত ভাইকে পেলে বলতেন, গতকাল আল্লাহ আমাকে ছালাত আদায়ের তাওফীক দিয়েছেন বা অমুক নেকীর কাজ করার অনুগ্রহ দান করেছেন'। এমনিতরো অভ্যাস আবু ফেরাস আব্দুল্লাহ বিন গালিব সহ অনেক মনীষীর ছিল (*কুরতুবী*)। উদ্দেশ্য ছিল উক্ত আয়াতের হুকুম অনুযায়ী আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া বর্ণনা করা।

৩৩৫. বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯।
৩৩৬. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।

মালেক বিন নাযলাহ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে যে, একদিন জনৈক ব্যক্তি জীর্ণবস্ত্র পরিধান করে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এলো। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, أَلَكَ مَالٌ؟ 'তোমার কি মাল-সম্পদ আছে'? লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সকল প্রকারের মাল আছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ 'যখন আল্লাহ তোমাকে মাল দিয়েছেন, তখন তার নিদর্শন তোমার উপরে প্রকাশ পাওয়া উচিত'।[৩৩৭]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَيُحِبُّ أَنْ يَّرَى أَثْرَ نِعْمَتِه عَلَى عَبْدِه 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন এবং স্বীয় বান্দার উপরে তাঁর নে'মতের নিদর্শন দেখতে ভালবাসেন'।[৩৩৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ 'যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে না'।[৩৩৯] অর্থাৎ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটা হ'ল আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পূর্বশর্ত।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ-

'যে ব্যক্তি কিছু দান করল, অতঃপর সে তা পেল। তার উচিত হ'ল বিনিময়ে কিছু প্রদান করা (অর্থাৎ দো'আ করা)। যদি কিছু না পায়, তাহ'লে তার উচিত প্রশংসা করা। কেননা যে ব্যক্তি প্রশংসা করল, সে ব্যক্তি শুকরিয়া আদায় করল। আর যে ব্যক্তি চুপ থাকল, সে অকৃতজ্ঞ হলো'।[৩৪০]

সারকথা :

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য আত্মনিবেদন করে, আল্লাহ তাকে কখনো পরিত্যাগ করেন না।

---

৩৩৭. নাসাঈ হা/৫২২৪; আহমাদ হা/১৭২৬৮, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৩৫২।
৩৩৮. আবু ইয়া'লা হা/১০৫৫, সনদ হাসান; তিরমিযী হা/২৮১৯, মিশকাত হা/৪৩৫০ 'পোষাক' অধ্যায়।
৩৩৯. আবুদাঊদ হা/৪৮১১; ছহীহাহ হা/৪১৭।
৩৪০. আবুদাঊদ হা/৪৮১৩; তিরমিযী হা/২০৩৪; ছহীহাহ হা/৬১৭।

সূরা শরহ (উন্মুক্ত করা)

সূরা যোহা-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৯৪, আয়াত ৮, শব্দ ২৭, বর্ণ ১০২।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) আমরা কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি?	اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ﴿۱﴾
(২) আর আমরা তোমার থেকে বোঝা নামিয়ে দিয়েছি।	وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ﴿۲﴾
(৩) যা তোমার পৃষ্ঠকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল।	الَّذِیْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ﴿۳﴾
(৪) আর আমরা তোমার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ﴿۴﴾
(৫) অতঃপর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ۙ﴿۵﴾
(৬) নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।	اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ؕ﴿۶﴾
(৭) অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও।	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ﴿۷﴾
(৮) এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও।	وَاِلٰی رَبِّكَ فَارْغَبْ ٪﴿۸﴾

বিষয়বস্তু :

পূর্বের সূরাটির পরপরই অত্র সূরাটি নাযিল হয়েছে এবং দু'টি সূরার বিষয়বস্তু অনেকটা একইরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র কয়েকটি নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে *(১-৪ আয়াত)*। অতঃপর তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে *(৫-৬ আয়াত)*। সবশেষে তাঁকে একান্তভাবে আল্লাহ্র প্রতি রুজু হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(৭-৮ আয়াত)*।

তাফসীর :

(১) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ 'আমরা কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি?'

شَرَحَ يَشْرَحُ شَرْحًا অর্থ উন্মুক্ত করা, ব্যাখ্যা করা, প্রশস্ত করা ইত্যাদি। إِنْشَرَحَ অর্থ উন্মুক্ত হওয়া। أَلَمْ نَشْرَحْ অর্থ الم نفتح। 'আমরা কি খুলে দেই নি'? এখানে

নিশ্চয়তাবোধক অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ قد شرحنا 'অবশ্যই আমরা উন্মুক্ত করেছি'। যেমন أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ 'আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন'? (*তীন ৯৫/৮*)। অর্থ, তিনিই শ্রেষ্ঠতম বিচারক। একে বলা হয় نفى النفى إثبات 'না-কে না বললে হ্যাঁ'। এটি استفهام تقرير অর্থাৎ 'নিশ্চয়তা জ্ঞাপক প্রশ্ন' যা قد সহ অতীত ক্রিয়ায় আসে। যেমন এসেছে, أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ 'আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন'? (*যুমার ৩৯/৩৬*)। অর্থ قد كفى بالله 'অবশ্যই আল্লাহ যথেষ্ট'। এখানেও তেমনি অর্থ হবে যে, আল্লাহই তোমার বক্ষকে উন্মুক্ত করেছেন ইসলামের জন্য এবং নবুঅত ও রিসালাতের জন্য।

আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্নের ভঙ্গিতে বলছেন, আমরা কি তোমার বক্ষকে রিসালাত ও দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব বহনের জন্য প্রশস্ত করে দেইনি? আমরা কি তোমার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি? এটি দৈহিক উন্মুক্তকরণ নয়, বরং হৃদিক উন্মুক্তকরণ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, فَمَنْ يُّرِدِ اللهُ أَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ- 'আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন' (*আন'আম ৬/১২৫*)। আর যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের পথ দেখান, তারা জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত পথের অনুগামী হয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللهِ أُوْلَئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُبِيْنٍ- 'আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে ব্যক্তি তার প্রভুর পক্ষ হ'তে আগত নূরের মধ্যে রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণ হ'তে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে' (*যুমার ৩৯/২২*)।

অনেক বিদ্বান আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন, 'আমরা কি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করি নাই'? এর দ্বারা শিশুকালে ধাত্রী হালীমার গৃহে থাকা অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর বক্ষ বিদারণ[৩৪১] এবং মে'রাজের রাত্রিতে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৩৪২] অত্র আয়াতের তাফসীরে ইমাম তিরমিযী মালেক বিন ছা'ছা'আহ ও আবু যার গিফারী (রাঃ) বর্ণিত আনাস বিন মালেক (রাঃ) প্রমুখাৎ মে'রাজের বহুল

৩৪১. আর-রাহীক্ব পৃ: ৫৬-৫৭; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১৬৪-৬৫; আলবানী, ছহীহ আস-সীরাতুন নববিইয়াহ পৃ: ১৬, সনদ জাইয়িদ ও শক্তিশালী; মুসলিম হা/১৬২, মিশকাত হা/৫৮৫২ 'নবুঅতের নিদর্শনসমূহ' অনুচ্ছেদ-৫।

৩৪২. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২, ৫৮৬৪ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ-৬।

প্রসিদ্ধ ছহীহ হাদীছগুলি এনেছেন।[৩৪৩] হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর বক্ষ উন্মুক্ত করার মধ্যে মে'রাজের রাত্রির বক্ষ বিদারণ এবং নবুঅত ও রিসালাতের গুরুভার বহনের জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করণ দুই-ই শামিল হয়েছে *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

(২) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ 'আর আমরা তোমার থেকে বোঝা নামিয়ে দিয়েছি'।

আবদুল আযীয বিন ইয়াহইয়া এবং আবু ওবায়দাহ বলেন, এর অর্থ হ'ল, নবুঅত ও রিসালাতের গুরু দায়িত্বের বোঝা তোমার উপরে হালকা করে দিয়েছি, যাতে তা তোমার উপরে ভারী মনে না হয়' *(কুরতুবী, তানতাভী)*।

(৩) اَلَّذِيْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ 'যা তোমার পৃষ্ঠকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল'।

অর্থাৎ যে দুঃসহ বোঝার চাপে তোমার পিঠ নুইয়ে যাচ্ছিল। এর দ্বারা 'অহি' অতরণকালের ভার বহনের কষ্টকর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বোঝা বহন অসাধ্য হ'লে মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে যে শব্দ বের হয়, তাকে نقيض বলা হয় (*তানতাভী*)। সেখান থেকে أَنْقَضَ ক্রিয়াপদ এসেছে। প্রথম দিকে 'অহির' ভার বহনে রাসূল (ছাঃ) অনুরূপ দৈহিক কষ্ট অনুভব করতেন। তবে ক্বাসেমী এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর মনোবেদনার কষ্ট বুঝিয়েছেন। কেননা প্রথমদিকে তাঁর দাওয়াত কেউ কবুল করত না। বরং নানাবিধ অপবাদ ও মিথ্যারোপের মাধ্যমে তাঁকে লোকেরা কষ্ট দিত। পরে এই কষ্ট দূর হয়ে যায় *(ক্বাসেমী)*। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ প্রথম ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

(৪) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 'আর আমরা তোমার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি'।

অর্থাৎ নবুঅত ও রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে তোমার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছি। এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী নবীগণের কাছ থেকে তোমার ব্যাপারে ওয়াদা নেওয়ার ফলে (*আলে ইমরান ৩/৮১*) পূর্ব থেকেই তোমার আলোচনা পূর্ববর্তী উম্মতগণের নিকটে যেমন ছিল, তেমনি তোমার জীবদ্দশায় তো বটেই ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাতে তোমার নাম সর্বত্র মুখে মুখে সর্বক্ষণ প্রচারিত হয়, তার ব্যবস্থা করেছি। যেমন আযানের মধ্যে, ইক্বামতের মধ্যে, তাশাহহুদের মধ্যে, জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবায়, হজ্জের খুৎবায়, আইয়ামে তাশরীক্বের দিনগুলিতে, ছাফা-মারওয়ায় ও হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে, বিবাহের খুৎবায়, এমনকি বক্তৃতা ও ভাষণের শুরুতে হামদ ও দরূদের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র সর্বদা তোমার প্রশংসিত নাম অত্যন্ত সম্মানের সাথে উচ্চারিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যদি একজন ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর

৩৪৩. তিরমিযী হা/৩৩৪৬ 'তাফসীর' অধ্যায়, ৮৩ অনুচ্ছেদ।

নবুঅতকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কাফের। তোমার দ্বীন আসার পর বিগত সকল দ্বীন রহিত করা হয়েছে। তোমার দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করা হয়েছে। তোমাকে সকল নবীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। পৃথিবীতে মুমিনের হৃদয়ে তোমাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। আখেরাতে তোমাকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান 'মাক্বামে মাহমূদ' দান করা হয়েছে। আসমান জগতে সকল ফেরেশতা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে এবং তাদের নিকটে আমরা তোমার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে হে রাসূল তোমার সুনাম-সুখ্যাতিকে আমরা সর্বদা উচ্চকিত করেছি। এই সৌভাগ্য দুনিয়ার কোন মানুষের হয়নি।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এর দ্বারা 'আযান' বুঝানো হয়েছে, যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর সভাকবি হযরত হাসসান বিন ছাবেত আনছারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় গেয়েছেন,

أَغَرَّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ خَاتَمٌ + مِنَ اللهِ نُوْرٌ يَلُوْحُ وَيَشْهَدُ

وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ + إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ

وَشَقَّ لَهُ مِن اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ + فَذُو العَرْشِ محمودٌ وهَذا مُحَمَّدُ

(১) তাঁর উপরে 'মোহরে নবুঅত' চমকিত হয়। যা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নূর স্বরূপ, যা উজ্জ্বলিত হয় ও সাক্ষ্য দেয়।

(২) আল্লাহ স্বীয় নবীর নামকে নিজের নামের সাথে যুক্ত করেছেন। যখন মুওয়াযযিন পাঁচ ওয়াক্তের আযানে 'আশহাদু' বলে।

(৩) আল্লাহ তাঁর নামের সাথে রাসূলের নামকে যুক্ত করেছেন তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য। অতএব আরশের মালিক হ'লেন 'মাহমূদ' (প্রশংসিত) এবং ইনি হ'লেন 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত)'।[৩৪৪]

ছারছারী (রহঃ) কতই না সুন্দর বলেছেন,

لاَ يَصِحُّ الأذانُ فِي الفَرْضِ إِلاَّ + باسِمه العَذْبِ فِي الْفَمِ الْمَرْضَي

'ফরয ছালাতের আযান শুদ্ধ হবে না, সন্তুষ্টচিত্ত মুওয়াযযিনের মুখে তাঁর মিষ্ট নামের উচ্চারণ ব্যতীত'। তিনি আরও বলেন,

أَلَم تَرَ أَنَّا لاَ يَصِحُّ أذانُنَا + وَلا فَرْضُنا إنْ لَمْ نُكَرِّرْهُ فِيْهِمَا

'তুমি কি দেখ না আমাদের আযান ও আমাদের ফরয ছালাত শুদ্ধ হয় না, যদি না আমরা সেখানে তাঁর (রাসূলের) নাম বারবার উচ্চারণ করি'? (*ইবনু কাছীর*)।

৩৪৪. দীওয়ানে হাসসান পৃঃ ৪৭।

(৫-৬) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 'অতঃপর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে'। 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে'।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে ও তাঁর উম্মতকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং একই কথা পরপর দু'বার বলে বিষয়টিকে যোরদার ও তাকীদপূর্ণ করেছেন। এটা আরবদের অন্যতম বাকরীতি (*কুরতুবী*)। দু'টি আয়াতেই الْعُسْرِ এসেছে معرفة বা নির্দিষ্টবাচক এবং يُسْراً এসেছে نكره বা অনির্দিষ্টবাচক। যার অর্থ একটি কষ্টের বিনিময়ে একাধিক স্বস্তি। অতএব একটি কষ্ট কখনো একাধিক স্বস্তির উপরে জয়লাভ করে না। বুঝা গেল যে, কষ্টের পরে স্বস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং তা হবে একাধিক। যেমন মক্কা থেকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একাকী আবুবকরকে নিয়ে হিজরত করেছিলেন কষ্টের সাথে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি সেখানে ফিরে এসেছিলেন দশ হাযার মুসলমানকে সাথে নিয়ে উচ্চতম মর্যাদা ও পাহাড় প্রমাণ সম্মান নিয়ে। এটির উদাহরণ ইবাদতেও রয়েছে। যেমন, ছালাতের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। না পারলে বসে, না পারলে কাৎ হয়ে। ছিয়ামের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, ছিয়াম রাখ। অসুখে বা কষ্টবোধ করলে ছেড়ে দাও। সফরে গিয়ে ছিয়াম ছেড়ে দাও ইত্যাদি। অতঃপর এটি স্বাভাবিক (حسّى) জীবনেও রয়েছে। যেমন দারিদ্র্যের পরে সচ্ছলতা, রোগমুক্তির পর সুস্থতা, বিপদমুক্তির পর স্বস্তি বহু আনন্দের বারতা নিয়ে হাযির হয়। বিষয়টি মানসিক জীবনেও (معنوى) হ'তে পারে। যেমন কষ্টে ছবর করার যে অসীম ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন, তা মানুষকে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী করে এবং যেকোন বিপদ হাসিমুখে মোকাবিলা করার শক্তি দান করে। যা তার বিপদকে সহজ করে দেয়।

(৭-৮) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ 'অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও' 'এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও'।

অর্থাৎ যখনই তুমি দুনিয়াবী ঝামেলা থেকে মুক্ত হবে, তখনই আল্লাহ্র ইবাদতে রত হও এবং একান্ত মনে তোমার প্রভুর সন্তুষ্টি কামনায় তার দিকে রুজূ হও।

এখানে فَانْصَبْ বলা হয়েছে, যা نَصَبٌ থেকে এসেছে। যার অর্থ কষ্ট করা, চেষ্টা করা। অতএব فَانْصَبْ-এর অর্থ হবে فاتعب فى العبادة شكرًا لأنعمه 'ইবাদতের কষ্টে রত হও তাঁর নে'মত সমূহের শুকরিয়া আদায়ের জন্য'। দুনিয়াবী আকর্ষণ থেকে আল্লাহ্র দিকে মুখ ফিরানোটাই মূলতঃ কষ্টের বিষয়। নফসের তাবেদার যারা, তারা এটা পারে না। যারা প্রবৃত্তির গলায় লাগাম দিতে পারে এবং নফসের চাহিদাকে দমন করতে পারে, কেবলমাত্র তারাই দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ্র ইবাদতে রত হ'তে পারে।

ফরয ইবাদতের পরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল রাতের ছালাত, যা তাহাজ্জুদ নামে পরিচিত। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে অতিরিক্ত কর্তব্য ছিল। নিঃসন্দেহে এটা ছিল আরও কষ্টকর। সারা দিন কাফির-মুশরিকদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মুকাবিলা, এরপর ভীত-সন্ত্রস্ত রাত্রির শেষভাগে উঠে আল্লাহ্‌র ইবাদতে রত হওয়া সন্দেহাতীতভাবে ছিল অতীব ক্লেশকর। মাক্কী জীবনে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। এই কষ্ট ও তার পুরস্কার বিষয়ে মাক্কী সূরা সাজদায় আল্লাহ বলেন,

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَّطَمَعاً وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ، فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে। এমতাবস্থায় তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আকাংখায় এবং আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে'। 'অতঃপর কেউ জানে না নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে' (*সাজদাহ* ৩২/১৬-১৭)।

এটাতো হ'ল সাধারণ মুমিন-মুত্তাক্বী ইবাদতগুযার নর-নারীর জন্য। এক্ষণে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য বিশেষভাবে কি পুরস্কার রয়েছে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوْدًا- 'রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ ছালাতে রত থাক। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। সত্বর তোমার প্রভু তোমাকে 'প্রশংসিত স্থানে' পৌঁছাবেন' (*বনী ইস্রাঈল* ১৭/৭৯)। 'মাক্বামে মাহমূদে' দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফা'আত করবেন। আর এই শাফা'আতের পরেই আল্লাহ বিচারকার্য শুরু করবেন। যাকে 'শাফা'আতে কুবরা' বলা হয়। এই মহা সম্মান কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেই দেয়া হবে, অন্য কোন নবীকে নয়। কারণ তিনিই একমাত্র বিশ্বনবী। ফরয ছাড়াও অতিরিক্ত রাতের ইবাদতের প্রতিদান স্বরূপ এটা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য জান্নাত ছাড়াও অতিরিক্ত মহা সম্মান।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া ব্যতীত মানুষের মানবিক মূল্যবোধ তার প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করতে পারে না। ইসলাম সেই প্রশিক্ষণই দিয়েছিল তার অনুসারীদের। তাই হাযারো নির্যাতনেও মুসলমানগণ পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়নি। বরং তাদের সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যবোধ তৎকালীন প্রবৃত্তিপরায়ণ সমাজনেতাদের উপরে সহজে জয়লাভ করে এবং তা বিশ্বজয়ী ইসলামী খেলাফতের সূচনা করে। অতএব জনশক্তি বা অস্ত্রশক্তি নয় বরং প্রধানতঃ নৈতিক ও আদর্শিক শক্তির জোরেই ইসলাম সেযুগে জয় লাভ করেছিল। এ যুগেও জয়লাভ করতে পারে সকল পার্থিব শক্তির উপরে।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শত নির্যাতনের মধ্যেও রাসূল (ছাঃ)-কে পাল্টা নির্যাতন প্রতিরোধের পথ বেছে নেবার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং তাঁকে ও তাঁর সাথী নির্যাতিত-নিপীড়িত নও মুসলিমদেরকে খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি রুজূ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিপ্লবের মৌলিক দর্শন এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ যা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। তবে এটি ছিল মাক্কী জীবনের ঘটনা। যখন তিনি প্রতিরোধে সক্ষম ছিলেন না। অতঃপর মাদানী জীবনে সক্ষমতা অর্জন করলে তাঁকে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় *(হজ্জ ২২/৩৯)* এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় *(আনফাল ৮/৬০)*। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ও বস্তুগত সক্ষমতা অপরিহার্য। নইলে সর্বদা ইসলামের বিজয়ের জন্য ঈমানী শক্তিই মুখ্য। বৈষয়িক শক্তি হ'ল ঢালস্বরূপ। যাকে কখনোই মুখ্য হিসাবে গণ্য করা হয়নি।

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ বাক্যের মধ্যে এ ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, হে মুহাম্মাদ! কাফেরদের লোভনীয় প্রস্তাবসমূহে কর্ণপাত করো না এবং তাদের দেওয়া কষ্ট ও নির্যাতনে ভীত ও দুর্বল হয়ে পড়ো না। কারু কাছে কিছু চেয়ো না। বরং আল্লাহ্র কাছেই সবকিছু চাও এবং তাঁর দিকেই একান্তভাবে মনঃসংযোগ কর। কারণ তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্র হাতেই নিবদ্ধ। তিনিই তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কষ্টের পরে স্বস্তি দেবেন। পরকালীন পুরস্কার ছাড়াও পার্থিব বিজয় ও স্বস্তিলাভ কেবল আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। অতএব সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল তোমার পালনকর্তা আল্লাহ্র দিকে রুজূ হও।

পিতা ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চাইতে অধিক অসহায়। স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূত ব্যতীত তাঁর প্রকাশ্য সাথী কেউ ছিল না। নমরূদের মত দুর্ধর্ষ শাসক ও একটি প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে একাই তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে আদর্শিকভাবে। শত নির্যাতনের মুখেও তিনি সেদিন বলেছিলেন,

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفاً وَّمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'আমি আমার চেহারাকে সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি একনিষ্ঠভাবে, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' (*আন'আম ৬/৭৯*)। মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন ইবরাহীমের বংশধর এবং শ্রেষ্ঠ রাসূল। অতএব তাঁকেও একইরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 'তোমার প্রতিপালকের দিকে রুজূ হও'। *সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী*।

এখানে وَإِلَى رَبِّكَ আগে আনা হয়েছে, যেটা পরে হওয়ার কথা। অর্থাৎ فَارْغَبْ إِلَى رَبِّكَ (তুমি রুজূ হও তোমার প্রভুর দিকে)। কিন্তু আগে আনার উদ্দেশ্য আল্লাহকে নির্দিষ্ট (الحصر) করা। إِلَى رَبِّكَ لاَ اِلَى غَيْرِه 'কেবল তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও, অন্যদিকে নয়'। অতএব কোন কাজের পূর্বে প্রথমে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়। কেননা কেবল তিনিই কাজটি সহজ করে দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সওয়ারীর পিছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, يَا غُلاَمُ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ হে বৎস! আল্লাহ্র বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, তিনিই তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। আল্লাহ্র বিধানসমূহ মেনে চল, তাহ'লে তুমি তাঁকে সর্বদা তোমার সম্মুখে পাবে। তুমি কিছু চাইলে আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে। যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে।[৩৪৫]

বস্তুতঃ প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের বিশ্বজয়ের মূল শক্তি ছিল আল্লাহ্র উপরে অটুট নির্ভরতা। তৎকালীন পরাশক্তি রোম সেনাপতি বারবার পরাজিত হয়ে ১৩ হিজরীতে ইয়ারমূকের পূর্বে আজনাদাইন যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার এক দুঃসাহসী ও উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরব খৃষ্টান গুপ্তচরকে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রেরণ করেন। গুপ্তচর মুসলিম সেনা শিবিরে কয়েকদিন অবস্থান শেষে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দেয়, তা ছিল নিম্নরূপ : هُمْ بِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ وَلَوْ سَرَقَ ابْنُ مَلِكِهِمْ قَطَعُوْا يَدَهُ وَلَوْ زَنَى رَجَمُوْهُ- 'তারা রাতের বেলায় ইবাদতগুযার ও দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার। আল্লাহ্র কসম! যদি তাদের শাসকপুত্র চুরি করে, তাহ'লে তারা তার হাত কেটে দেয়। অথবা যদি যেনা করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে মাথা ফাটিয়ে হত্যা করে ফেলে'। একথা শুনে সেনাপতি ক্বায়কুলান বলে ওঠেন, وَاللهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَنَا مِنْ ظَهْرِهَا 'আল্লাহ্র কসম! যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহ'লে ভূগর্ভ আমাদের জন্য উত্তম হবে ভূপৃষ্ঠের চাইতে'। অর্থাৎ আমাদের মরে যাওয়াই উত্তম হবে।

উল্লেখ্য যে, যুদ্ধে উক্ত সেনাপতি নিহত হন এবং মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। পরবর্তীতে ১৬ হিজরীতে শাম থেকে নিরাশ হয়ে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে ফিরে গিয়ে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর এক গুপ্তচরকে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ সম্পর্কে

৩৪৫. আহমাদ হা/২৭৩৬, তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২।

জানতে চাইলে তিনি বলেন, هُمْ فُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ وَرُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ، لاَ يَأْكُلُونَ فِي ذِمَّتِهِمْ إِلاَّ بِثَمَنٍ، وَلاَ يَدْخُلُونَ إِلاَّ بِسَلاَمٍ، يَقِفُوْنَ عَلَى مَنْ حَارَبُوْهُ حَتَّى يَأْتُوا عَلَيْهِ. 'তারা দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার ও রাতের বেলায় ইবাদতগুযার। তারা তাদের যিম্মায় থাকা কোন বস্তু মূল্য না দিয়ে খায় না এবং শান্তির বার্তা ব্যতীত কোন স্থানে প্রবেশ করে না। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, যতক্ষণ না তারা পরাজিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসে'। একথা শুনে রোম সম্রাট বলে ওঠেন, لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَنِيْ لَيَمْلِكُنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ 'যদি তুমি আমাকে সত্য বলে থাক, তাহ'লে ওরা অবশ্যই আমার দু'পায়ের নীচের এই সিংহাসনটারও মালিক হয়ে যাবে'।[৩৪৬] তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল এবং হযরত ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্য ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সেই অতুল্য নৈতিক শক্তি অর্জনের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সারকথা :

আল্লাহ যখন কাউকে দিয়ে বড় কোন খিদমত নিতে চান ও করাতে চান, তখন উক্ত কাজের জন্য তার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন এবং তাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি অনুগত রাখেন।

---

৩৪৬. ইবনু জারীর, তারীখু ত্বাবারী ২/২১৫; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৭, ৫৪।

সূরা তীন (ডুমুর)

সূরা বুরূজ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৯৫, আয়াত ৮, শব্দ ৩৪, বর্ণ ১৫৬।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ ডুমুর ও যয়তূন বৃক্ষের	وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ﴿١﴾
(২) শপথ সিনাইয়ের তূর পাহাড়ের	وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ﴿٢﴾
(৩) শপথ এই নিরাপদ নগরীর,	وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ ﴿٣﴾
(৪) অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٤﴾
(৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে।	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ أَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ﴿٥﴾
(৬) তবে তারা ব্যতীত, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।	إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٦﴾
(৭) অতঃপর এরপরেও কোন্ বস্তু তোমাকে ক্বিয়ামত দিবসে মিথ্যারোপে প্ররোচিত করছে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ﴿٧﴾
(৮) আল্লাহ কি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?	أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨﴾

বিষয়বস্তু :

চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ মানুষের সুন্দরতম দৈহিক অবয়ব, অতঃপর তার নিকৃষ্টতম পতনের কথা বর্ণনা করেছেন *(১-৫ আয়াত)*। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন মানুষের ঈমান ও সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে *(৬-৮ আয়াত)*।

গুরুত্ব :

(১) হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক সফরে (এশার) ছালাতের দুই রাক'আতের কোন একটিতে সূরা তীন পাঠ করেন। আমি কারু কাছ থেকেই এত সুন্দর কণ্ঠ ও এত সুন্দর ক্বিরাআত শুনিনি'।[৩৪৭]

(২) আমর ইবনু মায়মূন বলেন, আমি একদিন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে মক্কায় এশার ছালাত আদায় করি। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা তীন পড়লেন এবং

---

৩৪৭. বুখারী হা/৭৬৯; মুসলিম হা/৪৬৪, 'এশার ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য।

বায়তুল্লাহ্র সম্মানে তাঁর স্বর উঁচু করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফীল ও কুরায়েশ একত্রে পাঠ করেন (*কুরতুবী*)।

তাফসীর :

আল্লাহ অত্র সূরায় তীন, যয়তুন, তূর পাহাড় ও মক্কা নগরীর শপথ করে বলছেন যে, তিনি মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

(১) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ **'শপথ ডুমুর ও যয়তূন বৃক্ষের'**।

আল্লাহ এখানে তীন ও যয়তূনের কসম করেছেন এর অধিক উপকারিতার জন্যে এবং আরবদের নিকট এ দু'টি বৃক্ষের ব্যাপক পরিচিতির কারণে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, ইকরিমা, মুজাহিদ প্রমুখ বিদ্বান বলেন যে, هو تينكم الذى تأكلون وزيتونكم الذى تعصرون منه الزيت– 'এটা হ'ল ঐ তীন বা ডুমুর যা তোমরা খেয়ে থাক এবং ঐ যয়তূন বৃক্ষ যা থেকে তোমরা তেল বের করে থাক' (*কুরতুবী, ইবনু কাছীর*)। মুফাসসিরগণ তীন ও যয়তূনের বহু কাল্পনিক অর্থ বলেছেন। অথচ প্রকাশ্য অর্থ থেকে দূরতম অর্থে নিতে গেলে যে দলীল প্রয়োজন, তা সেখানে নেই। আল্লাহপাক যয়তূনকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করে এর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেছেন। যেমন তিনি বলেন, يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ 'প্রদীপটি প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা' (*নূর ২৪/৩৫*)।

আল্লাহ পাক তীন ও যয়তূনের শপথ করার মাধ্যমে এই দু'টি বৃক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকারিতার প্রতি বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ডুমুর ও যয়তূন তৈল তথা এ দু'টি বৃক্ষের উপকারিতাসমূহ এবং রোগ নিরাময় ক্ষমতা অন্যান্য বৃক্ষের তুলনায় অনেক বেশী বলে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ আবিষ্কারে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর প্রথম কৃষিকাজ শুরু হয় ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে এবং সে কৃষিজ বৃক্ষ ছিল তীন বা ডুমুর গাছ। সম্প্রতি ফিলিস্তীনের মাটির তলে শুকনা তীন ফলের যে ফসিল পাওয়া গেছে, তা দশ হাযার বছর পূর্বেকার। মানুষের বসবাস ও জীবনযাত্রা তখন থেকেই পৃথিবীতে শুরু হয়েছে। হিসাবে দেখা গেছে যে, পৃথিবীতে আদম (আঃ)-এর আগমন ঘটেছিল দশ হাযার বছর পূর্বে। তিনি যে তীন বৃক্ষের প্রথম আবাদ করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে। হয়ত ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী প্রকাশিত হবে।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ের ইঙ্গিত এতে রয়েছে যে, তীন ও যয়তূন যেখানে প্রথম ও বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হয়, সেই ফিলিস্তীনের বা সিরিয়ার মাটিতে মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল। বলা চলে যে, আদম থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত প্রায় সকল প্রধান নবীর আগমন ও বাসস্থান শাম ও তার আশপাশ এলাকাতেই ছিল। বিশেষ করে বনু ইস্রাঈলের

সর্বশেষ রাসূল হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম বায়তুল মুক্বাদ্দাস এলাকাতেই হয়েছিল। অতএব তীন ও যয়তূনের শপথ করে আল্লাহ ফিলিস্তীন ভূখণ্ডের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও তার আশপাশ তথা শাম অঞ্চলকে বরকতমণ্ডিত বলে ঘোষণা করেছেন (*ইসরা ১৭/১*)।

(২) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ 'শপথ সিনাইয়ের তূর পাহাড়ের'।

তূর পাহাড়ের পাদদেশে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ কথা বলেন এবং তাঁকে নবুঅত প্রদান করেন। সেকারণ তূর পাহাড়ের এমন এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যা পৃথিবীর কোন পাহাড়ের নেই। সিনাইকে আল্লাহ স্বয়ং الْوَادُ الْمُقَدَّسَةُ বা 'পবিত্র উপত্যকা' বলে ঘোষণা করেছেন (*ত্বোয়াহা ২০/১২*)। সে হিসাবে সিনাই উপত্যকার মর্যাদা অতীব উচ্চে। মুজাহিদ বলেন, সুরিয়ানী ভাষায় 'সীনীন' অর্থ 'মুবারক' বা পবিত্র। মুক্বাতিল ও কালবী বলেন, سنين كل جبل فيه شجر مُثْمِرٌ 'ফলবন্ত বৃক্ষসমৃদ্ধ পাহাড়কে 'সীনীন' বলা হয়, যাকে নাবাত্বী (نبطى) ভাষায় 'সীনা' (سِيْنَاءَ) বলা হয়'। سِيْنِيْنَ-কে سَيْنَاء ও سِيْنَاء দু'ভাবে পড়া হয়েছে (*কুরতুবী*)। যেমন আল্লাহ বলেন, وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِيْنَ 'এবং আমরা সৃষ্টি করেছি সেই বৃক্ষ, যা জন্মে সিনাই পাহাড়ে, যা আহারকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে' (*মুমিনূন ২৩/২০*)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) পড়তেন وَطُوْرِ سِيْنَاءَ (*কুরতুবী*)।

(৩) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ 'শপথ এই নিরাপদ নগরীর'।

অর্থাৎ মক্কা মু'আযযামার শপথ। এই নগরীকে আল্লাহ 'নিরাপদ' বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 'তারা কি দেখেনা যে, আমরা (মক্কাকে) নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যারা আছে, তাদের উপরে আক্রমণ করা হয়ে থাকে...' (*আনকাবূত ২৯/৬৭*)।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্র হুকুমে দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে মক্কার বিরানভূমিতে রেখে যান, তখন সেটাকে আবাদ করার জন্য ও শস্য-ফলাদি দ্বারা সমৃদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেছিলেন (*ইবরাহীম ১৪/৩৭*)। অতঃপর সেই ভবিষ্যৎ নগরীকে 'নিরাপদ' ও শান্তিময় করার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেছিলেন (*ইবরাহীম ১৪/৩৫; বাক্বারাহ ২/১২৬*)। শুধু তাই নয়, উক্ত নগরীতে একজন রাসূল প্রেরণের জন্য তিনি ও পুত্র ইসমাঈল খাছভাবে দো'আ করেছিলেন (*বাক্বারাহ ২/১২৯*)। ফলে আল্লাহপাক উক্ত নিরাপদ ও পবিত্র নগরীতে ইসমাঈল বংশের একমাত্র নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন (*জুম'আ ৬২/২*)। অতঃপর আল্লাহ মক্কার কুরায়েশদের নির্দেশ দেন, তারা যেন এই গৃহের প্রতিপালক

মহান আল্লাহ্র ইবাদত করে। তিনি বলেন, فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِيْ أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوْعٍ وَّآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ– 'অতএব তারা যেন এই গৃহের পালনকর্তার ইবাদত করে। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি হ'তে নিরাপদ করেছেন' (*কুরায়েশ* ১০৬/৩-৪)।

লক্ষণীয় যে, চারটি বস্তুর শপথে আল্লাহ তিনজন শ্রেষ্ঠ রাসূলের পুণ্যস্মৃতিবাহী তিনটি পবিত্র স্থানকে বেছে নিয়েছেন। যেমন 'তীন ও যয়তূন' বলে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ইঙ্গিত করেছেন, যা ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবস্থল। 'তূরে সীনীন' বলে তূর পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে, যেখানে তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন ও তাঁকে 'তাওরাত' প্রদান করেছিলেন। অতঃপর 'আল-বালাদুল আমীন' বলে মক্কা মু'আযযামাকে বুঝানো হয়েছে, যা ছিল সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্মস্থান ও কর্মস্থল এবং পিতা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর স্মৃতিভূমি।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আলোচ্য তিনটি আয়াতে তিনটি মহান ও পবিত্র স্থানের শপথ করা হয়েছে। যেখানে আল্লাহ্র নূর ও হেদায়াত প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখানে আল্লাহ্র তিনটি মহাগ্রন্থ তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিল হয়েছে। যেমন তাওরাতে উক্ত তিনটি স্থান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, جاء من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران 'আল্লাহ তূর পাহাড় থেকে এলেন (যেখানে তিনি মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেন)। অতঃপর (বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) 'সাঈর' পাহাড়ে চমকিত হলেন (যেখান থেকে তিনি ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন)। অতঃপর 'ফারান' অর্থাৎ মক্কার পাহাড় সমূহ থেকে ঘোষণা জারি করলেন (যেখান থেকে তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন)'।[৩৪৮]

(৪) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ 'অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে'।

---

৩৪৮. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-জওয়াবুছ ছহীহ লেমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ (রিয়াদ : দারুল 'আছেমাহ ১৪১৯/১৯৯৯) ৫/২০৭ পৃঃ; ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী। জামালুদ্দীন ক্বাসেমী والـتين এর ব্যাখ্যায় এক বিস্ময়কর আলোচনা পেশ করেছেন, যা এযাবত কোন মুফাসসির করেননি। তা এই যে, তিনি বলেন, 'সমসাময়িককালের কেউ আবিষ্কার করেছেন (استظهر بعض المعاصرين) যে, তীন গাছ হ'ল বুদ্ধের সেই গাছ, যার নীচে বসে তিনি সাধনা করতেন। তিনি একজন সত্যবাদী নবী (نبيًا صادقًا) ছিলেন। পরে তাঁর দ্বীন পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। কারণ তাঁর শিক্ষাসমূহ তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত হয়নি। এর মাধ্যমে আল্লাহ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ চারটি ধর্মের কসম করেছেন। 'তীন' দ্বারা বৌদ্ধ, 'যয়তূন' দ্বারা নাছারা, 'তূর' পাহাড় দ্বারা ইহুদী এবং 'আল-বালাদুল আমীন' দ্বারা ইসলাম ধর্ম বুঝানো হয়েছে। প্রথমে বৌদ্ধ, যা সবচাইতে বিকৃত। অতঃপর নাছারা, যা তার চাইতে কিছু কম বিকৃত। অতঃপর ইহুদী ধর্ম, যা তার চাইতে কম বিকৃত। অতঃপর ইসলাম, যা কুরআন ও সুন্নাহ্র কারণে আদৌ বিকৃত হয়নি (তাফসীর ক্বাসেমী)। আমরা বলি, এগুলি স্রেফ কাল্পনিক তাফসীর (?) মাত্র। যেদিকে দৃকপাত করা সমীচীন নয়।

পূর্বোক্ত তিনটি আয়াতে বর্ণিত চারটি বস্তুর শপথের জওয়াব হিসাবে অত্র আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এখানে মানুষকে সুন্দরতম দৈহিক কাঠামো ও সুসমন্বিত শক্ত-সমর্থ অবয়ব বিশিষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন আশরাফুল মাখলূক্বাতরূপে সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই কেবল জানেন সৃষ্টিসেরা কে? তাই আল্লাহ শপথ করে বলছেন সর্বোত্তম অবয়বে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً– 'নিশ্চয় আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদামণ্ডিত করেছি। আমরা তাদেরকে স্থলে ও পানিতে চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদেরকে আমাদের অনেক সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি' (*ইসরা* ১৭/৭০)।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি দু'দিক দিয়ে বিবেচনাযোগ্য। এক- সুন্দরতম অবয়ব, উন্নতরুচির খাদ্যাভ্যাস এবং কামনা-বাসনা ও বুদ্ধি-চেতনার দিক দিয়ে। দুই- ঈমান ও সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে।

প্রথমোক্ত দিক দিয়ে মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অন্যান্য প্রাণীকুল ও ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। প্রাণীকুলের মধ্যে কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি-চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি-চেতনা আছে, কিন্তু কামনা-বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই দু'টি বস্তু একত্রে আছে। সে তার বুদ্ধি-চেতনার সাহায্যে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরাভূত করে এবং এভাবে সে সকল সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

দুই- ঈমান ও সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সবার উপরে নির্ধারিত। কিন্তু কাফির-মুশরিক ও পাপিষ্ঠ মানুষ ফেরেশতার চাইতে উত্তম হওয়া দূরের কথা, এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে নিকৃষ্ট। এরা জ্ঞান থাকতেও বুঝে না, চোখ থাকতেও দেখেনা, কান থাকতেও শোনে না (*আ'রাফ* ৭/১৭৯)। এর কারণ মানুষের সামনে যখন আল্লাহ প্রেরিত শাশ্বত সত্য কোন আদর্শ থাকে না, তখন নিজের সীমিত জ্ঞান নিয়ে খেয়াল-খুশীমত চলতে গিয়ে সে পদে পদে হোঁচট খায়। নিজের আবেগ-অনুভূতির কাছে সর্বদা সে পরাজিত হয়। অবশেষে শয়তানী ফাঁদে পড়ে পশুত্বের নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। এমনকি গর্ব ও অহংকারে স্ফীত হয়ে সে নিজেকেই একসময় 'রব' বলে দাবী করে বসে। ফেরাঊন ছিল যার বাস্তব নমুনা' (*নাযে'আত* ৭৯/২৪)।

যুগে যুগে ফেরাঊনের অনুসারীরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে জেঁকে বসে আছে। এরাই মানবতার সর্বোচ্চ স্তর হ'তে পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হয়েছে। বলা চলে যে, এইরূপ লোকদের নেতৃত্বের কারণেই বিশ্বসমাজ সর্বদা কলুষিত হয়। ফলে একদিন আসবে চূড়ান্ত ধ্বংস- ক্বিয়ামত।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানুষ শুরু থেকেই সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট মানুষ ছিল। সে কখনোই বানর বা অন্য কিছু ছিল না। বস্তুতঃ কুরআনী সত্যের সামনে ডারউইনের বিবর্তনবাদের কাল্পনিক থিওরী একেবারেই অচল ও অগ্রহণযোগ্য।

(৫) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ 'অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে'। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ তাকে জাহান্নামে ফিরিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ সর্বোত্তম অবয়ব ও সর্বোন্নত রুচি ও মর্যাদার অধিকারী হওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য না করার ফলে মানুষ পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায় এবং জাহান্নামের খোরাক হয়।

এ আয়াতের অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, দৈহিক ও জ্ঞানগত শক্তির পূর্ণতা লাভের পর মানুষকে আমরা বার্ধক্যের ন্যুজতা ও শীর্ণতা এবং জ্ঞানগত ত্রুটি ও স্মৃতিহীনতা ইত্যাদির মাধ্যমে নিকৃষ্টতর অবস্থার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। মানুষ শত চেষ্টা করেও তার যৌবনকে ধরে রাখতে পারে না এবং বার্ধক্যকে ঠেকাতে পারে না। অমনিভাবে শত চেষ্টা করেও সে তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে এবং পাপাচারী যালেমরা জাহান্নামকে ঠেকাতে পারবে না।

(৬) إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ 'তবে তারা ব্যতীত, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার'।

অর্থাৎ মানবতার সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেনা ঐ ব্যক্তিগণ, যারা আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনেছে এবং তাঁরই দেখানো পথে সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে। যেমন সূরা আছরে আল্লাহ বলেন, وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কেবলমাত্র তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে'। 'যারা পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দিয়েছে'।

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ 'তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার'। غَيْرُ مَمْنُونٍ অর্থ غير مقطوع অবিচ্ছিন্ন বা অশেষ *(ইবনু কাছীর)*।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ- 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে, তাদের পালনকর্তা তাদের পথ প্রদর্শন করবেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে এমন নে'মতপূর্ণ জান্নাতের দিকে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ' (*ইউনুস* ১০/৯)।

অর্থাৎ ঈমানই হ'ল মূল। ঈমান সঠিক হ'লে আমল ভাল হবে। আমল ত্রুটিপূর্ণ হ'লে বুঝতে হবে তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ ছিল। শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্যে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে এবং জীবনের চলার পথে তাকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। যেমন হাযারো ঢেউয়ের মধ্যে নোঙর তার নৌকাকে শক্তভাবে ধরে রাখে।

তাওহীদ থাকলে ইত্তেবায়ে সুন্নাত থাকবেই। ইত্তেবায়ে সুন্নাত ব্যতীত স্রেফ আল্লাহতে বিশ্বাস জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। ইত্তেবা ব্যতীত তাওহীদের দাবী কপটতা বৈ কিছুই নয়। ঈমান ও আমল যার সঠিক হবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার পুরস্কার অফুরন্ত ও অসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا 'যদি কেউ পীড়িত হয় বা সফরে থাকে, তা'হলে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় সে যে নেক আমল করত, সেইরূপ ছওয়াব তার জন্য লেখা হবে'।[৩৪৯] অর্থাৎ সুস্থ অবস্থার নেকী পীড়িত অবস্থায়ও জারি থাকবে। যদি তার মধ্যে ঐ নেকী উপার্জনের আকাংখা থাকে।

(৭) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ 'অতঃপর এরপরেও কোন্ বস্তু তোমাকে ক্বিয়ামত দিবসে মিথ্যারোপে প্ররোচিত করছে'?

فَمَا يُكَذِّبُكَ এর ما مصدرية হ'লে অর্থ হবে, فَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تُكَذِّبَ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ 'কোন্ বস্তু তোমাকে পুনরুত্থান ও বিচার দিবসে মিথ্যারোপে প্ররোচিত করেছে'? পক্ষান্তরে ما موصولة হ'লে অর্থ হবে, فَمَنْ يُكَذِّبُكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ بِالدِّينِ 'বিচার দিবস সম্পর্কে এই বক্তব্যের পরে হে রাসূল! কে তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে'? অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি ও লয় প্রত্যক্ষ করার পরেও কে তাদের পুনরুত্থান ও বিচার করার ব্যাপারে আমার একচ্ছত্র ক্ষমতা বিষয়ে তোমার উপরে মিথ্যারোপ করবে? *(কুরতুবী)*। এতে অবিশ্বাসীদের প্রতি ধিক্কার ও বিস্ময় ব্যক্ত হয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, হে মানুষ! তোমার নিজের দেহের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা, তোমার কর্মের সফলতা ও বিফলতা, তোমার জীবনের উত্থান ও পতনের দৃশ্য স্বচক্ষে প্রতিনিয়ত দেখার পরেও কেন তুমি ক্বিয়ামতে অবিশ্বাস করছ? প্রতি রাতে নিদ্রাকালে তোমার মৃত্যু হচ্ছে। অতঃপর প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে তোমার ক্বিয়ামত হচ্ছে। এই নিদ্রা একদিন চিরনিদ্রায় পরিণত হবে। তোমার সেই নিদ্রা শেষে আবার তোমাকে উঠাবেন তিনি, যিনি তোমাকে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠাতেন। অতএব ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত হিসাব দানের জন্য দুনিয়াতেই প্রস্তুতি গ্রহণ কর। অহেতুক হঠকারিতা বশে ক্বিয়ামতে অবিশ্বাস করো না। দুনিয়ায় যেমন আল্লাহ

৩৪৯. বুখারী হা/২৬৯৬, মিশকাত হা/১৫৪৪ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১।

কুরআনের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করছেন। ক্বিয়ামতের দিন তেমনি জাহান্নামের দারোয়ান সরাসরি অহংকারী লোকদের জিজ্ঞেস করবে-

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوْا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ- قِيْلَ ادْخُلُوْا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

'জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোন পয়গম্বর আসেননি? যিনি তোমাদের আজকের এ দিনের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে'। 'তখন তাদের বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা সমূহ দিয়ে প্রবেশ কর সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। অহংকারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট' (*যুমার* ৩৯/৭১-৭২)।

(৮) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ 'আল্লাহ কি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন'?

অর্থ حَقًّا اللهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বিচারক'। এটি পূর্ববর্তী বাক্যের নিশ্চয়তাবোধক। أَلَيْسَ এখানে استفهام تقريرى বা 'নিশ্চয়তাবোধক প্রশ্ন' হিসাবে এসেছে।

অর্থাৎ হে হঠকারী ব্যক্তিগণ! আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? আর সেজন্যেই তো ক্বিয়ামত হবে। যাতে অহংকারী যালেমদের কাছ থেকে মযলূমদের পক্ষে আমি যথাযথ বদলা নিতে পারি। যালেমরা যুলুম করে পার পেয়ে যাবে, আর মযলূমরা কেবল মুখ বুঁজে যুলুম বরদাশত করে যাবে- তার কোন প্রতিদান তারা পাবে না, এটা তো ইনছাফ নয়। সেজন্য ক্বিয়ামত অবশ্যই হবে এবং ন্যায়বিচার অবশ্যই পাবে সকল মানুষ। অতএব আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? জবাব, অবশ্যই তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক। এর মধ্যে যালিম, কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি কঠোর ধমকি ও দুঃসংবাদ রয়েছে।

অত্র আয়াতের জওয়াবে بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (হ্যাঁ! নিশ্চয়ই আমি উক্ত বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারীদের অন্যতম) বলার হাদীছটি যঈফ।[৩৫০]

সারকথা :

ঈমান ও সৎকর্মের ফলে মানুষ মানবতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয় এবং তার বিপরীত হ'লে সে পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হয়। দুনিয়ার সুকৃতি ও দুস্কৃতির প্রতিদান ও প্রতিফল মানুষ যথাযথভাবে আখেরাতে প্রাপ্ত হবে। আর এটাই হ'ল ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত দাবী।

---

৩৫০. তিরমিযী হা/৩৩৪৭, আবুদাঊদ হা/৮৮৭; মিশকাত হা/৮৬০ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।

সূরা 'আলাক্ব (রক্তপিণ্ড)

সূরা ৯৬, আয়াত ১৯, শব্দ ৭২, বর্ণ ২৮১।

[এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত হেরা গুহায় নাযিল হওয়ার মাধ্যমে নুযূলে কুরআনের শুভ সূচনা হয়]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। — اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾

(২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে। — خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾

(৩) পড়। আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। — اِقۡرَاۡ وَ رَبُّکَ الۡاَکۡرَمُ ۙ﴿۳﴾

(৪) যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। — الَّذِیۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ﴿۴﴾

(৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। — عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ ؕ﴿۵﴾

(৬) কখনোই না! নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই সীমালংঘন করে। — کَلَّاۤ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَیَطۡغٰۤی ۙ﴿۶﴾

(৭) একারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। — اَنۡ رَّاٰہُ اسۡتَغۡنٰی ؕ﴿۷﴾

(৮) অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রত্যাবর্তনস্থল। — اِنَّ اِلٰی رَبِّکَ الرُّجۡعٰی ؕ﴿۸﴾

(৯) তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে যে নিষেধ করে, — اَرَءَیۡتَ الَّذِیۡ یَنۡہٰی ۙ﴿۹﴾

(১০) এক বান্দাকে যখন সে ছালাত আদায় করে? — عَبۡدًا اِذَا صَلّٰی ؕ﴿۱۰﴾

(১১) তুমি কি দেখেছ যদি সে সৎপথে থাকে, — اَرَءَیۡتَ اِنۡ کَانَ عَلَی الۡہُدٰۤی ۙ﴿۱۱﴾

(১২) অথবা আল্লাহভীতির নির্দেশ দেয়, — اَوۡ اَمَرَ بِالتَّقۡوٰی ؕ﴿۱۲﴾

(১৩) তুমি কি দেখেছ যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, — اَرَءَیۡتَ اِنۡ کَذَّبَ وَ تَوَلّٰی ؕ﴿۱۳﴾

(১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার সব কিছুই দেখেন? — اَلَمۡ یَعۡلَمۡ بِاَنَّ اللّٰہَ یَرٰی ؕ﴿۱۴﴾

(১৫) কখনোই না। যদি সে বিরত না হয়, তাহ'লে অবশ্যই আমরা তার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে সজোরে টান দেব।

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۙ﴿١٥﴾

(১৬) ঐ মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ ধরে।

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ﴿١٦﴾

(১৭) অতএব, ডাকুক সে তার পারিষদবর্গকে।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۙ﴿١٧﴾

(১৮) আমরাও অচিরে ডাকবো আযাবের ফেরেশতাদেরকে।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ﴿١٨﴾

(১৯) কখনোই না। তুমি তার কথা মানবে না। তুমি সিজদা কর এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য তালাশ কর।

كَلَّا ۭ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩﴿١٩﴾

বিষয়বস্তু :

সূরাটিতে চারটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এক- মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টি কৌশল বর্ণনা (১-২ *আয়াত*)। দুই- পড়া ও লেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন কৌশল শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে মানুষের উপর আল্লাহ যে বিরাট অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তার বর্ণনা (৩-৫ *আয়াত*)। তিন- অগণিত নে'মত পেয়েও মানুষ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে, যার পরিণতি হয় জাহান্নাম (৬-১৮ *আয়াত*)। চার- পাপীদের আনুগত্য না করে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(১৯ আয়াত)*।

গুরুত্ব :

ক্বদরের পবিত্র রজনীতে হেরা গুহায় বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সবচাইতে বড় অনুগ্রহ নুযূলে কুরআনের শুভ সূচনা হয় অত্র সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে। যদিও কুরআন সংকলনকালে আল্লাহ্‌র হুকুমে এ পাঁচটি আয়াতকে ৯৬নং সূরার শুরুতে যুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।[৩৫১]

নুযূলে অহি-র বিবরণ :

নুযূলে অহি-র বছরে রবীউল আউয়াল মাস থেকে রাসূল (ছাঃ) সত্যস্বপ্ন দেখতে থাকেন। ছ'মাস পর রামাযান মাসে তিনি হেরা গুহাতে ই'তিকাফ করেন। অতঃপর শেষ দশকে ক্বদর রাতে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। যা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ২৩ বছরে শেষ হয়। এজন্য তাঁর সত্য স্বপ্নকে নবুঅতের ৪৬ ভাগের একভাগ বলা হয়'।[৩৫২]

ইমাম আহমাদ হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ঘুমন্ত অবস্থায় সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে 'অহি' নাযিলের সূচনা হয়। স্বপ্নে

৩৫১. পরবর্তী সূরা ক্বদরে 'নুযূলে কুরআনের সূচনা' সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।
৩৫২. বুখারী হা/৬৯৮৯; মুসলিম হা/২২৬৩।

তিনি যা দেখতেন, প্রভাত সূর্যের মত তা সত্য হয়ে দেখা দিত। এরপর তাঁর মধ্যে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা দেখা দেয়। তখন তিনি হেরা গুহায় গিয়ে রাত কাটাতে থাকেন। তিনি একত্রে কয়েকদিনের খাদ্য সাথে নিয়ে যেতেন। ফুরিয়ে গেলে খাদীজার কাছে ফিরে এসে আবার খাদ্য নিয়ে যেতেন। এইভাবে একরাতে তাঁর নিকটে হেরা গুহাতে সত্য এসে হাযির হ'ল। ফেরেশতা তাঁকে বলল, তুমি পড়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا أَنَا بِقَارِئٍ 'আমি পড়তে জানি না'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন ফেরেশতা আমাকে বুকে ধরে জোরে চাপ দিল। তাতে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। তখন বলল, 'পড়'। বললাম, 'পড়তে জানিনা'। এবার দ্বিতীয়বার চাপ দিয়ে বলল 'পড়'। বললাম, পড়তে জানিনা। অতঃপর তৃতীয়বার চাপ দিয়ে বলল, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'- এখান থেকে পরপর পাঁচটি আয়াত। রাসূল (ছাঃ) পাঠ করলেন। তারপর ফেরেশতা চলে গেল এবং রাসূল (ছাঃ) বাড়ীতে ফিরে এলেন। এ সময় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি খাদীজাকে বললেন, زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ 'আমাকে চাদর মুড়ি দাও! আমাকে চাদর মুড়ি দাও'। অতঃপর চাদর মুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ থাকার পর তিনি বললেন, يَا خَدِيْجَةُ مَا لِىْ 'খাদীজা আমার কি হ'ল'? তারপর তিনি সব খুলে বললেন এবং শেষে বললেন, قَدْ خَشِيْتُ عَلَىَّ 'আমি মৃত্যুর আশংকা করছি'। তখন খাদীজা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, كَلاَّ أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ 'কখনোই না। সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ কখনোই আপনাকে লজ্জিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, গরীবের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন'। অতঃপর খাদীজা তাঁকে নিয়ে চাচাতো ভাই অরাক্বা বিন নওফেলের কাছে গেলেন। যিনি জাহেলী যুগে 'নাছারা' হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আরবী লিখতে পারতেন এবং ইনজীল থেকে আরবী করতেন। তিনি অতি বার্ধক্যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাকে বললেন, ভাই দেখুন আপনার ভাতিজা কি বলছেন। অরাক্বা বললেন, বল ভাতিজা, কি দেখেছ? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সব খুলে বললেন, যা তিনি দেখেছেন। জওয়াবে অরাক্বা বললেন, هَذَا النَّامُوسُ الَّذِى أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِى فِيهَا جَذَعًا، يَا لَيْتَنِىْ أَكُونُ حَيًّا، حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ- 'এতো সেই ফেরেশতা যিনি মূসার উপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হায়! যদি আমি সেদিন যুবক থাকতাম। হায়! যদি আমি সেদিন জীবিত থাকতাম। যেদিন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে বহিষ্কার করবে'। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বলে উঠলেন ? أَوَمُخْرِجِىَّ هُمْ 'ওরা কি

আমাকে বের করে দেবে?' অরাক্বা বললেন, نَعم، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِىَ 'হ্যাঁ! তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ, তা নিয়ে ইতিপূর্বে এমন কেউ আগমন করেননি, যার সাথে শত্রুতা করা হয়নি'। ছহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় إِلاَّ أُوذِىَ (যিনি নির্যাতিত হননি) এসেছে।[৩৫৩] অতঃপর তিনি বললেন, إِنْ يُدْرِكْنِى يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا 'যদি তোমার সেই দিন আমি পাই, তবে আমি তোমাকে যথাযোগ্য সাহায্য করব'।

এর কিছু দিনের মধ্যেই অরাক্বা মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় 'অহি' নাযিল বন্ধ হয়ে যায়। যাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি বারবার পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাতে থাকেন ফেরেশতাকে দেখার আশায়। হঠাৎ একদিন জিব্রীল তাঁর সামনে স্বরূপে প্রকাশিত হ'লেন এবং বললেন, يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا 'হে মুহাম্মাদ অবশ্যই আপনি নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র রাসূল'। একথা শোনার পরে তাঁর অস্থিরতা দূর হয়ে গেল এবং হৃদয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি ফিরে এলেন এবং এরপর থেকে কিছু দিন অহি-র আগমন বন্ধ রইল।

একদিন তিনি রাস্তায় চলা অবস্থায় একটি আওয়ায শুনে উপরদিকে তাকিয়ে জিব্রীলকে আবির্ভূত হ'তে দেখেন, যেভাবে তিনি তাকে হেরা গুহায় দেখেছিলেন। এদিন তিনি তাকে আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী চেয়ারের উপর বসা অবস্থায় দেখে ভীত হয়ে পড়েন এবং বাড়ীতে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। তখন সূরা মুদ্দাছছির নাযিল হয়। এরপর থেকে অহী নাযিল চলতে থাকে *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।[৩৫৪]

তাফসীর :

(১) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'।

অর্থ اقرأ مستعينًا باسم الله 'আল্লাহ্র নামে সাহায্য চেয়ে তুমি পাঠ কর'। এই আয়াতটি সহ পরপর পাঁচটি আয়াত মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে শেষনবী (ছাঃ)-এর নিকটে প্রেরিত সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ। এটাই ছিল আখেরী যামানার মানুষের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত সর্বপ্রথম আসমানী বার্তা। ইবনু কাছীর বলেন, وهن أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم– 'এগুলি ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হতে বান্দার উপরে প্রথম রহমত এবং তাদের উপরে আল্লাহ্র প্রথম নে'মত' (*ইবনু কাছীর*)।

---

৩৫৩. বুখারী হা/৪৯৫৩।

৩৫৪. বুখারী হা/৪; মুসলিম হা/১৬১; আহমাদ হা/২৬০০১; মিশকাত হা/৫৮৪১-৪৩ 'অহীর সূচনা' অনুচ্ছেদ।

কুরতুবী বলেন, এখানে পড়ার বিষয়টি উহ্য রাখা হয়েছে। যার অর্থ 'কুরআন' অর্থাৎ اقرأ القرآن وافتتحه باسم الله 'কুরআন পড় এবং বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর' *(কুরতুবী)*। এতে বুঝা যায় যে, প্রতিটি সূরার শুরুতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ করা উচিত। সম্ভবতঃ একারণেই প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত হয়েছে। তবে বক্তৃতা বা আলোচনার মাঝে যতবার কুরআনের আয়াত পাঠ করা হয়, ততবার 'বিসমিল্লাহ' পাঠের কোন দলীল নেই বরং শুরুতে একবার বলাই যথেষ্ট।

এর দ্বারা একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নে'মতটির অবতরণের সূচনা করা হ'ল তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র পবিত্র নামে। এতে একথাও বুঝানো হ'ল যে, যে কোন শুভ কাজের সূচনা আল্লাহ্র নামে ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করতে হবে। অত্র আয়াতে আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহের মধ্য থেকে প্রধান দু'টি ছিফাত উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে সবাই মানে। যেমন তিনি বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ- 'আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তুমি বল সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু ওদের অধিকাংশ কোন জ্ঞান রাখে না' (*লোকমান* ৩১/২৫)। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে মানলেও পালনকর্তা বা 'রব' হিসাবে মানতে অনেকে অস্বীকার করে। যেমন ফেরাঊন প্রকাশ্যে নিজেকে 'বড় রব' বলে দাবী করে বলেছিল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى 'আমি তোমাদের বড় পালনকর্তা (*নাযে'আত* ৭৯/২৪)। সম্ভবতঃ সেকারণেই আল্লাহ প্রথমে 'রব' এবং পরে 'খালেক' ছিফাতটি এনেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বান্দাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রকৃত 'রব' একমাত্র আমিই। আমিই তোমাদেরকে আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, পানি দিয়ে, খাদ্য-শস্য দিয়ে, রোগে আরোগ্য দান করে, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি দিয়ে দুনিয়ার এ মুসাফিরখানায় লালন-পালন করে থাকি। আমার এ পালনকার্যে আমি একক। আমার কোন শরীক নেই। রুবূবিয়াতের সকল ক্ষমতা কেবলমাত্র আমারই হাতে।

আল্লাহ সকলের পালনকর্তা হ'লেও 'তোমার প্রভু' (رَبِّكَ) বলে রাসূলকে খাছ করার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদাকে উচ্চ শিখরে উন্নীত করা হয়েছে। অতঃপর 'যিনি সৃষ্টি করেছেন' (الَّذِيْ خَلَقَ) বলে সৃষ্টির বিষয়টি সকল সৃষ্টিকুলের প্রতি আরোপ করা হয়েছে।

(২) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে'। অর্থ ابتدأ خلقه من علق 'তার সৃষ্টির সূচনা করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে'।

কুরআনে কোথাও মানুষকে 'শুকনো ঠনঠনে মাটি' থেকে *(রহমান ৫৫/১৪)*, কোথাও 'মাটির নির্যাস' থেকে *(মুমিনূন ২৩/১২)*, কোথাও 'পানি' থেকে *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)* সৃষ্টি বলা হয়েছে। এর দ্বারা সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বুঝানো হয়েছে। তবে মানব সৃষ্টির মূল উপাদান হ'ল 'মাটি' *(সাজদাহ ৩২/৭)*। তারপর তাতে পানি ঢেলে চটকানো কাদা *(হিজর ১৫/২৬)* বানানো হয়েছে। কিছুদিন পর ঠনঠনে শুকনো মাটি *(রহমান ৫৫/১৪)* হয়েছে। অতঃপর অবয়ব সৃষ্টি করে তাতে রূহ ফুঁকে দিয়ে তাকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করা হয়েছে *(ছোয়াদ ৩৮/৭১-৭২)*। অতঃপর আদম থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করে[৩৫৫] উভয়ের মিলনে মানব বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 'আমরা তোমাদের নানা পর্যায়ে সৃষ্টি করেছি' *(নূহ ৭১/১৪)*। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো, (তাহ'লে একবার ভেবে দেখ) আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে ... *(হজ্জ ২২/৫)*। বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং মায়ের গর্ভে মানব সৃষ্টির একটি স্তর বর্ণিত হয়েছে মাত্র। যা সকলের বোধগম্য বিষয়। আল্লাহ বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا 'তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু কাছ থেকে আসত, তাহ'লে এতে তারা অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত' *(নিসা ৪/৮২)*।

এখানে মানুষকে খাছ করার মাধ্যমে সকল সৃষ্টির মধ্যে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে। অতঃপর তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সেরা সৃষ্টি হ'লেও তুমি একথা ভুলে যেয়ো না যে, তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নিকৃষ্ট 'জমাট রক্তপিণ্ড' হ'তে। 'জমাট রক্তপিণ্ড' হ'ল মধ্যবর্তী অবস্থা। এর পূর্বে সে ছিল সূক্ষ্ম একটি পানি বিন্দু। পিতার শুক্রাণু ও মায়ের ডিম্বাণু যদি আল্লাহ্র হুকুমে মিলিত হয়, তবেই সেটা পরে রক্তবিন্দুতে পরিণত হয়। অতঃপর চার মাস বয়সে সন্তানের রূপ ধারণ করে এবং আল্লাহ্র হুকুমে তাতে রূহ আগমন করে।[৩৫৬] এখানে 'জমাট রক্ত' বলে সৃষ্টির পূর্বাপর অবস্থা সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টি কৌশল নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যাবলী উপস্থাপন করেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের মিলিত ব্যাখ্যায় একথা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য হবে স্রষ্টাকে জানা এবং তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহ অবগত

---

৩৫৫. নিসা ৪/১; বুখারী হা/৩৩৩১, মুসলিম হা/১৪৬৮, মিশকাত হা/৩২৩৮-৩৯।
৩৫৬. বুখারী হা/৭৪৫৪, মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২।

হওয়া। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে, তাহ'লে যেকোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। বিগত যুগে নূহ, 'আদ, ছামূদ, শো'আয়েব, ফেরাঊন ও তার কওমের পরিণতি এবং আধুনিক যুগে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং সাম্প্রতিক কালের বসনিয়া, সোমালিয়া, কসোভো এবং সর্বশেষ ইরাক ও আফগানিস্তান ট্রাজেডী এসবের বাস্তব প্রমাণ বহন করে।

(৩) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ 'পড়! আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু'।

প্রথম আয়াতে বর্ণিত اِقْرَأْ থেকে পুনরায় তাকীদ স্বরূপ এসেছে اِقْرَأْ 'তুমি পড়'। এখানেই বাক্য শেষ হয়েছে। অথবা اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ 'তুমি পড়। আর তোমার প্রভু তোমাকে সাহায্য করবেন ও বুঝাবেন। কেননা তিনি বড়ই দয়ালু *(কুরতুবী)*। এখানে প্রথম আয়াতটি আল্লাহ্‌র রুবূবিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত এবং অত্র আয়াতটি তাঁর প্রেরিত শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা কলম দিয়ে কুরআন-হাদীছ লিখিত ও সংরক্ষিত হয়। অহি নাযিলের শুরুতেই বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র এই ধরনের বার বার পড়ার নির্দেশ বিগত কোন ইলাহী গ্রন্থে ছিল বলে জানা যায় না। লক্ষণীয় যে, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কোনটাই এখানে বলা হয়নি। কারণ আল্লাহ চান মানুষ প্রথমে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করুক। অতঃপর সচেতনভাবেই তাওহীদের সাক্ষ্য দিক। অতঃপর ভক্তিভরে আল্লাহ্‌র ইবাদত করুক। শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি যে কুরআনের এত বড় তাকীদ, সেই কুরআনের অনুসারীদের বিশ্বব্যাপী আজ এত দুরবস্থা কেন? কারণ প্রধানতঃ একটাই- তারা কুরআনী শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানচর্চা তারা যেন ভুলেই গেছে- যা ছিল এককালে তাদের একক উত্তরাধিকার।

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ 'আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু'।

الأكرم অর্থ كريم দয়ালু। অথবা حليم অর্থ ধৈর্য ও স্থৈর্যের অধিকারী। যিনি বান্দার অজ্ঞতা ও মূর্খতায় ধৈর্য ধারণ করেন ও শাস্তি দিতে দেরী করেন। তবে কুরতুবী বলেন, প্রথমটাই অর্থের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ (*কুরতুবী*)। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সবচেয়ে বড় দয়ালু। কারণ তিনি মুমিন-কাফির সবাইকে আলো-বাতাস ও খাদ্য-পানীয় দিয়ে উদারভাবে প্রতিপালন করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বান্দাকে জ্ঞানরূপী মহা নে'মত দান করেছেন। যার ফলে সে মূর্খতার অন্ধকার হতে মুক্তি পেয়েছে।

(৪) اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 'যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন'।

লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষাদানকে আল্লাহ এখানে বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হিসাবে পেশ করেছেন।

ক্বাতাদাহ বলেন, 'কলম হ'ল আল্লাহ্র বিরাট একটি নে'মত। যা না হ'লে দ্বীন ও জীবন-জীবিকা কোনটাই সঠিকভাবে চলতো না'। قَلَمَ يَقْلِمُ قَلْمًا অর্থ কর্তন করা। যেমন নখ কাটা হয়। কলমের মাথা কেটে সরু করা হয় বলেই একে 'কলম' বলা হয়েছে। এযুগের বৈদ্যুতিক লেখনী মূলতঃ কলমের লেখনীর অনুকরণ মাত্র।

বিদ্বানগণ বলেন, কলম তিন প্রকার :

এক- সর্বপ্রথম সেই কলম যাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেন এবং লেখার নির্দেশ দেন। দুই- ফেরেশতাদের কলম, যা আল্লাহ তাদের হাতে দিয়েছেন বান্দার আমলনামা ও সবকিছুর তাক্বদীর লেখার জন্য। তিন- মানুষের ব্যবহৃত কলম। যা আল্লাহ তাদের হাতে দিয়েছেন জ্ঞানার্জনের জন্য ও অন্যান্য কাজের জন্য (*কুরতুবী*)।

ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ 'আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাকে বলেন, লেখ। সে বলল, কি লিখব? আল্লাহ বললেন, তাক্বদীর লিখ। তখন সে লিখল যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছ ঘটবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত'।[৩৫৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখাৎ অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى 'মাখলূক্বাত সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাঁর কিতাবে লিখেন, যা তখন তাঁর নিকটে আরশের উপরে ছিল- 'নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপরে জয়লাভ করে'।[৩৫৮]

আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ، كِرَاماً كَاتِبِيْنَ 'নিশ্চয়ই তোমাদের উপরে রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ'। 'সম্মানিত লেখকগণ' (*ইনফিত্বার ৮২/১০-১১*)। অর্থাৎ বান্দার প্রতি মুহূর্তের আমলসমূহ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ সর্বদা কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করছেন। এতে বুঝা যায় যে, দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্র কলমের সাহায্যেই সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়। কলম আল্লাহ পাকের দেয়া এক অপূর্ব নে'মত। যা মানুষের মনের কথা অবলীলাক্রমে লিখে ফেলে। মনের সাথে কলমের এই সংযোগ, মনের কথা কলমে

---

৩৫৭. তিরমিযী হা/২১৫৫; মিশকাত হা/৯৪।
৩৫৮. বুখারী হা/৭৫৫৪, মুসলিম হা/২৭৫১; মিশকাত হা/৫৭০০।

প্রকাশের ক্ষমতা, আল্লাহ্র দেয়া এমন এক অমূল্য নে'মত, যার কোন তুলনা নেই, যার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। যদি কলম না থাকতো, তাহ'লে দ্বীন-ধর্ম, সমাজ-রাষ্ট্র, আইন-আদালত, সাহিত্য-বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য কোন কিছুই ধরে রাখা সম্ভব হতো না। সবই বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যেত। কলম হ'ল মনের ও যবানের প্রতিনিধি। আল্লাহ্র হুকুমে মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, সেটাই মুখের ভাষায় বর্ণিত হয় ও কলমে লিখিত হয়। আল্লাহ বলেন, الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ– 'রহমান! যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন' (*রহমান ৫৫/১-৪*)। অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমানিয়াতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হ'ল মানুষকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া। যা তিনি অন্য কোন সৃষ্টিকে দেননি। কলম উক্ত ভাষারই প্রতিনিধিত্ব করে। নুযূলে অহি-র শুরুতেই আল্লাহ এভাবে কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

(৫) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না'।

অর্থাৎ অজানা বিষয়ে জ্ঞানদান করাটাই বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ালু হওয়ার অন্যতম প্রধান দলীল। মূলতঃ আল্লাহ্র নিকট হ'তে অজানা বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের কারণেই আদম (আঃ) ফেরেশতাদের উপরে জয়লাভ করেছিলেন (*বাক্বারাহ ২/৩১*)। অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপরে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল নিহিত রয়েছে ইলমের মধ্যে। মানুষের মধ্যে জ্ঞানের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অংশ দিয়ে দেয়া হয়েছে। যে মানুষ যত বেশী কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানচর্চা করবে, সে তত বেশী অজানা বিষয় জানতে পারবে ও নিত্য-নতুন কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا 'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহে পরিচালিত করব' (*আনকাবূত ২৯/৬৯*)। কিন্তু মুসলমান বর্তমানে সেই আসন থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছে জ্ঞানচর্চা হ'তে দূরে থাকার কারণে। ফলে নিজের ঘরের বহু বিষয় আজও তার অজানা রয়েছে। সে জানেনা তার মাটির নীচে তার পানির নীচে এমনকি তার আকাশে আল্লাহ্র কত অগণিত নে'মত লুকিয়ে রয়েছে।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেছেন যে, قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ 'তোমরা ইল্মকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেলো'।[৩৫৯]

অজানা বিষয়ে জ্ঞান লাভের বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্যেও প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ 'এবং তিনি তোমাকে শিখিয়েছে যা তুমি জানতে না'

৩৫৯. হাকেম ১/১০৬ হা/৩৬০; দারেমী হা/৪৯৮, মওকূফ ছহীহ।

(*নিসা ৪/১১৩*)। এটি সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئاً 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করে এনেছেন এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না' (*নাহল ১৬/৭৮*)।[৩৬০]

উম্মী নবী :

দুষ্টমতি লেখকগণ রাসূল (ছাঃ)-কে ভণ্ডনবী প্রমাণ করার জন্য তাকে অরাক্বা বিন নওফেলের নিকট থেকে ইঞ্জীল শিক্ষা করে, অতঃপর তা কুরআন হিসাবে তিনি প্রচার করেছেন বলে তাফসীর করে থাকেন। এটি যে ডাহা মিথ্যা পূর্বে বর্ণিত হাদীছ থেকেই বুঝা যায়। রাসূল (ছাঃ) ইতিপূর্বে লেখাপড়া কোথাও শিখেন নি, এটি সর্ববাদী সম্মত বিষয়। এর মধ্যে হিকমত এই যে, যেন পৃথিবীর কোন পণ্ডিত তাঁকে নিজের শিক্ষক বলে দাবী করতে না পারেন। যুগে যুগে বাতিলপন্থীদের এ ধরনের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলেন, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ 'তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লেখনি, যে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করবে' *(আনকাবূত ২৯/৪৮)*। এমনকি তাঁর ঈমান আনার বিষয়েও আল্লাহ বলেন, مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ 'তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি?' (*শূরা ৪২/৫২*)। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) 'নিরক্ষর' (Unlettered) ছিলেন। কিন্তু 'অজ্ঞ' (Illiterate) ছিলেন না। অতএব নবুঅত ও রিসালাত স্রেফ আল্লাহ প্রেরিত অনুগ্রহ। এটি মানুষের অর্জিত বিষয় নয়।

ইলম অর্জনের গুরুত্ব :

বর্ণিত আয়াতগুলিতে দ্বীনী ইলম অর্জনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নেই, যার প্রথম বাক্য হ'ল 'পড়'। তৃতীয় আয়াতের শুরুতে পুনরায় তাকীদ দিয়ে বলা হয়েছে 'পড়'। এর পরেই চতুর্থ আয়াতে কলমের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এতে পড়া ও লেখা দু'টিই যে ইলমের মাধ্যম, সেকথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাই ইলম অর্জন করা আদম সন্তানের প্রতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পক্ষ হ'তে প্রথম নির্দেশ হিসাবে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ

---

৩৬০. কিছু লোক প্রচার করে থাকে যে, বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হিঃ) মায়ের গর্ভ থেকে ১৮ পারা কুরআনের হাফেয অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। অথচ আল্লাহ বলছেন, 'তোমরা কিছুই জানতে না' (নাহল ১৬/৭৮)। অন্যদিকে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, وما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ 'তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি'? *(শূরা ৪২/৫২)*।

مُسْلِمٍ 'ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[৩৬১] এর অর্থ দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয। তিনি আরও বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ 'আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন'।[৩৬২] এছাড়াও সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে সাধ্যমত জ্ঞানার্জন করা ও সেখান থেকে কল্যাণ আহরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা বান্দার জন্য অবশ্য কর্তব্য *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*।

উপরে বর্ণিত পাঁচটি আয়াত হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের প্রথম 'অহি'। আয়াতগুলি নাযিলের পরে বিশুদ্ধ মতে ১০ দিন আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি (*আর-রাহীক্ব, পৃঃ ৬৯*)। অহি-র এই বিরতিকাল 'ফাৎরাতুল অহি' (فترة الوحى) নামে খ্যাত। বক্তা গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বলার পর শ্রোতাকে তার মর্মার্থ অনুধাবনের জন্য যেমন সময় দিয়ে থাকেন, আল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি আয়াত নাযিলের পর তার রাসূলকে যেন তার মর্ম ও গুরুত্ব অনুধাবনের সুযোগ দিলেন। কেবল রাসূল নন, সকল যুগের সকল মানুষ আয়াতগুলির গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। যেমন পাঁচটি আয়াতের প্রথম দু'টি আয়াত এবং তৃতীয় আয়াতের প্রথমাংশে তাওহীদে রুবূবিয়াতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার কোন শরীক নেই। অতঃপর তৃতীয় আয়াতের শেষাংশ থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত নবুঅতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যা কেবলমাত্র শ্রবণ, লিখন ও প্রচারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নবুঅত ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত আল্লাহ্র বিধান জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যে বিধান জানা ও না মানা পর্যন্ত দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত কল্যাণ লাভ আদৌ সম্ভব নয়।

এখানে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে, একজন উম্মী নবীকে সর্বপ্রথম নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে 'তুমি পড়'। একজন নিরক্ষর নবীকে সর্বপ্রথম বলা হচ্ছে কলমের সাহায্যে ইলম শিক্ষার কথা। এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ্র কালাম, যা রাসূলের মুখ দিয়ে বের করা হয়েছে মাত্র। এর শব্দ, বাক্য বা অর্থ কোনটাই রাসূল (ছাঃ)-এর নিজস্ব নয়। কারণ তিনি নিজেই ছিলেন উম্মী ও নিরক্ষর। তাঁর পক্ষে কুরআনের ন্যায় সর্বোচ্চ অলংকার সমৃদ্ধ এবং সর্বোচ্চ বিজ্ঞান, অতীত ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণী সমৃদ্ধ আয়াতসমূহ বর্ণনা করা একেবারেই অকল্পনীয় বিষয়। *সুবহানাল্লা-হি ওয়া বেহামদিহী, সুবহানাল্লা-হিল 'আযীম*।

৩৬১. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩, ৩৯১৪।
৩৬২. বুখারী হা/৭১, মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০।

(৬) كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى 'কখনোই না! নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই সীমালংঘন করে'।

(৭) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى 'এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে'।

كَلاَّ 'কখনোই না'। এটি হ'ল كلمة ردع বা প্রত্যাখ্যানকারী অব্যয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নে'মতসমূহকে অস্বীকারকারী ও সীমালংঘনকারীদের হঠকারী বক্তব্য সমূহকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ফলে كَلاَّ-এর বাস্তব অর্থ দাঁড়িয়েছে حَقًّا 'অবশ্যই'।

এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আবু জাহল প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যদিও বক্তব্য সকল হঠকারী মানুষের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতগুলি অনেক পরে নাযিল হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুমে তা অত্র সূরার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কুরআনের এই সংকলন প্রক্রিয়া এবং আয়াত ও সূরাসমূহের তারতীব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হুকুমে সম্পন্ন হয়েছে। যা তাওক্বীফী বা অপরিবর্তনীয় (*কুরতুবী*)।

আল্লাহ পাক এখানে মানুষের একটি স্বাভাবিক দুষ্ট প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন। সেটি এই যে, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন মনে করে, তখন তার মধ্যে অহংকার ও সীমালংঘন প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আবু জাহল ছিল মক্কার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। ধনবলে ও জনবলে সে ছিল বেপরওয়া। সে নিজেকে পরমুখাপেক্ষীহীন ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। অসহায় মুসলমানদের এবং রাসূল (ছাঃ)-কে সে নানাবিধ নির্যাতন করত। আর এভাবে কষ্ট দিয়ে সে উল্লাস প্রকাশ করত।

(৮) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى 'অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রত্যাবর্তনস্থল'।

رَجَعَ يَرْجِعُ رُجُوْعًا وَمَرْجَعًا وَرُجْعَى অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। الرُّجْعَى এসেছে فُعْلَى ওযনে মাছদার হিসাবে। যা اسم ظرف হয়েছে। অর্থ مَرْجِعُ 'প্রত্যাবর্তনস্থল'। যেমন আল্লাহ বলেন, إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'আল্লাহ্র নিকটেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন, যা কিছু তোমরা (দুনিয়াতে) করেছিলে' *(মায়েদাহ ৫/১০৫)*।

অর্থাৎ মানুষ যতই নিজেকে অভাবমুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন মনে করুক, যতই শক্তির বড়াই করুক, তাকে অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যেতে হবে। কেননা যেখান থেকে তার রূহ দুনিয়াতে এসে তার দেহে প্রবেশ করেছিল ফেরেশতার মাধ্যমে, সেখানেই তাকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ্র হুকুমে। এ নিয়মের কোন ব্যত্যয় হবে না। বিপদে ধৈর্যশীল বান্দারা তাই বলে থাকেন, إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ 'নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে ফিরে যাব' (*বাক্বারাহ ২/১৫৬*)। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ– ‘তোমরা ভয় কর ঐ দিনকে, যেদিন তোমরা আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না’ (*বাক্বারাহ ২/২৮১*)। উল্লেখ্য যে, এটাই হ’ল অবতরণ কালের হিসাবে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত’ (*কুরতুবী*)।

(৯) أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يَنْهَى ‘তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে যে নিষেধ করে’।

(১০) عَبْداً إِذَا صَلَّى ‘এক বান্দাকে যখন সে ছালাত আদায় করে’।

এখানে নিষেধকারী ব্যক্তি হ’ল আবু জাহল এবং ছালাত আদায়কারী বান্দা হ’লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন আবু জাহল তার লোকদের বলল, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে মাটিতে মাথা লাগায় (অর্থাৎ কা‘বাগৃহে ছালাত আদায় করে?)। লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন সে বলল, وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِه ‘লাত ও ওযযার কসম! যদি আমি তাকে এটা করতে দেখি, তাহ’লে অবশ্যই আমি তার ঘাড় দাবিয়ে দেব’। অতঃপর সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসল, যখন তিনি ছালাতরত ছিলেন। তখন সে তাঁর গর্দান মাড়াবার উদ্দেশ্যে এগোতে গেল। অমনি সে পিছন দিকে হটে এল ও দু’হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করল। তখন তাকে বলা হ’ল, তোমার কি হয়েছে? জবাবে সে বলল, আমি দেখলাম, আমার ও তার মাঝে একটি আগুনের পরিখা ও ভয়ংকর দৃশ্য এবং ডানাবিশিষ্ট একটি দল’।

উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ دَنَا مِنِّى لاَخْتَطَفَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا ‘যদি সে আমার নিকটবর্তী হ’ত, তাহ’লে ফেরেশতারা তার এক একটি অঙ্গ ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলত’।[৩৬৩] উক্ত প্রসঙ্গে অত্র আয়াতগুলি নাযিল হয় (*কুরতুবী*)।

এখানে عَبْدًا অনির্দিষ্ট বচনে ‘একজন বান্দা’ বলে রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদাকে আরও সমুন্নত করা হয়েছে। সাথে সাথে এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি ‘আব্দ (দাস)। কিন্তু মা‘বূদ (উপাস্য) নন। যারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশ বলেন, সেইসব অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ও মা‘রেফতী পীর-ফকীরদের ঘোর প্রতিবাদ রয়েছে অত্র আয়াতে।

(১১-১২) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ‘তুমি কি দেখেছ যদি সে সৎপথে থাকে’। ‘অথবা আল্লাহ্ভীতির নির্দেশ দেয়’।

(১৩-১৪) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى ‘তুমি কি দেখেছ যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়’? ‘সেকি জানে না যে, আল্লাহ তার সব কিছুই দেখেন’?

৩৬৩. মুসলিম হা/২৭৯৭; নাসাঈ হা/১১৬৮৩; মিশকাত হা/৫৮৫৬ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়-২৯, ‘নবুঅতের আলামত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৫।

অর্থাৎ আবু জাহল গং হেদায়াতের উপরে থাক বা আল্লাহভীরু হৌক, মিথ্যারোপ করুক বা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করুক, সবই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে রয়েছে। শেষের দু'টি أَرَأَيْتَ প্রথম أَرَأَيْتَ থেকে بدل হয়েছে। অর্থাৎ أَلَمْ يَعْلَمْ أَبُوْ جَهْلٍ بِأَنَّ اللهَ يَرَى 'আবু জাহল কি জানেনা যে, আল্লাহ (সবকিছু) দেখছেন'? *(কুরতুবী)*। শেষের আয়াতটি হ'ল পরপর তিনটি শর্তের জওয়াব বা খবর (*তানতাভী, কুরতুবী*)। অর্থাৎ সে যদি তাক্বওয়া অবলম্বন করে তাহ'লে পুরস্কৃত হবে। আর যদি সে মিথ্যারোপ করে, তাহ'লে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। বস্তুতঃ তার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্র দৃষ্টিতে রয়েছে।

(১৫) كَلاَّ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ 'কখনোই না। যদি সে বিরত না হয়, তাহ'লে অবশ্যই আমরা তার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে সজোরে টান দেব'।

এখানে كَلاَّ অর্থ حَقًّا 'অবশ্যই'। لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ অর্থ لَنَأْخُذَنَّ بِشِدَّةٍ بِنَاصِيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই আমরা তার কেশগুচ্ছ ধরে সজোরে টানবো'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ 'অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে। অতঃপর তাদের পাকড়াও করা হবে কপালের চুল ও পা ধরে' *(রহমান ৫৫/৪১)*। سَفَعَ يَسْفَعُ سَفْعًا 'থাপ্পড় মারা' سَفَعَهُ بِنَاصِيَتِهِ 'সে তার কপালের চুল ধরে সজোরে টেনেছে'। لَنَسْفَعاً আসলে ছিল لَنَسْفَعَنْ (لام تاكيد بانون خفيفة)। কিন্তু ওয়াক্ফের কারণে নূন-এর বদলে (اً) হয়েছে। এ শাস্তি দুনিয়াতেও হয়েছে। যেকারণে আবু জাহল শত চেষ্টা করেও রাসূল (ছাঃ)-এর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি।

আবু জাহলের ন্যায় কাফের নেতাদের প্রতি এ এক চরম হুমকি। দুনিয়াবী জীবনে কোন মানুষের প্রতি মানুষের এর চাইতে কঠোরতম ভাষা আর হয় না। আর তা যদি হয় মানুষের প্রতি মানুষের, তাহ'লে আল্লাহ্র হুমকি আরও কত বেশী কঠোর হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, ছালাতে বাধাদানকারী ব্যক্তিকে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে চূড়ান্তভাবে অপদস্থ করব এবং কঠিন আযাবে গ্রেফতার করব। ছালাতে বাধাদানকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ অন্যত্র 'সর্বাপেক্ষা বড় যালেম' বলে আখ্যায়িত করেছেন, যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা হ'তে নিষেধ করে এবং তা ধ্বংস করার প্রয়াস চালায়? (*বাক্বারাহ ২/১১৪*)। অতএব যে সকল সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায়, প্রতিষ্ঠানে বা কারখানায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছালাতের সুযোগ দেয়া হয় না বা ছালাতের নির্দেশ দেয়া হয় না কিংবা ছালাত আদায়ে নিরুৎসাহিত করা হয় বা বাধা দেওয়া হয়, তাদের হাশর হবে আবু

জাহলের সাথে। দুনিয়া ও আখেরাতে তারা আল্লাহ্র কঠিন গযবের শিকার হবে। আবু জাহল ও তার সাথীরা যারা ছালাতরত রাসূল (ছাঃ)-এর মাথার উপরে উটের ভুঁড়ি চাপিয়েছিল, তারা উক্ত ঘটনার ১০ বছর পরে বদরের যুদ্ধে একত্রে নিহত হয়েছিল এবং লাশগুলি একটি দুর্গন্ধযুক্ত পরিত্যক্ত কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।[৩৬৪] দুনিয়াতে তারা যেমন অভিশপ্ত ও অপদস্থ হয়েছিল, আখেরাতে তেমনি তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। অতএব ছালাতে বাধা দানকারীগণ সাবধান হও! ছালাত ঈমানকে তাযা রাখে। সেকারণ সেযুগের ও এ যুগের আবু জাহ্লরা ছালাতকে সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। তারা ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমানকে ছালাত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

(১৬) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ‘ঐ মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ ধরে’।

এটি ‘বদল’ হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্য হ’তে। অর্থাৎ ناصيةُ أبى جهلٍ كاذبةٍ فى قولها وخاطئةٍ فى فعلها– ‘আবু জাহলের মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ, যে তার কথায় মিথ্যুক ও কাজে পাপিষ্ঠ’ (*কুরতুবী*)।

(১৭) فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ ‘অতএব, ডাকুক সে তার পারিষদবর্গকে’।

এখানে ل এসেছে التحدّى (চ্যালেঞ্জ)-এর জন্য। অর্থ إن كان صادقا فى قوله فَلْيَدْعُ قَوْمَهُ ‘যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহ’লে তার দলবল ডাকুক’।

একদিন রাসূল (ছাঃ) কা‘বা চত্বরে ছালাত আদায় করছিলেন। তখন আবু জাহল সেখানে গিয়ে তিনবার রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا ؟ ‘আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি’? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) তাকে পাল্টা ধমক দিলেন। তখন আবু জাহল বলল, أَتُهَدِّدُنِى أَمَا وَاللهِ إِنِّى لَأَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِى نَادِياً ‘তুমি আমাকে ধমকাচ্ছো? অথচ আল্লাহ্র কসম! এই উপত্যকায় আমার মজলিস অর্থাৎ আমার দলই সবচেয়ে বড়’। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।[৩৬৫] অতএব দলগর্বী যালেমরা সাবধান!

(১৮) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ‘আমরাও অচিরে ডাকবো আযাবের ফেরেশতাদের’।

এটি পূর্বের আয়াতে বর্ণিত চ্যালেঞ্জের জওয়াব। শুরুতে একটি واو উহ্য রয়েছে। যা দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। পূর্বের আয়াতের শেষের ‘হা’ (ه) সাকিন এবং অত্র আয়াতের واو যা হরফে ইল্লাত হওয়ার কারণে সাকিন গণ্য হয়েছে।

---

৩৬৪. বুখারী হা/২৪০; মিশকাত হা/৫৮৪৭ ‘অহি-র সূচনা’ অনুচ্ছেদ।
৩৬৫. তিরমিযী হা/৩৩৪৯; নাসাঈ কুবরা হা/১১৬৮৪; ইবনু জারীর; ছহীহাহ হা/২৭৫।

زَبَنَ يَزْبِنُ زَبْنًا অর্থ রোধ করা, বাধা দেওয়া। সেখান থেকে زَبِيْنَةٌ অর্থ রক্ষী, সিপাহী। বহুবচনে زَبَانِيَةٌ। আরবরা এই শব্দ ব্যবহার করত কঠিন পাকড়াওয়ের ক্ষেত্রে (*কুরতুবী*)। এর দ্বারা ঐ ফেরেশতাদেরও বুঝানো হয়, যারা পাপীদের হাঁকিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যায়'। আয়াতে 'আযাবের ফেরেশতা' বুঝানো হয়েছে (*ইবনু কাছীর, তানতাভী*)। যেমন আল্লাহ বলেন, عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ 'জাহান্নামের উপর নিযুক্ত রয়েছে ফেরেশতামণ্ডলী, যারা নির্মম ও কঠোর। যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তার অবাধ্যতা করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে থাকে' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। এখানে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, জনবল ও অস্ত্রবল দিয়ে আল্লাহ্র শাস্তিকে মুকাবিলা করা কারু পক্ষে সম্ভব নয়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَاللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ مِنْ سَاعَتِه 'আল্লাহ্র কসম! যদি সে তার দলবল ডাকত, তাহ'লে অবশ্যই আযাবের ফেরেশতারা তৎক্ষণাৎ তাদের পাকড়াও করত'।[৩৬৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَوْ فَعَلَ لأَخَذَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ عِيَانًا 'যদি সে এটা করত, তাহ'লে প্রকাশ্যভাবেই ফেরেশতারা তাকে ধরত'।[৩৬৭]

نَادِيَهُ অর্থ أهل مجلسه وعشيرته 'তার বৈঠকের লোকদের ও আত্মীয়-পরিজনদের'। نَدَا يَنْدُوْ نَدْوًا 'জমা হওয়া, মজলিসে হাযির হওয়া'। সেখান থেকে نَادِى অর্থ মজলিস, বৈঠক ইত্যাদি। يَوْمُ التَّنَادِ অর্থ ক্বিয়ামতের দিন। যেদিন সকলে সমবেত হবে। আয়াতে النادى অর্থ أهل النادى 'আবু জাহলের দলবল ও তার পারিষদবর্গ'।

(১৯) كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 'কখনোই না। তুমি তার কথা মানবে না। তুমি সিজদা কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য তালাশ কর'।

كَلاَّ বলে এখানে আবু জাহলের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অর্থাৎ আবু জাহল যে ছালাত ত্যাগ করতে বলছে সেটা হবে না। অতএব হে রাসূল! তুমি কখনোই আবু জাহলের কথা শুনবে না। তাকে পরোয়া করবে না। তুমি যেখানে খুশী ছালাত আদায় কর ও আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান কর। আল্লাহ তোমাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে যে, মুসলমান যেন কোন অবস্থায় আবু জাহলের ও তাদের আদর্শের অনুসরণ না করে এবং জীবন গেলেও ইসলাম ছেড়ে কুফরকে গ্রহণ না করে।

---

৩৬৬. তিরমিযী হা/৩৩৪৯, হাদীছ ছহীহ।
৩৬৭. আহমাদ হা/২২২৫, তিরমিযী হা/৩৩৪৮।

আয়াতে وَاسْجُدْ (সিজদা কর) অর্থ ছালাত আদায় কর। কেননা সিজদা হ'ল ছালাতের অন্যতম প্রধান রুকন। যা ব্যতীত ছালাত হয়না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ 'বান্দা তার পালনকর্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, যখন সে সিজদারত হয়। অতএব তোমরা সেখানে বেশী বেশী দো'আ কর'।[৩৬৮] এখানে সিজদাবনত হওয়ার অর্থ ছালাতে মগ্ন হওয়া (*কুরতুবী*)।

আবু জাহ্ল ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যকার এই ঘটনা স্মরণ করে এই আয়াত পাঠের পর পাঠক ও শ্রোতাকে সিজদা করার বিধান দেয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ– 'আমরা সূরা ইনশিক্বাক্ব ও সূরা 'আলাক্ব শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সিজদা করেছি।[৩৬৯]

সংশয় নিরসন :

(১) আয়াতগুলি আবু জাহলের উপলক্ষে নাযিল হ'লেও এর বক্তব্য সর্বযুগের ইসলাম বিরোধী অহংকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য। (২) একইরূপ ঘটনা ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব ঘটিয়েছিল। সে সিজদারত রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের উপর উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল এবং ফাতিমা (রাঃ) এসে তাঁকে মুক্ত করেন।[৩৭০] কিন্তু সেখানে ফেরেশতা এসে বাধা দেয়নি। এর জবাবে হাফেয ইবনু হাজার বলেন, দু'জনেই একই ধরনের কাজে শরীক হ'লেও আবু জাহলের হুমকি ও জনবলের বড়াই ছিল বেশী। সেজন্য তাকে দ্রুত বাধা দেওয়া হয়। অবশ্য রাসূল (ছাঃ)-এর বদ দো'আয় তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধের দিন নিহত হয়।[৩৭১] (৩) এখানে যে ছালাতের কথা বলা হয়েছে, তা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বের ছালাত। (৪) এখানে যে সিজদায়ে তেলাওয়াতের কথা এসেছে, তা পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের জন্য সুন্নাত' *(ক্বাসেমী)*।

সারকথা :

লেখাপড়ার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা বাধ্যতামূলক। ধনবল ও জনবল আল্লাহ্র রহমতের দলীল নয় এবং সহায়হীনতা ও দরিদ্রতা আল্লাহ্র ক্রোধের প্রমাণ নয়। অতএব সর্বাবস্থায় পূর্ণ ইখলাছ ও আনুগত্য সহকারে আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হওয়া বান্দার জন্য অবশ্য কর্তব্য।

সূরাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যা শুরু হয়েছে নুযূলে অহি-র সূচনা দ্বারা এবং শেষ হয়েছে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদা ও তাঁর নৈকট্য তালাশের নির্দেশনা দ্বারা।

---

৩৬৮. মুসলিম হা/৪৮২ ছালাত অধ্যায়; নাসাঈ হা/১১৩৭; মিশকাত হা/৮৯৪।
৩৬৯. বুখারী হা/১০৭৫; মুসলিম হা/৫৭৮; মিশকাত হা/১০২৪ 'সুজূদুল কুরআন' অনুচ্ছেদ।
৩৭০. বুখারী হা/২৯৩৪, মুসলিম হা/১৭৩৪, মিশকাত হা/৫৮৪৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯।
৩৭১. বুখারী হা/২৪০; মুসলিম হা/১৭৯৪; মিশকাত হা/৫৮৪৭।

সূরা ক্বদর (মহিমান্বিত)

সূরা ‘আবাসা-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ৯৭, আয়াত ৫, শব্দ ৩০, বর্ণ ১১২।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) আমরা একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে।	اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَیۡلَۃِ الۡقَدۡرِ ۚ﴿ۖ۱﴾
(২) তুমি কি জানো ক্বদরের রাত্রি কি?	وَ مَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا لَیۡلَۃُ الۡقَدۡرِ ؕ﴿۲﴾
(৩) ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম।	لَیۡلَۃُ الۡقَدۡرِ ۬ۙ خَیۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ ؕ﴿ؔ۳﴾
(৪) এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রূহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে।	تَنَزَّلُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَ الرُّوۡحُ فِیۡهَا بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ ۚ مِنۡ کُلِّ اَمۡرٍ ۛ﴿ۙ۴﴾
(৫) এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।	سَلٰمٌ ۟ۛ هِیَ حَتّٰی مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ ﴿۵﴾

বিষয়বস্তু :

নুযূলে কুরআনের সময়কাল এবং ক্বদর রজনীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

গুরুত্ব :

(১) আল্লাহ তা‘আলা এই রাত্রিতে কুরআন নাযিলের সূচনা করেছেন। যা মানবজাতির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নির্দেশক। (২) এই রাত্রির ইবাদত হাযার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয় (৩) এই রাত্রিতে রহমতের পশরা নিয়ে হাযার হাযার ফেরেশতা নাযিল হয় ও পৃথিবীতে আল্লাহ্র রহমত বিতরণ করে (৪) এই রাত্রির মাহাত্ম্য বর্ণনায় এটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে নাযিল হয়েছে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষ তেলাওয়াত করবে।

তাফসীর :

(১) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ‘আমরা একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে’।

অর্থ ابتدأنا انزال القرآن على قلب خاتم النبيين ‘শেষনবীর হৃদয়ে আমরা কুরআন নাযিলের সূচনা করেছি’। এখানে ‘আমরা’ বলে বহুবচনের সম্মানজনক ক্রিয়াপদ (صيغة العظمة) আনা হয়েছে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশের জন্য। যেমন তিনি অন্যত্র

বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'আমরা যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমরা এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। কখনো নিজের একত্ব বর্ণনার জন্য একবচনের ক্রিয়াপদ (صيغة الوحدانية) ব্যবহার করেছেন। যেমন إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪)*। (ه) সর্বনাম দ্বারা 'কুরআন' বুঝানো হয়েছে। যদিও পূর্বে তার উল্লেখ নেই। তবে বিষয়টি পরিষ্কার। আর পুরা কুরআনই তো একটি সূরার ন্যায় *(কুরতুবী)*।

'ক্বদর' (القدر) অর্থ الشرف، المنزلة সম্মান, মর্যাদা। لَيْلَةُ الْقَدْرِ অর্থ মর্যাদার রাত্রি। অথবাلَيْلَةٌ ذُوْ قَدْرٍ মহিমান্বিত রজনী। অথবা لَيْلَةُ التَّقْدِيْرِ 'তাক্বদীর নির্ধারণের রাত্রি'। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ- أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ- 'আমরা একে নাযিল করেছি বরকতময় রাত্রিতে। আর আমরা তো সতর্ককারী'। 'এ রাত্রে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়'। 'আমাদের আদেশক্রমে। আর আমরাই তো প্রেরণকারী' *(দুখান ৪৪/৩-৫)*।

এ রাতের নেক আমল সমূহের ছওয়াব তুলনাহীন। তাছাড়া এ রাতে সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত কিতাব সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত রাসূলের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। সেকারণেও এ রাতকে লায়লাতুল ক্বদর বা মহিমান্বিত রজনী হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকতে পারে। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এলাহী গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে ক্বদরের রাত্রিতে। এ রাত্রিটা কোন্ মাসে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ- 'রামাযান মাস। যে মাসে নাযিল হয়েছে কুরআন, মানবজাতির জন্য হেদায়াত ও হেদায়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। অর্থাৎ ক্বদরের রাত্রি হ'ল রামাযান মাসে, কথিত শা'বান মাসে নয়। ক্বদর রাত্রিকে অন্যত্র 'মুবারক রাত্রি' বলা হয়েছে। যেমন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ 'আমরা একে নাযিল করেছি বরকতময় রজনীতে' *(দুখান ৪৪/৩)*।

ইকরিমা থেকে উক্ত রাত্রি অর্থ 'শা'বানের মধ্য রাত্রি' বলে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু কাছীর বলেন, এটি একেবারেই দূরবর্তী কথা (فَقَدْ أَبْعَدَ النَّجْعَةُ)। কেননা কুরআন নিজেই

ব্যাখ্যা দিয়েছে 'রামাযানে নাযিল হয়েছে' বলে *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। এ প্রসঙ্গে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে تُقْطَع الآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ، ويُولدُ لَهُ، وَلَقَدْ أُخْرِج اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى 'এই রাতে এক শা'বান থেকে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারিত হয়। এমনকি এই সময় কার বিয়ে হবে, সন্তান হবে বা মৃত্যু হবে সবই'।[৩৭২] তা 'মুরসাল'। এরূপ দুর্বল দলীল দিয়ে কুরআনী দলীল সমূহের মুকাবিলা করা যায় না' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা দুখান ৪৪/৩-৪)*। অতএব এ আয়াতে বিদ'আতীদের জন্য কোন দলীল নেই। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, যারা সূরা দুখানে বর্ণিত 'মুবারক রাত্রি' অর্থ 'মধ্য শা'বান' বলেন এবং ক্বদরের রাত্রির ন্যায় ঐ রাত্রিতে তাক্বদীর বণ্টন হয় বলেন, তারা গায়েবী বিষয়ে অকাট্য দলীল ব্যতীত কথা বলার দুঃসাহস দেখিয়ে থাকেন। যে বিষয়ে নিষ্পাপ রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছ বর্ণিত হয়নি, সে বিষয়ে কোনরূপ ধারণা পোষণ করা আমাদের জন্য সিদ্ধ নয়'।[৩৭৩]

নুযূলে কুরআনের সূচনা :

বিশুদ্ধ হিসাব মতে নুযূলে কুরআন শুরু হয় হেরা গুহায় ২১ রামাযান সোমবার ক্বদরের রাত্রিতে। প্রথম পাঁচটি আয়াত (*সূরা 'আলাক্ব ১-৫ আয়াত*) নাযিল করে জিব্রীল (আঃ) চলে যান। খৃষ্টীয় হিসাবে এ দিনটি ছিল ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বয়স ছিল চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন এবং সৌরবর্ষ হিসাবে ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন।[৩৭৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে যে কথা বলা হয়েছে যে, পুরা কুরআন জিব্রীল (আঃ) একত্রে লওহে মাহফূয থেকে রামাযান মাসের ক্বদর রাত্রিতে নিম্ন আকাশে এনে বায়তুল ইযযাতে রাখেন *(ইবনু কাছীর)*। অতঃপর সেখান থেকে লেখক ফেরেশতাগণ জিব্রীলকে বিশ রাত্রিতে বারে বারে আবৃত্তি করে শুনান। অতঃপর জিব্রীল সেটা নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে বারে বারে নাযিল করেন, যা বিশ বছরে শেষ হয়' *(মাওয়ার্দী)*। ইবনুল 'আরাবী বলেন, وهذا باطل، ليس بين جبريل وبين الله واسطة ولا بين جبريل ومحمد عليهما السلام واسطة– 'এটি বাতিল কথা। কেননা জিব্রীল ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন মাধ্যম নেই। জিব্রীল ও রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যেও কোন মাধ্যম নেই' (*কুরতুবী*)। বরং সঠিক কথা এই যে, কুরআন লওহে মাহফূযে সুরক্ষিত ছিল *(বুরূজ ৮৫/২১-২২)*। সেখান থেকে প্রয়োজন মাফিক আল্লাহ জিব্রীল মারফত তাঁর রাসূলের নিকটে প্রেরণ করেছেন। যা ২৩ বছরে শেষ হয়েছে।

---

৩৭২. ইবনু জারীর, বায়হাক্বী-শো'আব; যঈফাহ হা/৬৬০৭।
৩৭৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, শিফাউল 'আলীল পৃঃ ২২; তাফসীরে ক্বাসেমী।
৩৭৪. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৬-৬৭, টীকাসহ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 'তুমি কি জানো ক্বদরের রাত্রি কি?'

এর দ্বারা এ রাতের উচ্চ মর্যাদার প্রতি শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ফার্রা বলেন, কুরআনের যেসব স্থানে وَمَا أَدْرَاكَ আসে, তার অর্থ হয় قد أدراه 'সে জানে'। আর যেখানে وما يُدْرِيْكَ আসে, তার অর্থ হয়, لم يُدْرِه 'সে জানে না' । যেমন বলা হয়েছে وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى 'তুমি কি জানো সে হয়ত পরিশুদ্ধ হ'ত?' *(আবাসা ৮০/৩; কুরতুবী)*। এখানে 'লায়লাতুল ক্বদর' কি, সেটা আল্লাহ নিজেই পরবর্তী আয়াতে জানিয়ে দিচ্ছেন।

'লায়লাতুল ক্বদর' অর্থ আল্লাহ বলেছেন, لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ 'বরকতময় রাত্রি' (*দুখান ৪৪/৩*)। কেন এটি 'বরকতময়' তার ব্যাখ্যাও আল্লাহ দিয়েছেন, فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ 'এরাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়' (*দুখান ৪৪/৪*)। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে নির্ধারিত তাক্বদীর হ'তে আগামী এক বছরের হায়াত-মউত-রূযী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের তাক্বদীর ফেরেশতাদের হাতে এ রাতে অর্পণ করা হয় *(ইবনু কাছীর, দুখান ৪৪/৪)*। এ রাতে কুরআন নাযিলের সূচনা হওয়াটাও ছিল তাক্বদীরের একটা অংশ। আর কুরআন নাযিলের ফলে এ রাতের মর্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'তুমি কি জানো ক্বদরের রাত্রি কি'? অতঃপর তিনি বলেন-

(৩) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ 'ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম'। অর্থাৎ লায়লাতুল ক্বদর যাবতীয় সময়কালের চেয়ে উত্তম (خير من جميع الدهور), যাতে লায়লাতুল ক্বদর নেই। আরবরা ألف বা 'হাযার' শব্দ ব্যবহার করে থাকে 'কোন বস্তুর চূড়ান্তসীমা' (فى نهاية الأشياء) বুঝানোর জন্য। যেমন অন্য আয়াতে ইহুদীদের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ 'তাদের কেউ কামনা করে যেন হাযার বছর আয়ু পায়' (*বাক্বারাহ ২/৯৬*)। এখানে 'হাযার বছর' অর্থ চিরকাল (جميع الدهر)। একইভাবে أَلْفِ سَنَةٍ বা 'হাযার বছর' অর্থ অনন্তকাল *(কুরতুবী)*।

অর্থাৎ কেবল এক হাযার মাসের নয়, বরং এ রাতের ইবাদত ও নেক আমল হাযার হাযার রাতের ইবাদতের তুলনায় উত্তম। তিনটি আয়াতে পরপর তিনবার 'লায়লাতুল ক্বদর' উল্লেখ করার পর বলা হচ্ছে এটি হাযার রাত্রির চেয়ে উত্তম। বারবার বলার

মাধ্যমে এ রাতের মর্যাদা আরও উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য, 'হাযার রাত্রির' ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনু জারীর, কুরতুবী ও ইবনু কাছীরে অনেকগুলি বিস্ময়কর বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। যার প্রায় সবগুলিই ভিত্তিহীন, যঈফ, মুনকার এবং ইস্রাঈলী বর্ণনা মাত্র (*হাশিয়া কুরতুবী*)। অনেকে হাযার মাসের ব্যাখ্যা ৮৩ বছর ৪ মাস করেছেন *(ইবনু কাছীর)*। এগুলি কষ্ট কল্পনা মাত্র। আর এগুলি আরবদের বাকরীতির বিরোধী। বস্তুতঃ এখানে 'হাযার রাত্রি' বলে অসংখ্য ও অগণিত রাত্রি বুঝানো হয়েছে। শিরক ও বিদ'আতে পূর্ণ এবং দুনিয়াবী স্বার্থে দুষ্ট হাযার মাস রাত্রি জাগরণের চাইতে স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদতে একটি রাত্রি জাগরণ সর্বোচ্চ মর্যাদামণ্ডিত নয় কি?

এ রাতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، متفق عليه–

(ক) 'যে ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ছালাতে রত থাকবে, আল্লাহ তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন'।[৩৭৫] অর্থাৎ ইবাদত হ'তে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এবং তাঁর নিকট থেকে ছওয়াব ও পুরস্কার লাভের আকুল আকাংখা নিয়ে। এখানে 'সকল গোনাহ' বলতে সকল ছগীরা অর্থাৎ ছোট গোনাহ বুঝানো হয়েছে। কেননা কবীরা বা বড় গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ 'যারা কবীরা গোনাহ ও অশ্লীল কর্মসমূহ হ'তে বিরত থাকে, তবে ছোটখাট গোনাহ ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী' *(নাজম ৫৩/৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ– 'দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হ'তে আরেক জুম'আ, এক রামাযান হ'তে আরেক রামাযান তার মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে, যদি সে কবীরা গোনাহ সমূহ হ'তে বিরত থাকে'।[৩৭৬]

(খ) রামাযানের আগমনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِيْنُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ– 'তোমাদের নিকটে রামাযান মাস আগমন করেছে। যা বরকতমণ্ডিত

৩৭৫. বুখারী হা/৩৫, মুসলিম হা/৭৬০, মিশকাত হা/১৯৫৮।
৩৭৬. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪ 'ছালাত' অধ্যায়।

মাস। আল্লাহ এ মাসের ছিয়াম তোমাদের উপরে ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ থাকে ও শয়তানগুলি শৃংখলিত থাকে। এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাযার মাসের চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল, সে (আল্লাহ্র বিশেষ রহমত থেকে) বঞ্চিত রইল'।[৩৭৭]

(৪) تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ 'এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রূহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে'।

অর্থাৎ এ রাতে রহমত ও বরকতের ডালি নিয়ে জিব্রীলের নেতৃত্বে অগণিত ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করে আল্লাহ্র বিশেষ অনুমতিক্রমে। ক্বাতাদাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق 'যাতে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত থাকে এবং মৃত্যু ও রূযির হিসাব নির্ধারিত থাকে' *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ বলেছেন, فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ 'এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়' *(দুখান ৪৪/৪)*।

এখানে 'রূহ' অর্থ জিব্রীল (আঃ)। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًّا– 'অতঃপর আমরা তার (মরিয়ামের) নিকটে আমাদের রূহকে (জিব্রীলকে) পাঠালাম। অতঃপর সে তার (মরিয়ামের) নিকটে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল' (*মারিয়াম* ১৯/১৭)। অমনিভাবে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ 'বিশ্বস্ত ফেরেশতা (জিব্রীল) একে (কুরআনকে) নিয়ে অবতরণ করে' (*শো'আরা* ২৬/১৯৩)। আলোচ্য আয়াতে 'ফেরেশতাগণ' বলার পরে পৃথকভাবে 'রূহ' বলে ফেরেশতাগণের সর্দার হিসাবে জিব্রীল (আঃ)-এর স্বতন্ত্র মর্যাদা নির্দেশ করা হয়েছে।

بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ 'তাদের প্রতিপালকের অনুমিতক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে'।

ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহ্র হুকুম প্রতিপালন করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, لاَ يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ 'আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ দেন, তারা তার অবাধ্যতা করে না এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়, তারা তা পালন করে' (*তাহরীম* ৬৬/৬)। এরপরেও بِأِذْنِ رَبِّهِمْ 'তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, এরাতে আল্লাহ্র বিশেষ অনুমতিক্রমে বিশেষ ফেরেশতামণ্ডলী বিশেষ নির্দেশসমূহ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে।

---

৩৭৭. আহমাদ হা/৮৯৭৯; নাসাঈ, সনদ ছহীহ, 'ছিয়াম' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৯৬২ 'ছওম' অধ্যায়।

এখানে بِإِذْنِ رَبِّهِمْ অর্থ بالإذن الكوني 'তাঁর প্রাকৃতিক নির্দেশক্রমে'। কেননা প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহ। এর অর্থ الإذن الشرعي 'বিধানগত নির্দেশ' নয়। যেমন মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ 'তাদের কি এমন কোন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধানসমূহ রচনা করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি'? *(শূরা ৪২/২১)*।

এখানে مِنْ كُلِّ أَمْرٍ অর্থ بكل أمر مما يأمرهم الله به 'আল্লাহ্র বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ 'ফেরেশতাগণ তাকে (মানুষকে) হেফাযত করে থাকে আল্লাহ্র নির্দেশে' (*রা'দ* ১৩/১১)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أى بكل أمر قدَّره الله وقضاه فى تلك السنة إلى قابل 'আল্লাহ্র ঐ সকল নির্দেশ সহকারে যা তিনি আগামী এক বছরের জন্য নির্ধারিত করেছেন ও ফায়ছালা করেছেন' (*কুরতুবী*)।

ইবনু কাছীর বলেন, এ রাতে ফেরেশতাগণ অধিক সংখ্যায় অবতরণ করে অধিক বরকতের কারণে। অধিকহারে বরকত ও রহমতের অবতরণের সাথে সাথে ফেরেশতাগণও অধিকহারে অবতরণ করে থাকে। যেমন তারা কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহকে স্মরণ করার মজলিসসমূহ ঘিরে রাখে। সেখানে প্রশান্তির বিশেষ রহমত নাযিল করে। তারা ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি সম্মানের জন্য তাদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেয়'।[৩৭৮]

কুরতুবী ও তানতাভী বলেন, مِنْ كُلِّ أَمْرٍ -য়ে বাক্য শেষ হয়েছে। পরবর্তী বাক্য سَلاَمٌ থেকে শুরু হয়েছে। একথা নাফে' ও অন্যান্য বিদ্বান হ'তে বর্ণিত হয়েছে (*কুরতুবী*)।

উল্লেখ্য যে, এরাতের বরকত থেকে বঞ্চিত হয় ঐসব গৃহ, যেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। যেমন আবু ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْرُ 'ঐ গৃহে (বা স্থানে) (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যেখানে কুকুর বা ছবি থাকে'।[৩৭৯] এর দ্বারা প্রাণীর ছবি বুঝানো হয়েছে, যা টাঙানো থাকে। ছবি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য সবই এর মধ্যে শামিল। 'কুকুর' দ্বারা সাধারণ কুকুর বুঝানো হয়েছে, যা বাড়ীর পাহারাদারীর জন্য নয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়।

(৫) سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 'এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত'।

---

৩৭৮. ইবনু কাছীর; মুসলিম হা/২৬৯৯, আবুদাঊদ হা/৩৬৪১ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২০৪, ২১২।
৩৭৯. বুখারী হা/৫৯৪৯, মুসলিম হা/২১০৭, মিশকাত হা/৪৪৮৯ 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ।

ক্বাতাদাহ ও ইবনু যায়েদ বলেন, هى خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر ‘এ রাতে কেবলই মঙ্গল। ফজর পর্যন্ত কোন অমঙ্গল নেই’ (*ইবনু কাছীর*)। যাহহাক বলেন, لا يقدّر الله فى تلك الليلة إلا السلامة ‘এ রাতে আল্লাহ শান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নির্ধারণ করেন না’। মুজাহিদ বলেন, هى ليلة سالمة لايستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء ولا أذى ‘এটি নিরাপদ রাত্রি। এ রাতে শয়তান কোন মন্দ বা কষ্টদায়ক কাজ করতে সক্ষম হয় না’। শা‘বী বলেন, এ রাতে মাগরিব হ’তে ফজর পর্যন্ত ফেরেশতাগণ মসজিদের মুছল্লীদের উপরে এবং প্রত্যেক মুমিনের উপরে সালাম করে বলে, السلام عليك ايها المؤمن ‘হে মুমিন আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক!’ (*কুরতুবী*)।

ক্বদরের রাত্রি কোন্টি :

লায়লাতুল ক্বদর কোন তারিখে হয়ে থাকে, সে বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‘তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে লায়লাতুল ক্বদর সন্ধান কর’।[৩৮০]

বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে, যার আলোকে বিদ্বানগণ এক একটির উপরে যোর দিয়েছেন। যেমন উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) ২৭ শে রামাযানের রাত্রির ব্যাপারে দৃঢ় মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) আমাদের খবর দিয়েছেন যে, أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا ‘ঐদিন সূর্য উঠবে, কিন্তু আলোকচ্ছটা থাকবে না’।[৩৮১] এর উপরে ভিত্তি করে অনেক বিদ্বান ২৭-এর রাত্রিকে লায়লাতুল ক্বদর বলে নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) প্রমুখাৎ বুখারী বর্ণিত হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হ’লেন। তখন দু’জন মুসলিম তাঁর সামনে এসে গেল। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে ক্বদরের রাত্রি সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের সাথে দেখা হয়ে গেল। ফলে সেটা আমার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হ’ল (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণের কথাটা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হ’ল)। সম্ভবতঃ এটা তোমাদের জন্য ভাল হ’ল। অতএব তোমরা এটা অনুসন্ধান কর ২৯, ২৭ ও ২৫শের

৩৮০. বুখারী হা/২০১৭; মিশকাত হা/২০৮৩ ‘ছওম’ অধ্যায়।
৩৮১. তিরমিযী হা/৩৩৫১ হাদীছ ছহীহ; মুসলিম, মিশকাত হা/২০৮৮।

রাতে'।[৩৮২] ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হাদীছের ব্যাখ্যা এটাই হ'তে পারে যে, তিনি বের হয়েছিলেন কেবল ঐ বছরের শবে ক্বদর নির্দিষ্ট করে বলার জন্য' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমস্ত হাদীছ একত্রিত করলে এ রাত্রিকে নির্দিষ্ট করার কোন উপায় নেই। যদি ২৭-এর রাত্রি নির্দিষ্ট হ'ত, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ কেবল এ রাতেই ইবাদতে রত থাকতেন। কিন্তু তাঁদের আমল ছিল এর বিপরীত। তারা শেষ দশকে ই'তিকাফে ও ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। অথচ আমরা কেবল ২৭ রাত্রিকেই শবেক্বদর ধরে নিয়েছি এবং এ রাত্রিকে ইবাদতের জন্য এমনকি ওমরাহ্র জন্য খাছ করে নিয়েছি। অথচ ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) ১৯ দিন সেখানে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তিনি বা তাঁর সঙ্গী ছাহাবীগণের কেউ ২৭শে রামাযানে বিশেষভাবে শবে ক্বদর পালন করেননি বা ওমরা করেননি। বরং এভাবে দিন নির্ধারণ করাটাই বিদ'আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরাতটিকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করেননি। মানুষ এভাবে বহু কিছুকে নিজেদের কল্পনার ভিত্তিতে দ্বীনের বিধান হিসাবে নির্ধারণ করেছে। যা আদৌ কোন দ্বীন হিসাবে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এর মাধ্যমে আমরা অনুষ্ঠানপ্রিয় হয়ে পড়েছি এবং শর্টকাট রাস্তায় জান্নাত পাওয়ার শয়তানী ধোঁকায় নিপতিত হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন-আমীন!

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এ রাত্রিকে গোপন রেখেছেন তার তাৎপর্য এই যে, বান্দা যেন সারা রামাযান ইবাদতে কাটায় এবং শেষ দশকে তার প্রচেষ্টা যোরদার করে' *(ইবনু কাছীর)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমৃত্যু রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করে গেছেন। তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন'।[৩৮৩] এ মর্মে ইবনু ওমর ও আয়েশা (রাঃ) হ'তে বুখারী ও মুসলিমে হাদীছসমূহ বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ- 'শেষ দশক হাযির হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সারা রাত জাগতেন, পরিবারের সবাইকে জাগাতেন এবং খুব কষ্ট করতেন ও কোমরে কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন'।[৩৮৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِه- 'আল্লাহ্র রাসূল

---

৩৮২. বুখারী হা/২০২৩; মিশকাত হা/২০৯৫ 'ছওম' অধ্যায়।

৩৮৩. বুখারী হা/২০২৬, মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭ 'ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদ।

৩৮৪. বুখারী হা/২০২৪, মুসলিম হা/১১৭৪, মিশকাত হা/২০৯০।

(ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ইবাদতে যত কষ্ট করতেন, এত কষ্ট অন্য সময় করতেন না'।[৩৮৫]

ইবনু কাছীর বলেন, সর্বদা বেশী বেশী প্রার্থনা করা মুস্তাহাব। রামাযান মাসে আরও বেশী এবং রামাযানের শেষ দশকে আরও বেশী। তন্মধ্যে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে সবচাইতে বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। বিশেষভাবে যে দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এ রাত্রিতে পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা হ'ল اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল! তুমি ক্ষমা করতে ভালবাসো। অতএব আমাকে ক্ষমা কর'।[৩৮৬]

উল্লেখ্য যে, নুযূলে কুরআনের এই মাসে রাসূল (ছাঃ) নিয়মিতভাবে জিব্রীল (আঃ)-এর নিকট কুরআন পেশ করতেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জিব্রীল (আঃ) রামাযানের প্রতি রাতে আগমন করতেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিকটে কুরআন পেশ করতেন। এ সময় রাসূল (ছাঃ) দানের হস্ত প্রসারিত করতেন বায়ু প্রবাহের ন্যায়।[৩৮৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন প্রতিবছর একবার করে পেশ করা হ'ত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর বছরে দু'বার পেশ করা হয়। তিনি প্রতিবছর ১০ দিন ই'তিকাফ করেন। কিন্তু মৃত্যুর বছরে তিনি ২০ দিন ই'তিকাফ করেন'।[৩৮৮] অর্থাৎ নবুঅত লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি রামাযানে তাঁর নিকটে কুরআন পেশ করা হ'ত *(মির'আত ৭/১৪৯)*।

সারকথা :

আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও পরিচ্ছন্ন অন্তরে আল্লাহ্র নূর প্রক্ষিপ্ত হয়। রামাযানের মাসব্যাপী সাধনা শেষে তাই ক্বদর রজনীতে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। এ রাতের অপরিমেয় ফযীলত ও বরকত লাভের আশায় শেষ দশকে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হয়। যাতে মুমিনের অন্তরজগত পরিশুদ্ধ হয় এবং তা আল্লাহ্র নূর ও হেদায়াত লাভের যোগ্য হয়।

---

৩৮৫. মুসলিম হা/১১৭৫, মিশকাত হা/২০৮৯।
৩৮৬. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী হা/৩৫১৩, মিশকাত হা/২০৯১।
৩৮৭. বুখারী হা/৩২২০, মুসলিম হা/২৩০৮, মিশকাত হা/২০৯৮।
৩৮৮. বুখারী হা/৪৯৯৮, মিশকাত হা/২০৯৯ 'ছওম' অধ্যায়, 'ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদ; মির'আত হা/২১১৯, ২১২২; ৭/১৫০, ১৫৬ পৃঃ।

সূরা বাইয়েনাহ (স্পষ্ট প্রমাণ)

সূরা তালাক-এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ।

সূরা ৯৮, আয়াত ৮, শব্দ ৯৪, বর্ণ ৪১২।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ١

(১) আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং মুশরিকরা (তাদের মূর্খতা হ'তে) বিরত হ'ত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ٢

(২) তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে প্রেরিত একজন রাসূল, যিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র পত্র সমূহ,

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۗ٣

(৩) যাতে রয়েছে সরল বিধান সমূহ।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ٤

(৪) আর কিতাবধারীরা বিভক্ত হয়েছে তাদের নিকটে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরেই।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۗ٥

(৫) অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ٦

(৬) আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে। এরা হ'ল সৃষ্টির অধম।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ٧

(৭) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা।

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ

(৮) তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত

عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝٨

হয় নদী সমূহ। যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপরে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

বিষয়বস্তু :

অত্র সূরায় দু'টি বিষয় আলোচিত হয়েছে : (১) ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য *(১-৫ আয়াত)*। (২) কাফির-মুশরিকদের শাস্তি ও ঈমানদারগণের পুরস্কার *(৬-৮ আয়াত)*।

গুরুত্ব :

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উবাই ইবনে কা'বকে বললেন, إِنَّ اللهَ أَمَرَنِىْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوْا) قَالَ وَسَمَّانِىْ لَكَ؟ قَالَ « نَعَمْ » فَبَكَى– 'আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমার উপরে সূরা বাইয়েনাহ পাঠ করি। উবাই বললেন, আল্লাহ আপনার নিকটে আমার নাম বলেছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন উবাই (খুশীতে) কাঁদতে লাগলেন'।[৩৮৯]

ইমাম কুরতুবী বলেন, এর মধ্যে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের শিক্ষাদানের তাৎপর্যগত বিষয়টি (فقه) ফুটে ওঠে। অন্য একজন বিদ্বান বলেন, এর মধ্যে এই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যেন কেউ নিম্নস্তরের কাউকে শিক্ষাদানে কুণ্ঠাবোধ না করে। উল্লেখ্য যে, উবাই ইবনে কা'ব ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্চারণ পদ্ধতি দ্রুত ধারণে সক্ষম ছাহাবী *(কুরতুবী)*। সেকারণ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে সূরাটি শুনালেন। যাতে তিনি হুবহু অন্যকে শিখাতে পারেন। অত্র হাদীছে সূরাটির গুরুত্বের সাথে সাথে উবাই ইবনে কা'বের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে এই মর্মে যে, আল্লাহ্র মহান দরবারে তার নামটি বাছাই করা হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

তাফসীর :

(১) لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ 'আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং মুশরিকরা (তাদের মূর্খতা হ'তে) বিরত হ'ত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়'।

ইবনু কাছীর বলেন, আহলে কিতাব অর্থ আরব ও আজমের ইহুদী-নাছারাগণ এবং মুশরিক অর্থ মূর্তিপূজারী ও অগ্নি উপাসকগণ' *(ইবনু কাছীর)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

---

৩৮৯. বুখারী হা/৪৯৫৯, মুসলিম হা/৭৯৯; মিশকাত হা/২১৯৬।

এখানে আহলে কিতাব বলে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাযীর, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকা বুঝানো হয়েছে এবং মুশরিকগণ বলতে মদীনা ও মক্কার এবং আশপাশের মুশরিক সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে (*কুরতুবী*)। তবে 'মুশরিক' অর্থ আহলে কিতাবও হ'তে পারে। কেননা তারা তাওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং আল্লাহ্র কিতাব থেকে তারা কোন ফায়েদা হাছিল করেনি। যেমন আজকালকের মুসলমানদের অবস্থা।

مُنْفَكِّيْنَ অর্থ منتهين عن كفرهم ومائلين عنه 'কুফরী থেকে বিরত এবং তা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীগণ'। مُنْفَكِّيْنَ অর্থ تاركين 'পরিত্যাগকারী' হ'তে পারে। অর্থাৎ যখন রাসূল (ছাঃ) তাদের কাছে এলেন, তখন তারা তাঁকে পরিত্যাগ করল। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ 'অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত বস্তু (কুরআন বা মুহাম্মাদ) আসল, তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। অতএব কাফিরদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হৌক' (*বাক্বারাহ ২/৮৯; কুরতুবী*)।

ইহুদীদের অনেকে ওযায়ের (আঃ)-কে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলত। নাছারাদের অনেকে ঈসা (আঃ)-কে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলত (*তওবা ৯/৩০*)। কেউ খোদ ঈসা ও তার মাকে 'উপাস্য' বলত (*মায়েদাহ ৫/১১৬*)। কেউ ঈসাকে 'তিন উপাস্যের অন্যতম' বলত (*মায়েদাহ ৫/৭৩*)। তারা তাদের পীর-আউলিয়াদেরকে 'রব'-এর আসনে বসিয়েছিল (*তওবা ৯/৩১*)। ফলে আল্লাহ প্রেরিত কিতাব তওরাত ও ইনজীলের অনুসারী হওয়ার দাবীদার হ'লেও তারা তাওহীদ তথা একত্ববাদ থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছিল। বিভিন্ন শয়তানী যুক্তি দিয়ে তারা তাদের কপোলকল্পিত এসব শিরকী আক্বীদা-বিশ্বাস ও রেওয়াজকে টিকিয়ে রেখেছিল। তওরাত ও ইনজীলকে তারা বিকৃত করে ফেলেছিল (*বাক্বারাহ ২/৭৫-৭৯*)। ফলে এমন সত্যগ্রন্থ তাদের সামনে ছিল না, যা তাদেরকে ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে বিরত রাখতে পারে। অবশেষে যখন কুরআন নাযিল হ'তে লাগলো, তখন তাদের অনেকে কুফরী বিশ্বাস থেকে বিরত হ'ল এবং ইসলাম কবুল করে ধন্য হ'ল। প্রখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের প্রথম দিনেই ইসলাম কবুল করেন। পরবর্তীতে ত্বাঈ গোত্রের খ্রিষ্টান নেতা 'আদী বিন হাতেম, আবদুল ক্বায়েস গোত্রের খ্রিষ্টান নেতা জারূদ ইবনুল 'আলা আল-'আবদী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইসলাম কবুল করেন।

পক্ষান্তরে মক্কা-মদীনা ও তার আশপাশের মূর্তিপূজারী ও অগ্নি উপাসক মুশরিকদের কাছে কোন ইলাহী কিতাব ছিল না। তাদের সব কিছু রীতি-নীতি ছিল সমাজনেতাদের মনগড়া এবং তা ছিল পুরোদস্তুর শোষণমূলক। তবুও বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের প্রতি তাদের ছিল একটা অন্ধ আবেগ, যা ছাড়তে তারা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কুরআনের স্পষ্ট সত্যের আলো বিকশিত হওয়ার পর তাদের অনেকের ঘোর কেটে যায় এবং তারা ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। যদিও এর জন্য তাদের

অনেককে চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়। হারাতে হয় ঘর-বাড়ি, জন্মস্থান এমনকি জীবন। এটা কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাব যুগেই নয়, বরং পরবর্তী যুগেও মানুষ সর্বদা অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে এসেছে এবং আসতে থাকবে। আর সাথে সাথে অন্ধকারের কীটেরা তাদের উপর নির্যাতন চালাবে। কেননা কুরআন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা মানুষকে আলোর পথে ডাকবে ও সর্বদা মানুষ আলোর পথে আসবে।

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ– 'যতক্ষণ না তাদের কাছ সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়'। অর্থাৎ কুরআন ও তার বাহক রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যেকথা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(২) رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُوْ صُحُفاً مُّطَهَّرَةً 'তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত একজন রাসূল, যিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র পত্রসমূহ'।

অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে তাদের নিকটে আগমন করেন রাসূল, যিনি তাদের নিকট তেলাওয়াত করেন পবিত্র কুরআন। এখানে رَسُوْلٌ অর্থ মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যাজ্জাজ বলেন, رَسُوْلٌ এখানে পূর্বের আয়াতে বর্ণিত اَلْبَيِّنَةُ হ'তে 'বদল' হওয়াতে مرفوع বা পেশযুক্ত হয়েছে (কুরতুবী)। نكرة বা অনির্দিষ্টবাচক শব্দ ব্যবহার করে রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। مِنَ اللهِ 'আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে' বলার মাধ্যমে তাঁর সম্মানকে আরও উন্নীত করা হয়েছে। সাথে সাথে সন্দেহবাদীদের মোক্ষম জবাব দেওয়া হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا 'আমরা তোমাকে মানবজাতির জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট' *(নিসা ৪/৭৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا 'বরকতময় তিনি যিনি স্বীয় বান্দার (মুহাম্মাদের) উপর ফুরক্বান (কুরআন) নাযিল করেছেন। যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হ'তে পারেন' *(ফুরক্বান ২৫/১)*। এই বান্দা নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। যিনি মানুষের মধ্যে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী'।[৩৯০] যিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে জিব্রীলের মাধ্যমে অহিপ্রাপ্ত হয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/৯৭)*।

تَلاَ يَتْلُوْ تِلاَوَةً অর্থ আবৃত্তি করা। এজন্য কুরআন পাঠ করাকে তেলাওয়াত করা বলা হয়। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 'যখন আমরা কুরআন পাঠ করি, তখন তুমি উক্ত পাঠের অনুসরণ কর' (*ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৮*)। 'তেলাওয়াত' পরিভাষাটি কুরআনের সঙ্গে খাছ। যা হুবহু মুছহাফে উছমানীর আবৃত্তি হবে, অন্য কোন

৩৯০. বুখারী হা/৭২৮১, মিশকাত হা/১৪৪।

ক্বিরাআতের নয়। যেমন আলোচ্য আয়াতে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর ক্বিরাআত হ'ল- لَمْ يَكُنِ الْمُشْرِكُوْنَ وأَهْلُ الْكِتَابِ مُنْفَكِّيْنَ ইবনুল 'আরাবী বলেন, وهى جائزة فى مَعرِض البيان لا فى معرض التلاوة 'এটি তাফসীরের ক্ষেত্রে বলা জায়েয, তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে নয়' (*কুরতুবী*)। কেননা তেলাওয়াত বলতে সেটাই বুঝাবে যা হবে কুরায়শী ক্বিরাআত এবং যে ক্বিরাআতের উপরে ইজমায়ে ছাহাবা হয়েছে এবং যা মুছহাফে ওছমানী হিসাবে এককভাবে মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত হয়েছে। অন্য কিছু পাঠ করাকে 'তেলাওয়াত' বলা যাবে না। বললে সেটা হবে কুরআনের সাথে চরম বেআদবী।

صُحُفاً مُّطَهَّرَةً 'পবিত্র পত্রসমূহ'। অর্থাৎ কুরআন, যা থেকে তিনি পাঠ করে শুনাতেন। যা 'লওহে মাহফূযে' অর্থাৎ আল্লাহ্র সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থানে 'সুরক্ষিত ফলকে' লিপিবদ্ধ ছিল (*বুরূজ ৮৫/২১-২২, ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭৭-৭৮*)। অন্যত্র এর ব্যাখ্যা এসেছে এভাবে, فِيْ صُحُف مُّكَرَّمَة، مَّرْفُوْعَة مُّطَهَّرَة، بِأَيْدِيْ سَفَرَة، كِرَام بَرَرَة– 'এটা লিখিত আছে সম্মানিত পত্রসমূহে'। 'যা উচ্চ ও পবিত্র '। 'যা লিখিত হয়েছে লিপিকারগণের হাতে'। 'যারা মহান ও পূত-চরিত্র' (*'আবাসা ৮০/১৩-১৬*)।

مُّطَهَّرَةً বা 'পবিত্র' অর্থ, مبرأة من الزور والكذب والباطل 'যা বানোয়াট, মিথ্যা ও বাতিল হ'তে মুক্ত'। ونزيهة من الرذائل 'যা সকল প্রকার শিরক হ'তে মুক্ত' منقاة من الشرك এবং 'অশ্লীলতা হ'তে পবিত্র'। صُحُفٌ একবচনে صَحِيْفَةٌ অর্থ লেখার পাত্র। এখানে ফলক বা কাগজ বুঝানো হয়নি। বরং লিখিত বস্তু বুঝানো হয়েছে। কুরআন প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হ'ত (*বাক্বারাহ ২/৯৭*)। সেখান থেকে তিনি মুখে পাঠ করে শুনাতেন। লিখিত কুরআন দেখে তিনি তেলাওয়াত করতেন না। কেননা তিনি উম্মী ছিলেন। না কিছু দেখে পড়তে পারতেন, না লিখতে পারতেন (*কুরতুবী*)। ফলে এখানে صُحُفاً مُّطَهَّرَةً বা 'পবিত্র পত্রসমূহ' বলতে রাসূল (ছাঃ)-এর হৃদয়পটে অংকিত কুরআনের বাণীসমূহ বুঝানো হয়েছে। যা সকল প্রকার মিথ্যা ও ক্রটিসমূহ হ'তে পবিত্র। আল্লাহ বলেন, لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِه تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ 'সামনে বা পিছন থেকে এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করে না। এটি প্রজ্ঞাময় ও মহা প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' (*হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪২*)।

(৩) فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ 'যাতে রয়েছে সরল বিধান সমূহ'। كُتُبٌ অর্থ مَكْتُوْبٌ 'লিখিত বস্তু'। সে হিসাবে كُتُبٌ ও صُحُفٌ সমার্থবোধক। এখানে كُتُبٌ অর্থ أحكام 'বিধান সমূহ' (*কুরতুবী*)।

قَيِّمَةٌ অর্থ بالحق مستقيمة ناطقة 'সরল ও সত্য বর্ণনাকারী' (*তানতাভী*)। ইবনু জারীর বলেন, عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ 'ন্যায়পূর্ণ ও সরল বাক্য, যাতে কোন ভুল নেই'। এর অর্থ হ'তে পারে محكمة অর্থাৎ 'বিধান সম্বলিত'। যেমন আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ- 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমার উপরে কিতাব নাযিল করেছেন, যার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট বিধান সম্বলিত। আর এগুলিই হ'ল কিতাবের মূল অংশ' *(আলে ইমরান ৩/৭)*। অর্থাৎ রাসূল তাদের নিকটে এমন কিতাব থেকে আবৃত্তি করে শুনান, যা স্পষ্ট বিধানসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ।

(8) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ 'আর কিতাবধারীরা বিভক্ত হয়েছে তাদের নিকটে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরেই'।

অর্থাৎ শেষনবীর আগমনের ব্যাপারে তারা ইতিপূর্বে সবাই একমত ছিল এবং তাঁর আগমনের অপেক্ষায় উন্মুখ ছিল। কেননা কিতাবধারী ইহুদী-নাছারাগণ তাদের কিতাবে লিখিত শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শুভাগমনের বিষয়ে আগে থেকেই জানতো। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ '(কল্যাণ তাদেরই প্রাপ্য) যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে, যাঁর কথা তারা তাদের নিকটে রক্ষিত তওরাত ও ইনজীলে লিখিত পেয়ে থাকে' ... *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। এতদ্ব্যতীত বনু ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় উম্মতকে এ বিষয়ে আগাম সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ- 'আর স্মরণ কর যখন মারিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে ইস্রাঈল সন্তানগণ। আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আসবেন। যার নাম হবে আহমাদ' (*ছফ ৬১/৬*)।

বস্তুতঃ এই সুসংবাদের কারণেই বায়তুল মুক্বাদ্দাস এলাকা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর বহু ইহুদী মদীনায় এসে আগাম বসবাস শুরু করে দেয় ও নিজেদের হিব্রু ভাষা ত্যাগ করে আরবী ভাষা শিখে নেয়। যাতে শেষনবীর আবির্ভাবের সাথে সাথে তারা সবার আগে তাকে বরণ করে নিতে পারে। দেখা গেল যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় আগমনের সাথে সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের মত ইহুদীদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা ও বিজ্ঞ আলেম ইসলাম কবুল করলেন। কিন্তু বাকী দুনিয়াদার ইহুদী সমাজপতিরা যখন দেখল যে, মুহাজির ও আনছাররা ইসলাম কবুল করে আগেই তার ছাহাবী হয়ে গেছেন, সেখানে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হয়ত খাটবে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং

অজুহাত তুলল যে, শেষনবী আসবেন ইসহাকের বংশে। কিন্তু ইনি তো ইসমাঈলের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। বস্তুতঃ এটা ছিল তাদের মনগড়া অজুহাত মাত্র। যার কোনই ভিত্তি ছিল না। বরং তারা শেষনবীকে ঠিকই চিনেছিল যেভাবে তাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, اَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ 'যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছিলাম (অর্থাৎ ইহুদী-নাছারাগণ) তাকে চিনে, যেমন তারা চিনে তাদের সন্তানদের। অথচ তাদের একটি দল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে' (*বাক্বারাহ ২/১৪৬*)।

এভাবেই তারা কেউ ঈমান আনে ও কেউ কুফরী করে বিভক্ত হয়ে যায়। আর এটা ছিল স্রেফ তাদের যিদ ও হঠকারিতা মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا تَفَرَّقُوْا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ 'তাদের কাছে ইলম (কুরআন) এসে যাওয়ার পরেই তারা বিভক্ত হয়ে যায় পরস্পরে হঠকারিতার কারণে' (*শূরা ৪২/১৪*)। বস্তুতঃ ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মতভেদের কারণই ছিল তাদের হঠকারিতা। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম ধর্ম। আর কিতাবধারীরা এটি গ্রহণে আপোষে মতভেদ করেছে তাদের নিকট ইলম (কুরআন) এসে যাওয়ার পর পরস্পরে হঠকারিতা বশে' (*আলে ইমরান ৩/১৯*)। মুসলিম উম্মাহকে এ বিষয়ে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ– 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এসে যাওয়ার পরেও পরস্পরে মতভেদ করেছে। ওদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব' (*আলে ইমরান ৩/১০৫*)।

কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলমানের! তারা আল্লাহ্র সাবধানবাণীকে অগ্রাহ্য করে ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে শত দলে বিভক্ত হয়েছে ও আপোষে হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে তাদের উপর দুনিয়াতেই আল্লাহ্র গযব নেমে এসেছে। ইসলামী খেলাফত হারানোর মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক ঐক্য ধ্বংস হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ চূড়া থেকে তারা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এখন তারা ইহুদী-নাছারা ও কুফরী শক্তির লেজুড়বৃত্তির মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে ফিরছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِى إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ 'আমার উম্মতের অবস্থা বনু ইস্রাঈলের মতই হবে এক জোড়া জুতার পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ন্যায়। বনু ইস্রাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে একটি ফের্কা ব্যতীত। লোকেরা বলল, তারা কারা হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, مَا

أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ 'যে তরীকার উপর আমি ও আমার ছাহাবীগণ আছি'। হাকেম-এর বর্ণনায় এসেছে اَلْيَوْمَ 'আজকের দিনে'।[৩৯১] মোটকথা স্রেফ যিদ ও হঠকারিতা বশে ইহুদী-নাছারাগণ সেদিন কুরআন ও তার বাহক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অস্বীকার করেছিল। আজও তাদের সে অবস্থার তেমন কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

(৫) وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ– 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন'।

অর্থাৎ ইহুদী-নাছারাদের মূল কিতাবে তাওহীদের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার বিপরীতে তারা শিরকে লিপ্ত হয়েছে। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَـــهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পীর-আউলিয়া ও মরিয়ম-তনয় মসীহ ঈসাকে রব-এর আসনে বসিয়েছে। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তারা যেসব বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করে, সেসব থেকে তিনি পবিত্র' (*তওবা ৯/৩১*)।

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ অর্থ ইবাদতকে আল্লাহ্র জন্য খালেছ করা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْنَ 'তুমি বল যে, আমি আদিষ্ট হয়েছি খালেছ আনুগত্য সহকারে আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য' (*যুমার ৩৯/১১*)। ইমাম কুরতুবী বলেন, এই আয়াতের মধ্যে দলীল রয়েছে আল্লাহ্র ইবাদত সমূহে 'নিয়ত' ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে। কেননা ইখলাছ হ'ল কলবের আমল, যা দ্বারা কেবল আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণ করা হয়, অন্যের নয়'। আর যা না হ'লে বান্দার কোন আমল কবুল হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[৩৯২] আল্লাহ কেবল مُخْلَصًا অর্থাৎ খালেছ বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং حُنَفَاءُ শব্দ উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ – مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام خاصة 'সকল

---

৩৯১. তিরমিযী হা/২৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; হাকেম ১/১২৯; ছহীহাহ হা/২০৩-০৪; যঈফাহ হা/১০৩৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৩/১২৬ পৃঃ।

৩৯২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১।

দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নির্দিষ্টভাবে কেবল ইসলামের দিকে রুজু হওয়া'। যেমন ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفاً وَّمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ– 'আমি আমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে ফিরিয়ে দিলাম সেই সত্তার দিকে, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' (*আন'আম ৬/৭৯*)। অন্যত্র তাওহীদের ব্যাখ্যা আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। যেমন وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ– 'আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত হ'তে বিরত থাকো' (*নাহল ১৬/৩৬*)।

এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, إِنَّ الْعِبَادَةَ لاَ تَحْصُلُ إِلاَّ بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوْتِ 'ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ব্যতীত ইবাদত হাছিল হওয়া সম্ভব নয়' এবং তাওহীদ ও শিরকের জগাখিচুড়ী আল্লাহ্র নিকটে কখনোই কবুলযোগ্য নয়। আর ত্বাগূত হ'ল, كل معبود من دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا الى الضلال 'আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্য। যেমন শয়তান, গণৎকার, মূর্তি এবং ঐ সকল বস্তু যা মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে' (*কুরতুবী*)। পারিভাষিক অর্থে, الطَّاغُوْتُ أَن يَّتَحَاكَمَ الرَّجُلُ اِلَى مَا سِوَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْبَاطِلِ 'কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে যে বাতিলের নিকট ফায়ছালা নিয়ে যাওয়া হয়, সেটাই হ'ল ত্বাগূত' (*ইবনু কাছীর -মর্মার্থ*)।

وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ 'এবং তারা ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে'।

অর্থাৎ খালেছ আনুগত্য সহকারে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করার সাথে সাথে ছালাত ও যাকাত আদায় করবে। এখানে তিনটি আমল একত্রে বলা হয়েছে। এক- নিয়তকে আল্লাহ্র জন্য খালেছ করা, যা হ'ল কলবের আমল। দুই- ছালাত কায়েম করা, যা হ'ল দৈহিক আমল এবং তিন- যাকাত আদায় করা, যা হ'ল আর্থিক আমল। তিনটিকেই একত্রে ইবাদত বলা হয়েছে। যাকে ইবাদতে ক্বালবী, ইবাদতে বদনী ও ইবাদতে মালী বলা যেতে পারে। ইমাম যুহরী, ইমাম শাফেঈ প্রমুখ বিদ্বানগণ এ আয়াত থেকে দলীল নিয়েছেন এই মর্মে যে, 'আমল ঈমানের অংশ' (*ইবনু কাছীর*)।

'ছালাত কায়েম করা' অর্থ ছালাত ওয়াক্ত মোতাবেক আদায় করা এবং তার ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত সমূহের যথাযথ হেফাযত করা। ইবনু কাছীর বলেন, ছালাত হ'ল দৈহিক ইবাদত সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (أشرف عبادات البدن)।

'যাকাত আদায় করা' অর্থ হকদারগণের নিকট যথার্থভাবে পৌঁছে দেওয়া (*কুরতুবী*)। যাকাত হ'ল আর্থিক ইবাদত সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যা ফকীর-মিসকীনদের প্রতি দয়ার গ্যারান্টি। ইবনু কাছীর বলেন, যাকাত হ'ল দরিদ্র ও মুখাপেক্ষীদের প্রতি দয়াশীলতা (الإحسان الى الفقراء والمحاويج)।

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 'আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন'।

অর্থাৎ শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস এবং ছালাত ও যাকাত যথাযথভাবে আদায় করাটাই হ'ল প্রকৃত দ্বীন ও সরল পথ। যাতে কোন মিথ্যা ও বক্রতা নেই।

(৬) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ– 'আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে। এরা হ'ল সৃষ্টির অধম'।

যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে। অতঃপর তারা ঈমান আনে না' *(আনফাল ৮/৫৫)*।

অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ কাফেরদের দুনিয়া ও আখেরাতের অবস্থান সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। দুনিয়ায় তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একেবারেই মর্যাদাহীন ও সৃষ্টির অধম এবং আখেরাতে তারা হবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা।

(৭) إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা'।

অর্থাৎ ঈমান ও আমলে ছালেহ যার মধ্যে একত্রিতভাবে পাওয়া যাবে, সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকটে সৃষ্টির সেরা। শুধুমাত্র বিশ্বাস বা শুধুমাত্র সৎকর্ম শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট নয়। এ আয়াতের উপরে ভিত্তি করে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও একদল বিদ্বান মুমিনদের মর্যাদা ফেরেশতাদের উপরে নির্ধারণ করেছেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

'ঈমান' অর্থ একমাত্র উপাস্য হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক বা তুলনীয় মনে না করা। রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী ও সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে বিশ্বাস করা এবং তাঁর সাথে কোন ব্যক্তিকে শরীক বা তুলনীয় মনে না করা। 'আমলে ছালেহ' অর্থ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুমোদিত নেক আমল এবং তার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ। যারা এটা করেন, তারাই হ'লেন সৃষ্টির সেরা মানুষ। বিশ্বাস ও কর্মগত এই পার্থক্যের কারণেই মুমিন ও কাফিরের মধ্যে বিয়ে-শাদী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের নিকৃষ্ট অবস্থান বর্ণনার পর অত্র আয়াতে তার বিপরীতে মুমিনদের সর্বোচ্চ অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে।

(৮) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ– 'তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী সমূহ। যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তার উপরে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে'।

অত্র আয়াতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের পরকালীন পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে পরকালে 'জান্নাতে আদন' প্রতিদান হিসাবে দেওয়া হবে। عَدْن অর্থ الإقامة বা বসবাস। أَقَامَ অর্থ عَدَنَ يَعْدِنُ عَدْنًا عُدُوْنًا 'বসবাস করা'। যেখান থেকে এসেছে مَعْدِنٌ অর্থ খনি। মুফাসসিরগণ বলেন, 'আদন' হ'ল بُطْنَانُ الْجَنَّةِ 'বাগিচার মধ্যস্থল' (*কুরতুবী*)। মূলতঃ 'আদন' একটি জান্নাতের নাম, যা অন্যান্য জান্নাত থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যা কেবল আল্লাহ্র ইলমে রয়েছে।

خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً 'যেখানে তারা অনন্তকাল ধরে বসবাস করবে'। যার কোন বিরতি হবে না বা সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না।

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ– 'আল্লাহ তাদের উপরে সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট'। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের আমলের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তারাও তাদের আমলের কল্পনাতীত প্রতিদান পেয়ে আল্লাহ্র উপরে সন্তুষ্ট হয়েছে।

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ 'এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে'।

الخوف والخشية অর্থ ভয়। তবে الخوف অর্থ 'সাধারণ ভয়' এবং الخشية অর্থ 'বিশেষ ভয়' যার শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকে। এখানে আল্লাহভীতিকে সেই অর্থে আনা হয়েছে। যার ভয়ে শরীর শিউরে ওঠে। আর এই ভীতিই হ'ল 'প্রকৃত সৌভাগ্যের উৎস' (مَلاَكُ السعادة الحقيقية)।

خَشِيَ অর্থ خاف الله فى السر والعلانية فتناهى عن المعاصى 'গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে। অতঃপর পাপ সমূহ থেকে বিরত হয়'। সে ভয় করে আল্লাহ কৃত ফরয সমূহ পালনের মাধ্যমে এবং তাঁর নিষেধ সমূহ বর্জনের মাধ্যমে। এই ভয়টা কেমন সে সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের

সামনে আল্লাহ্র কথা বলা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। অতঃপর যখন আল্লাহ্র আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ-

'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিতাব নাযিল করেছেন, যা বারবার পঠিত হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গাত্রচর্ম ভয়ে শিহরিত হয়। অতঃপর তাদের দেহ ও মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে' *(যুমার ৩৯/২৩)*। অতএব শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত সমূহের নাম তাক্বওয়া নয়, বরং হৃদয়ের আল্লাহভীতিই হ'ল প্রকৃত তাক্বওয়া। যা আল্লাহ দেখে থাকেন।

জান্নাতীদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى- 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করে ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা হ'তে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাত তার ঠিকানা হবে' (*নাযে'আত ৭৯/৪০-৪১*)। সে আল্লাহ প্রেরিত শরী'আত অনুযায়ী ইবাদত করে এমনভাবে যেন সে আল্লাহকে দেখছে। আর যদি তা না পারে, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই দেখছেন। যেমন হাদীছে জিব্রীলে এসেছে, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ- 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে, যেন তুমি তাকে দেখছ। আর যদি তা না পার, তাহ'লে (বিশ্বাস রাখো যে,) তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৩৯৩] আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ، الَّذِيْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِيْنَ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- 'তুমি ভরসা কর মহাপরাক্রান্ত পরম দয়াময়ের উপরে'। 'যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি ছালাতে দণ্ডায়মান হও'। 'এবং মুছল্লীদের সাথে উঠাবসা কর'। 'নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(শো'আরা ২৬/২১৭-২০)*। বস্তুতঃ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই হ'ল সবকিছুর মূল। জান্নাত কেবল তাদেরই ঠিকানা হবে। اللهم اجعلنا منهم 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তাদের মধ্যে শামিল কর! আমীন!!

সারকথা :

সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং সকল ব্যাপারে যথার্থভাবে তাঁকে ভয় করার মাধ্যমেই আল্লাহ্র রেযামন্দী হাছিল করা সম্ভব।

৩৯৩. বুখারী হা/৫০, মুসলিম হা/৮, মিশকাত হা/২।

সূরা যিলযাল (ভূমিকম্প)

সূরা নিসা-র পরে মদীনায় অবতীর্ণ।

সূরা ৯৯, আয়াত ৮, শব্দ ৩৬, বর্ণ ১৫৬।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে,	اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾
(২) যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ বের করে দেবে,	وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴿٢﴾
(৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হ’ল?	وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾
(৪) সেদিন পৃথিবী তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿٤﴾
(৫) কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন।	بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ﴿٥﴾
(৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়।	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾
(৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে।	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾
(৮) আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।	وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

বিষয়বস্তু :

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু হ’ল ক্বিয়ামত অনুষ্ঠান। যা দু’টি ভাগে আলোচিত হয়েছে। প্রথমভাগে ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে *(১-৫ আয়াত)*।

দ্বিতীয়ভাগে বলা হয়েছে যে, মানুষকে ঐদিন স্ব স্ব আমলনামা দেখানো হবে। অতঃপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের মাধ্যমে তার যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হবে *(৬-৮ আয়াত)*।

গুরুত্ব :

(১) সূরাটিতে ক্বিয়ামত প্রাক্কালের চূড়ান্ত ভূকম্পনের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে এবং মানুষকে অণু পরিমান সৎকর্ম হ’লেও তা করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(২) কবি ফারাযদাক্ব -এর চাচা (বরং দাদা) ছা'ছা'আহ বিন মু'আবিয়া রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সূরা যিলযাল পুরাটা শুনিয়ে দিলেন। শেষে পৌঁছে গেলে তিনি বলে উঠলেন, حَسْبِى لاَ أُبَالِى أَنْ لاَ أَسْمَعَ غَيْرَهَا 'যথেষ্ট! এটা ব্যতীত কুরআনের আর কিছু না শুনলেও চলবে'।[৩৯৪]

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এল। অতঃপর বলল, أَقْرِئْنِى يَا رَسُولَ اللهِ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি 'আলিফ লাম রা' বিশিষ্ট সূরা সমূহের তিনটি পাঠ কর। লোকটি বলল, আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে, হৃদয় শক্ত হয়ে গেছে, জিহ্বা মোটা হয়ে গেছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হা-মীম' বিশিষ্ট সূরা পড়। লোকটি আগের মতই বলল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে 'মুসাব্বিহাত' থেকে তিনটি পড়। লোকটি আগের মতই বলল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে একটি ব্যাপক অর্থপূর্ণ সূরা (سُوْرَةٌ جَامِعَةٌ) শিক্ষা দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সূরা যিলযাল পাঠ করে শুনালেন। ক্বিরাআত শেষ হ'লে লোকটি বলল, وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَداً 'যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, আমি এর উপরে মোটেই বৃদ্ধি করব না'। অতঃপর লোকটি পিঠ ফিরে চলে যেতে থাকল। তখন রাসূল (ছাঃ) দু'বার বললেন, أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ 'লোকটি সফলকাম হ'ল'।[৩৯৫] অতঃপর বললেন, عَلَىَّ بِهِ 'ওকে আমার কাছে ডেকে আনো'। লোকটিকে ফিরিয়ে আনা হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى جَعَلَهُ اللهُ عِيداً لِهَذِهِ الأُمَّةِ 'আমি ঈদুল আযহা সম্পর্কে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ এদিনকে এ উম্মতের জন্য ঈদ হিসাবে নির্ধারিত করেছেন'। লোকটি বলল, হে রাসূল! আমি যদি ছোট একটি মাদী বকরীছানা ব্যতীত কিছুই না পাই, তাহ'লে আমি কি সেটাকে কুরবানী করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। বরং তুমি وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমার চুল-নখ কাটো, গোফ ছাটো, গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ কর, এটাই তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হবে'।[৩৯৬]

---

৩৯৪. নাসাঈ কুবরা হা/১১৬৯৪; আহমাদ হা/২০৬১২, হাদীছ ছহীহ; ফারাযদাক্ব-এর দাদা হওয়াটাই সঠিক। তাঁর বংশ পরিচয় হ'ল : ফারাযদাক্ব আল-হাম্মাম বিন গালিব বিন ছা'ছা'আহ বিন নাজিয়াহ (আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৭০২৯)।

৩৯৫. الرُّوَيْجِلُ শব্দটি الراجل থেকে تصغير হয়েছে। অর্থ الماشى ضد الراكب 'পায়ে চলা ব্যক্তি, যা আরোহীর বিপরীত'।

৩৯৬. আহমাদ হা/৬৫৭৫, আরনাঊত্ব, সনদ হাসান; হাকেম হা/৩৯৬৪, সনদ ছহীহ; তাফসীর ইবনু কাছীর।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, সূরা যিলযাল নাযিল হ'লে আবুবকর (রাঃ) কাঁদতে থাকেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ 'যদি তোমরা পাপ' না হ'তে, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ আরেকটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করতেন, যারা পাপী হ'ত এবং তিনি তাদের ক্ষমা করতেন'।[৩৯৭]

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্র সূরার শেষ দু'টি আয়াতকে একত্রে الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ 'অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত' বলে অভিহিত করেছেন।[৩৯৮]

তাফসীর :

(১) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ' যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে'।

زَلْزَلَ يُزَلْزِلُ زَلْزَلَةً زِلْزَالاً وَزَلزالاً 'ভূমিকম্প হওয়া'। অর্থাৎ حرَّكت الأرض من أصلها পুরা পৃথিবী জড়শুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠবে *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ- 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর বিষয়'। 'যেদিন তোমরা তা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। যেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী মা তার দুগ্ধপানকারী সন্তান থেকে উদাসীন হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ খালাস করে ফেলবে। আর মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল সদৃশ। যদিও সে মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি অতীব কঠিন' *(হজ্জ ২২/১-২)*। এটি ইস্রাফীলের শিঙ্গায় ফুঁকদানের পরের ঘটনা। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ 'যেদিন কম্পিত করবে কম্পিতকারী'। 'যার পিছে পিছে আসবে আরেকটি নিনাদ' *(নাযে'আত ৭৯/৬-৭)*। প্রথম নিনাদকে نفخة صعق 'কম্পনের নিনাদ' এবং দ্বিতীয় নিনাদকে نفخة بعث বা 'পুনরুত্থানের নিনাদ' বলা হয়। প্রথম নিনাদে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে নতুন পৃথিবী হবে। অতঃপর দ্বিতীয় নিনাদের পরেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তাতে মৃতরা সব জীবিত হয়ে উঠে যাবে। দুই নিনাদের মাঝে সময়ের ব্যবধান হবে

---

৩৯৭. ত্বাবারাণী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১১৫১২; হায়ছামী বলেন, এর সকল রাবী ছহীহ-এর রাবী এবং এর দুর্বলতাটুকুর জন্য শাওয়াহেদ রয়েছে, যা তাকে শক্তিশালী করে। কুরতুবী হা/৬৪৩৬; হাদীছের শেষের অংশটি (لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ الخ) মুসলিম হা/২৭৪৮ ও তিরমিযী হা/৩৫৩৯-য়ে বর্ণিত হয়েছে।

৩৯৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭৩।

চল্লিশ। সেটি দিন, মাস না বছর, সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলতে অস্বীকার করেন'।[৩৯৯] পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যের আলোকে অত্র আয়াতের অর্থ দ্বিতীয় কম্পনের বলে অনুমিত হয়।

(২) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا 'যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ বের করে দেবে'। অর্থাৎ কবরবাসীরা সবাই জীবিত হয়ে বের হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ 'অতঃপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সবাই উঠে দাঁড়িয়ে যাবে ও দেখতে থাকবে' (*যুমার ৩৯/৬৮*)। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'যেদিন মানুষ বিশ্বপালকের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে' (*মুত্বাফফেফীন ৮৩/৬*)। আল্লাহ আরও বলেন, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ 'যেদিন পৃথিবী প্রসারিত হবে'। 'এবং তার ভিতরকার সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে' (*ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৩-৪*)।

এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ভূগর্ভে বহু সোনা-দানা খনি আকারে মানুষের জন্য সঞ্চিত রাখা হয়েছে যা উত্তোলন করে জনকল্যাণে ব্যয় করা মানুষের যরূরী কর্তব্য। যেমন হাদীছেও এ বিষয়ে বক্তব্য এসেছে যে, ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 'পৃথিবী উগরে দিবে ভূগর্ভে সঞ্চিত মূল্যবান স্বর্ণ-রৌপ্যসমূহ, যা বড় বড় স্তম্ভের মত'।[৪০০] অর্থাৎ কবর সমূহ থেকে মানুষ এবং ভূগর্ভ থেকে অন্যান্য সবকিছু বের করে দেওয়া হবে।

(৩) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا 'এবং মানুষ বলবে, এর কি হ'ল'?

অর্থাৎ পৃথিবীর এই ভয়ংকর পরিবর্তিত অবস্থা দেখে বিশেষ করে কাফেররা ভীতবিহ্বল হয়ে বলবে, ما الذي حدث لها وما شأنها 'এর কি হ'ল? এর কি অবস্থা'? কেননা তারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল না। মুমিনরা ভীতচকিত হ'লেও বিস্মিত হবে না। কেননা আগে থেকেই তারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল।

(৪) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا 'সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে'।

কুরতুবী ও ইবনু কাছীর বলেন, এর অর্থ হ'ল أى تخبر الأرض يومئذ بما عمل عليها من خير أو شر– 'পৃথিবী সেদিন তার উপরে যে সব ভাল ও মন্দ কর্ম সংঘটিত হয়েছে, সব

৩৯৯. বুখারী হা/৪৯৩৫, মুসলিম হা/২৯৫৫, মিশকাত হা/৫৫২১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'শিঙ্গায় ফুঁক দান' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুল বারী হা/৬৫১৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৪০০. মুসলিম হা/১০১৩; তিরমিযী হা/২২০৮; মিশকাত হা/৫৪৪৪ 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ।

বলে দেবে'। يَوْمَئِذٍ 'বদল' হয়েছে إِذَا زُلْزِلَتِ থেকে। সেকারণ يَوْمَ-এর উপরে 'যবর' হয়েছে। في ذلك الوقت تحدث أخبارها 'সেই সময় পৃথিবী তার সব খবর বলে দেবে' *(ক্বাসেমী)*। অথবা এটি جواب شرط হয়েছে إِذَا زُلْزِلَتِ থেকে। অর্থাৎ যেদিন ক্বিয়ামত হবে, সেদিন পৃথিবী সবকিছু বলে দেবে'। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুওয়াযযিনের আযানের ধ্বনি জিন, ইনসান, গাছ, পাথর, মাটি সহ যেই-ই শুনবে, সকল বস্তুই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে'।[৪০১] আর এটা হবে আল্লাহ্র ন্যায়বিচারের প্রমাণ হিসাবে এবং পাপীদের অস্বীকারের জওয়াব হিসাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ- 'স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমরা সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা আমার সাথে অন্যকে শরীক করেছিল তাদেরকে আমরা বলব, কোথায় তোমাদের শরীকগণ যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে ধারণা করতে'? 'তখন তাদের শিরকের ফল এছাড়া আর কিছুই হবে না যে তারা বলবে, আল্লাহ্র কসম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুশরিক ছিলাম না' *(আন'আম ৬/২২-২৩; মুমিন ৪০/৭৪)*। তবে পৃথিবী সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে তাদের আর কিছুই বলার থাকবে না।

(৫) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا 'কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন'।

أَوْحَى لَهَا অর্থ أوحى إليها 'তার প্রতি নির্দেশ দিবেন'। অর্থাৎ أَذِنَ لَهَا فِي أَنْ تُحَدِّثَ أَخْبَارَهَا 'আল্লাহ তাকে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করার অনুমতি দিবেন'। কেবল পৃথিবীকে নয়, বরং মানুষের চোখ, কান ও দেহচর্ম সবাইকে আল্লাহ কথা বলার অনুমতি দিবেন এবং তারা যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ 'যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদের জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন দলে'। 'অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে'। 'জাহান্নামীরা তখন তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি

---

৪০১. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৯; বুখারী হা/৬০৯; নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত হা/৬৫৬, ৬৬৭।

দান করেছেন' (*হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১৯-২১*)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত ও তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে তাদের পা' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

(৬) يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ 'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়'।

অর্থাৎ সেদিন মানুষ তাদের কবর হ'তে হিসাবস্থলের দিকে দলে দলে সমবেত হবে। অতঃপর হিসাব শেষে সেখান থেকে কেউ জান্নাতীদের ডান সারিতে কেউ জাহান্নামীদের বাম সারিতে প্রকাশ পাবে *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭-৯; বালাদ ৯০/১৭-১৯)*। এভাবে মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا- وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا 'সেদিন আমরা দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব'। 'এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেব' *(মারিয়াম ১৯/৮৫-৮৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ-

'যে দিন ক্বিয়ামত সংঘঠিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। 'অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে'। 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে হাযির করা হবে' (*রূম ৩০/১৪-১৬*)।

أَشْتَاتًا অর্থ فِرَقًا فِرَقًا 'দলে দলে'। একবচনে شَتٌّ (*কুরতুবী*)। لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ অর্থ ليريهم الله جزاء ماعملوه فى الدينا من خير وشر 'দুনিয়ায় তাদের ভাল-মন্দ কর্মের ফলাফল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে দেখানোর জন্য'। সেদিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দিয়ে বলা হবে, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৪)*। অতএব মানুষের কর্তব্য প্রতিদিন শুতে যাবার আগে নিজের কর্মের হিসাব নিজে নেওয়া। কেননা তার সব কর্মই লিখিত হচ্ছে।

(৭) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'।

(৮) وَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ 'এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে'।

ذَرَّةٌ অর্থ বিন্দু, সরিষাদানা, ছোট্ট পিপীলিকা। এর দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছোট্ট বস্তুর উপমা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পাপ বা পূণ্য যত ছোটই হৌক না কেন ক্বিয়ামতে বিচারের দিন তা দেখা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এক অণু পরিমান যুলুম করবেন না। যদি কেউ অণু পরিমান সৎকর্ম করে, তবে তিনি তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেন এবং আল্লাহ তার পক্ষ হ'তে মহা পুরস্কার দান করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪০)*। সেদিন সব আমল ওযন করা হবে। যার ওযন ভারী হবে, সে জান্নাতী হবে। আর যার ওযন হালকা হবে, সে জাহান্নামী হবে' *(ক্বারে'আহ ১০১/৬-৯)*। ঐ ওযন কিভাবে করা হবে, সেটি গায়েবী বিষয়। যা কেবল আল্লাহ জানেন।

অর্থাৎ সৎ বা অসৎকর্ম, তা যত ছোটই হৌক না কেন, সবকিছু ঐদিন হিসাবে চলে আসবে এবং তার যথাযথ প্রতিদান ও প্রতিফল পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوْءٍ، 'সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও..., (*আলে ইমরান ৩/৩০*)। তবে যে ব্যক্তি অন্যায় কর্ম থেকে খালেছ অন্তরে তওবা করে, সে ব্যক্তির উক্ত মন্দকর্ম হিসাব থেকে বাদ যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকটে তওবা কর খালেছ তওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়' (*তাহরীম ৬৬/৮*)। বিচারের দিন কিছু মুমিনের গোপন পাপ সম্পর্কে আল্লাহ একাকী তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন। তখন সে সব কথা স্বীকার করবে। যখন আল্লাহ দেখবেন যে, এতে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তিনি তাকে বলবেন, إِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَإِنِّى أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ 'আমি এগুলি তোমার উপর দুনিয়ায় গোপন রেখেছিলাম। আর আজ আমি তোমার জন্য ঐগুলি ক্ষমা করে দিলাম'।[৪০২]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের শেষ দিকে অত্র আয়াতটি *(যিলযাল ৭-৮)* সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ 'এটি অনন্য ও

---

৪০২. বুখারী হা/২৪৪১; মুসলিম হা/২৭৬৮।

সারগর্ভ আয়াত'।[৪০৩] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) অত্র আয়াতটিকে أحكم آية في القرآن 'কুরআনের সবচেয়ে বড় বিধান দানকারী আয়াত' বলে অভিহিত করেছেন এবং সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত' (*কুরতুবী*)।

জাহান্নাম থেকে বাঁচুন :

(১) হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ 'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো একটা খেজুরের টুকরা দিয়ে হ'লেও কিংবা একটু মিষ্ট কথা দিয়ে হ'লেও'।[৪০৪]

(২) আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ 'সামান্য নেকীর কাজকেও তুমি ছোট মনে করো না। এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে হ'লেও'।[৪০৫]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ 'হে মুমিন নারীগণ! তোমরা প্রতিবেশীকে বকরীর পায়ের দুই ক্ষুরের মধ্যেকার সামান্য গোশত দিয়ে সাহায্য করাকেও তুচ্ছ মনে করো না'।[৪০৬]

উম্মে বুজাইদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ 'পোড়ানো ক্ষুর হ'লেও সায়েলকে দাও'।[৪০৭]

(৪) আদী বিন হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ একটা খেজুরের টুকরা দিয়েও নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে, তবে সে যেন তা করে'।[৪০৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ'তেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত বিষয়েও আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে কৈফিয়ত তলব করা হবে'।[৪০৯]

---

৪০৩. বুখারী হা/৪৯৬২; মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩ 'যাকাত' অধ্যায়।
৪০৪. বুখারী হা/৮৪১৭' যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৮৫৭ 'নবুঅতের নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ।
৪০৫. মুসলিম হা/২৬২৬, তিরমিযী হা/১৮৩৩, মিশকাত হা/১৮৯৪ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।
৪০৬. বুখারী হা/২৫৬৬; মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৯২।
৪০৭. আহমাদ হা/১৬৬৯৯; নাসাঈ হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/১৯৪২ 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ।
৪০৮. মুসলিম হা/১০১৬ 'যাকাত' অধ্যায়, ২০ অনুচ্ছেদ।
৪০৯. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩, মিশকাত হা/৫৩৫৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহাহ হা/২৭৩১।

(৫) হযরত জাবের ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক নেকীর কাজই ছাদাক্বা'।[৪১০]

কাফিরের সৎকর্ম :

প্রশ্ন হ'ল, ক্বিয়ামতের দিন কাফিররা তাদের সৎকর্মের পুরস্কার পাবে কি?

এর জবাব এই যে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে বা তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আখেরাতে কিভাবে পুরস্কার পেতে পারে? আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُوْرٍ-

'যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের সেখানে মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবেনা যে তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও হালকা করা হবেনা। এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি' *(ফাত্বির ৩৫/৩৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ- قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ-

'জাহান্নামের অধিবাসীরা তাদের প্রহরীদের বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের শাস্তি হালকা করেন'। জবাবে 'তারা বলবে, তোমাদের নিকটে কি নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে, নিশ্চয়ই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে, তাহ'লে তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়ে থাকে' *(গাফের/মুমিন ৪০/৪৯-৫০)*।

বস্তুতঃ কাফিরদের সৎকর্মের পুরস্কার আল্লাহ দুনিয়াতেই দিবেন তাদের নাম-যশ বৃদ্ধি, সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তানাদি ও রূযী বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু আখেরাতে তারা কিছুই পাবে না। যেমন তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমরা তার ফসল বর্ধিত করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দেই। তবে তার জন্য আখেরাতে কিছুই থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*। আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ

৪১০. বুখারী হা/৬০২১, মুসলিম হা/১০০৫, মিশকাত হা/১৮৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৬।

هَبَاءً مَّنْثُوْرًا 'আর আমরা তাদের কৃতকর্মগুলোর দিকে অগ্রসর হব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। কেননা কুফরী তাদের সকল সৎকর্মকে বিনষ্ট করে দিবে এবং তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন তাদের আমল ওযন করার জন্য দাড়িপাল্লাও খাড়া করা হবেনা। যেমন আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا '(ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী হ'ল তারাই) যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করে, তাদের সমস্ত আমল নিস্ফল হয়ে যায়। অতএব ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য দাড়িপাল্লা খাড়া করব না' *(কাহফ ১৮/১০৫)*। কেননা তা নেকী হ'তে খালি থাকবে।

তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। তবে তাদের পাপের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তির তারতম্য হ'তে পারে। যেমন আবু ত্বালিবের শাস্তি সবচেয়ে কম হবে। তাকে আগুনের জুতা ও ফিতা পরানো হবে। তাতেই তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটবে। তবে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। যেমন তিনি বলেন, 'আমি তাকে আগুনে ডুবন্ত পেয়েছিলাম। অতঃপর (সুফারিশের মাধ্যমে) আমি তাকে হালকা আগুনে উঠিয়ে আনি। অর্থাৎ টাখনু পর্যন্ত আগুনে পুড়বে'। তিনি বলেন, 'যদি আমি না হ'তাম, তাহ'লে তিনি থাকতেন জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে'।[৪১১] শাস্তির এই তারতম্য আখেরাতে সকল কাফিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি-না, সেটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র এখতিয়ারে। তবে এটা নিশ্চিত যে, কাফেররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ- خَالِدِينَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ-

'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত এবং ফেরেশতামণ্ডলী ও সকল মানুষের লা'নত'। 'সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি হালকা করা হবেনা এবং তাদের কোনরূপ অবকাশ দেওয়া হবেনা' *(বাক্বারাহ ২/১৬১-৬২)*।

সারকথা :

কর্ম যত ছোটই হৌক তা ধ্বংস হয় না। অতএব সৎকর্ম যত ছোটই হৌক তা করতে হবে এবং পাপ যত ছোটই হৌক তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

---

৪১১. বুখারী হা/৫১৭; মুসলিম হা/৩৬১, ৩৫৮; মিশকাত হা/৫৬৬৮ 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

সূরা ‘আদিয়াত

(ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বসমূহ)

সূরা আছরের পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০০, আয়াত ১১, শব্দ ৪০, বর্ণ ১৬৪।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

(১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহের,	وَالْعٰدِیٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿۱﴾
(২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নি বিচ্ছুরক অশ্বসমূহের,	فَالْمُوْرِیٰتِ قَدْحًا ۙ﴿۲﴾
(৩) অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্ব সমূহের,	فَالْمُغِیْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿۳﴾
(৪) যারা সে সময় ধূলি উৎক্ষেপন করে,	فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿۴﴾
(৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।	فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿۵﴾
(৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ	اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿۶﴾
(৭) আর সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী।	وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ ۚ﴿۷﴾
(৮) নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মায়ায় অন্ধ।	وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ ؕ﴿۸﴾
(৯) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে?	اَفَلَا یَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ ۙ﴿۹﴾
(১০) এবং বুকের মধ্যে যা লুকানো ছিল সব প্রকাশিত হবে?	وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ ۙ﴿۱۰﴾
(১১) নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের কি হবে সে বিষয়ে সম্যক অবগত।	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّخَبِیْرٌ ﴿۱۱﴾

বিষয়বস্তু :

অত্র সূরায় দু’টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এক- মালিকের প্রতি অনুগত সুদক্ষ সামরিক অশ্বের শপথ করে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং সে ধন-সম্পদের মায়ায় অন্ধ *(১-৮ আয়াত)*।

দুই- মানুষকে এর মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে এবং আখেরাতে জওয়াবদিহিতার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে *(৯-১১ আয়াত)*।

তাফসীর :

আল্লাহ পাক সূরার শুরুতে বর্ণিত পরপর পাঁচটি আয়াতে সুপ্রশিক্ষিত, সুদক্ষ ও মালিকের প্রতি অনুগত সামরিক অশ্বের শত্রুপক্ষের উপরে দুঃসাহসিক হামলাকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি একান্তই অকৃতজ্ঞ। অথচ অবলা চতুষ্পদ জন্তু হওয়া সত্ত্বেও সামরিক অশ্বগুলি তাদের মনিবের প্রতি কতই না বিশ্বস্ত ও অনুগত যে, তারা মালিকের হুকুমে জীবন বাজি রেখে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সৃষ্টিসেরা মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি আনুগত্যশীল নয় এবং তাঁর দেওয়া অনুগ্রহ সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।

(১) وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً 'শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহের'।

عدَا يَعْدُو عَدْوًا 'দৌড়ানো'। সেখান থেকে اسم فاعل (কর্তৃকারক) الْعَادِيَاتِ অর্থ الأفراس تعدو 'ঐসব অশ্ব যারা দৌড়ায়'।

ضَبَحَتِ الْخَيْلُ ضَبْحًا অর্থ صوتُ أنفاسِهَا إِذَا عَدَتْ 'ঘোড়ার নিঃশ্বাসের শব্দ যখন সে দৌড়ায়'। ضَبْحًا বাক্যে حال হওয়ার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এটা ঐ সময় হয় যখন ঘোড়া ভীষণ জোরে দৌড়ায়। আত্বা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঘোড়া, কুকুর ও শিয়াল ব্যতীত অন্য পশু এরূপ শব্দ করে না *(কুরতুবী)*। এখানে অর্থ হ'ল যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের উপরে ভীষণ যোরে অতর্কিত হামলা করার লক্ষ্যে 'ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহের শপথ'।

(২) فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا 'অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নি বিচ্ছুরক অশ্ব সমূহের'

وَرَى يَرِى وَرْيًا অর্থ إذا خرجت ناره 'যখন লোহার ঘর্ষণে আগুন বের হয়'। এখানে إِيْرَاءٌ থেকে الْمُوْرِيَاتُ 'অগ্নি বিচ্ছুরণকারী অশ্বসমূহ'।

قَدْحًا অর্থ الاستخراج 'বের করা'। যেমন বলা হয়, قَدَحْتُ الْعَيْنَ 'আমি চক্ষু পরিস্কার করেছি'। অর্থ إذا اخرجت منها الماء الفاسد 'যখন চোখ থেকে মন্দ পানি বের করা হয়'। এখানে অর্থ হবে 'লোহার ঘর্ষণে আগুন বের করা'। এক্ষণে فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحاً অর্থ ইকরিমা, আত্বা, যাহহাক প্রমুখ বিদ্বান বলেন, هى الخيل حين تُورِى النارَ بحوافرها 'ঐসব ঘোড়া (যখন প্রস্তরময় ভূমিতে লৌহনাল পরিহিত অবস্থায় প্রচণ্ডবেগে দৌড়ায়, তখন) যারা তাদের পায়ের ক্ষুরসমূহ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের করে' (*কুরতুবী*)।

(৩) فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحاً **‘অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্ব সমূহের’**

الخَيلُ تُغِير أَغَارَ يُغِيْرُ إغارةً، أغارَ على العدوِّ إذا هجم عليه– ‘হামলা করা’। এখানে অর্থ على العدو عند الصبح ‘ঐসব ঘোড়া যারা প্রভাতকালে শত্রুদের উপরে হামলা করে’। صُبْحاً বাক্যে حال হওয়ার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে। আরবদের মধ্যে সাধারণতঃ প্রভাতকালে শত্রুর উপরে আক্রমণ করার নিয়ম ছিল। যেমন কাফেরদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ– ‘অতঃপর যখন তাদের আঙিনায় আযাব নাযিল হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটা হবে খুবই মন্দ’ (*ছাফফাত ৩৭/১৭৭*)।

(৪) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً **‘যারা সে সময় ধূলি উৎক্ষেপণ করে’।**

أَثَارَ يُثِيْرُ إثارةً অর্থ ‘উড়ানো’। نَقْعاً অর্থ ‘ধূলি’। بِهِ অর্থ بالعَدْو ‘দৌড়ের সাথে’। অর্থাৎ الخَيلُ تثير الغُبارَ بشدة العَدْو في المكان الذى أغارت به ‘তীব্র বেগে হামলার কারণে আক্রমণস্থলে ঘোড়া ধূলি উৎক্ষেপণ করে’। আক্রমণস্থল বলতে طريق الوادى হ’তে পারে, যে পথে ধাবিত হয়ে শত্রুদলকে আক্রমণ করা হয়’ (*কুরতুবী*)। অর্থাৎ দৌড়ের বা যুদ্ধের তীব্রতার কারণে সকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও আকাশে ধূলি উৎক্ষিপ্ত হয়।

(৫) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً **‘অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে’।**

وَسْطٌ অর্থ ‘মধ্যখান’ جَمْعٌ অর্থ ‘দল’। এখানে جموعًا من الأعداء ‘বিপক্ষীয় সেনাদল’। جَمْعًا বাক্যে مفعول به হয়েছে। এক্ষণে فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا অর্থ فوسطن بركبانهن العدو ‘আরোহীদের নিয়ে তারা শত্রুদলের অভ্যন্তরভাগে ঢুকে পড়ে’ (*কুরতুবী*)।

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ পাক সুদক্ষ ও দুঃসাহসী সামরিক অশ্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করেছেন, তা একত্রিত করে নিম্নরূপে বলা যায় :

‘শপথ ঐ অশ্বসমূহের, ভীষণ বেগে দৌড়ানোর সময় যাদের ক্ষুরাঘাতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয় এবং প্রভাতকালে হামলা করে শত্রুব্যূহের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এ সময় ঘনঘোর যুদ্ধের কারণে সকালের ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও আকাশে ধূলি উৎক্ষিপ্ত হয়’।

বস্তুতঃ ঘোড়ার পুরাটাই বান্দার জন্য কল্যাণকর। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ‘ঘোড়ার কপালকে কল্যাণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত’।[৪১২]

৪১২. বুখারী হা/২৮৫০ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।

(৬) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ 'নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ'।

الإِنْسَانَ। দ্বারা 'মানবজাতি' বুঝানো হয়েছে। যা সমষ্টিবাচক এবং মর্মগত দিক দিয়ে বহুবচন। কিন্তু শব্দগতভাবে একবচন হওয়ায় لِرَبِّهِ ('তার পালনকর্তার প্রতি') বলে একবচনের সর্বনাম আনা হয়েছে। এটি উপরে বর্ণিত শপথগুলির জওয়াব (جواب القسم) হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ মনিবের প্রতি অনুগত সুদক্ষ যুদ্ধাশ্বের শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই মানুষ তার মালিকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। অতএব অবাধ্য হওয়াটাই যেন মানুষের স্বভাব। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعاً، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعاً، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعاً 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরুরূপে'। 'যখন তাকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন সে দিশেহারা হয়ে পড়ে'। 'আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে কৃপণ হয়' (*মা'আরেজ ৭০/১৯-২১*)।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, মানুষকে যখন দোষযুক্ত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন সে দোষ করলে তাকে দোষী বলা হবে কেন? জওয়াব এই যে, এখানে মানব স্বভাবে নিহিত মন্দ উপকরণটার কথাই কেবল বলা হয়েছে। কিন্তু ভাল উপকরণটার কথা বলা হয়নি, যা পরেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন, إِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ، وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ، وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُوْنَ- 'তবে মুছল্লীগণ (মুমিনগণ) ব্যতীত'। 'যারা নিয়মিতভাবে ছালাত আদায় করে'। 'যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে,' 'প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য'। 'যারা বিচার দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে'। 'যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে' (*মা'আরেজ ৭০/২২-২৭*)। এভাবে ২৩ থেকে ৩৪ আয়াত পর্যন্ত মুমিনের ৯টি গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তার পরে মুমিনদের উত্তম প্রতিদান ও কাফেরদের মন্দ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবে ভাল ও মন্দ দু'টি দিক রয়েছে। উভয় প্রবণতাকে মানুষের ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِراً وَّإِمَّا كَفُوْراً 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হ'তে পারে কিংবা অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে' (*দাহ্র ৭৬/৩*)।

অতএব মানুষের স্বভাবে জন্মগতভাবে অকৃতজ্ঞতার বীজ লুকানো থাকলেও তাকে অকৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি বা এজন্য তাকে বাধ্য করা হয়নি। সে দোষী

তখনই হবে, যখন সে স্বেচ্ছায় দোষ করবে। মূলতঃ এর মধ্যেই রয়েছে মানুষের দেওয়া জ্ঞানের পরীক্ষা। আল্লাহ্র দেখানো পথে যার সঠিক ব্যবহারের উপরেই তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ নির্ধারিত হবে। আর তার বিপরীত হ'লে উভয় জগতে রয়েছে গ্লানিকর পরিণতি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতে 'ইনসান' (الإنسان) বলতে 'কাফের' বুঝানো হয়েছে এবং كَنُوْدٌ অর্থ كَفور 'অকৃতজ্ঞ' (*কুরতুবী*)। কেননা প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনোই আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় না। যাহহাক বলেন, আয়াতটি মক্কার ধনশালী কাফের নেতা অলীদ বিন মুগীরাহ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে'। তবে বক্তব্য সকল যুগের সকল অকৃতজ্ঞ মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

كَنَدَ يَكْنُدُ كَنُوْدًا অর্থ كفر النعمة وجحدها 'নে'মতকে প্রত্যাখ্যান করা ও অস্বীকার করা'। كَنُوْدٌ শব্দটি পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। الأَرضُ الْكَنُوْدُ অর্থ ঐ মাটি, যাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না' (*কুরতুবী*)। অনুরূপভাবে কাফের ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নিকট থেকে ভাল কিছুই আশা করা যায় না।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্দা ও হাযরামাউতের অধিবাসীদের পরিভাষায় كَنُوْدٌ অর্থ عاصى 'পাপী'। রাবী'আ ও মুযার গোত্রের পরিভাষায় كَفُوْرُ 'অকৃতজ্ঞ'। কেনানাহ গোত্রের পরিভাষায় الْبَخِيْلُ السَّيِّئُ الْمَلَكَةِ 'কৃপণ ও কু-স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি'। অতঃপর বলা হয়েছে যে, 'কানূদ' ঐ ব্যক্তিকে বলে هو الذى يكفر اليسير ولا يشكر الكثير 'যে ব্যক্তি ছোট বিষয়কে অস্বীকার করে এবং বড় বিষয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না'। তিরমিযী বলেন, الذى يرى النعمة ولا يرى المنعم 'যে ব্যক্তি অনুগ্রহ দেখে, অথচ অনুগ্রহকারীকে দেখে না'। আবুবকর আল-ওয়াসেত্বী বলেন, الذى ينفق نعم الله فى معاصى الله 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দেওয়া নে'মতসমূহকে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় ব্যয় করে' (*কুরতুবী*)। হাসান বাছরী বলেন, الذى يعد المصائب وينسى نعم ربه 'যে ব্যক্তি কষ্টগুলিই কেবল গণনা করে, অথচ তার প্রভুর দেওয়া নে'মতসমূহকে ভুলে যায়' (*ইবনু কাছীর*)।

উপরে বর্ণিত সব বক্তব্যই একটি কথায় মূলীভূত হয়েছে, আর তা হ'ল, اَلْجُحُوْدُ وَالْكُفْرَانُ 'আল্লাহ্র নে'মতসমূহকে অস্বীকার ও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা'। আর এটাই হ'ল 'কানূদ' ব্যক্তির মূল বৈশিষ্ট্য। যা আল্লাহ শপথ করে বর্ণনা করেছেন।

(৭) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيْدٌ ‘এবং সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী’।

অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞ, তার কথা ও কর্মই তার জ্বলন্ত সাক্ষী। আর সে নিজেই এ বিষয়ে ভালভাবে অবহিত। তবে অনেক বিদ্বান وَإِنَّهُ-এর সর্বনামকে আল্লাহ্র দিকে রুজু বলেছেন। যার অর্থ হবে ‘এবং আল্লাহ তার ব্যাপারে অবশ্যই অবগত’। দু’টি অর্থই প্রযোজ্য। অর্থাৎ বান্দা নিজেও যেমন তার নিজের অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত, আল্লাহ তেমনি সম্যক অবগত। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ– ‘আল্লাহ্র মসজিদসমূহ আবাদ করার যোগ্যতা মুশরিকদের নেই, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর উপরে সাক্ষী ...’ (*তওবা ৯/১১*)। অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহ্র হাযারো অনুগ্রহ লাভের পরেও তার প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য, তার কথা ও কর্মই তার বড় সাক্ষী। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ‘যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের যবান, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে’ (*নূর ২৪/২৪*)। এ ব্যাপারে বান্দা যেমন সাক্ষী, আল্লাহ তেমনি সাক্ষী।

(৮) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ‘নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মায়ায় অন্ধ’।

ইবনু কাছীর বলেন, এর দু’টি অর্থ হ’তে পারে। এক- সে ধনলিপ্সায় অন্ধ। দুই- ধনলিপ্সার কারণে সে প্রচণ্ড কৃপণ’ (*ইবনু কাছীর*)।

الْخَيْر অর্থ المال ‘সম্পদ’। যেমন আল্লাহ বলেন, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ‘যখন তোমাদের কারু মৃত্যু হাযির হয়, তখন সে যদি মাল-সম্পদ ছেড়ে যায়, তাহ’লে তার পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য বৈধভাবে অছিয়ত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হ’ল’ (*বাক্বারাহ ২/১৮০*)। কাফের-মুশরিকরা ধন-সম্পদকেই خَيْرٌ বা ভাল এবং যুদ্ধ-বিগ্রহকে سُوْءٌ বা মন্দ বলে অভিহিত করত (*কুরতুবী*)। যেমন ওহোদ যুদ্ধে সাময়িক বিপর্যয়ের পর মুনাফিকরা যখন মুমিনদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলতে থাকে যে, لَوْ أَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا যদি তারা আমাদের সঙ্গে পিছনে ফিরে আসত, তাহ’লে তারা নিহত হ’ত না’ (*আলে ইমরান ৩/১৬৮*)। এমতাবস্থায় যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর যখন জানা গেল যে, কাফের বাহিনী পুনরায় মদীনার উপর চড়াও হওয়ার জন্য আসছে, তখন যুদ্ধক্লান্ত আহত ছাহাবীদের নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পরদিন সকালেই কাফেরদের মুকাবিলায় বেরিয়ে

পড়েন এবং মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে তিনদিন অবস্থান করেন। কাফের বাহিনীর নেতা আবু সুফিয়ান এ খবর জানতে পেরে ভয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসে। এ ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ 'অতঃপর মুসলমানেরা ফিরে এলো আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কল্যাণ নিয়ে। কোনরূপ যুদ্ধ তাদের স্পর্শ করেনি...' (*আলে ইমরান ৩/১৭৪*)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ কাফেরদের কথা অনুযায়ী মাল-কে 'খায়ের' বা ভাল বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও 'মাল' মন্দ হয় ও হারাম হয়। পক্ষান্তরে 'জিহাদ' যা কেবল আল্লাহ্র জন্য হয়, তা সর্বদা কল্যাণকর হয়। কাফির-মুনাফিক ও বস্তুবাদীদের মূল লক্ষ্য থাকে মাল উপার্জন। পক্ষান্তরে মুমিনদের লক্ষ্য থাকে মাল ব্যয় করে আখেরাত অর্জন। বস্তুবাদীরা মালের প্রতি হয় প্রচণ্ড আসক্ত ও দারুন কৃপণ। পক্ষান্তরে মুমিনরা মালকে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করার প্রতি থাকে সর্বদা আগ্রহশীল ও উদার।

আয়াতের শেষে বর্ণিত لَشَدِيْدٌ অর্থ لَقَوِيٌّ فِي حُبِّهِ لِلْمَالِ 'মালের আসক্তিতে কঠোর' অথবা لَبَخِيْلٌ 'প্রচণ্ড কৃপণ' (*কুরতুবী*)।

(৯) أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِيْ الْقُبُوْرِ 'সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে'। অর্থ أفلا يعلم الإنسان 'মানুষ কি জানেনা? أَفَلاَ অর্থ أَلاَ এখানে فاء 'অতিরিক্ত' আনা হয়েছে প্রশ্নকে যোরদার করার জন্য এবং বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য (استفهام تقريري)। এক্ষণে অর্থ হবে 'তবে কি মানুষ জানে না? সে কি তার স্বাভাবিক জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারে না? সে যেভাবে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, অনুরূপভাবে সে কি তার কবর থেকে জেগে উঠবে না?

أَفَلاَ يَعْلَمُ অর্থ أَفَلاَ يَتَيَقَّنُ 'সে কি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না'? এখানে একবচন দ্বারা 'আদম সন্তান' (ابن آدم) অথবা 'মানুষ' (الإنسان) বুঝানো হয়েছে।

بَعْثَرَ يُبَعْثِرُ بَعْثَرَةً অর্থ قَلَبَ 'উলট-পালট করা'। جَعَلَ أَسْفَلَهُ أَعْلاَهُ 'নীচের অংশ উপরে উঠানো'। এখানে بُعْثِرَ অর্থ نُشِرَ، قُلِبَ উত্থিত হওয়া। যেমন আল্লাহ পুনরুত্থান সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে বলেন, وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُوْرُ 'আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তার দ্বারা মেঘমালা

সঞ্চালিত করেন। অতঃপর তার মাধ্যমে আমরা মৃত যমীনকে জীবিত করি ওর মৃত্যুর পর। (আর) পুনরুত্থান এভাবেই হবে' *(ফাত্বির ৩৫/৯)*। সেটা কিভাবে হবে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ 'যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে উঠে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫১)*। পূর্বের আয়াতগুলিতে মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও প্রচণ্ড ধনলিপ্সার কথা বর্ণনার পর এখানে মানুষকে দুনিয়াত্যাগ ও আখেরাতে জওয়াবদিহিতার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ বলছেন, বনু আদম কি জানে না যে, তাকে কবর থেকে পুনরুত্থিত হ'তে হবে? এর মাধ্যমে ক্বিয়ামত যে অবশ্যম্ভাবী, সেকথা বুঝানো হয়েছে।

(১০) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ 'এবং বুকের মধ্যে যা লুকানো ছিল সব প্রকাশিত হবে'।

حُصِّلَ অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أُبْرِزَ 'প্রকাশিত হবে' *(কুরতুবী)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, তাদের অন্তরে যেসব বিষয় লুকানো ছিল, সেদিন সব প্রকাশিত হবে' (*ইবনু কাছীর*)। মানুষের বাহ্যিক দিকটাই দুনিয়াতে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এমনকি মুনাফিকও খাঁটি মুসলিমের মত আচরণ করে। কিন্তু আখেরাতে মানুষের মনের খবর সব প্রকাশ পেয়ে যাবে। আর তার উপরেই তার কর্মফল নির্ধারিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ 'যেদিন গোপন বিষয় সমূহ পরীক্ষিত হবে'। 'সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না' *(তারিক্ব ৮৬/৯-১০)*। ৯ আয়াতে বলা হয়েছে কবরে যা ছিল সব উত্থিত হবে এবং ১০ আয়াতে বলা হয়েছে বুকের মধ্যে যা লুকানো ছিল, সব প্রকাশিত হবে, দু'টি আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য খুবই স্পষ্ট।

(১১) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ 'নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের কি হবে, সে বিষয়ে সম্যক অবগত'।

ইতিপূর্বে ৯ আয়াতে أَفَلاَ يَعْلَمُ '(সে কি জানেনা?) একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে رَبَّهُمْ (তাদের প্রতিপালক) বলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে ৬ আয়াতে বর্ণিত إِنَّ الْإِنْسَانَ ('মানুষ')-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে। কেননা 'মানুষ' বলে মানবজাতি বুঝানো হয়েছে, যা সমষ্টির অর্থ দেয়। يَوْمَئِذٍ অর্থ يَوْمُ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ 'হিসাব ও প্রতিদান দিবস'।

يَوْمَئِذٍ এর عامل হ'ল لَخَبِيْرٌ অর্থাৎ اَنَّهُ خَبِيْرٌ يَوْمَئِذٍ 'তিনি ঐ দিন সম্পর্কে সম্যক অবগত'। বস্তুতঃ يَوْمَئِذٍ، حِيْنَئِذٍ، بَعْدَإِذٍ প্রভৃতি কালবোধক যৌগিক শব্দগুলি সর্বদা উহ্য عامل -এর معمول হিসাবে আসে এবং সর্বদা যবরযুক্ত (مبنى على الفتح) হয়ে থাকে।

خَبِيْرٌ অর্থ عالم بأسرارهم وضمائرهم وأعمالهم 'তাদের সকল গোপন ও অন্তরের বিষয় সমূহ এবং তাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে অবগত'। ইমাম রাযী বলেন, হৃদয়ের কর্মসমূহকে খাছ করার কারণ হ'ল এই যে, দৈহিক কর্মসমূহ (أعمال الجوارح) হৃদয়ের কর্মসমূহের (أعمال القلوب) অনুগামী। সেজন্য আল্লাহ অন্তরকে সকল মন্দের উৎস (آثِمٌ قَلْبُهُ - *বাক্বারাহ ২/২৮৩*) এবং সকল ভাল-র উৎস (وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ -*আনফাল ৮/২; হজ্জ ২২/৩৫*) বলে গণ্য করেছেন' *(ক্বাসেমী)*।

বস্তুতঃ لَخَبِيْرٌ বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ বান্দার গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় জানেন। সেই সাথে প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে এ ব্যাপারে যে, তিনি তার যথার্থ প্রতিফল দান করবেন। কারু প্রতি সামান্যতম যুলুম করা হবে না। আল্লাহ সকল দিনেরই খবর রাখেন। কিন্তু এখানে يَوْمَئِذٍ বলে ঐদিনকে খাছ করার কারণ হ'ল এই যে, সেদিন সকলকে বিচার শেষে বদলা দেওয়া হবে। ঐ দিনের জ্ঞান রাখার বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এখানে ظرف হওয়া সত্ত্বেও يَوْمَئِذٍ -কে আগে আনা হয়েছে। এছাড়া বাক্যালংকারের বিষয়টি তো আছেই।

শায়েখ তানতাভী জাওহারী বলেন, প্রত্যেক শপথ ও শপথকৃত বস্তুর মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক থাকে। যেমন আল্লাহ সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দিবস, রাত্রি প্রভৃতির শপথ করেছেন নিজের একত্ববাদ ও পুনরুত্থান দিবসের প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য। এক্ষণে অত্র সূরায় যুদ্ধাশ্বের শপথ করার সাথে ঐ দুইয়ের কি সম্পর্ক?

জেনে রাখা আবশ্যক যে, এখানে 'জিহাদ' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর সাধারণতঃ জিহাদে বিজয়ের সাথে সাথে আসে প্রচুর গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। যা পেয়ে বিজয়ী দল উল্লসিত হয় ও অনেক সময় সীমা লংঘন করে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنِّى مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا 'আমি আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ভয় করি তোমাদের

উপরে দুনিয়াবী জৌলুস বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে'।[৪১৩] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 'নিশ্চয় দুনিয়াটা হ'ল লোভনীয় এবং সুজলা-সুফলা বস্তু। আল্লাহ তোমাদেরকে এখানে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। অতঃপর তিনি দেখছেন তোমরা কেমন কাজ কর'।[৪১৪] আল্লাহ্র রহমতে মুসলমানেরা যুদ্ধ করেছে, বিজয় লাভ করেছে, দুনিয়ার উপরে শাসন চালিয়েছে। ধনৈশ্বর্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে' (*তাফসীর তানতাভী*)। রাসূল (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনে যার সূচনা হয়েছিল এবং খলীফাদের যুগে তারা বিশ্বনেতৃত্ব লাভে ধন্য হয়েছিল।

সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। যখন মুসলমানরা ছিল নির্যাতিত ও বিতাড়িত। যুদ্ধাশ্ব বা যুদ্ধের অনুমতি তাদের ছিল না। অথচ সেই সময় আল্লাহ এই সূরা নাযিল করে মুসলমানদেরকে সুন্দর ভবিষ্যতের আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। সূরার শুরুতে যুদ্ধাশ্বের শপথ করে আল্লাহ বলতে চেয়েছেন যে, সেদিনের যুদ্ধাশ্বের ন্যায় আগামী দিনে যেন মুসলমান রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা লাভে প্রয়াসী হয়। অতঃপর মুসলমান যদি বস্তুগত শক্তি লাভ করে, তাহ'লে তারা যেন নিরেট বস্তুবাদীদের মত অকৃতজ্ঞ ও ধনলিপ্সু জাতিতে পরিণত না হয়। বরং সর্বাবস্থায় আখেরাতে মুক্তি লাভ ও সেখানে জওয়াবদিহিতার ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং দুনিয়াকে আখেরাত লাভের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে।

যুদ্ধাশ্বের শপথের মাধ্যমে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে সামরিক ও বস্তুগত ক্ষমতা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট উত্তম ও অধিকতর প্রিয় দুর্বল মুমিনের চাইতে'।[৪১৫]

সারকথা :

সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করার পরেও মানুষকে অবশেষে কবরে আশ্রয় নিতে হবে। অতঃপর পরকালে সবকিছুর জওয়াবদিহি করতে হবে। এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে অত্র সূরাতে।

৪১৩. বুখারী হা/১৪৬৫, মুসলিম হা/১০৫২, মিশকাত হা/৫১৬২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।
৪১৪. মুসলিম হা/২৭৪২, মিশকাত হা/৩০৮৬ 'বিবাহ' অধ্যায়।
৪১৫. মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪।

সূরা ক্বারে‘আহ (করাঘাতকারী)

সূরা কুরায়েশ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০১, আয়াত ১১, শব্দ ৩৬, বর্ণ ১৫৮।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

(১) করাঘাতকারী!	اَلْقَارِعَةُ ۝١
(২) করাঘাতকারী কি?	مَا الْقَارِعَةُ ۝٢
(৩) তুমি কি জানো, করাঘাতকারী কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣
(৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত	يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤
(৫) এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত।	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥
(৬) অতঃপর যার ওযনের পাল্লা ভারি হবে,	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦
(৭) সে (জান্নাতে) সুখী জীবন যাপন করবে।	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧
(৮) আর যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে,	وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨
(৯) তার ঠিকানা হবে ‘হাভিয়াহ’।	فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩
(১০) তুমি কি জানো তা কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠
(১১) প্রজ্বলিত অগ্নি।	نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

বিষয়বস্তু :

অত্র সূরায় দু’টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক- ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের বর্ণনা *(১-৫ আয়াত)*। দুই- নেকী ও বদীর ওযন এবং তার প্রতিদান ও প্রতিফল সম্পর্কে বর্ণনা *(৬-১১ আয়াত)*।

তাফসীর :

(১-৩) اَلْقَارِعَةُ، مَا الْقَارِعَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ‘করাঘাতকারী’! ‘করাঘাতকারী কি’? ‘তুমি কি জানো, করাঘাতকারী কি’?।

قَرَعَ يَقْرَعُ قَرْعًا অর্থ قرع الباب بشدة فى امر فظيع ‘ভীতিকর কারণে জোরে দরজা খটখটানো’। সেখান থেকে اَلْقَارِعَةُ ‘করাঘাতকারী’।

পারিভাষিক অর্থে اَلْقَارِعَةُ অর্থ الساعة 'ক্বিয়ামত'। ইবনু কাছীর বলেন, এটি ক্বিয়ামতের বিভিন্ন নাম সমূহের অন্যতম। যেমন আল-হাক্বাহ, আল-গাশিয়াহ, আত-ত্বাম্মাহ, আছ-ছাখখাহ প্রভৃতি। অতঃপর এই দিনের ভয়ংকর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- 'তুমি কি জানো ক্বারে'আহ কি'? এর মাধ্যমে দ্রুত শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং একে যোরে করাঘাতকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ংকর কম্পন ও প্রচণ্ড শব্দ প্রাণীজগতের কানে ও হৃদয়ে তীব্র আঘাত করবে ও ভয়ে হৃৎকম্পন শুরু হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ– 'আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সবাই তাঁর নিকটে আসবে বিনীত অবস্থায়' *(নমল ২৭/৮৭; যুমার ৩৯/৬৮)*।

مَا الْقَارِعَةُ -এর মধ্যে مَا অব্যয়টি كلمة استفهام على جهة التعظيم والتفخيم على شأنها– 'ঐদিনের ঘটনার বড়ত্ব ও ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য প্রশ্নবোধক অব্যয়'। যেমন অন্যত্র এসেছে, اَلْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ *(কুরতুবী)*। এখানে الْقَارِعَةُ 'মুবতাদা' এবং مَا الْقَارِعَةُ 'খবর' হয়েছে। এর বিপরীতটা নয়। কেননা খবরটাই এখানে মুখ্য বিষয়' *(ক্বাসেমী)*।

(8) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ 'যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত'।

يَوْمَ-এর শেষ অক্ষর যবরযুক্ত হয়েছে উহ্য ক্রিয়ার 'কর্ম' (مفعول فيه) হওয়ার কারণে। অর্থাৎ... اُذْكُرْ يَوْمَ 'স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন ...'।

এর মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। الفَرَاش বলতে ঐসব পতংগকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলিকে উন্মুক্ত ও জ্বলন্ত আগুনের চারপাশে ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاث كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ 'তারা সেদিন ভীত-নমিত নেত্রে বের হবে কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল সদৃশ' (*ক্বামার ৫৪/৭*)। আখেরী যামানার নবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া পতঙ্গদল (الْفَرَاشِ) এবং নিজেকে তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, 'আমার উদাহরণ হ'ল সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর পতঙ্গসমূহ দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আর ঐ ব্যক্তি তাদের

বাধা দিতে লাগল। কিন্তু পতঙ্গদল তাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল। হে লোকসকল! আমিও তেমনি (آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ) তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে পিছনে টানছি। আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। আমি তোমাদের বারবার ডাকছি, هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ 'আগুন ছেড়ে আমার দিকে এস'! কিন্তু তোমরা আমাকে পরাজিত করে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছ'।[৪১৬]

(৫) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ 'এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত'।

পূর্বের আয়াতের ন্যায় অত্র আয়াতের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিনের ভীতিকর অবস্থা বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً– 'সেদিন পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে' (*নাবা ৭৮/২০*)। আরও বলা হয়েছে, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ، فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا 'যেদিন পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে'। 'অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা সদৃশ' (*ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৫-৬*)। কাফেররা এটা বিশ্বাস করতে চাইত না। তাই আল্লাহ বলেন, وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفاً، فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً– 'তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তুমি বল, আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন'। 'অতঃপর পৃথিবীকে সম্পূর্ণ সমতল করে ছাড়বেন' (*ত্বোয়াহা ২০/১০৫-১০৬*)।

الْعِهْنِ অর্থ الصوف المصبوغ 'রং করা পশম'। الْمَنْفُوْشِ অর্থ 'ঐ পশম যা হাত দিয়ে ধুনা হয়। অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়তে থাকে' (*কুরতুবী*)। এর মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থার বাণীচিত্র অংকন করা হয়েছে।

(৬) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ 'অতঃপর যার ওযনের পাল্লা ভারি হবে'।

مَوَازِيْنُهُ অর্থ موازين حسناته 'নেকীর পাল্লা সমূহ'। একবচনে مِيْزَانٌ অর্থ وَزْنٌ আরবরা শব্দটিকে حَذَاءٌ 'সমান সমান' বা 'সম্মুখ' অর্থে ব্যবহার করে। যেমন তারা বলে, داری ميزان دارك ووزن دارك. 'আমার ঘর তোমার ঘরের সম্মুখ বরাবর অবস্থিত' (*ক্বাসেমী*)। সেখান থেকে 'দাড়িপাল্লা' অর্থ হয়েছে। যাতে দু'দিকের দু'টি পাল্লা বরাবর থাকে। এখানে مَوَازِيْنُ বহুবচন হয়েছে বান্দার আমল সমূহের হিসাবে। কেননা প্রত্যেক আমলের ওযন ও হিসাব পৃথক হবে। উক্ত ওযন কিভাবে করা হবে, সেটি গায়েবী বিষয়। যা কেবল আল্লাহ জানেন।

---

৪১৬. বুখারী হা/৬৪৮৩, মুসলিম হা/২২৮৪; মিশকাত হা/১৪৯।

(৭) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ 'সে (জান্নাতে) সুখী জীবন যাপন করবে'।

عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ অর্থ حياة مرضية 'সন্তোষভাজন জীবন' যাতে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ে সন্তুষ্ট। عَيْشٌ অর্থ আরাম, জীবন। عِيْشَةٍ অর্থ জীবন যাপন। رَاضِيَةٍ কর্তৃকারক (اسم فاعل) হ'লেও তা কর্মকারক (اسم مفعول) অর্থে এসেছে।

ক্বিয়ামতের দৃশ্য বর্ণনার পর এক্ষণে আল্লাহ দুনিয়াতে আমলকারীদের পরকালীন পুরস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করছেন। যাদের আমল আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে, তাদের ওযনের পাল্লা ভারি হবে। তারা জান্নাত লাভে ধন্য হবে এবং সেখানে সুখে-শান্তিতে থাকবে।

(৮) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ 'আর যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে'।

এই ওযন কিভাবে হবে, সেটি গায়েবী বিষয়। যা মানুষের বোধগম্য নয়। কেননা এবিষয়ে কুরআন বা হাদীছে কিছু বলা হয়নি। উল্লেখ্য, যাদের নেকী ও বদীর ওযন সমান সমান হবে, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে আ'রাফ নামক স্থানে বন্দী থাকবে' *(আ'রাফ ৭/৪৬-৪৮)*। এরা হ'ল মুনাফিক। যারা মুসলমানদের সাথে বসবাস করত। পুলছেরাত পার হওয়ার সময় মুমিন নর-নারীগণ তাদের ঈমানের জ্যোতিতে দ্রুত পার হয়ে যাবে চোখের পলকে। জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করবে না। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের মুনাফেকীর অন্ধকারে আটকে যাবে। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ- يُنَادُوْنَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ- فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ 'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা মুমিনদের ডেকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরা কিছু নিতে পারি। তখন তাদের বলা হবে, পিছনে ফিরে যাও এবং সেখানে নূর তালাশ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝে একটি প্রাচীর দাঁড় করানো হবে যাতে একটি দরজা থাকবে। যার ভিতর অংশে থাকবে রহমত ও বাহির অংশে আযাব'। 'তারা মুমিনদের ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? জবাবে মুমিনরা বলবে, হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ করেছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদের প্রতারিত করেছিল। অবশেষে আল্লাহ্র হুকুম (মৃত্যু) এসে গিয়েছিল। বস্তুতঃ প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল'। এইসব লোকের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম। যেমন পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ

বলেন, 'আজ তোমাদের নিকট থেকে কোন মুক্তিপণ নেওয়া হবে না এবং কাফিরদের নিকট থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল। এটাই তোমাদের সাথী। আর এটা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(হাদীদ ৫৭/১৩-১৫)*। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

(৯) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ 'তার ঠিকানা হবে 'হাভিয়াহ'।

(১০) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ 'তুমি কি জানো তা কি?'

(১১) نَارٌ حَامِيَةٌ 'প্রজ্বলিত অগ্নি'।

অর্থাৎ যার কোন সৎকর্ম নেই অথবা থাকলেও তার চাইতে অসৎকর্মের পরিমাণ বেশী, তার ঠিকানা হবে 'হাভিয়া'। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُوْنَ- 'আর সেদিন ওযন হবে যথার্থ। অতঃপর যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারি হবে, তারা সফলকাম হবে'। 'পক্ষান্তরে যাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেইসব লোক, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করত' (*আ'রাফ ৭/৮-৯*)। আল্লাহ আরও বলেন, وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ- 'আর আমরা ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারু প্রতি যুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষাদানা পরিমাণ হয়, আমরা তা উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট' (*আম্বিয়া ২১/৪৭*)।

(هَاوِيَةٌ) 'হাভিয়া' জাহান্নামের একটি নাম। সব জাহান্নামেরই দহন ক্ষমতা বেশী। কিন্তু 'হাভিয়া'-র বেলায় 'প্রজ্বলিত অগ্নি' বলায় একথা নিশ্চিতভাবে এসে যায় যে, হাভিয়ার দহন ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে বেশী। ইবনু কাছীর জাহান্নামের আটটি নামের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- নার, জাহীম, সাক্বার, জাহান্নাম, হাভিয়াহ, হাফেরাহ, লাযা, হুত্বামাহ (*ইবনু কাছীর, সূরা নাযে'আত ১০ আয়াতের তাফসীর*)।

এখানে أُمُّهُ বলে 'আশ্রয়স্থল' বুঝানো হয়েছে। যেমন মা তার সন্তানের আশ্রয়স্থল হয়ে থাকেন। هَوَى يَهْوِى هَوِيًّا অর্থ, উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করা'। সেখান থেকে صفت হয়েছে هَاوِيَةٌ। অর্থ المهواة التى لا يدرك قعرها 'নিক্ষেপস্থল, যা এমন গভীর, যার তলদেশের নাগাল পাওয়া যায় না' (*তানতাভী*)। এখানে হাভিয়াকে أُمُّهُ বা 'তার মা' বলে উপমা দিয়ে পাপীকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে *(ক্বাসেমী)*। কেননা তাদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ

ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ– ‘যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে (এবং বলা হবে,) জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর’ *(ক্বামার ৫৪/৪৮)*।

مَا هِيَهْ মূলে ছিল مَا هِيَ তবে আয়াত শেষে ওয়াকফের বিরতি বুঝানোর জন্য হা সাকিন (ہْ) বৃদ্ধি করা হয়েছে (*কুরতুবী*)।

نَارٌ حَامِيَةٌ অর্থ حارة بلغت النهاية فى الحرارة ‘এমন প্রজ্বলিত অগ্নি, যা দহন ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে’ (*তানতাভী*)।

জাহান্নামের পরিচয় :

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বুখারী, মুসলিম, আহমাদ প্রভৃতির বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ‘জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৭০ গুণ বেশী দাহিকা শক্তি সম্পন্ন।[৪১৭]

(২) মুসনাদে আহমাদের অন্য বর্ণনায় এসেছে ১০০ গুণ বেশী।[৪১৮] ত্বাবারাণী আওসাত্ব-এর বর্ণনায় এসেছে যে, দুনিয়ার আগুনের তুলনায় জাহান্নামের আগুন ১০০ গুণ বেশী কালো।[৪১৯] এসকল বর্ণনা দ্বারা কেবল আধিক্য বুঝানো হয়েছে।

(৩) নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ ‘জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব হবে ঐ ব্যক্তির, যার দু’পায়ে আগুনের জুতা ও ফিতা পরিহিত থাকবে। যাতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটবে। যেমন উত্তপ্ত কড়াইয়ের পানি টগবগ করে ফুটে থাকে’।[৪২০]

(৪) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُؤْتَى جَهَنَّمُ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ تَجُرُّوْنَهَا. ‘ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবে।[৪২১]

সারকথা : ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে এবং মানুষকে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ও ফলাফল অবশ্যই পেতে হবে।

---

৪১৭. বুখারী হা/৩২৬৫, মুসলিম হা/২৮৪৩; মিশকাত হা/৫৬৬৫।
৪১৮. আহমাদ হা/৮৯১০,সনদ ছহীহ; আলবানী ছহীহুল জামে‘ হা/৭০০৬।
৪১৯. ত্বাবারাণী, আওসাত্ব হা/৪৮৫; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৮৫৭৬, হায়ছামী বলেন, সকল সূত্রই ছহীহ-এর রাবী।
৪২০. মুসলিম হা/২১৩, বুখারী হা/৬৫৬১, হাকেম ১/২৮৭ ‘জুম‘আ’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৬৬৭
৪২১. মুসলিম হা/২৮৪২; মিশকাত হা/৫৬৬৬।

সূরা তাকাছুর

(অধিক পাওয়ার আকাংখা)

সূরা কাওছারের পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০২, আয়াত ৮, শব্দ ২৮, বর্ণ ১২২।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

(১) অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে,	اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ①
(২) যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও।	حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ②
(৩) কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে।	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ③
(৪) অতঃপর কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④
(৫) কখনই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে (তাহ'লে কখনো তোমরা পরকাল থেকে গাফেল হ'তে না)।	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑤
(৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑥
(৭) অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দিব্য-প্রত্যয়ে দেখবে।	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ⑦
(৮) অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।	ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ⑧

বিষয়বস্তু :

প্রাচুর্যের লোভ মানুষকে আখেরাত ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু না, তাকে দুনিয়া ছাড়তেই হবে এবং আখেরাতে পাড়ি দিতেই হবে *(১-৫ আয়াত)*। অতঃপর সেখানে তারা দুনিয়াবী নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং হাতে-নাতে ফলাফল পাবে *(৬-৮ আয়াত)*।

তাফসীর :

(১) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ 'অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে'।

أَلْهَاكُمْ অর্থ أنساكم 'তোমাদের ভুলিয়ে রাখে'। এখানে كُمْ (তোমাদের) বলে অবিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী, অংশীবাদী এবং পাপাচারী লোকদের বুঝানো হয়েছে; ঈমানদার ও

সৎকর্মশীলদের নয়। মন্দ লোকের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণেই এখানে সাধারণভাবে كُمْ বা 'তোমাদের' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে সর্বযুগেই মন্দ লোকের সংখ্যা বেশী ছিল এবং আছে। সেকারণ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সাবধান করে বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ 'যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মান্য কর, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। ওরা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে আদম! ... তোমার সন্তানদের একটি দলকে জাহান্নামের দিকে বের করে নাও। আদম বলবেন, ঐদলটি কতজনের? আল্লাহ বলবেন, এক হাযারের মধ্যে ৯৯৯ জন'।[৪২২] ভাল ও মন্দ লোকের সংখ্যায় কি বিশাল ব্যবধান! সম্ভবতঃ একারণেই আল্লাহ বলেছেন, قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ 'আমার কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম' *(সাবা ৩৪/১৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি মাত্র ফের্কা জান্নাতে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা? রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى 'যে তরীকার উপর আমি ও আমার ছাহাবীগণ আছি, তার অনুসারীরা'।[৪২৩]

التَّكَاثُرُ অর্থ 'পরস্পরে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা'। মূল ধাতু (المادة) হ'ল الكثرة 'আধিক্য'। এটা নেকীর প্রতিযোগিতা হ'লে তা অন্যায় নয়। যেমন জান্নাত লাভে উৎসাহিত করে আল্লাহ বলেন, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ 'অতএব প্রতিযোগীরা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করুক' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬)*। আধিক্যের প্রতিযোগিতা অন্যায় উদ্দেশ্যে হ'লে সেটা পাপের কারণ হবে। কবি বলেন,

وَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى + وإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلكَاثِرِ

'সম্পদ গণনায় তুমি অন্যের চাইতে অধিক নও। বরং প্রকৃত সম্মান নিহিত রয়েছে ইলমে দ্বীন ও অধিক ইবাদতের অধিকারীর জন্য'।

বস্তুতঃ অধিক ধনলিপ্সা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাংখা মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য এবং আখেরাতের চিন্তা হ'তে গাফেল রাখে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার এই আকাংখার শেষ হয় না। আর এটি মানুষের একটি স্বভাবগত প্রবণতা। কাফের-মুনাফিকরা এতে ডুবে থাকে। কিন্তু মুমিন নর-নারী এ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সর্বদা আখেরাতের জন্য প্রস্তুত থাকে।

---

৪২২. বুখারী হা/৬৫৩০, মুসলিম হা/২২২; মিশকাত হা/৫৫৪১ 'হাশর' অনুচ্ছেদ।
৪২৩. তিরমিযী হা/২৬৪০, মিশকাত হা/১৭১।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুক্বাতিল ও কালবী বলেন, কুরায়েশ বংশের বনু আবদে মানাফ ও বনু সাহ্ম দুই গোত্র পরস্পরের উপরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাধান্য দাবী করে বড়াই করত। সে উপলক্ষে সূরাটি নাযিল হয় (*কুরতুবী*)। কিন্তু বক্তব্য সকল যুগের সকল লোভী ও অহংকারী মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কেননা দুনিয়াবী শান-শওকত মায়া-মরীচিকার মত। এগুলোর কোন কিছুই বান্দা সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। কেবলমাত্র তার নেক আমল ব্যতীত।

(১) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ– 'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাংখা করবে। তার মুখ ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। আর আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন'।[৪২৪]

রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলতেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত হাদীছকে কুরআনের অংশ মনে করতাম, যতক্ষণ না সূরা তাকাছুর নাযিল হয়'।[৪২৫]

(২) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দু'জন পিপাসু ব্যক্তি রয়েছে, যারা কখনো তৃপ্ত হয় না। একজন হ'ল জ্ঞান পিপাসু, যার পিপাসা কখনো নিবৃত্ত হয় না। অন্যজন হ'ল দুনিয়া পিয়াসী, যার লোভ কখনো শেষ হয় না'।[৪২৬]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মালের ধনী বড় ধনী নয়। বরং হৃদয়ের ধনী হ'ল বড় ধনী'।[৪২৭]

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, জিব্রীল আমার হৃদয়ে এ কথাটি নিক্ষেপ করেছেন যে, কেউ মৃত্যুবরণ করে না যতক্ষণ না সে তার রিযিক পূর্ণ করে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধভাবে রিযিক সন্ধান কর। কাংখিত রিযিক আসতে দেরী হওয়ায় তা যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে উপার্জনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্র কাছে যে রিযিক রয়েছে, তা তাঁর আনুগত্য ব্যতীত লাভ করা যায় না (অর্থাৎ বৈধ রিযিকেই আল্লাহ বরকত দেন, অবৈধ রিযিকে নয়)।[৪২৮]

---

৪২৪. বুখারী হা/৬৪৩৯, মুসলিম হা/১০৪৮, মিশকাত হা/৫২৭৩।
৪২৫. বুখারী হা/৬৪৪০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ।
৪২৬. বায়হাক্বী-শো'আবুল ঈমান, হাকেম ১/৯২; ছহীহুল জামে' হা/৬৬২৪; মিশকাত হা/২৬০।
৪২৭. বুখারী হা/৬৪৪৬, মুসলিম হা/১০৫১, মিশকাত হা/৫১৭০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।
৪২৮. শারহুস সুন্নাহ, বায়হাক্বী-শো'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তুমি আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী। তুমি অল্পে তুষ্ট হও, তাহ'লে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। তুমি অন্যের জন্য সেটাই ভালবাসো, যেটা তুমি নিজের জন্য ভালবাসো, তাহ'লে তুমি হবে প্রকৃত মুমিন।[৪২৯]

(২) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ 'যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও'।

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ অর্থ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْمَوتُ فَوَصَلْتُمْ إِلَى الْمَقَابِرِ وَصِرْتُمْ مِنْ أَهْلِهَا 'যতক্ষণ না তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। অতঃপর তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও ও তার বাসিন্দা হয়ে যাও'। مَقَابِر একবচনে مَقْبِرَةٌ অর্থ কবরস্থান। الْقُبُوْر একবচনে الْقَبْر 'কবর'। জানা আবশ্যক যে, দুনিয়াবী জীবনের সমাপ্তি হিসাবে এখানে কবরের কথা বলা হয়েছে। নইলে কবর মানুষের জন্য চূড়ান্ত ঠিকানা নয়। বরং এটি জীবনের সফরসূচীর তৃতীয় পর্যায় বা দারুল বারযাখ। অর্থাৎ পর্দার অন্তরালের যাত্রী বিশ্রামাগার বা Waiting room মাত্র। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ 'আর তাদের সম্মুখে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। অর্থাৎ এটি দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী অবস্থান এবং কবর হ'ল আখেরাতের প্রথম মনযিল। এর পরবর্তী চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী ঠিকানা বা দারুল ক্বারার হ'ল জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

জীবনের সফরসূচী :

মানব জীবনের সফরসূচী শুরু হয় প্রথমে আল্লাহ্র নিকট থেকে মায়ের গর্ভে। এটা হ'ল প্রথম মনযিল। এখানে সাধারণতঃ ৯ মাস ১০ দিন থাকার পর ভূমিষ্ঠ হয়ে সে দুনিয়াতে আসে। এটা হ'ল দ্বিতীয় মনযিল বা 'দারুদ্দুনিয়া'। এখানে সে কমবেশী ৭০ বছর অবস্থান করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের আয়ু ষাট হ'তে সত্তর বছরের মধ্যে হবে। খুব কম সংখ্যকই তা অতিক্রম করবে'।[৪৩০] যা চারটি স্তরে বিভক্ত : (ক) শৈশবের দুর্বলতা (১-১৬ বছর)। (খ) যৌবনের শক্তিমত্তা (১৬-৪০ বছর)। (গ) প্রৌঢ়ত্বের পূর্ণতা (৪০-৬০ বছর) এবং (ঘ) বার্ধক্যের দুর্বলতা (৬০-৭০ বছর)। অতঃপর নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মৃত্যু ও কবরে গমন। এটা হ'ল তৃতীয় মনযিল বা 'দারুল বারযাখ'। এখান থেকে তার আখেরাতের সফর শুরু হয়। যা শেষ হবে ক্বিয়ামতের দিন। কবর তার জন্য জান্নাতের টুকরা হবে বা জাহান্নামের গর্ত হবে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থান শেষে সেখানে মানুষের তিনটি সারি হবে। অগ্রগামী দল, ডাইনের সারি ও বামের সারি। প্রথম দু'টি দল জান্নাতী হবে ও বামের সারি জাহান্নামী হবে। এটি হ'ল চতুর্থ মনযিল বা 'দারুল ক্বারার'। যা হ'ল চূড়ান্ত ঠিকানা।

---

৪২৯. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭, হাদীছ ছহীহ।
৪৩০. তিরমিযী হা/৩৫৫০, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৮০।

ক্বিয়ামতের দিন হিসাব শেষে সকল মানুষকে জাহান্নামের উপর রক্ষিত পুলছিরাত পার হ'তে হবে *(মারিয়াম ১৯/৭১)*। জান্নাতীগণ চোখের পলকে পার হয়ে যাবেন ও সেখানে চিরকাল থাকবেন। কিন্তু জাহান্নামীরা তাতে পতিত হবে। সেখানে কাফির-মুশরিকরা চিরকাল থাকবে। কিন্তু মুমিন পাপীরা তাদের খালেছ ঈমানের কারণে ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুফারিশক্রমে এবং সবশেষে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৪৩১]

উল্লেখ্য যে, অনেকে আলোচ্য আয়াত দ্বারা কবরকে শেষ ঠিকানা বলেন এবং ক্বিয়ামত ও জান্নাত-জাহান্নামকে অস্বীকার করেন। এটি ভুল ও অন্যায় ব্যাখ্যা মাত্র। কেননা এখানে زُرْتُمُ 'তোমরা যিয়ারত কর' বলা হয়েছে। আর যিয়ারতকারী অবশ্যই তার মূল ঠিকানায় ফিরে আসে। আর মানুষের মূল ঠিকানা হ'ল যেখান থেকে মায়ের গর্ভে তার রূহ এসেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে সে ফিরে যাবে। যেমন তিনি বলেন, إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ 'আল্লাহ্র নিকটেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে' *(মায়েদাহ ৫/৪৮, ১০৫; হূদ ১১/৪)*।

হযরত ওছমান গণী (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন কান্নায় তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হল, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা আসলে আপনি কাঁদেন না। অথচ এখানে আপনি কাঁদছেন? জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، وَقَالَ : مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ–

'নিশ্চয়ই কবর হ'ল আখেরাতের মনযিল সমূহের প্রথম মনযিল। যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পাবে, তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলি সহজ হয়ে যাবে। আর যদি সে এখানে মুক্তি না পায়, তাহলে পরবর্তীগুলি কঠিন হবে। তিনি বলেন, কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য আমি দেখিনি'।[৪৩২]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দেহের একাংশ ধরে বললেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ– 'পৃথিবীতে তুমি আগন্তুক অথবা পথযাত্রীর মত বসবাস কর'।[৪৩৩] وَعُدَّ نَفْسَكَ فِى أَهْلِ الْقُبُورِ 'এবং নিজকে সর্বদা কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য কর'।[৪৩৪]

---

৪৩১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; মিশকাত হা/৫৫৭২-৭৩ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।
৪৩২. তিরমিযী হা/২৩০৮, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২।
৪৩৩. বুখারী হা/৬৪১৬।
৪৩৪. তিরমিযী হা/২৩৩৩, ইবনু মাজাহ হা/৪১১৪; মিশকাত হা৫২৭৪।

(৩) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ 'কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে'।

(৪) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ 'অতঃপর কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে'। যখন তোমরা আখেরাতে ফিরে আসবে, তখন এই প্রাচুর্য তোমাদের কোন কাজে লাগবে না।

كَلاَّ পরপর দু'বার আনা হয়েছে শ্রোতাকে ধমক দেওয়ার জন্য ও সতর্ক করার জন্য। এটি كلمة ردع বা প্রত্যাখ্যানকারী শব্দ। এর মাধ্যমে বান্দার লোভের আধিক্যকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এর দ্বারা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রাচুর্যের লোভ করো না। পরিণামে তোমরা লজ্জিত হবে। যা তোমরা সত্বর জানতে পারবে। হাসান বাছরী বলেন, هذا وعيد بعد وعيد 'এটি ধমকের পরে ধমক' (*ইবনু কাছীর*)। দু'বার আনার অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, প্রথমটি দ্বারা কবর এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা আখেরাত বুঝানো হয়েছে। অথবা প্রথমটিতে বলা হয়েছে, তোমরা সত্বর জানতে পারবে যখন মৃত্যু এসে যাবে ও তোমাদের রূহ তোমাদের দেহ থেকে টেনে বের করা হবে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, পুনরায় তোমরা জানতে পারবে যখন তোমরা কবরে প্রবেশ করবে এবং মুনকার-নাকীর তোমাদের প্রশ্ন করবে'। অথবা প্রথমটি দ্বারা ক্বিয়ামত এবং শেষেরটি দ্বারা হাশর অর্থাৎ বিচার দিবস বুঝানো হয়েছে (*কুরতুবী*)।

(৫) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ 'কখনই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে (তাহ'লে কখনো তোমরা পরকাল থেকে গাফেল হ'তে না)'। তৃতীয়বার كَلاَّ এনে বান্দাকে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে বলা হয়েছে, যদি তোমরা ক্বিয়ামত সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে! কেননা ক্বিয়ামত ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস দৃঢ় থাকলে তোমরা কখনোই অধিক অর্থ-বিত্ত ও প্রাচুর্যের পিছনে ছুটতে না। এখানে لَوْ (যদি) এর জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা ক্বিয়ামত সম্পর্কে আজকে নিশ্চিত জানতে যা পরে জানবে, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা আল্লাহ ও আখেরাত থেকে গাফেল হ'তে না। ইবনু আবী হাতেম বলেন, তিনটি স্থানেই كَلاَّ অর্থ أَلاَ অর্থাৎ 'সাবধান'। ফার্রা বলেন, বরং كَلاَّ অর্থ হবে حقًّا 'অবশ্যই'। অর্থাৎ অবশ্যই তোমরা ক্বিয়ামত সম্পর্কে সত্বর জানতে পারবে (*কুরতুবী*)।

অত্র আয়াতের শেষে পাঠক অবশ্যই থামবেন এবং ওয়াক্ফ করবেন। পরবর্তী আয়াতের সঙ্গে মিলানো যাবে না। কেননা তাতে অর্থ হবে, 'যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে, তাহ'লে অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করতে'। যা মূল অর্থকে বিনষ্ট করে দেয়। কেননা জাহান্নাম দেখার বিষয়টি হ'ল মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরের বিষয়।

দুনিয়ার সাথে আখেরাতের তুলনা :

(১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন চলার পথে একটি মৃত বকরীর বাচ্চা দেখিয়ে বলেন, এক দিরহামের বিনিময়েও কি তোমরা এটিকে খরিদ করবে? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটি তোমাদের কাছে যত নিকৃষ্ট, আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়া তার চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট'।[৪৩৫] পক্ষান্তরে জান্নাত সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমনসব চক্ষু শীতলকারী বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি, হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি। অতঃপর তিনি সূরা সাজদাহ ১৭ আয়াতটি পাঠ করেন যার অর্থ 'কেউ জানেনা তার জন্য চক্ষুশীতলকারী কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের পুরস্কার স্বরূপ'।[৪৩৬] তিনি বলেন, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا 'জান্নাতের একটি চাবুক রাখার স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চাইতে উত্তম'।[৪৩৭]

(২) মুত্বাররিফ স্বীয় পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ : يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ مَالِىْ مَالِىْ، قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ؟

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলাম। সে সময় তিনি সূরা তাকাছুর পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, বনু আদম বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ হে আদম সন্তান! তোমার মাল কি কেবল অতটুকু নয়, যতটুকু তুমি ভক্ষণ করলে ও শেষ করলে। অথবা পরিধান করলে ও জীর্ণ করলে, অথবা ছাদাক্বা করলে ও তা সঞ্চয় করলে'?[৪৩৮]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ : مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ

৪৩৫. মুসলিম হা/২৯৫৭, মিশকাত হা/৫১৫৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।
৪৩৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১২।
৪৩৭. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৩।
৪৩৮. মুসলিম হা/২৯৫৮, মিশকাত হা/৫১৬৯ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।

فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ– 'বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল! অথচ তার মাল হ'ল মাত্র তিনটি : (১) যা সে খায় ও শেষ করে। (২) যা সে পরিধান করে ও জীর্ণ করে এবং (৩) যা সে ছাদাক্বা করে ও সঞ্চয় করে। এগুলি ব্যতীত বাকী সবই চলে যাবে এবং অন্যদের জন্য সে ছেড়ে যাবে'।[৪৩৯]

(৪) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ– 'মাইয়েতের সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু'জন ফিরে আসে ও একজন তার সাথে থেকে যায়। মাইয়েতের সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়'।[৪৪০]

(৫) হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ– 'আদম সন্তান বার্ধক্যে জীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু দু'টি বস্তু বৃদ্ধি পায়। সম্পদের লোভ ও অধিক বয়স পাওয়ার আকাংখা'।[৪৪১]

(৬) হাফেয ইবনু আসাকির ইমাম আহনাফ ইবনে ক্বায়েস (নাম : যাহহাক)-এর জীবনী আলোচনায় বলেন, একদা তিনি একজন ব্যক্তির হাতে একটি দিরহাম দেখে বলেন, এটি কার? সে বলল, আমার। আহনাফ বললেন, ওটা তোমার হবে তখনই, যখন তুমি ওটা কোন নেকীর কাজে বা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে। অতঃপর আহনাফ জনৈক কবির নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করেন-

أنتَ للمال إذا أمسكتَه + فإذا أنفقتَه فالمالُ لَكَ

'যখন তুমি আটকে রাখলে, তখন তুমি মালের
আর যখন তুমি খরচ করলে, তখন মাল হ'ল তোমার' (*ইবনু কাছীর*)।

(৬) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ 'তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে'।

এটি পূর্ববর্তী আয়াতের لَوْ (যদি)-এর জবাব নয়। বরং এটি সম্পূর্ণ পৃথক ও শপথসূচক বাক্য। শুরুতে وَاللهِ (আল্লাহ্র কসম) উহ্য রয়েছে। لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ হ'ল উক্ত শপথের জওয়াব। এর সাথে পূর্বের আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

৪৩৯. মুসলিম হা/২৯৫৯, মিশকাত হা/৫১৬৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।
৪৪০. বুখারী হা/৬৫১৪, মুসলিম হা/২৯৬০, মিশকাত হা/৫১৬৭।
৪৪১. বুখারী, মুসলিম হা/১০৪৭, মিশকাত হা/৫২৭০।

(৭) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দিব্য-প্রত্যয়ে দেখবে'।

এটি পূর্ববর্তী আয়াতের তাকীদ হয়েছে এবং لَتَرَوُنَّه - لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة আনা হয়েছে। যার অর্থ, 'অবশ্য অবশ্যই তোমরা দেখবে'। যেদিন জাহান্নামকে ৭০ হাযার লাগামে বেঁধে টেনে আনা হবে। প্রত্যেক লাগামে ৭০ হাযার ফেরেশতা থাকবে'।[৪৪২] আর প্রত্যেক ফেরেশতা হবে 'নির্মম ও কঠোর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। কত বিশাল ও ভয়ংকর সেই জাহান্নাম! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন -আমীন!

এটিতে প্রচ্ছন্নভাবে আরেকবার ধমক দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে শপথ লুকিয়ে রয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তোমরা অবশ্যই জাহান্নামকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। তখন তোমাদের মধ্যে দিব্য-প্রত্যয় জন্মাবে।

এখানে 'তোমরা' বলে কাফেরদের বুঝানো হ'তে পারে। কেননা তাদের জন্যে জাহান্নাম অবধারিত। অথবা সাধারণভাবে সকল বনু আদমকে বুঝানো হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيًّا 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় (জাহান্নামে) পৌঁছবে না। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফায়ছালা' (*মারিয়াম* ১৯/৭১)। এখানে পৌঁছানোর অর্থ প্রবেশ করা নয়, বরং অতিক্রম করা। একে 'পুলছিরাত' বলা হয়। ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, মুমিনগণ পুলছিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে বিদ্যুতের বেগে, জাহান্নামের কোন উত্তাপ তারা অনুভব করবে না। কিন্তু কাফের-ফাসেকগণ আটকে যাবে ও জাহান্নামে পতিত হবে...।[৪৪৩] যেমন পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেন, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا 'অতঃপর আমরা আল্লাহভীরুদের উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব' (*মারিয়াম* ১৯/৭২)। অতএব মুমিন-কাফির সবাই জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ করবে। মুমিনগণ সহজে পার হয়ে যাবে। কিন্তু কাফের-ফাসেকগণ জাহান্নামে পতিত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সেদিনের কঠিন পাকড়াও থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

এখানে عَيْنَ الْيَقِيْنِ বা 'দিব্য-প্রত্যয়ে' বলার কারণ এই যে, মানুষ চোখে দেখাটাকে অধিক গুরুত্ব দেয় কানে শোনার চাইতে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ 'শোনা খবর কখনো চোখে দেখার সমান নয়'।[৪৪৪] النَّفْسُ অর্থ الْعَيْنُ। ফলে দেখাটাকেই ইয়াক্বীন গণ্য করা হয়েছে' *(ক্বাসেমী)*।

৪৪২. মুসলিম হা/২৮৪২, মিশকাত হা/৫৬৬৬।
৪৪৩. বুখারী, মুসলিম হা/১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৭৯।
৪৪৪. আহমাদ হা/২৪৪৭; মিশকাত হা/৫৭৩৮, সনদ ছহীহ।

দুনিয়াতে ঈমানদারগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথায় বিশ্বাসী হয়ে মনের চোখ দিয়ে সেটা দেখতে পারে এবং আখেরাতে মানুষ সেটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তখনকার দিব্য-প্রত্যয়ে কোন কাজ হবে না *(সাজদাহ ৩২/২৯)*। দুনিয়াতে বিশ্বাস করলে ও সেই অনুযায়ী সাবধান হয়ে নেক আমল করলে আখেরাতে কাজে লাগবে *(মুল্ক ৬৭/২; যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। ফলে সেদিন জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করলেও আল্লাহ্র হুকুমে সেখানে সে পতিত হবে না। বরং সহজে পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। দুঃখ হয় মানুষের জন্য যে, সে নিজে না দেখেও অন্যের কথা শুনে নিজের মৃত মাতা-পিতা ও দাদা-দাদীর উপরে ঈমান এনে থাকে। অথচ সে নবী-রাসূলের কথা শুনে আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনতে পারে না। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে নরম করে দিন এবং তাকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করুন- আমীন!

(৮) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ‘অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে দেওয়া নে‘মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’। এখানেও পূর্বের আয়াতের ন্যায় ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা বাচক ক্রিয়া لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة আনা হয়েছে। যার অর্থ, অবশ্য অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে’।

আবু নছর আল-কুশায়রী বলেন, প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। তবে কাফেরদের প্রশ্ন করা হবে ধমক ও ধিক্কার হিসাবে (تَقْرِيْعًا وَتَوْبِيْخًا)। কেননা তারা এগুলোর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত না। আর মুমিনকে প্রশ্ন করা হবে তাকে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে ও তার মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (تذكيرًا وَتشريفًا)। কেননা সে সর্বদা এসব নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করত’ (*কুরতুবী*)। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন তাকে উক্ত কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, তখন সে খুশী হবে ও গর্বিত বোধ করবে। সকলের নিকট তখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে কাফের-মুনাফিকরা লজ্জিত ও ধিকৃত হবে।

মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা, তার হস্ত-পদ-পেট ও মস্তিষ্ক, তার প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সবই আল্লাহ্র দেওয়া অফুরন্ত নে‘মতের অংশ। মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থে সৃষ্ট আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি, বায়ু-পানি-মাটি, খাদ্য-শস্য, ফল-ফলাদি, পাহাড়-জঙ্গল, নদী-নালা, গবাদিপশু ও পক্ষীকুল সবই আল্লাহ্র নে‘মতরাজির অংশ। মানুষের জ্ঞান-সম্পদ, তার চিন্তাশক্তি ও বাকশক্তি হ’ল সর্বাধিক মূল্যবান নে‘মত। সর্বোপরি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে প্রেরিত কিতাব ও নবী-রাসূলগণ মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا ‘যদি তোমরা আল্লাহ্র নে‘মতরাজি গণনা কর, তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না’ (*ইবরাহীম ১৪/৩৪; নাহল ১৬/১৮*)।

দৃশ্যমান ও অদৃশ্য হাযারো নে'মতের মধ্যে আল্লাহ মানুষের লালন-পালন করে থাকেন। অকৃতজ্ঞ সন্তান যেমন পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করে না, অকৃতজ্ঞ মানুষ তেমনি তার পালনকর্তা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে না। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً– 'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের সেবায় অনুগত করে দিয়েছেন? এবং তোমাদের উপরে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নে'মতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?...' (*লোকমান* ৩১/২০)। তিনি বলেন, وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ– 'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং একটি সমুদ্রের সাথে সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর নে'মতসমূহ (كلمات) লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' (*লোকমান* ৩১/২৭)।

প্রধান নে'মত সমূহ :

নিম্নে আমরা মানুষের প্রধান প্রধান নে'মত সমূহ, যা পবিত্র কুরআনে ও ছহীহ হাদীছ সমূহে উল্লেখিত হয়েছে, তার মধ্য থেকে কয়েকটির কথা উল্লেখ করব।-

(১) চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় : আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً– 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' (*বনু ইসরাঈল* ১৭/৩৬)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) النَّعِيْمِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, هو صحة الأبدان والأسماع والأبصار এটা হ'ল দেহ, কর্ণ ও চক্ষুর সুস্থতা। কেননা এগুলি কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে আল্লাহ বান্দাকে পৃথক পৃথকভাবে প্রশ্ন করবেন। যদিও আল্লাহ এ বিষয়ে সম্যক অবহিত' (*ইবনু কাছীর*)। অতএব এইসব অমূল্য নে'মতের অপব্যবহার যাতে না হয়, সে বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

(২) স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতা : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'দু'টি নে'মত রয়েছে, যে দু'টিতে বহু মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়েছে- স্বাস্থ্য এবং সচ্ছলতা'।[৪৪৫] অর্থাৎ যখন সে সুস্থ ও সচ্ছল থাকে, তখন এ দু'টি নে'মতকে সে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে

৪৪৫. বুখারী হা/৬৪১২, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ; মিশকাত হা/৫১৫৫।

ব্যয় করে না। বরং অলসতা করে এবং এখন নয়, পরে করব বলে শয়তানী ধোঁকায় পতিত হয়। ফলে যখন সে অসুস্থ হয় বা অসচ্ছল হয় কিংবা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন আর ঐ নেকীর কাজটি করার সুযোগ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ-

'তুমি পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে গণীমত (সম্পদ) মনে কর : (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে (২) পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে'।[৪৪৬]

ইবনুল জাওযী বলেন, مَنِ اسْتَعْمَلَ فَرَاغَهُ وَصِحَّتَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ فَهُوَ الْمَغْبُوطُ وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَهُوَ الْمَغْبُونُ- 'যে ব্যক্তি তার সচ্ছলতা ও সুস্থতাকে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে লাগায়, সে ব্যক্তি হ'ল 'মাগবূত্ব' বা ঈর্ষণীয়। আর যে ব্যক্তি ঐ দু'টি বস্তুকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজে লাগায়, সে হ'ল 'মাগবূন' বা ধোঁকায় পতিত'।[৪৪৭] অত্র হাদীছে সুস্বাস্থ্য ও আর্থিক সচ্ছলতাকে আল্লাহ্র বিশেষ নে'মত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

(৩) সম্পদ, সন্তান ও নেতৃত্ব : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالاً وَوَلَدًا... وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ..- 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেইনি?... আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ও গণীমতের মাল নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেইনি?'[৪৪৮] অত্র হাদীছে কান ও চোখ ছাড়াও ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও নেতৃত্বকে অন্যতম প্রধান নে'মত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যে বিষয়ে তাকে ক্বিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে।

(৪) আত্মীয়-পরিজন, ব্যবসা ও বাড়ী-ঘর : পবিত্র কুরআনে আরও কয়েকটি বস্তুকে মানুষের প্রিয়বস্তু হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, যেগুলি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দেওয়া অত্যন্ত মূল্যবান নে'মত। যেমন আল্লাহ বলেন,

---

৪৪৬. হাকেম হা/৭৮৪৬, বায়হাক্বী-শো'আব, তিরমিযী; ছহীহুল জামে' হা/১০৭৭; ছহীহাহ হা/১১৫৭; মিশকাত হা/৫১৭৪।
৪৪৭. ফাৎহুল বারী হা/৬৪১৪-এর ব্যাখ্যা।
৪৪৮. তিরমিযী হা/২৪২৮ সনদ ছহীহ; কুরতুবী হা/৬৪৬৩।

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ-

'বল তোমাদের নিকটে যদি তোমাদের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিবার ও গোত্র-পরিজন, তোমাদের মাল-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করে থাক, তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা করে থাক এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা পসন্দ করে থাক, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চাইতে এবং তাঁর পথে জিহাদের চাইতে তোমাদের নিকটে অধিক প্রিয় হয়, তাহ'লে তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, যে পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় নির্দেশসহ আগমন করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না' (*তওবা ৯/২৪*)। উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রতিটি নে'মতের বিষয়ে বান্দাকে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে।

(৫) সদাসঙ্গী পুত্রগণ : এই সঙ্গে আরেকটি নে'মতের কথা বলা হয়েছে। وَبَنِينَ شُهُودًا 'সদাসঙ্গী পুত্রগণ' (*মুদ্দাছছির ৭৪/১৩*)। অনেকের একাধিক পুত্র সন্তান আছে। কিন্তু কেউ পিতামাতার কাছে থাকেনা। এটা যথার্থ নে'মত নয়। যে সন্তান সর্বদা পিতামাতার সুখ-দুঃখের সাথী থাকে, সেই-ই হ'ল প্রকৃত নে'মত।

(৬) পুণ্যশীলা স্ত্রী : আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, – إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'নিশ্চয় সমগ্র দুনিয়াটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল পুণ্যবতী স্ত্রী'।[৪৪৯] এই শ্রেষ্ঠ নে'মত কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করা হবে। তেমনি স্ত্রীকেও তার সংসারের গুরু দায়িত্ব পালন সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে'।[৪৫০]

(৭) ক্ষুধায় অন্ন : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ « مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ». قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ « وَأَنَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِى الَّذِى أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا ». فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِى بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَيْنَ فُلاَنٌ ». قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِىُّ فَنَظَرَ

৪৪৯. মুসলিম হা/১৪৬৭; মিশকাত হা/৩০৮৩ 'বিবাহ' অধ্যায়।
৪৫০. বুখারী হা/৮৯৩, মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّى قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ ». فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ، رواه مسلم-

'একদা দিনে বা রাত্রিতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ঘর থেকে বের হ'লেন। রাস্তায় তিনি আবুবকর ও ওমরকে পেলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ বস্তু এই সময় তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে এনেছে? তারা উভয়ে বললেন, ক্ষুধা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমাকেও বের করেছে ঐ বস্তু, যা তোমাদেরকে বের করে এনেছে'। অতঃপর বললেন, ওঠো! তারা উঠলেন ও তাঁর সাথে জনৈক আনছারীর বাড়ীতে গেলেন। কিন্তু তখন বাড়ীতে কেউ ছিল না। এমতাবস্থায় বাড়ীওয়ালার স্ত্রী তাঁদের স্বাগত জানালো। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়? স্ত্রী বলল, উনি আমাদের জন্য সুপেয় পানি আনতে গিয়েছেন। এমন সময় আনছার ব্যক্তি এসে গেলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দুই সাথীকে দেখে আনন্দে বলে উঠলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّى 'আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা! আজকের দিনে সর্বাধিক সম্মানিত মেহমান কারু নেই আমার ব্যতীত'। অতঃপর তিনি গাছে উঠে টাটকা খেজুরের কাঁদি কেটে আনলেন এবং আধা-পাকা, শুকনা ও পাকা খেজুর পরিবেশন করতে লাগলেন। অতঃপর ছুরি নিয়ে ছাগল যবেহ করতে গেলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, খবরদার দুগ্ধবতী বকরী যবেহ করো না। অতঃপর ছাগল যবেহ করা হ'ল এবং তিনজনে মিলে রান্না করা গোশত খেলেন। খেজুর খেলেন ও পানি পান করলেন।

খানাপিনা শেষে পরিতৃপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আজকের এই নে'মত সম্পর্কে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে এনেছিল। অতঃপর তোমরা ফিরে যাওনি এই নে'মত না পাওয়া পর্যন্ত'।[৪৫১]

---

৪৫১. মুসলিম হা/২০৩৮ 'পানীয় সমূহ' অধ্যায়, ২০ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৪২৪৬ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়, 'মেহমানদারী' অনুচ্ছেদ। উপরোক্ত হাদীছের রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ৭ম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের সময় ইসলাম কবুল করেছিলেন। এতে অনেকে ধারণা করেন ঘটনাটি অনেক

মুসনাদে আবু ইয়া'লা *(হা/৭৮)* আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এবং ছহীহ ইবনু হিব্বান *(হা/৫২১৬)* ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ওমর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে দুপুর বেলায় যোহর ছালাত শেষে দু'জনের মসজিদে ঠেস দিয়ে বসে থাকার কথা এসেছে। তিরমিযী *(হা/২৩৬৯-৭০)* ও আবু ইয়া'লা *(হা/২৫০)*-তে উক্ত আনছার ছাহাবীর নাম এসেছে, আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান (ابو الهيثم مالك ابن التِّيِّهان)। সেখানে একথাও এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) গিয়ে প্রথমে তিনবার সালাম করেন। কিন্তু সাড়া না পেয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হ'লেন। এমন সময় তার স্ত্রী ছুটে এসে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُ تَسْلِيْمَكَ وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ يَّزِيْدَنَا مِنْ سَلاَمِكَ 'হে রাসূল! আমি আপনার সালাম শুনেছিলাম। কিন্তু আমাদের উপর আপনার সালাম আরও বেশী পাবার আকাংখায় জবাব না দিয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম'। রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে বললেন, خيرًا 'বেশ'। আবুল হায়ছাম কোথায়? তাকে দেখছি না যে? উম্মুল হায়ছাম বললেন, উনি আমাদের জন্য পানি আনতে গিয়েছেন'।[৪৫২]

উল্লেখ্য যে, এই মহা সৌভাগ্যবান মেযবান আবুল হায়ছাম আনছারীর (রাঃ)-এর প্রশংসা করে বিখ্যাত সৈনিক কবি ও পরবর্তীতে ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে রোমকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঐতিহাসিক মুতা যুদ্ধের অন্যতম শহীদ সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) তাঁর ছয় লাইনের বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন (*কুরতুবী*)। যার দু'টি লাইন নিম্নরূপ :

فَلَمْ أَرَ كَالْإِسْلاَمِ عِزًّا لِأُمَّةٍ + وَلاَ مِثْلَ أَضْيَافِ الْإِرَاشِيِّ مَعْشَرًا

نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَفَارُوقُ أُمَّةٍ + وَخَيْرُ بَنِي حَوَّاءَ فَرْعًا وَعُنْصُرًا

'উম্মতের জন্য ইসলামের চাইতে সম্মান আমি কিছুতে দেখিনি। আর ইরাশীর মেহমানদের ন্যায় মর্যাদাবান কাউকে আমি মানবজাতির মধ্যে দেখিনি'। 'নবী, ছিদ্দীক

পূর্বের, যা তিনি শুনে বর্ণনা করেছেন। কেননা খায়বর যুদ্ধে বিজয়ের পর গণীমত হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম অনেক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং তিনি নিজে 'ফিদাক' খেজুর বাগানের মালিক হন। এর জবাবে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, هذا زعم باطل এটি একটি বাতিল ধারণা মাত্র। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমৃত্যু সচ্ছলতা ও দরিদ্রতার মধ্যে পরিক্রান্ত হয়েছেন। কখনো তিনি সম্পদশালী হয়েছেন, আবার কখনো নিঃস্ব হয়েছেন'। যেমন আয়েশা, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী বর্ণিত হাদীছ সমূহে এসেছে যে, মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দীনার, দিরহাম, বকরী, উট, গোলাম, বাঁদী কিছুই রেখে যাননি। এরপরও যদি কিছু থেকে থাকে, সবই ছাদাক্বা হয়ে গিয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬৪-৬৭, ফাযায়েল ও শামায়েল অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) ছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবু সালামাহ বিন আব্দুর রহমান প্রমুখ ছাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

৪৫২. মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/২৫০, আবুদাঊদ হা/৫১৮৫, সনদ যঈফ; তাফসীর ইবনু কাছীর; তাফসীরে কুরতুবী।

ও উম্মতের ফারূক। শাখা ও মূলে হাওয়ার সন্তানদের মধ্যে সেরা' *(কুরতুবী)*। ইরাশ একটি স্থানের নাম। বাড়ীওয়ালা মেযবান সেদিকে সম্পর্কিত।

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, ক্ষুৎ-পিপাসায় অন্নদান আল্লাহ্র এক অমূল্য নে'মত। এজন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পাখি থেকে উপদেশ হাছিল করতে বলেছেন। যেমন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পার, তাহ'লে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে রিযিক দান করবেন, যেভাবে তিনি পাখিকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় ও সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে'।[৪৫৩]

(৮) জীবন একটি নে'মত : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ-

'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তান তার প্রভুর নিকট থেকে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পা বাড়াতে পারবে না। ১- তার জীবন সম্পর্কে, কিসে তা শেষ করেছিল। ২- তার যৌবন সম্পর্কে, কিসে তা জীর্ণ করেছিল। ৩- তার মাল সম্পর্কে, কোন পথে তা অর্জন করেছিল এবং ৪- কোন পথে তা ব্যয় করেছিল। ৫- তার ইল্ম সম্পর্কে, তদনুযায়ী সে আমল করেছিল কি-না'।[৪৫৪]

অত্র হাদীছটি মানুষের পুরা জীবনকেই নে'মত গণ্য করে। বিশেষ করে দ্বীনী ইল্মের নে'মত। কেননা বাকী চারটা সবার থাকলেও ইল্ম সবার থাকে না। অধিকন্তু ইল্ম অনুযায়ী আমলকারী আলেমের সংখ্যা খুবই কম।

(৯) সকল নবী ও শেষনবী : আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ 'আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা

৪৫৩. তিরমিযী হা/২৩৪৪, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৯৯, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'তাওয়াক্কুল' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।
৪৫৪. তিরমিযী হা/২৪১৬, মিশকাত হা/৫১৯৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৯৪৬।

আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' *(নাহল ১৬/৩৬)*। বস্তুতঃ এটাই ছিল মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। এজন্য প্রেরিত ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে প্রথম মানুষ আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম নবী।[৪৫৫] অতঃপর শেষনবী[৪৫৬] মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন জগদ্বাসীর প্রতি রহমত স্বরূপ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ 'আমরা তো তোমাকে জগদ্বাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*। মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন, هو ما أنعم الله علينا بمحمد صلى الله عليه و سلم 'ঐ নে'মত হ'লেন স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যাঁকে আল্লাহ আমাদের উপরে নে'মত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন' *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

'আল্লাহ ঈমানদারগণের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন...' (*আলে ইমরান ৩/১৬৪*)।

সকল উম্মতের প্রতি নবী প্রেরণের এই মহা নে'মত সম্পর্কে কাফের ও ফাসেকদের জাহান্নামে নিক্ষেপের সময় সেখানকার দাররক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে,

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ-

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি? তারা কি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করেননি? এবং তোমাদেরকে আজকের দিনে সাক্ষাতের ব্যাপারে তাঁরা কি সতর্ক করেননি? তারা বলল, হ্যাঁ'। কিন্তু অবিশ্বাসীদের প্রতি শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হয়েছে' *(যুমার ৩৯/৭১)*।

(১০) ইসলামের বিধান হালকা হওয়া : হাসান বাছরী ও মুফাযযাল বলেন, উক্ত নে'মত হ'ল, আমাদের উপর শরী'আতের বিধানসমূহকে হালকা করা এবং কুরআনকে সহজ করা *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'আর তিনি তোমাদের উপরে দ্বীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা রাখেননি' (*হজ্জ ২২/৭৮*)। যেমন ইহুদীদের জন্য বিধান ছিল শিরকের তওবা কবুল হওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করা *(বাক্বারাহ ২/৫৪)*। অথচ ইসলামে কথা ও কর্মের মাধ্যমে অন্তর থেকে তওবা করাই

৪৫৫. আহমাদ হা/২১৫৮৬, ২২৩৪২; মিশকাত হা/৫৭৩৭; ছহীহাহ হা/২৬৬৮।
৪৫৬. আহযাব ৩৩/৪০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৫৭৪৫, ৫৭৪৮।

যথেষ্ট। এছাড়াও যেমন সফরে ছালাত জমা ও ক্বছর করা, পরিবহনে ক্বিবলা বাধ্যতামূলক না হওয়া, অপারগ অবস্থায় বসে, কাৎ হয়ে বা ইশারায় ছালাত আদায় করা, মোযার উপর মাসাহ করা, সফরে ছিয়াম ক্বাযা করা, ঋতু অবস্থায় মেয়েদের ছালাত মাফ হওয়া ও ছিয়াম ক্বাযা করা ইত্যাদি। অন্যত্র আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ؟ 'আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ লাভের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? (*ক্বামার ৫৪/১৭, ২২, ৩২, ৪০*)। উল্লেখ্য যে, কুরআন সহজ হওয়ার অর্থ হ'ল, এর তেলাওয়াত সহজ এবং এর শিক্ষা-দীক্ষাসমূহ স্পষ্ট ও বাস্তবায়নযোগ্য। যেমন ছালাত পড়, ছিয়াম রাখো, অন্যায়-অশ্লীলতা হ'তে দূরে থাক ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন থেকে আহকাম বের করা ও আয়াতের উদ্দেশ্য অনুধাবন করাটা সহজ নয়। এজন্য যোগ্য ও তাক্বওয়াশীল আলেম হওয়া যরূরী।

(১১) কুরআন ও সুন্নাহ : কুরআন ও সুন্নাহ উম্মতের নিকটে রেখে যাওয়া শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দুই জীবন্ত মু'জেযা, দুই পবিত্র আমানত এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র সবচাইতে বড় নে'মত। বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনের এক ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'তোমাদের মাঝে আমি দু'টি বস্তু ছেড়ে গেলাম। তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না যতদিন এ দু'টি বস্তুকে তোমরা কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকবে। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[৪৫৭]

এখন রাসূল নেই, খলীফাগণ নেই। উম্মতের সম্মুখে রয়েছে কেবল কুরআন ও হাদীছের দুই অমূল্য নে'মত। অতএব সে অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করেছে কি-না, সে বিষয়ে আল্লাহ্র নিকটে অবশ্যই জওয়াবদিহি করতে হবে।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন বিশ্বনবী।[৪৫৮] কুরআন ও সুন্নাহ হ'ল আল্লাহ প্রেরিত বিশ্ববিধান। যা সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এলাহী বিধান। অতএব মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই উক্ত ইলাহী নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি, ইহুদী

৪৫৭. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬, সনদ হাসান।
৪৫৮. সাবা ৩৪/২৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৮।

হৌক, নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনবার্তা শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে'।[৪৫৯]

বস্তুতঃপক্ষে উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ই আল্লাহ্র গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। এগুলি সম্পর্কে বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা দুনিয়ায় থাকতে এগুলির শুকরিয়া আদায় করেছিল, না কুফরী করেছিল। এই প্রশ্ন প্রত্যেক মানুষকেই করা হবে। আল্লাহ আমাদেরকে আখেরাতে জবাবদানের তাওফীক দান করুন -আমীন!

সারকথা :

অধিক পাওয়ার আকাংখা পরিহার করতে হবে এবং অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে। সাথে সাথে আখেরাতে আল্লাহ্র নে'মত সমূহের জওয়াবদিহি করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

৪৫৯. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।

সূরা আছর (কাল)

সূরা শারহ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০৩, আয়াত ৩, শব্দ ১৪, বর্ণ ৭০।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

(১) কালের শপথ! وَالْعَصْرِ ①

(২) নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ②

(৩) তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে ‘হক’-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে। إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

বিষয়বস্তু :

কালের শপথ করে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত (১-৩ *আয়াত*)। যা হ’ল, ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবর।[৪৬০]

গুরুত্ব :

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন হাফ্ছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে এমন দু’জন ছাহাবী ছিলেন, যারা মিলিত হ’লে একে অপরকে সূরা আছর না শুনিয়ে পৃথক হ’তেন না।[৪৬১]

(২) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন, لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّوْرَةَ لَوَسِعَتْهُمْ– ‘যদি মানুষ এই সূরাটি গবেষণা করত, তাহ’লে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হ’ত’ *(ইবনু কাছীর)*।

(৩) জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পূর্বে একবার ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাযযাবের কাছে গিয়েছিলেন। তখন মুসায়লামা তাকে বলেন, তোমাদের নবীর উপর সম্প্রতি কি নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, তাঁর উপরে অতি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ (وجيزة بليغة) একটি সূরা নাযিল হয়েছে।

---

৪৬০. الإيمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالصبر।

৪৬১. ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী-শু‘আবুল ঈমান; ছহীহাহ হা/২৬৪৮।

মুসায়লামা কাযযাব বলল, সেটা কি? তখন আমর ইবনুল আছ তাকে সূরা আছর শুনিয়ে দিলেন।

অতঃপর ভণ্ডনবী কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল, আমার উপরেও অনুরূপ একটা সূরা নাযিল হয়েছে। আমর ইবনুল আছ বললেন, সেটা কি? তখন মুসায়লামা বলল, يَا وَبْرُ يَا وَبْرُ، إِنَّمَا أَنْتَ أُذْنَانِ وَصَدْرٌ، وَسَائِرُكَ حَقْرٌ و فَقْرٌ– 'হে ওয়াব্র হে ওয়াব্র (বিড়াল জাতীয় ছোট প্রাণী)! তোমার আছে কেবল দু'টি বড় কান ও সীনা। আর তোমার বাকী সবই ফালতু'। অতঃপর মুসায়লামা জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগল? জবাবে আমর ইবনুল আছ বললেন, وَاللهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ تَكْذِبُ 'আল্লাহ্র কসম! তুমি ভালভাবেই জানো যে, আমি জানি তুমি মিথ্যা বলছ' (*ইবনু কাছীর*)।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উভয়ে কুফরী অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কুরআনী সত্যকে আমর ইবনুল আছ দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করেন। এই সত্যপ্রিয়তাই তাঁকে পরে ইসলামের পথে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি ও খালেদ ইবনু ওয়ালীদ এবং কা'বা গৃহের চাবি রক্ষক ওছমান বিন তালহা ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৩৪৭)*। বস্তুতঃ বড় হৌক বা ছোট হৌক কুরআনের প্রতিটি সূরা, আয়াত ও বর্ণই হতবুদ্ধিকর (مُعْجِزٌ)। যার মুকাবিলা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাফসীর :

(১) وَالْعَصْرِ 'কালের শপথ'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, العصر أى الدهر 'আছর' অর্থ 'কাল' (*কুরতুবী*)। ওয়াও (واو) হ'ল শপথের অব্যয়। অর্থাৎ কালের শপথ। যার মধ্যে আদম সন্তানের ভাল-মন্দ সকল কাজ সম্পাাদিত হয় (*ইবনু কাছীর*)। তাছাড়া কালের মধ্যে বিস্ময়কর ঘটনা সমূহ ঘটার কারণে একে 'বিস্ময়ের কেন্দ্র' (ابو العجب) বলা হয় *(ক্বাসেমী)*।

কালের শপথ আল্লাহ সম্ভবতঃ এজন্য করেছেন যে, বান্দা ভাল-মন্দ যে কাজই করুক না কেন তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালের মধ্যেই তাকে করতে হয়। এর বাইরে গিয়ে সে কিছুই করতে পারে না। অতএব তাকে সবসময় আল্লাহ্র দৃষ্টির সামনেই থাকতে হয়। কেননা বান্দার হিসাবে কাল তিনটি হ'লেও আল্লাহ্র নিকটে সবই বর্তমান কাল।

দ্বিতীয় কারণ এটা হ'তে পারে যে, সামনে যে কথা বলা হবে মহাকাল তার সাক্ষী। বর্তমানের অবিশ্বাসীরা বিগত যুগের অবিশ্বাসী ও অহংকারীদের পতন ও ধ্বংসের কারণ

সন্ধান করলে তার প্রমাণ পাবে। বিগত যুগে নূহের কওম, আদ, ছামূদ, লূত, শু'আয়েব, ফেরাঊন প্রমুখ বিশ্বের সেরা শক্তিশালী সম্প্রদায়গুলি আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে কেবল বর্ণিত চারটি গুণ তাদের মধ্যে না থাকার কারণে। যেকোন জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

তৃতীয় কারণ আছরের ওয়াক্ত হ'তে পারে। কেননা সাধারণতঃ এই সময় কুরায়েশ নেতারা 'দারুন নাদওয়াতে' পরামর্শসভায় বসত এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে ভাল-মন্দ সিদ্ধান্ত নিত। মন্দ সিদ্ধান্তের কারণে লোকেরা এই সময়টাকে 'মন্দ সময়' (زمان سوء) বলত' *(ক্বাসেমী)*। এখানে আছর-এর শপথ করে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, কালের কোন দোষ নেই। দোষী হ'ল মানুষ।

শায়েখ তানতাভী জাওহারী বলেন, পবিত্র কুরআনে ৪০টি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০টি ভূমণ্ডলীয় ও ২০টি নভোমণ্ডলীয়। ভূমণ্ডলীয় ২০টি হ'ল যেমন, ঝঞ্ঝাবায়ু (وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا), মেঘ বহনকারী বায়ু (فَالْحَامِلاَتِ وِقْرًا), পৃথিবী ও তার বিস্তৃতি (وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا), তীন (وَالتِّيْنِ), যায়তূন (وَالزَّيْتُوْنِ), তূর পাহাড় (وَطُورِ سِيْنِيْنَ), মক্কা নগরী (لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ), ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا), সাক্ষ্যদাতা (وَشَاهِدٍ), উপস্থিতগণ (وَمَشْهُوْدٍ), ক্বিয়ামতের দিন (لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ), জোড় (وَالشَّفْعِ), বেজোড় (وَالْوَتْرِ), উত্তাল সমুদ্র (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ), নর ও মাদী সকল সৃষ্টি (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى), দৃশ্যমান ও অদৃশ্য (مَا تُبْصِرُونَ وَمَا لاَ تُبْصِرُوْنَ), পিতা ও সন্তান (وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ), প্রাণ ও তার বিন্যস্তকরণ (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا)।

অতঃপর নভোমণ্ডলীয় ২০টি হ'ল : ফজর (وَالْفَجْرِ), দশ রাত্রি (وَلَيَالٍ عَشْرٍ), লুকোচুরি নক্ষত্ররাজি (بِالْخُنَّسِ), প্রভাতকাল (وَالصُّبْحِ), পূর্বাহ্ন (وَالضُّحَى), সূর্য (وَالشَّمْسِ), চন্দ্র (وَالْقَمَرِ), নক্ষত্র (وَالنَّجْمِ), দিবস (وَالنَّهَارِ), রাত্রি (وَاللَّيْلِ), নক্ষত্রসমূহের অস্তাচল (مَوَاقِعِ النُّجُومِ), পূর্ব ও পশ্চিমের রব (رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ), সান্ধ্য-লালিমা (بالشَّفَقِ), গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশ (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ), ফেরেশতাগণ যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا), ফেরেশতাগণ যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে (وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا), ফেরেশতাগণ যারা অগ্রসর হয় দ্রুতগতিতে

(فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا), ফেরেশতাগণ যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে (وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا), ফেরেশতাগণ যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে (فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا), আছর (وَالْعَصْرِ)।[৪৬২]

উপরোক্ত চল্লিশটি সৃষ্ট বস্তুর শপথের মধ্যে আলোচ্য সূরা আছর অর্থাৎ কালের শপথ হ'ল কুরআনের তারতীব অনুযায়ী সর্বশেষ শপথ। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির আগমনের পর থেকে এযাবৎকাল সংঘটিত মানবেতিহাসের উত্থান-পতনের ঘটনাবলী আমাদের পরবর্তী বক্তব্যের জীবন্ত সাক্ষী। যুগে যুগে বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যা থেকে উপদেশ হাছিল করবেন।

খ্যাতনামা মুফাসসির ইমাম রাযী *(৫৪৪-৬০৬ হি:)* আছর-এর সঠিক তাৎপর্য কি হবে, সেবিষয়ে জনৈক বিগত মনীষীর (بعض السلف) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি এটা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক বরফ বিক্রেতার আওয়ায তাঁর কানে এল। সে চিৎকার দিয়ে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলছে, اِرْحَمُوْا مَنْ يَّذُوْبُ رَأْسُ مَاله 'তোমরা রহম কর ঐ ব্যক্তির প্রতি, যার পুঁজি প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে'। একথা শুনেই তিনি বলে উঠলেন, هَذَا مَعْنَى سُوْرَةِ الْعَصْرِ... 'এটাই তো সূরা আছরের তাৎপর্য। যার বয়স চলে যাচ্ছে। অথচ কোন সৎকর্ম করছে না। সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত' *(তাফসীর রাযী)*। বস্তুতঃ 'কাল' প্রতি সেকেণ্ডে সময়ের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। অতএব প্রত্যেক মানুষকে তার সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালের মধ্যেই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কেননা সে প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাযার মাইল (৩ লক্ষ কি: মি:) গতিবেগে তার মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। বরফ গলার ন্যায় প্রতি সেকেণ্ডে তার আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে কালের স্মৃতিপটে তার প্রতিটি কথা ও কর্ম লিপিবদ্ধ হচ্ছে। এ কারণেই আল্লাহ কালের শপথ করেছেন।

(২) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে'। অর্থাৎ পরিণতিতে তারা ক্ষতির মধ্যে আছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا 'অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের আযাব আস্বাদন করল। বস্তুতঃ ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণতি' *(তালাক ৬৫/৯)*। এটি হ'ল পূর্ববর্তী শপথের জওয়াব।

---

৪৬২. তাফসীর তানতাভী, ২৫/২৬৫; তিনি 'তূর পাহাড়' এবং 'জোড় ও বেজোড়' উল্লেখ করেননি। এটা আমরা যোগ করলাম। এতদ্ব্যতীত তিনি الفلــق লিখেছেন। অথচ এই শব্দে কোন শপথ নেই। সেখানে আমরা بِالْخُنَّسِ যোগ করলাম -*লেখক*।

এখানে إِنَّ الْإِنْسَانَ لَخَاسِرٌ (নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত) না বলে لَفِيْ خُسْرٍ (অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে) বলার মাধ্যমে একথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, إن الانسان منغمس فى الخسر من كل جانب 'নিশ্চয়ই মানুষ চারদিক থেকে ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে'। فِيْ এখানে ظرفية হয়েছে।

الْإِنْسَانَ-এর اَلْ অর্থ كُلٌّ 'সকল মানুষ'। اَلْ দ্বারা جنس বা জাতি বুঝানো হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের স্বভাবগত ক্ষতিপ্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর মানুষ যে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রতিনিয়ত ক্ষতির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, সে কথাটা জোরালোভাবে ব্যক্ত করার জন্য সূরার শুরুতে وَالْعَصْرِ-এর واو দ্বারা শপথ, অতঃপর অত্র বাক্যের শুরুতে إِنَّ এবং শেষে لَ (لَفِيْ خُسْرٍ) সহ মোট তিনিটি নিশ্চয়তাবোধক অব্যয় আনা হয়েছে। বিগত যুগের বিধ্বস্ত সভ্যতাসমূহ এবং বর্তমান যুগের ধর্মনিরেপক্ষ বস্তুবাদী সভ্যতাসমূহ যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে, এগুলি হ'ল আল্লাহ্‌র উপরোক্ত সাবধানবাণীর বাস্তব প্রমাণ।

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানগর্বী রাষ্ট্রনেতাদের অমানবিক কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এন্থনী ইডেন ১৯৩৮ সালে বলেছিলেন, 'যদি কিছু না করা হয়, তাহ'লে এই পৃথিবীর অধিবাসীরা এই শতাব্দীর শেষভাগে আদিম গুহাবাসী ও বন্য লোকদের জীবন ধারায় ফিরে যাবে। কী আশ্চর্য! পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো এমন এক অস্ত্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে, যার ভয়ে সবাই ভীত। কিন্তু তা আয়ত্তে আনতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেউ রাযী নয়। কোন কোন সময় আমি বিস্ময়ের সাথে ভাবি, যদি অন্য কোন গ্রহ থেকে কোন পর্যটক আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহে নেমে আসেন, তাহ'লে তিনি পৃথিবীকে দেখে কি বলবেন? তিনি দেখবেন, আমরা সকলে মিলে আমাদেরই ধ্বংসের উপকরণ তৈরী করছি। এমনকি আমরা একে অপরকে তার ব্যবহার পদ্ধতিও বাৎলে দিচ্ছি'।[৪৬৩]

মিঃ ইডেনের উক্ত সতর্কবাণীর মাত্র তিন বছর পরেই শুরু হয়ে যায় পাঁচ বছরব্যাপী ২য় বিশ্বযুদ্ধ। যাতে প্রায় ৩ কোটি মানুষ নিহত হয়। যে মারণাস্ত্রের বিষয়ে তিনি হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, আমেরিকার সেই এটমবোমার আঘাতে ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট সকাল সোয়া আট ঘটিকায় জাপানের হিরোশিমা মহানগরীর ১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিমেষে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। চোখের পলকে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় ২ লক্ষ ১০ হাযার থেকে ৪০ হাযার বনু আদম'।[৪৬৪] এর তিনদিন পরে ৯ই আগষ্ট

৪৬৩. আবুল হাসান আলী নাদভী, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো? ৩য় মুদ্রণ ২০০৪, পৃঃ ২৬২।
৪৬৪. মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারোলে? পৃঃ ২৬৩।

বুধবার দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় জাপানের নাগাসাকি শহরে। যাতে মৃত্যুবরণ করে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ। উভয় বোমার তেজস্ক্রিয়তার ফলে ক্যান্সার ইত্যাদির মত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আজও সেখানকার মানুষ মরছে। বংশপরম্পরায় জাপানীরা বহন করে চলেছে এসব দুরারোগ্য ব্যাধি।[৪৬৫]

সেদিনকার সেই 'লিটলবয়' নামক ছোট্ট এটমবোমার চাইতে অনেক বড় ও বহু শক্তিশালী আণবিক বোমা এখন পাশ্চাত্য দেশগুলির হাতে রয়েছে। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কিংবা স্রেফ আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে অন্যান্য দেশগুলি এখন আণবিক বোমা বানানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এমনকি ভারত, চীন ও পাকিস্তানের মত দরিদ্র রাষ্ট্রগুলি, যাদের জনগণ ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিনিয়ত আত্মহত্যা করছে, তারাও এখন আণবিক বোমার মালিক হয়েছে। অথচ এই বোমা নিক্ষেপ করলে কেবল শত্রুপক্ষই মরবে না, নিজেদের লোকেরাও তার তেজস্ক্রিয়ায় ধ্বংস হবে। সব কিছু জেনেও নেতারা ছুটছেন ধ্বংসের পিছনে। চলছে বোমা মারা ও নতুন নতুন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী ও পরীক্ষার প্রতিযোগিতা। ঠিক যেন আগুনে পুড়ে মরার জন্য পতংগ তার নিজের ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে।

মানবদরদী রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِى تَقَحَّمُونَ فِيهَا– 'হে লোকসকল! জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আমি তোমাদের কোমর ধরে আকর্ষণকারী। তোমরা জাহান্নাম থেকে আমার দিকে ফিরে এসো! তোমরা জাহান্নাম থেকে আমার দিকে ফিরে এসো! কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করে জাহান্নামে ঢুকে পড়ছ'।[৪৬৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে শত্রুবাহিনী থেকে ভয় প্রদর্শনকারী নগ্ন সতর্ককারীর ন্যায় (وَإِنِّى أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ)। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো! তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো'! (فَالنَّجَاءُ ثُمَّ النَّجَاءُ)।[৪৬৭] কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য যে, মানুষ জেনে-বুঝে নিজের ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ 'নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে'।

(৩) إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 'তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে'।

৪৬৫. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ৬ আগষ্ট, ২০০৭, পৃঃ ৭।
৪৬৬. বুখারী হা/৬৪৮৩, মুসলিম হা/২২৮৪, মিশকাত হা/১৪৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।
৪৬৭. বুখারী হা/৬৪৮২, মুসলিম হা/২২৮৩, মিশকাত হা/১৪৮।

অর্থাৎ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারে কেবল চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ। যার মধ্যে প্রথম দু'টি হ'ল ব্যক্তিগত ও পরের দু'টি হ'ল সমাজগত। প্রথম দু'টির প্রথমটি হ'ল ঈমান এবং দ্বিতীয়টি হ'ল আমল। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জ্ঞান যদি তাওহীদ বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল হয়, তবে তার কর্ম হবে মঙ্গলময়। আর যদি তা না হয়, তবে তার কর্ম হবে অকল্যাণময়। মানুষের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে এদু'য়ের ফলাফল সুস্পষ্ট। যে জাতি ইলমী ও আমলী শক্তিতে উন্নত, সে জাতিই পৃথিবীতে উন্নত হয়। মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস তার বাস্তব সাক্ষী। অতএব ক্ষতি থেকে বাঁচতে হ'লে মানুষকে নিম্নোক্ত চারটি গুণ অর্জন করতে হবে-

(১) ঈমান (الإيمان بالله) : পৃথিবীতে মানুষে মানুষে পার্থক্যের মানদণ্ড হ'ল ঈমান। যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, তারা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহতে অবিশ্বাসী, তারা ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থকাম। ঈমানদারের সকল কাজ হয় আখেরাতমুখী। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের সকল কাজ হয় প্রবৃত্তিমুখী। দু'জনের জীবনধারা হয় সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ বলেন, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ - وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ 'আমরা রাসূলদের পাঠিয়ে থাকি এজন্য যে, তারা মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করবে। এক্ষণে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা কোনরূপ চিন্তান্বিত হবে না'। 'পক্ষান্তরে যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, তাদের পাপাচারের কারণে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে' *(আন'আম ৬/৪৮-৪৯)*।

الإيمان من الأمن ضد الخوف والشك। ঈমান অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, যা ভীতি ও সন্দেহের বিপরীত। সন্তান যেমন পিতা-মাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয়, মুমিন তেমনি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়।

মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি হ'ল ছয়টি : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (১) আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস, (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস, (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, (৪) তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, (৫) বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস এবং (৬) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস। যা হাদীছে জিব্রীলে বর্ণিত হয়েছে।[৪৬৮] যাকে ঈমানে মুফাছছাল বলা হয়। অতঃপর মুমিনের বিশ্বাসের সারকথা বা ঈমানে মুজমাল

৪৬৮. হাদীছে জিব্রীল, মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২ 'ঈমান' অধ্যায়।

হ'ল, آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে যেমন তিনি, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং আমি কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে'। অতঃপর ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল, اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْاَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ– 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম হ'ল ঈমান, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঈমান হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা'। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না। অতএব জনগণের ঈমান যাতে সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরিবার, সমাজ ও সরকারকে সর্বদা সেই পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। নইলে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হ'লে সমাজ অকল্যাণে ভরে যাবে।

উল্লেখ্য যে, খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আবুবকর (রাঃ) ও অন্যদের ঈমান সমান'। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে।

ঈমানের ব্যাপারে মানুষ তিনভাগে বিভক্ত। (১) খালেছ বিশ্বাসী মুমিন (২) অবিশ্বাসী কাফের (৩) দোদুল্যমান কপট বিশ্বাসী। এদের মধ্যে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে কেবলমাত্র প্রথম দল। শেষোক্ত দু'টি দল চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

বস্তুতঃ প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বাগ্রে ঈমান সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب العلم قبل القول والعمل 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন'। তিনি দলীল এনেছেন আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে– فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ– 'তুমি জ্ঞান অর্জন কর এ বিষয়ে যে, কোন উপাস্য নেই আল্লাহ ব্যতীত এবং তোমার গোনাহের জন্য ক্ষমা চাও' (*মুহাম্মাদ ৪৭/১৯*)। এখানে কথা ও কাজের পূর্বেই ইল্মের কথা বলা হয়েছে।

অতএব আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'ঈমান এনেছে' অর্থ 'জেনে-বুঝে ঈমান এনেছে'। মনে রাখা আবশ্যক যে, পৃথিবীতে এইরূপ একজন ঈমানদার বেঁচে থাকতে ক্বিয়ামত হবে না। আল্লাহ্র নিকটে পৃথিবীর সকল মানুষের চাইতে একজন তাওহীদবাদী প্রকৃত মুমিনের গুরুত্ব অনেক বেশী। কেবল তার জন্যই পৃথিবী ধ্বংস হবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِى الأَرْضِ اللهُ اللهُ 'অতদিন পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার মত একজন লোক বেঁচে থাকবে'।[৪৬৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলার মত লোক থাকবে'।[৪৭০] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ, তাওহীদের স্বীকৃতি দানকারী। এর অর্থ 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকর করা নয়। যেমন কিছু ছূফীবাদী লোক ধারণা করে থাকে। কেননা এটি একটি বিদ'আতী যিকর, শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই। যদি সকল মুসলমান এই ধরনের যিকর পরিত্যাগ করে, তথাপি ক্বিয়ামত হবে না যদি নাকি তারা তাওহীদপন্থী থাকে' *(মিশকাত ৫৫১৬ নং হাদীছের টীকা দ্রঃ)*।

(২) সৎকর্ম (العمل الصالح) : আল্লাহ বলেন, أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান' *(সাজদাহ ৩২/১৯)*। তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা'। 'তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী সমূহ। যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপরে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭-৮)*।

শরী'আত অনুমোদিত নেক আমলকেই 'সৎকর্ম' বলা হয়। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, মানুষের প্রতি দয়া, ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি সম্মান ইত্যাদি। কোন কাজ 'সৎকর্ম' হিসাবে গণ্য হবার জন্য শর্ত হ'ল তিনটি : (১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হওয়া (২) কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী হওয়া। (৩) বিদ'আত মুক্ত হওয়া। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে যা দ্বীন বলে গৃহীত ছিল, সেটাই মাত্র দ্বীন। পরবর্তীকালে ধর্মের নামে আবিষ্কৃত কোন রীতি-নীতিকে দ্বীন বলা হবে

---

৪৬৯. মুসলিম হা/১৪৮; মিশকাত হা/৫৫১৬।
৪৭০. হাকেম, আহমাদ হা/১৩৮৬০, সনদ ছহীহ।

না। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে। তাতে কম-বেশী করার এখতিয়ার কারু নেই। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে সে ব্যাপারে মুমিন পুরুষ ও নারীর নিজস্ব কোন এখতিয়ার থাকবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। তিনি আরও বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'যারা রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে তারা এব্যাপারে সতর্ক হৌক যে, তাদের গ্রেফতার করবে (দুনিয়াতে) বিভিন্ন ফিৎনা-ফাসাদ অথবা (পরকালে) মর্মান্তিক আযাব' *(নূর ২৪/৬৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নতুন কিছু সৃষ্টি করল, যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যত'।[৪৭১] তিনি বলেন, مُحَمَّدٌ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ 'মুহাম্মাদ হ'লেন মানুষের মাঝে সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড'।[৪৭২] ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, إِنَّ كُلَّ ما لم يَكُنْ على عهد رسولِ الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه دينًا لم يَكُنِ اليومَ دينًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমানকালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না *(আল-ইনছাফ, পৃঃ ৩২)*।

অতঃপর আমল কবুল হওয়ার শর্ত হ'ল তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ (عقيدة صحيحة) হওয়া (২) তরীকা সঠিক (طريقة صحيحة) হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল (إخلاص عمل)। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হওয়া *(যুমার ৩৯/২)*। মোটকথা শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস, ছহীহ সুন্নাহ্‌র অনুসরণ এবং শ্রুতি ও প্রদর্শনীমুক্ত ইখলাছ, এই তিনটির সমন্বয় ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিকটে বান্দার কোন সৎকর্মই কবুল হবে না এবং তাতে কোন ছওয়াবও সে পাবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ ، يَجْرِي عَلَيْهَا النَّاسُ يَتَّخِذُونَهَا سُنَّةً ، قَالُوا : وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ : إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ جُهَلاَؤُكُمْ ،

---

৪৭১. বুখারী হা/২৬৯৭, মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।
৪৭২. বুখারী হা/৭২৮১, মিশকাত হা/১৪৪।

وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ-

‘তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে যখন ফিৎনা (বিদ‘আত) তোমাদেরকে এমনভাবে ঘিরে নিবে যে, এই ফিৎনার মধ্যেই তোমাদের বড়রা বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বড় হবে। মানুষ বিদ‘আতের উপরেই চলতে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা সেটাকেই ‘সুন্নাত’ হিসাবে গ্রহণ করবে। লোকেরা বলল, এটা কখন হবে? তিনি বললেন, (ক) যখন তোমাদের আলেমগণ মৃত্যুবরণ করবেন ও মূর্খদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। (খ) যখন সাধারণ আলেমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু জ্ঞানী আলেমের সংখ্যা কমে যাবে। (গ) যখন নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে। (ঘ) যখন আখেরাতের কাজের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া তালাশ করবে এবং দ্বীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করবে’।[৪৭৩]

আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً- الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ‘তুমি বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব?’ ‘পার্থিব জীবনে যাদের সকল প্রচেষ্টা বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ধারণা করেছে যে, তারা সৎকর্ম করেছে’ *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

(৩) দাওয়াত (الدعوة الى الله) : আয়াতে বর্ণিত দু’টি সমাজগত গুণের প্রথমটি হ’ল ‘পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দেওয়া’ (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ)। এটি হ’তে হবে আল্লাহ্‌র পথে পরকালীন স্বার্থে এবং আল্লাহ প্রেরিত হক-এর দিকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা কার আছে, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে... *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ‘তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে মানুষকে আহ্বান কর এবং অবশ্যই তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الدِّينُ النَّصِيحَةُ ‘দ্বীন হ’ল নছীহত’।[৪৭৪] প্রত্যেক মুমিন পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দিবে। যেমন কাউকে শিরক কিংবা বিদ‘আত করতে দেখলে বা কোন ফরয কাজে গাফলতি দেখলে তাকে বলবে, হে ভাই! শিরক বর্জন কর। ফরয কাজটি আগে সম্পন্ন কর। অনুরূপভাবে কাউকে কোন অন্যায় করতে দেখলে বলবে, হে ভাই! আল্লাহকে ভয় কর! অন্যায় থেকে বিরত হও।

---

৪৭৩. দারেমী হা/১৮৫, হাকেম ৪/৫১৪-১৫, হা/৮৫৭০; আলবানী, ছহীহ তারগীব হা/১১১।
৪৭৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬, ৬৭।

الحق هو الشرع 'হক' হ'ল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا 'আর তুমি বল, হক আসে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। অতঃপর যার ইচ্ছা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যার ইচ্ছা তাতে অবিশ্বাস করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি...' (*কাহফ ১৮/২৯*)।

মানুষের সীমিত জ্ঞান কখনো চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছতে পারে না। তাই তাকে অহি-র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। যা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নবীগণের মাধ্যমে নাযিল হয়। ইসলামী শরী'আতে যা পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহ করেছে। স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা যা পসন্দ করে না। তাই দুনিয়াবী জৌলুসে মোহমুগ্ধ এবং চটকদার যুক্তি ও সন্দেহবাদে আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ বলেন, اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ– 'সত্য তোমার প্রভুর কাছ থেকে এসেছে। অতএব তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (*বাক্বারাহ ২/১৪৭; আলে ইমরান ৩/৬০; ইউনুস ১০/৯৪*)। তিনি বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَّعَدْلاً لاَ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– 'তোমার প্রভুর বাক্য সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাক্যের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (*আন'আম ৬/১১৫*)।

সংখ্যা কখনোই সত্যের মাপকাঠি নয়। সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَن سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ– 'আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিপদগামী করে দেবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে' (*আন'আম ৬/১১৬*)।

রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে মানবজাতির কাছে দু'টি আমানত রেখে গেছেন। তিনি বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তুকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[৪৭৫]

অতএব 'হক'-এর ব্যাখ্যা রাসূল (ছাঃ) নিজেই দিয়ে গেছেন এবং নিজের নবুঅতী জীবনে সেই হক-এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দান করে গেছেন। যদি বিশ্বকে অন্যায়-অনাচার ও অশান্তির দাবানল থেকে বাঁচাতে হয়, তাহ'লে পরস্পরকে আল্লাহ প্রেরিত 'হক' তথা

---

৪৭৫. মুওয়াত্ত্বা মালেক; মিশকাত হা/১৮৬, সনদ হাসান।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিতে হবে, অন্য কিছুকে নয় বা তাতে কোনরূপ যোগ-বিয়োগ নয়।

দাওয়াতের ফযীলত : মানুষের নিকট হক-এর এই দাওয়াত দেওয়া ফরয। রাসূল (ছাঃ) এসেছিলেন 'আল্লাহ্‌র পথের দাঈ' হিসাবে (*আহযাব ৩৩/৪৬*)। তিনি বলেন, (১) بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً– 'একটিমাত্র আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে মানুষের নিকট পৌঁছে দাও...।'[৪৭৬] (২) তিনি আরো বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِله 'কেউ যদি কোন নেক কাজের পথনির্দেশ দেয়, সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য ছওয়াব পায়'।[৪৭৭]

(৩) রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ– 'যদি তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে একজন লোককেও আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন, তবে সেটা তোমার জন্য সর্বোত্তম লাল উট কুরবানীর চাইতে উত্তম হবে'।[৪৭৮]

(৪) দাওয়াত এককভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে দিতে হবে। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ– 'বল! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

(৫) দাওয়াত সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بعقَابه 'যখন মানুষ অন্যায়কর্ম হ'তে দেখে, অথচ তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে না। আল্লাহ সত্বর তাদের সকলের উপর তার বদলা নিবেন।' তিনি বলেন, কোন সম্প্রদায়ে যখন পাপ ছড়িয়ে পড়বে এবং সেই সমাজে ভাল লোকের সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা তা প্রতিরোধের কোন চেষ্টা নিবে না, তখন তাদের সকলের উপর আল্লাহ ব্যাপক গযব নামিয়ে দিবেন'।[৪৭৯]

(৬) তিনি বলেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ

৪৭৬. বুখারী; মিশকাত হা/১৯৮।
৪৭৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯।
৪৭৮. বুখারী হা/৩০০৯, মুসলিম হা/২৪০৬, মিশকাত হা/৬০৮০ 'আলীর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।
৪৭৯. আহমাদ হা/১, তিরমিযী হা/২১৬৮, আবূদাঊদ হা/৪৩৩৮; মিশকাত হা/৫১৪২।

آثَامِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি কাউকে হেদায়াতের পথে ডাকে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এটি তাদের ছওয়াব থেকে কোন অংশ কমাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তার জন্য সেই পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এটি তাদের গোনাহ থেকে কোন অংশ কমাবে না'।[৪৮০]

(৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সফরে বের হয়েছেন। এমন সময় তাঁকে তাঁর ছোট ভাই কুছাম (মৃ: ৫৭ হিঃ) অথবা কন্যার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হ'ল। তিনি *ইন্না লিল্লাহ* পাঠ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ লজ্জা নিবারণ করেছেন। খাদ্য ও পোষাক দান করেছেন। ছওয়াবও আল্লাহ দিবেন। অতঃপর রাস্তার একপাশে গিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন এবং অনেকক্ষণ বসে রইলেন। অতঃপর সওয়ারীর দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় সূরা বাক্বারাহ ৪৫ আয়াতটি পাঠ করলেন। যার অর্থ 'তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর' *(ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর; বাক্বারাহ ২/৪৫)*। এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের গভীর নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ দাওয়াতের মাধ্যমেই দ্বীন বেঁচে থাকে।

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার অথবা সপ্তাহে বেশীর বেশী দুই বা তিনদিন মানুষকে ডেকে মজলিস করে দাওয়াত দিতে বলতেন।[৪৮১] অনুরূপভাবে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবারে দাওয়াত দিতেন।[৪৮২]

(৪) ছবর (الصبر) : সমাজগত গুণের দ্বিতীয়টি হ'ল, 'পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দেওয়া' (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'ধৈর্য্যশীল বান্দাদের বেহিসাব পুরস্কার দান করা হবে' *(যুমার ৩৯/১০)*।

'ছবর' অর্থ حبس النفس عما لا ينبغى فعله 'যে কাজ করা উচিৎ নয়, সে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা'। যেমন কোন রোগ-পীড়া বা বিপদাপদ হ'লে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া, হে ভাই! ছবর কর। এটি তাক্বদীর, যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ ছিল। দিশেহারা হয়ো না। আল্লাহ্র নিকটে এর উত্তম বদলা প্রার্থনা কর। যেমন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের সান্ত্বনা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তে বলেন, اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا 'হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য ধারণের পারিতোষিক দান কর

৪৮০. মুসলিম হা/২৬৭৪, মিশকাত হা/১৫৮।
৪৮১. বুখারী হা/৬৩৩৭, মিশকাত হা/২৫২।
৪৮২. বুখারী হা/৭০, মুসলিম হা/২৮২১, মিশকাত হা/২০৭ 'ইলম' অধ্যায়।

এবং আমাকে এর উত্তম প্রতিদান দাও'।[৪৮৩] এমনিভাবে ছালাতে জামা'আত থেকে গাফেল ব্যক্তিকে জামা'আতে উদ্বুদ্ধ করা, কৃপণ ব্যক্তিকে দানে উদ্বুদ্ধ করা, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে নাজী ফের্কাভুক্ত হবার ও সেকারণে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের উপদেশ দেওয়া, হারামে লিপ্ত ব্যক্তিকে হারাম থেকে বাধা দেওয়া ও হালাল-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি।

বস্তুতঃ হক-এর উপদেশ দিলে বা হক-এর পথে দাওয়াত দিলে বাতিল ক্ষেপে যাবে। তারা হকপন্থীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করার চেষ্টা করবে। তাদের উপরে নানাবিধ অত্যাচার চালাবে। এমতাবস্থায় হকপন্থী ব্যক্তিকে হক-এর উপরে দৃঢ় থেকে উপদেশ দান করতে হবে। কোন অবস্থাতেই হক থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না বা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করা যাবে না।

হক-এর অনুসারী হওয়ার অপরাধে বাতিলের পূজারী আবু জাহলদের অত্যাচারে নিগৃহীত বেলাল, খাব্বাব, খোবায়েব, আছেম, ইয়াসির পরিবার প্রমুখ সত্যসেবীগণ ছবর ও দৃঢ়তার যে অতুল্য নমুনা রেখে গেছেন, যুগে যুগে তা সকল হকপন্থীর জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে। ইয়াসির পরিবারের উপরে অমানুষিক নির্যাতনের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ব্যথাহত রাসূল (ছাঃ) সেদিন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে ছোট্ট একটি বাক্য উচ্চারণ করে বলেছিলেন, صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرْ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ 'ছবর কর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ'ল জান্নাত'।[৪৮৪] তপ্ত মরুর বুকে নির্যাতিত ইয়াসির পরিবারের ব্যথিত হৃদয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর এই সান্ত্বনাবাক্য সেদিন যে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিল, আজও তা হ'তে পারে যেকোন হকপন্থীর জন্য শক্তির আবেহায়াত। তবে এই ছবর সর্বাবস্থায় নয়। বরং শক্তি থাকলে যালেমের যুলুম প্রতিরোধ করতে হবে এবং এজন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জনের নির্দেশ এসেছে রাসূল (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনে *(আনফাল ৮/৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট উত্তম ও অধিক প্রিয় দুর্বল মুমিনের চাইতে'।[৪৮৫]

'ছবর' তিন প্রকার : (১) বিপদে ছবর করা (الصبر فى المصيبة) (২) পাপ থেকে ছবর করা অর্থাৎ বিরত থাকা (الصبر عن المعصية) (৩) আল্লাহ্র আনুগত্যে ছবর করা অর্থাৎ দৃঢ় থাকা (الصبر على الطاعة)। প্রথমটি 'আম' বা সাধারণ। দ্বিতীয়টি 'হাসান' বা সুন্দর এবং তৃতীয়টি 'আহসান' বা সবচেয়ে সুন্দর। যদি নাকি সবগুলি কেবল আল্লাহ্র ওয়াস্তে

৪৮৩. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮।
৪৮৪. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩২০; হাকেম হা/৫৬৪৬, হাকেম ছহীহ বলেছেন। যাহাবী চুপ থেকেছেন; বায়হাক্বী-শো'আবুল ঈমান হা/১৬৩১; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ১০৩, সনদ ছহীহ।
৪৮৫. মুসলিম হা/২৬৬৪, মিশকাত হা/৫২৯৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, ৪ অনুচ্ছেদ।

হয়। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সত্যের পথে উক্ত তিন প্রকার ছবর এখতিয়ার করার তাওফীক দান করেন- আমীন!

ছবরের ফযীলত :

(১) আল্লাহ বলেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيْرًا- مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيْرًا 'আর তাদের ছবরের পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন'। 'তারা সেখানে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা অতিশয় গরম বা অতিশয় শীত কোনটাই দেখবে না' *(দাহর ৭৬/১২-১৩)*।

(২) তিনি বলেন, وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ- الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ 'তুমি ধৈর্য্যশীলদের সুসংবাদ দাও'। 'যাদের উপর কোন বিপদ আসলে বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)*।

(৩) ছুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[৪৮৬]

(৪) আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَمًا ، خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا 'তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেওয়া হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ কক্ষ এজন্য যে, তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে'। 'সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল হিসাবে কতইনা উৎকৃষ্ট সেটি! *(ফুরক্বান ২৫/৭৫-৭৬)*।

(৫) আল্লাহ সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। যেমন তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে

---

৪৮৬. মুসলিম হা/২৯৯৯, মিশকাত হা/৫২৯৭।

থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। আর এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় কথা। আল্লাহ আমাদের ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

সর্বোত্তম জাতির বৈশিষ্ট্য :

অত্র সূরায় বর্ণিত চারটি গুণের মধ্যে শেষোক্ত দু'টি গুণ হ'ল মুসলমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেটি আল্লাহ অন্যত্র 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ– 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে এ জন্যে যে, তোমরা মানুষকে ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখবে' (*আলে ইমরান ৩/১১০*)।

মূলতঃ এ কাজটিই হ'ল সর্বোত্তম জাতি হওয়ার মাপকাঠি। সৎকাজের আদেশ বা উপদেশ দেওয়া তুলনামূলকভাবে কিছুটা সহজ হ'লেও অসৎকাজে নিষেধ ও বাধা দানের কাজটা সর্বদা কঠিন। আর সেজন্যেই সেখানে ছবরের কথা এসেছে। মুসলমানকে তার চিন্তায়-চেতনায়, কথায়-কর্মে, ব্যবহারে-আচরণে সর্বদা সর্বাবস্থায় ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ-এর মূলনীতি অনুসরণ করে চলতে হবে। তবেই সমাজ পরিশুদ্ধ হবে। দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা আসবে।

অবশ্য সবকিছুর মূলে হ'ল ঈমান। ঈমানে যদি ভেজাল বা দুর্বলতা বা কপটতা থাকে, তাহ'লে বাকী তিনটিতে তার প্রভাব পড়বেই। ঈমান হ'ল বীজ ও বাকীগুলি হ'ল ফলের মত। তাই ঈমান যত সঠিক, সুদৃঢ় ও সুন্দর হবে, আমল তত নিখুঁৎ, নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ হবে। তার পরকাল আরও সুন্দর হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও -আমীন!

আরেকটি যরূরী বিষয় এই যে, আল্লাহ এখানে أُوْصُوا 'তোমরা উপদেশ দাও' না বলে تَوَاصَوا 'তোমরা পরস্পরকে উপদেশ দাও' বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। তাই এটা স্পষ্ট যে, সূরা আছরের একটি বড় শিক্ষা হ'ল, মুক্তির জন্য কেবল নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের কর্ম সংশোধনের চেষ্টা করাও অবশ্য কর্তব্য। নইলে ক্ষতি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কেননা সমাজকে নিয়েই মানুষ। সমাজ অশুদ্ধ হয়ে গেলে ব্যক্তি একাকী শুদ্ধ থাকতে পারে না।

সারকথা :

দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য চারটি গুণ অর্জন করা অপরিহার্য। ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবর। যার কোন একটি গুণের কমতি থাকলে কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হ'তে পারবে না এবং ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

সূরা হুমাযাহ (নিন্দাকারী)

সূরা ক্বিয়ামাহ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০৪, আয়াত ৯, শব্দ ৩৩, বর্ণ ১৩৩।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য।	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿۱﴾
(২) যারা সম্পদ জমা করে ও তা গণনা করে	الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿۲﴾
(৩) সে ধারণা করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে	يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿۳﴾
(৪) কখনোই না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামাহ্র মধ্যে	كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۫ۖ﴿۴﴾
(৫) তুমি কি জানো 'হুত্বামাহ' কি?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ﴿۵﴾
(৬) এটি আল্লাহ্র প্রজ্বলিত অগ্নি	نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿۶﴾
(৭) যা কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে	الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ؕ﴿۷﴾
(৮) এটা তাদের উপরে বেষ্টিত থাকবে	اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿۸﴾
(৯) দীর্ঘ স্তম্ভ সমূহে।	فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۧ﴿۹﴾

বিষয়বস্তু :

আলোচ্য সূরায় দু'টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এক- পরনিন্দাকারী ও অর্থলিপ্সু ধনিক শ্রেণীর দুর্ভোগ ও ধ্বংসের কথা *(১-৩ আয়াত)*।

দুই- ঐসব লোকদের পরকালীন শাস্তির বর্ণনা *(৪-৯ আয়াত)*।

তাফসীর :

(১) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 'দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য'। আল্লাহ وَيْلٌ দিয়ে সূরা শুরু করেছেন। যা كلمة وعيد 'দুঃসংবাদবাহী শব্দ'। অর্থাৎ দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী ব্যক্তির জন্য। আবুল 'আলিয়াহ, হাসান বাছরী, রবী' বিন আনাস, মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বান বলেন, الهمزة الذى يَغْتاب ويَطْعن فى وجه الرجل، واللمزة

–الذى يغتابه من خلفه إذا غاب 'হুমাযাহ' হ'ল ঐ ব্যক্তি যে মানুষের মুখের উপরে নিন্দা করে ও অপদস্থ করে। আর 'লুমাযাহ' হ'ল ঐ ব্যক্তি যে পিছনে নিন্দা করে তার অনুপস্থিতিতে'। তবে মুক্বাতিল এর বিপরীত বলেছেন। অর্থাৎ হুমাযাহ পিছনে এবং লুমাযাহ সম্মুখে নিন্দাকারী'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, المشّاؤون بالنميمة والمفسدون بين الأحبة والباغون للبراء العيب– 'এরা ঐসব লোক যারা একের কথা অন্যকে লাগিয়ে চোগলখুরী করে। বন্ধুদের মধ্যে ভাঙন ধরায় ও নির্দোষ ব্যক্তিদের দোষ খুঁজে বেড়ায়'। ইবনু কায়সান বলেন, الهمزة الذى يؤذى جلساءه بسوء اللفظ واللمز الذى يكسر عينه على جليسه ويشير بعينه ورأسه وحاجبيه– 'হুমাযাহ' হ'ল, যে ব্যক্তি বৈঠকের সাথীদের মন্দ ভাষা বলে কষ্ট দেয় এবং 'লুমাযাহ' হ'ল, যে ব্যক্তি চোখ, মাথা বা ভ্রুর সাহায্যে বৈঠকের কোন সাথীর বিরুদ্ধে মন্দ ইঙ্গিত করে'। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا يَضْحَكُوْنَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ 'যারা পাপী তারা মুমিনদের দেখে হাসে'। 'আর যখন তারা তাদের নিকট দিয়ে যায়, তখন চোখ টিপে কটাক্ষ করে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৯-৩০)*।

هُمَزَةٍ-এর আভিধানিক অর্থ الكسر 'ভাঙ্গা'। আরবী বর্ণমালার 'হামযাহ' অক্ষরটি ভগ্ন হওয়ার কারণে ওটাকে 'হামযাহ' বলা হয়। لُمَزَةٍ অর্থ الطعن والضرب 'আঘাত করা বা প্রহার করা'। الهمز واللمز দু'টি সমার্থক শব্দ। যার অর্থ الدفع والضرب প্রতিরোধ করা ও প্রহার করা। সেখান থেকে হুমাযাহ ও লুমাযাহ কথাটি পরনিন্দাকারী ব্যক্তির জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে (*কুরতুবী, তানতাভী*)। কেননা এর ফলে মানুষের অন্তরে আঘাত করা হয় ও তাতে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

তবে ব্যবহারিকভাবে দু'টি শব্দের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেটি হ'ল الهمز بالفعل واللمز باللسان। অর্থাৎ همز হ'ল কাজের মাধ্যমে নিন্দা করা, আর لمز হ'ল কথার মাধ্যমে নিন্দা করা। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে মক্কার ধনকুবের অলীদ বিন মুগীরাহ্র চোগলখুরী চরিত্র তুলে ধরে আল্লাহ বলেন, هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ 'সে পিছনে নিন্দা করে এবং একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়' (*ক্বলম ৬৮/১১*)। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসাবে মুনাফিক ও দুনিয়াপূজারীদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ–

'তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা ছাদাক্বা বণ্টনে তোমাকে পিছনে দোষারোপ করে। তারা কিছু পেলে খুশী হয়, আর না পেলে ক্ষুব্ধ হয়' *(তওবা ৯/৫৮)*।

আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিন্দাকারী মক্কার নেতা আখনাস বিন শারীক্ব, অলীদ বিন মুগীরাহ, উবাই ইবনে খালাফ প্রমুখের উদ্দেশ্যে নাযিল হ'লেও *(কুরতুবী)* এর বক্তব্য সর্বযুগের সকল পরনিন্দাকারীর জন্য প্রযোজ্য।

(২) اَلَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ 'যারা মাল জমা করে ও তা গণনা করে'।

অর্থ كنز المال و لم ينفقه فى وجوه البر لله 'মাল জমা করে এবং তা আল্লাহ্র জন্য কোন সৎকর্মে ব্যয় করে না'। মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব বলেন, ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان بالليل نام كأنه جيفة– 'দিনের বেলায় মাল তাকে গাফেল রাখে এই মাল ঐ মাল করে। আর রাতের বেলায় সে ঘুমে মরা লাশের মত পড়ে থাকে' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ সে কেবল টাকার পিছনে ছুটেই জীবন শেষ করে। রূহের খোরাক দেয় না। আল্লাহ্র হক আদায় করে না। ইবাদতের জন্য তার সময় জোটে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَجَمَعَ فَأَوْعَى 'সে সম্পদ জমা করে ও তা আগলে রাখে' (*মা'আরেজ ৭০/১৮*)। অত্র আয়াতে পুঁজিবাদীদের প্রচণ্ডভাবে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যাকাত আদায় ও প্রয়োজনীয় দানশীলতা বজায় রেখে ভবিষ্যতের জন্য মাল সঞ্চয় করা দোষণীয় নয়। বরং দোষণীয় হ'ল মাল উপার্জন ও সঞ্চয় করাকেই মুখ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করা ও সেই চিন্তায় জীবনপাত করা।

(৩) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ 'সে ধারণা করে যে, মাল তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে'।

এখানে أَخْلَدَهُ অর্থ দু'টো হ'তে পারে اخلد ذكره او طال عمره 'তার স্মৃতি চিরস্থায়ী হবে অথবা তার হায়াত দীর্ঘ হবে'।

টাকা থাকলে স্বাস্থ্য-সুখ সবই ঠিক থাকবে এবং সে দুনিয়াতে চিরস্থায়ী হবে, এমন এক উদ্ভট ধারণা ধনলিপ্সু কৃপণ লোকেরা মনের মধ্যে লালন করে থাকে। অথচ সে যদি কৃপণ হয়, তাহ'লে তার দুর্নামটাই চিরস্থায়ী হয়। যেমন কৃপণ সেরা ক্বারূণের দুর্নাম। পক্ষান্তরে যদি যে দানশীল হয়, তাহ'লে তার সুনাম মানুষের মুখে মুখে থাকে। যেমন হাতেম তাঈ, আবুবকর, ওমর, ওছমান (রাঃ), হাজী মুহসিন প্রমুখ। পরপর বর্ণিত দু'টি আয়াতে আল্লাহ বস্তুবাদী ও দুনিয়াপূজারীদের অবাস্তব উচ্চাকাংখার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এবং তাদের ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, তারা কি ভেবেছে যে, তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ায় চিরস্থায়ী করে রাখবে? ইকরিমা বলেন, أى يزيد فى

عمره؟ 'সে কি ভেবেছে যে, তার ধন-সম্পদ তার আয়ু বৃদ্ধি করে দেবে'? এখানে أَخْلَدَهُ অতীতকালের ক্রিয়াপদ হ'লেও এর অর্থ হবে ভবিষ্যৎকালের। যেমন বলা হয়ে থাকে, هلك والله فلان ودخل النار اى يدخل 'আল্লাহ্র কসম! সে ধ্বংস হয়েছে এবং জাহান্নামে গেছে। অর্থ সে জাহান্নামে যাবে' (*কুরতুবী*)। অতএব আয়াতের অর্থ হবে, সে কি ভেবেছে যে, তার মাল তাকে ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী করে রাখবে বা তাকে দীর্ঘজীবী করবে?

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ- 'মৃত ব্যক্তির সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু'জন ফিরে আসে ও একজন তার সাথে থেকে যায়। সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়'।[৪৮৭]

আমল যদি পাপের হয়, তাহ'লে ঐ আমলের কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। অর্থগৃধ্নু কৃপণ ব্যক্তি, যে তার অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করেনি, কেবলই সঞ্চয় করেছে, তার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

'আর যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও'। 'সেদিন জাহান্নামের আগুনে মালগুলি উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে (এবং বলা হবে,) এগুলো সেই মাল, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। অতএব এখন তোমাদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ করো' (*তওবা ৯/৩৪-৩৫*)।

অত্র আয়াতে পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা এ অর্থনীতি মানুষকে অর্থনৈতিক পশুতে পরিণত করে। টাকার মানদণ্ডে উঁচু-নীচু ও ন্যায়-অন্যায় বিচার করা হয়। পুঁজিবাদী ব্যক্তি ও সরকার পুঁজির স্বার্থে যেকোন অন্যায় করতে প্রস্তুত থাকে। আধুনিক বিশ্বে বড় বড় যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে, সব কেবলই

৪৮৭. বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হা/২৯৬০; তিরমিযী হা/২৩৭৯; মিশকাত হা/৫১৬৭।

পুঁজিবাজার বৃদ্ধির স্বার্থে। আজকের পৃথিবীতে যে প্রকট খাদ্যাভাব চলছে, তার জন্য সিংহভাগ দায়ী পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং মানুষের পুঁজিবাদী মানসিকতা ও বিশ্বব্যাপী চক্রবৃদ্ধিহারে সূদী কারবারের ব্যাপকতা। যা কেবল অন্ধ দুনিয়াপূজারই তিক্ত ফল মাত্র।

(৪) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ 'কখনোই না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে 'হুত্বামাহ্'র মধ্যে'। অর্থ حَقًّا لَيُطْرَحَنَّ 'অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে'।

نَبَذَ يَنْبِذُ نَبْذًا 'নিক্ষেপ করা'। এই শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্র প্রচণ্ড ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছে। كَلاَّ হ'ল كلمة ردع প্রত্যাখ্যানকারী অব্যয়। অর্থাৎ ধনলিপ্সু কাফেররা যা ধারণা করে, সেটা কখনোই হবার নয়। ওমর বিন আব্দুল্লাহ (গুফরাহ্র গোলাম) বলেন, আল্লাহ পাক যেখানেই كَلاَّ বলেন, সেখানে তার অর্থ হবে যেন তিনি বলছেন, كَذَبْتَ 'তুমি মিথ্যা বলেছ' (*কুরতুবী*)। অতএব كَلاَّ অর্থ حَقًّا لَيُنْبَذَنَّ 'অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে'। অথবা উহ্য শপথের জওয়াব, وَاللهِ لَيُنْبَذَنَّ আল্লাহ্র কসম! সে নিক্ষিপ্ত হবে'।

এখানে 'কখনোই না' বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, ধন-সম্পদ কাউকে চিরজীবী বা দীর্ঘজীবী করে না। বরং মাল ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তার নেক আমল বেঁচে থাকে। এই নেক আমল বা সৎকর্ম তাকে যেমন দুনিয়াতে সুনাম-সুখ্যাতির সাথে বাঁচিয়ে রাখে, আখেরাতেও তেমনি তার সাথী হয় এবং তার জান্নাতের অসীলা হয়।

الْحُطَمَةِ একটি জাহান্নামের নাম। الحطمة هى التى تحطم الشئ اى تفتته 'যা বস্তুকে পিষ্ট করে' অর্থাৎ পিষ্টকারী। حَطَمَ يَحْطِمُ حَطْمًا অর্থ كَسَرَ يَكْسِرُ كَسْرًا 'ভেঙ্গে ফেলা'। সকল জাহান্নামই পিষ্টকারী। কিন্তু হুত্বামাহ জাহান্নামের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যেজন্য এভাবে বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে। ইবনু কাছীর (রহঃ) জাহান্নামের আটটি নাম উল্লেখ করেছেন। যথা : নার, জাহীম, সাক্বার, জাহান্নাম, হাভিয়াহ, হাফেরাহ, লাযা, হুত্বামাহ *(নাযে'আত ১০ আয়াতের তাফসীর)*।

(৫) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ 'তুমি কি জানো 'হুত্বামাহ' কি?

প্রশ্নবোধক বাক্যের মাধ্যমে হুত্বামাহ জাহান্নামের ভয়ংকর রূপ বুঝানো হয়েছে। এই বিশেষ ও কঠিনতম আযাবের জাহান্নামেই মাল সঞ্চয়কারী ও গণনাকারী ধনলিপ্সু পুঁজিবাদী লোকদের শাস্তি দেয়া হবে।

(৬) نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ 'এটি আল্লাহ্র প্রজ্বলিত অগ্নি'।

এটি পূর্ববর্তী আয়াতের জওয়াব। এখানে نَارُ اللهِ বলে জাহান্নামকে আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধ করার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, শাস্তি পাওয়ার হকদার ব্যক্তিই মাত্র শাস্তি পাবে। যা হবে ন্যায়বিচারমূলক শাস্তি (عقوبة عدل)। এটি আদৌ অবিচারমূলক শাস্তি (عقوبة جور) নয়। যেমনটি দুনিয়ায় হয়ে থাকে। শক্তিশালী যালেমরা দুনিয়ায় পার পেয়ে যায়। আর দুর্বল মযলূম সর্বদা নির্যাতিত হয়। তাই ন্যায়বিচারের দাবী এটাই যে, ক্বিয়ামতের দিন এরা কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হউক। আর আল্লাহ সেটাই দিবেন।

وَقَدَ يَقِدُ وَقْدًا وُقُوْدًا অর্থ 'প্রজ্বলিত হওয়া'। সেখান থেকে مُوْقَدَة 'প্রজ্বলিত'।

সকল জাহান্নামই আল্লাহ্র সৃষ্ট এবং সকল জাহান্নামই প্রজ্বলিত অগ্নি। অথচ হুত্বামাহ্র বেলায় 'আল্লাহ্র' এবং 'প্রজ্বলিত' বলার কারণ হ'ল এর বিশেষ ও ভয়ংকর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা। কুরতুবী বলেন, এ জাহান্নামের আগুন হাযার হাযার বছর ধরে জ্বালানো হয়েছে এবং যা কখনো নিভেনি। এর দ্বারা জাহান্নাম ও জান্নাত যে সৃষ্ট, সেটা বুঝা যায়।

(৭) اَلَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ 'যা কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে'।

الْأَفْئِدَة একবচনে فؤاد অর্থ হৃদয় বা কলিজা। اطلع على الشئ اى أشرف عليه او وصل اليه 'ঝুঁকে পড়া', পৌঁছে যাওয়া'।

تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَة অর্থ تَهجُ ألمها على القلوب 'আগুনের উত্তাপ কলিজা জ্বালিয়ে দিবে'। অর্থাৎ আগুন তার সারা দেহ খেয়ে ফেলবে। এমনকি তার কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু সে মরবে না। কেননা আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَى 'সেখানে তারা মরবেও না এবং বাঁচবেও না' (*ত্বোয়াহা ২০/৭৪; আ'লা ৮৭/১৩*)। এখানে নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা' বলার কারণ হ'ল এই যে, এটিই হ'ল দেহের সবচেয়ে নরম স্থান এবং আগুন যখন কলিজায় পৌঁছে যায়, তখন মানুষ মারা যায়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি শাস্তির কঠোরতায় মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হবে। কিন্তু মরবে না, যাতে সে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। আবার বাঁচবেও না যাতে সে স্বস্তি লাভ করে।

(৮) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ 'এটা তাদের উপরে বেষ্টিত থাকবে'।

وَصَدَ يَصِدُ وَصْدًا অর্থ 'দৃঢ় হওয়া'। أَوْصَدَ أوصد عليه اى ضيَّق عليه 'সংকীর্ণ হওয়া'। أَغْلَقَهُ الْبَابَ অর্থ 'দরজা বন্ধ করা'। সেখান থেকে مُّؤْصَدَةٌ অর্থ مطبقة مغلقة الأبواب لا

لهم منها مخلص 'চারদিক থেকে দরজা বন্ধ থাকবে, সেখান থেকে বের হবার কোন পথ পাবে না'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ 'যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হ'তে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর বলা হবে, আগুনের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করো, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে' *(সাজদাহ ৩২/২০)*। চলন্ত গাড়ীতে বা কোন গৃহে আগুন ধরে গেলে বদ্ধ দরজার মধ্যে জীবন্ত মানুষ যেভাবে পুড়ে কয়লা হয়ে যায়, এখানে সেটি কল্পনা করা যায়।

(৯) فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ 'দীর্ঘ স্তম্ভ সমূহে'।

অর্থাৎ তাদেরকে লম্বা লম্বা খুঁটিতে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। এখানে في অর্থ با অর্থাৎ مؤصدة بعمد ممددة লম্বা লম্বা খুঁটির সাথে দৃঢ়ভাবে বাঁধা হবে *(কুরতুবী)*। عَمَدٌ وعُمُدٌ একবচনে عَمُوْدٌ وَعِمَادٌ অর্থ খুঁটি (*কুরতুবী*)। যেমন আল্লাহ বলেন, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا 'তিনি আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভসমূহ ব্যতিরেকে, যেটা তোমরা দেখছ' *(লোকমান ৩১/১০; রা'দ ১৩/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ 'মূলবস্তু হ'ল ইসলাম। আর তার খুঁটি হ'ল ছালাত এবং শিখর হ'ল জিহাদ'।[৪৮৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। তারপর খুঁটির সাথে বাঁধা হবে এবং গলায় বেড়ীবদ্ধ করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে' (*ইবনু কাছীর*)। এভাবে চূড়ান্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। পুঁজিবাদী কৃপণরা সাবধান হবে কি?

সারকথা :

পরনিন্দাকারী ও অর্থলিপ্সু ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কেবল ধ্বংসই রয়েছে। পরচর্চাকারীরা মানুষের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে এবং পুঁজিবাদীরা মানুষের প্রাপ্য খাদ্য ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ও হত্যা করে। তাই উভয়ের জন্য পরকালে হুত্বামাহ্র কঠিন শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে।

৪৮৮. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৬১৬, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৯; ছহীহাহ হা/১১২২।

সূরা ফীল (হাতি)

সূরা কাফেরূন-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০৫, আয়াত ৫, শব্দ ২৩, বর্ণ ৯৬।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

(১) তুমি কি শোনো নি, তোমার প্রভু হস্তীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন?	اَلَمۡ تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ ؕ﴿۱﴾
(২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?	اَلَمۡ یَجۡعَلۡ کَیۡدَهُمۡ فِیۡ تَضۡلِیۡلٍ ۙ﴿۲﴾
(৩) তিনি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি	وَّ اَرۡسَلَ عَلَیۡهِمۡ طَیۡرًا اَبَابِیۡلَ ۙ﴿۳﴾
(৪) যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল মেটেল পাথরের কংকর	تَرۡمِیۡهِمۡ بِحِجَارَۃٍ مِّنۡ سِجِّیۡلٍ ۪ۙ﴿۴﴾
(৫) অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণসদৃশ।	فَجَعَلَهُمۡ کَعَصۡفٍ مَّاۡکُوۡلٍ ٪﴿۵﴾

বিষয়বস্তু :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের ৫০ বা ৫৫ দিন পূর্বে[৪৮৯] ইয়ামনের খ্রিষ্টান গভর্ণর আবরাহা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হস্তীবাহিনীসহ বিশাল সৈন্যদল নিয়ে কা'বাগৃহ ধ্বংস করার জন্য এসেছিলেন। আল্লাহ পাক পক্ষীকুল পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করে ঐ বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেন। অত্র সূরায় অতীব সংক্ষেপে সেই ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে। যাতে মানুষ নিজেদের শক্তির বড়াই না করে এবং আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনে।

ঘটনা :

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, কা'বাগৃহকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী হস্তীওয়ালাদেরকে পর্যুদস্ত করে আল্লাহ পাক কুরায়েশদের উপরে একটি বড় অনুগ্রহ করেছিলেন। অথচ ঐ সময় কুরায়েশরা (হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনে হানীফের অনুসারী হবার দাবীদার হলেও) তারা ছিল মূর্তিপূজারী। পক্ষান্তরে হস্তীওয়ালারা (ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার হ'লেও) তারা ছিল ত্রিত্ববাদী নাছারা। একই বছরে প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ফলে এটি ছিল অদূর ভবিষ্যতে নবী আগমনের পূর্ব সংকেত (من باب الإرهاص)। অবস্থা যেন এটা বলে দিচ্ছিল যে, হে

---

৪৮৯. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৫১।

কুরায়েশগণ! হাবশীদের উপরে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আমরা তোমাদের সাহায্য করিনি। বরং বায়তুল্লাহ হেফাযতের জন্য আমরা সেদিন তোমাদের সাহায্য করেছিলাম। যার সম্মান ও মর্যাদা আমরা আরও উন্নীত করব সত্বর তোমাদের মাঝে নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণের মাধ্যমে। যিনি হবেন সর্বশেষ নবী। তাঁর উপরে আল্লাহ্র অসংখ্য অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হৌক!'

ঘটনা এই যে, ইতিপূর্বে আমরা সূরা বুরূজের তাফসীরে গর্তওয়ালাদের কাহিনীতে বলে এসেছি যে, ইয়ামনের হিমইয়ারী গোত্রের সর্বশেষ শাসক ইউসুফ যূ-নওয়াস (يوسف ذو نواس) স্রেফ তাওহীদবাদী নাছারা হওয়ার কারণে একই দিনে বিশ হাযার (মতান্তরে সত্তুর হাযার) ঈমানদার নর-নারী ও শিশুকে আগুনের দীর্ঘ গর্তে জীবন্ত নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। যাহহাকের বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনাটিও ঘটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের চল্লিশ বছর পূর্বে (*কুরতুবী*)। অর্থাৎ তাঁর জন্মবর্ষে। গর্তওয়ালাদের সেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড থেকে দাঊদ যূ-ছা'লাবান (داؤد ذو ثعلبان) নামক একজন মাত্র ব্যক্তি কোনভাবে পালিয়ে বাঁচে এবং পার্শ্ববর্তী শাম (সিরিয়া)-এর খ্রিষ্টান বাদশাহ ক্বায়ছারের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন তাকে সাহায্য করার জন্য ক্বায়ছার ইয়ামনের নিকটবর্তী হাবশার শাসক নাজাশীর কাছে লিখিত নির্দেশ পাঠান। নাজাশী তখন আরিয়াত্ব ও আবরাহার (أرياط وأبرهة) নেতৃত্বে ইয়ামনে দু'দল সৈন্য পাঠান। তারা গিয়ে ইয়ামন দখল করেন এবং সেখানকার যালেম শাসক ইউসুফ যূ-নওয়াস সাগরে ডুবে আত্মাহুতি দেয়। তখন থেকে ইয়ামন হাবশার অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু অচিরেই দুই সেনাপতির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। তখন অধিক রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্য উভয়ে উভয়কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। যিনি জিতবেন তিনি শাসক হবেন। আরিয়াত্ব ছিলেন অধিক শক্তিশালী ও বিশালবপু। কিন্তু আবরাহা ছিল বেঁটে ও দুর্বল। ফলে আরিয়াত্বের তরবারির আঘাতে তার নাক-মুখ কেটে রক্তাক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় আবরাহার গোলাম আতাওদাহ (عَتَوْدَة) হামলা চালিয়ে আরিয়াত্বকে হত্যা করে। আবরাহা আহত অবস্থায় ফিরে আসেন ও পরে সুস্থ হয়ে ইয়ামনের একচ্ছত্র শাসক হন'। যুদ্ধে নাক-মুখ কাটা হওয়ার কারণেই তাকে 'আশরাম' (الأشرم) বলা হ'তে থাকে। তখন থেকে أبرهة الأشرم 'নাককাটা আবরাহা' নামে তিনি পরিচিত হন। তার পুরা নাম ছিল আবরাহা ইবনুছ ছাববাহ (أبرهة بن الصبَّاح) (*কুরতুবী*)।

আরিয়াত্বকে হত্যা করায় বাদশাহ নাজাশী আবরাহার উপরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে পত্র পাঠান। যাতে এই মর্মে শপথ করেন যে, 'সত্বর আমি তার এলাকা পর্যুদস্ত করব এবং তার কপাল ধূলি-ধূসরিত করব।' এই পত্র পেয়ে আবরাহা ভীত হয়ে কূটনীতির

আশ্রয় নেন। তিনি বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদিসহ এক থলে ইয়ামনের মাটি পাঠান এবং সেই সাথে নিজের নাক কেটে পাঠান (وجَزَّ ناصيته فأرسلها معه)। নাজাশী এটা পেয়ে বিস্মিত হন এবং খুশী হয়ে তাকে ক্ষমতায় বহাল রাখেন। বাদশাহকে লেখা চিঠিতে আবরাহা বলেন, ইয়ামনের মাটির থলি মাড়িয়ে আপনি আপনার শপথ ভঙ্গ করুন এবং সেই সাথে আমি আমার নাক কেটে পাঠালাম। আমি আপনার গোলাম ছিলাম এবং সর্বদা গোলাম থাকব (*ইবনু কাছীর, কুরতুবী*)। বাদশাহ তাকে ক্ষমতায় বহাল রাখার পর আবরাহা পুনরায় লিখেন যে, আমি আপনার জন্য ইয়ামনের মাটিতে এমন একটি গীর্জা বানাব, যার কোন তুলনা নেই। অতঃপর তিনি রাজধানী ছান'আ নগরীতে উক্ত গীর্জা নির্মাণ করেন। যা ছিল সে যুগের বিস্ময়। গীর্জাটি এত উঁচু ছিল যে, তাকালে মাথার টুপী পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'ত। সেজন্য আরবরা তার নাম দেয় 'কুল্লাইস' (القُلَّيس)।

অতঃপর আবরাহা চিন্তা করলেন যে, আরবদেরকে মক্কায় হজ্জ বাদ দিয়ে এখানে হজ্জ করাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ঘোষণা জারি করলেন যে, এবছর থেকে হজ্জ কা'বাগৃহের বদলে এই গীর্জায় হবে। তার এই ঘোষণা সর্বত্র দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। কুরায়েশরা রাগে ফেটে পড়ল। কথিত আছে যে, তাঁদের কেউ একজন এসে ঐ জাঁকজমকপূর্ণ 'কুল্লাইস' গীর্জায় গোপনে ঢুকে পায়খানা করে যায়। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, কুরায়েশদের একদল যুবক ঐ গীর্জায় ঢুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। যাতে গীর্জা পুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায় (*ইবনু কাছীর*)।

এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আবরাহা বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। কোন বর্ণনায় ২০ হাযার ও কোন বর্ণনায় ৬০ হাযার সৈন্যের কথা এসেছে। তবে শেষোক্ত বর্ণনাটি আরবী কবিতা থেকে নেওয়া (*কুরতুবী*)। আর সে যুগে কবিতাই ছিল ইতিহাসের বাহন। অতএব শেষোক্ত সংখ্যাটিই সঠিক বলে অনুমিত হয়। উক্ত বাহিনীর সাথে নাজাশীর পক্ষ হ'তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশালবপু হস্তীবাহিনী পাঠানো হয়। যার নেতৃত্বে ছিল 'মাহমূদ' নামক হাতিটি। হস্তীবাহিনীর সংখ্যা কেউ বলেছেন ১টি, কেউ বলেছেন ২টি, ৮টি বা ১২ টি বা তার বেশী। তবে 'মাহমূদ' ছিল এদের নেতা। বাকীরা মাহমূদের অনুগামী। এদের নেওয়া হয়েছিল এজন্য যে, লোহার শিকলের এক প্রান্ত কা'বার দেওয়ালে বেঁধে অন্য প্রান্ত হাতির ঘাড়ে বাঁধা হবে। অতঃপর হাতিকে হাঁকিয়ে দেয়া হবে, যাতে পুরা কা'বাগৃহ এক সাথে উপড়ে ভেঙ্গে পড়ে *(ইবনু কাছীর)*।

আবরাহার কা'বা অভিযানের খবর শুনে সর্বত্র আতংক ছড়িয়ে পড়ল। কিছু সাহসী মানুষ তাকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নিল। এদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন ইয়ামনের সাবেক শাসক বংশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা যূ-নফর (ذو نفر)। তিনি তার নিজ সম্প্রদায় এবং সমস্ত আরব জনগণকে বায়তুল্লাহ রক্ষার পবিত্র জিহাদে তার সাথে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান। ফলে বহু লোক তার পতাকাতলে সমবেত হয় এবং আবরাহার সাথে

যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু অবশেষে তারা পরাজিত হয়। যূ-নফর বন্দী হ'লেন। কিন্তু আবরাহা তাকে হত্যা না করে সঙ্গে নিলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর খাশ'আম এলাকা অতিক্রমের সময় নুফায়েল বিন হাবীব আল-খাশ'আমী (نفيل بن حبيب الخشعمى) তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে বাধা দিলেন। কিন্তু তুমুল যুদ্ধের পর তারাও পরাজিত হ'ল। নুফায়েলকে হত্যা না করে আবরাহা তাকেও সাথে নিলেন পথপ্রদর্শক হিসাবে। অতঃপর ত্বায়েফ অতিক্রম করার সময় সেখানকার প্রসিদ্ধ ছাক্বীফ গোত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল। কিন্তু সেটা বায়তুল্লাহ্‌র স্বার্থে ছিল না, বরং তাদের 'লাত' প্রতিমা রক্ষার স্বার্থে ছিল। কারণ তারা ভেবেছিল যে, আবরাহা তাদের মূর্তি ধ্বংস করার জন্য আসছেন। পরে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারল এবং আবরাহার সম্মানার্থে একজন দক্ষ পথপ্রদর্শক হিসাবে 'আবু রিগাল' (أبو رغال) নামক জনৈক ব্যক্তিকে আবরাহার সাথে পাঠালো। তার নির্দেশনা অনুযায়ী আবরাহা মক্কার অদূরবর্তী 'মুগাম্মিস' (المغمِّس) নামক স্থানে অবতরণ করলেন। অতঃপর তার বাহিনী মক্কার উট-দুম্বা ইত্যাদি গবাদিপশু লুট করা শুরু করল। যার মধ্যে মক্কার নেতা আব্দুল মুত্ত্বালিবের দু'শো উট ছিল।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পথপ্রদর্শক আবু রিগাল মুগাম্মিসে অবতরণ করেই মৃত্যুবরণ করল। সেই থেকে আরবরা তার কবরে পাথর ছুঁড়ে মারে। যেমন জনৈক কবি বলেন,

وأرجُمُ قبره فى كل عام + كرجم الناس قبر أبي رغال

'আমি তার কবরে প্রতি বছরে পাথর মেরে থাকি। যেমন লোকেরা আবু রিগালের কবরে পাথর ছুঁড়ে মারে' (*কুরতুবী*)। এভাবে 'আবু রিগাল' কুখ্যাত হয়ে আছে।

অতঃপর আবরাহা হুনাত্বাহ আল-হিমইয়ারী (حُناطة الحِمْيرى) নামক এক ব্যক্তিকে তার প্রতিনিধি হিসাবে মক্কায় পাঠান এই কথা বলে যে, তিনি যেন মক্কার নেতাকে গিয়ে বলেন যে, আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা এসেছি কা'বাগৃহ ধ্বংস করতে। যদি তারা বাধা না দেন, তাহ'লে তাদের নেতা যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। হুনাত্বাহ গিয়ে মক্কার নেতা আব্দুল মুত্ত্বালিব-কে সব কথা খুলে বললেন। জওয়াবে আব্দুল মুত্ত্বালিব বললেন, আবরাহার বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এটি আল্লাহ্‌র ঘর ও তার বন্ধু ইবরাহীমের ঘর। আল্লাহ তার গৃহের হেফাযত করবেন। অতঃপর তিনি তার কয়েকজন পুত্রসহ আবরাহার কাছে গেলেন। আব্দুল মুত্ত্বালিবের সুশ্রী, সুঠাম, সৌম্যকান্তি দেখে আবরাহা শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে তার আসন থেকে নেমে এসে তার পাশে বিছানায় বসেন এবং পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখে দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলেন। আব্দুল মুত্ত্বালিব তাঁর লুট করা দু'শো উট ফেরত চাইলেন। কিন্তু কা'বাগৃহ সম্পর্কে কিছু বললেন না। এতে বিস্মিত হয়ে আবরাহা বললেন, 'আপনাকে দেখে আমি শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি বিস্মিত হচ্ছি এজন্য যে,

আপনি কেবল আপনার স্বার্থের কথা বললেন। অথচ যে কা'বাগৃহ আমরা ধ্বংস করতে এসেছি, যা আপনার ও আপনার পিতৃপুরুষের ইবাদতগৃহ, তার সম্পর্কে আপনি কিছুই বললেন না'। তখন জবাবে আব্দুল মুত্ত্বালিব বললেন, أَنَا رَبُّ الْإِبِلِ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيْهِ 'আমি মালিক উটের। আর ঐ গৃহের একজন মালিক আছেন, যিনি তাকে রক্ষা করবেন' *(তানতাভী)*। আবরাহা বললেন, مَا كَانَ لِيَمْتَنِعَ مِنِّي 'আজ আমার হাত থেকে ওকে রক্ষা করার কেউ নেই'। আবদুল মুত্ত্বালিব বললেন, أَنْتَ وَذَاكَ 'এটা আপনার ও তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) ব্যাপার'।

আবদুল মুত্ত্বালিব তাঁর দু'শো উট নিয়ে ফিরে এলেন। অতঃপর সবাইকে মক্কা থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিতে বললেন। তারপর তিনি নিজে ও একদল সাথীসহ গিয়ে কা'বাগৃহের দরজার চৌকাঠ ধরে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনায় তিনি বলেন,

يَا رَبِّ لا أَرْجُوْ لَهُمْ سِوَاكَا + يَا ربِّ فَامْنَعْ مِنهُمْ حِمَاكَا

إِنَّ عَدُوَّ البَيْتِ مَنْ عَادَاكَا + إِمْنَعْهُم أَنْ يُّخَرِّبُوْا قِرَاكَا

'হে প্রভু! ওদের প্রতিরোধের জন্য তুমি ব্যতীত কারু কাছে আমি কিছুই আশা করি না। হে প্রভু! ওদের থেকে তুমি তোমার হারামকে রক্ষা কর'। 'নিশ্চয়ই কা'বাগৃহের শত্রু তারাই যারা তোমার শত্রু। তোমার এই জনপদকে ধ্বংস করা থেকে তুমি ওদের বাধা দাও।[৪৯০] এছাড়া আব্দুল মুত্ত্বালিবের আরও দো'আ বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আব্দুল মুত্ত্বালিব ও তাঁর সাথী নেতৃবর্গ এবং মুত্বইম বিন 'আদী ও অন্যান্য নেতাগণ হেরা পাহাড়ের গুহাসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং অশ্রুসজল নেত্রে তাকিয়ে থাকেন আবরাহা বাহিনীর অবস্থা দেখার জন্য *(ইবনু কাছীর)*।

অতঃপর আবরাহা যখন মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ নেন এবং হাতিকে মক্কার দিকে হাঁকাতে চেষ্টা করেন, তখন হাতি বসে পড়ে। ইবনু ইসহাক বলেন, নুফায়েল বিন হাবীব আল-খাশ'আমী, যাকে পথপ্রদর্শক হিসাবে আবরাহা সাথে এনেছিলেন, তিনি হাতিকে উদ্দেশ্য করে তার কান ধরে বলেন,

أُبْرُكْ مَحْمُوْدُ أَوِ ارْجِعْ رَاشِدًا مِنْ حَيْثُ جِئْتَ، فَإِنَّكَ فِيْ بَلَدِ اللهِ الْحَرَامِ- 'বসে পড়ো মাহমূদ অথবা যেখান থেকে এসেছ, সোজা সেখানে ফিরে যাও। কেননা তুমি আল্লাহ্‌র পবিত্র শহরে এসেছ'। অতঃপর শত চেষ্টা করেও হাতিকে মক্কা মুখো করা যায়নি। অথচ ইয়ামন মুখো করা হলেই হাতি দৌড় দেয়। মক্কা মুখো করলেই সে বসে পড়ে।

৪৯০. তাফসীর ত্বাবারী ৩০/১৮৫ পৃঃ।

ইতিমধ্যে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অচেনা পাখি আসতে শুরু করে। যাদের প্রত্যেকের মুখে একটি ও দু'পায়ে দু'টি কংকর ছিল, যা ডাল ও গমের মত সাইজের। এই কংকর যার মাথায় পড়েছে, সে ধ্বংস হয়েছে। সবাইকে লাগেনি। কিছু আঘাতপ্রাপ্তদের মরতে দেখে বাকী সবাই দিগ্বিদিক ছুটে পালাতে শুরু করে। এই দৃশ্য দেখে পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া নুফায়েল বিন হাবীব বলে ওঠেন,

أَيْنَ الْمَفَرُّ والإلَهُ الطَّالِبُ + والْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

'কোথায় পালাচ্ছ, খোদ আল্লাহ আজ তোমাদের ধরেছেন। নাককাটা (আবরাহা) পরাজিত। সে বিজয়ী নয়'। এছাড়াও নুফায়েল-এর আরও কবিতা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু ইসহাক বলেন, আবরাহা বাহিনী মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়ামন পর্যন্ত পথে পথে মরতে মরতে যায় এবং আবরাহা তার প্রিয় রাজধানী ছান'আ শহরে পৌঁছে লোকদের কাছে আল্লাহ্র গযবের ঘটনা বলার পর মৃত্যুবরণ করে। এ সময় তার বুক ফেটে কলিজা বেরিয়ে যায়'। মুক্বাতিল বিন সুলায়মান বলেন, কুরায়েশরা ঐদিন বহুমূল্য গণীমতের মাল হস্তগত করে। একা আবদুল মুত্ত্বালিব যা স্বর্ণ পান, তাতে তাঁর সমস্ত পাত্র পূর্ণ হয়ে যায়। ইবনু ইসহাক বলেন, এর পরপরই আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমত স্বরূপ কুরায়েশদের গৃহে তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন (*ইবনু কাছীর*)। তিনি বলেন, আবরাহা বাহিনীর এই মর্মান্তিক পরিণতির ফলে সমগ্র আরবে কুরায়েশদের সম্মান ও মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তারা তাদেরকে أَهْلُ اللهِ 'আল্লাহওয়ালা' বলতে থাকে। তারা বলতে থাকে যে, قَاتَلَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكَفَاهُمْ مَئُونَةَ عَدُوِّهِمْ 'আল্লাহ তাদের পক্ষে লড়াই করেছেন এবং তাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন (*কুরতুবী*)। এই ঘটনার পর দশ বছর মক্কার লোকেরা মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকে।[৪৯১]

হস্তীওয়ালাদের এই ঘটনা আরবদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে অনেকে জীবিত ছিলেন। যেমন হাকীম বিন হেযাম, হাতেব বিন আব্দুল ওযযা, নওফেল বিন মু'আবিয়া প্রমুখ। যারা প্রত্যেকে ১২০ বছর করে বয়স পেয়েছিলেন। ৬০ বছর জাহেলিয়াতে ও ৬০ বছর ইসলামে। এছাড়া উক্ত ঘটনার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে অনেকগুলি ছহীহ হাদীছ এসেছে। যেমন হোদায়বিয়ার দিন রাসূল (ছাঃ)-এর উষ্ট্রী 'ক্বাছওয়া' বসে পড়লে তিনি বলেন, حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ 'হস্তীবাহিনীকে বাধা দানকারী (আল্লাহ) তাকে বাধা দিয়েছেন'।[৪৯২]

---

৪৯১. হাকেম ২/৫৩৬ হা/৬৮৭৭; ছহীহাহ হা/১৯৪৪।
৪৯২. বুখারী হা/২৭৩১, ২৭৩২।

আলোচ্য সূরা ফীলে আল্লাহ পাক হারাম শরীফের অসীলায় কিভাবে কুরায়েশদের নিরাপত্তা দান করেন, সেকথা কুরায়েশদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং স্বীয় নবীসহ বিশ্ববাসীকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

তাফসীর :

(১) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ 'তুমি কি শোনো নি তোমার প্রভু হস্তীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন'?

أَلَمْ تَرَ অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَلَمْ تَسْمَعْ 'তুমি কি শোননি?' ফার্রা বলেছেন ألم تُخْبَر 'তুমি কি খবর পাওনি?' মুজাহিদ বলেছেন أَلَمْ تَعْلَمْ 'তুমি কি জানো না?' কোন নিশ্চিত বিষয় জানানোর জন্য এরূপ বাকরীতি প্রয়োগ করা হয়। শব্দটি প্রশ্নবোধক হ'লেও বক্তব্যটি নিশ্চয়তাবোধক। আবরাহার কা'বা অভিযান ও আল্লাহ্র গযবে তার ধ্বংসের কাহিনীটি আরবদের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। যদিও রাসূল (ছাঃ) সে ঘটনা দেখেননি, তবুও তা ছিল প্রশ্নাতীত একটি নিশ্চিত ঘটনা। أَصْحَابُ الْفِيْلِ বলতে আবরাহা বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে। অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর শক্তি-মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বান্দাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, এত বড় নিদর্শন দেখার পরেও؟ فَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُوْنَ 'তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা ঈমান আনো না?' (*কুরতুবী*)।

(২) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ 'তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?'

ইয়ামনী খ্রিষ্টান শাসকদের চক্রান্ত ছিল কা'বাগৃহকে নিশ্চিহ্ন করা এবং কুরায়েশদের ধ্বংস করা। কিন্তু তারা কোনটাই করতে পারেনি। বরং তারাই ধ্বংস হয়েছে। কা'বাগৃহ অক্ষত রয়ে গেছে এবং তাদের ফেলে যাওয়া বিপুল গণীমত পেয়ে কুরায়েশরা আরও সচ্ছল হয়েছে। কুরায়েশদের সম্মান সর্বত্র আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

فِي تَضْلِيْلٍ অর্থ فى إبطال وتضييع 'বাতিল ও ধ্বংস' (*কুরতুবী*)।

(৩) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيْلَ 'তিনি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি'।

এখানে طَيْرًا একবচন এলেও তার অর্থ বহুবচন এবং জাতিবোধক।

ইবনু হিশাম বলেন, أَبَابِيلَ অর্থ جَمَاعَات 'দলে দলে'। আরবরা এটি একবচনে বলে না (*ইবনু কাছীর*)। ফার্রা ও আখফাশ বলেন, 'আবাবীল' আধিক্যবোধক শব্দ। এর কোন

একবচন নেই। যেমন বলা হয় جَاءَتْ اِبِلُكَ أَبَابِيْلَ اَىْ فِرَقًا 'তোমার উট এসেছে দলে দলে'। অনুরূপভাবে এখানে طَيْرًا أَبَابِيْلَ অর্থ 'পাখি এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে'। অর্থাৎ فِى جماعات عظام 'বিরাট বিরাট দলে'। অনেকে একবচন إِبَّالة বা إِبَالَةٌ বা إِبِيْل বলেছেন। কিন্তু তা অপ্রচলিত (*কুরতুবী, ইবনু কাছীর*)।

ইবনু আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, متتابعة مجتمعة 'একের পিছে এক ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি'।

ওবায়েদ বিন ওমায়ের বলেন, هى طير سود بحرية فى منقارها وأظافيرها الحجارة 'সেগুলি ছিল সামুদ্রিক কালো পাখি, যার ঠোঁটে ও পায়ে কংকর ছিল'। ইবনু মাসঊদ, ইবনু যায়েদ ও আখফাশ বলেন, 'চারিদিক থেকে তারা এসেছিল' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ইকরিমা বলেন, 'সবুজ পাখি যা সমুদ্রের দিক থেকে এসেছিল'। ওয়াক্বেদী তার সূত্রে উল্লেখ করেন যে, পাখিগুলি ছিল হলুদ যা কবুতরের চেয়ে ছোট এবং পাগুলি ছিল লাল রংয়ের। প্রত্যেকের সাথে ছিল তিনটি করে কংকর। সেগুলি তারা নিক্ষেপ করে। অতঃপর তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়' (*ইবনু কাছীর*)। সাঈদ বিন জুবায়ের বলেন, সবুজ পাখি। যার ঠোঁট ছিল হলুদ। তিনি বলেন, كانت طيرا من السماء لم يُرَ قبلها ولا بعدها 'এগুলি ছিল আসমানী পাখি। যার ন্যায় পাখি তার পূর্বে বা পরে আর কখনো দেখা যায়নি' (*কুরতুবী*)। এটাই হ'ল সঠিক কথা। কেননা গযবের উদ্দেশ্যে প্রেরিত কোন প্রাণী পৃথিবীতে বেঁচে থাকে না। যেমন ইতিপূর্বে দাঊদ (আঃ)-এর সময়ে কিছু লোককে শূকর ও বানরে পরিণত করা হয়েছিল (*বাক্বারাহ ২/৬৫*)। কিন্তু তাদের কোন বংশ পৃথিবীতে ছিল না।

অনেকে 'আবাবীল'-কে এক প্রকার পাখি ধারণা করেন। এমনকি এ পাখির অদ্ভুত সব কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। যেমন 'এরা সারাদিন উড়ে বেড়ায়। কোথাও বসে না। এদের মারলে আল্লাহ্র গযবে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। সাতটা মানুষ খুন করতে রাযী, কিন্তু এদের বাসা ভাঙতে রাযী নই' ইত্যাদি। বিশেষ করে কারাগারগুলিতে এক ধরনের কালো পাখি দেখা যায়। সেগুলিকে কারাগারের লোকেরা 'আবাবীল' পাখি বলে এবং 'বরকতের পাখি' মনে করে। অথচ এগুলি স্রেফ ধারণা মাত্র। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোন কোন তাফসীরে طَيْرًا أَبَابِيْلَ অর্থ 'আবাবীল পাখি' করা হয়েছে, যা নিতান্তই ভুল।

(৪) تَرْمِيْهِم بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ 'যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল মেটেল পাথরের কংকর'।

تَرْمِيْهِمْ স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে উহ্য কর্তা جماعات الطير হ'তে। অর্থাৎ পাখির দলসমূহ নিক্ষেপ করেছিল।

سِجِّيْل আরবদের নিকটে কঠিন ও শক্ত বস্তুকে বলা হয়। কোন কোন মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, এটি ফারসী যৌগিক শব্দ, যা দু'টি শব্দের সমষ্টি। আসলে ছিল 'সাঙ্গগিল' (سَنْك و كِلْ)। সেখান থেকে আরবীতে 'সিজ্জীল' (سجيل)। 'সাঙ্গ' অর্থ পাথর এবং 'গিল' অর্থ মাটি। মাটি ও পাথরের মিলিত কংকর *(ইবনু কাছীর)* । এক কথায় 'মেটেল পাথরের কংকর'। যেমন হযরত লূত (আঃ)-এর সমকামী কওমকে ধ্বংস করার জন্য তাদের উপরে গযবের যে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, حِجَارَةً مِّن طِيْنٍ 'মাটির পাথর' (*যারিয়াত ৫১/৩৩*)। সম্ভবতঃ উক্ত আয়াত দৃষ্টে 'ছেহাহ' (الصحاح) নামক বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে حِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ-এর অর্থ حجارة من طين করা হয়েছে *(কুরতুবী)*।[৪৯৩] অর্থাৎ 'মেটেল পাথর'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও ইকরিমা বলেন, 'ঐ কংকর যার গায়ে লেগেছে, তার গায়ের চামড়া ফেটে বসন্তের গুটি বেরিয়েছে এবং সেবারই প্রথম বসন্ত রোগ দেখা দেয়'। ইবনু ইসহাক বলেন, সে বছরই প্রথম আরবদেশে হাম ও বসন্ত রোগের আবির্ভাব ঘটে (*ইবনু কাছীর*)।

(৫) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ 'অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণদৃশ'।

اَلْعَصْفُ বহুবচন। একবচনে عَصيفة، عَصفة، عُصافة অর্থ ভক্ষিত তৃণ। ঘাস-বিচালি চিবিয়ে খেয়ে গবাদিপশু যা ফেলে দেয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كقشر البر 'গমের ভূষির ন্যায়'। আবরাহা বাহিনীর উপরে নিক্ষিপ্ত গযবের কংকর যার দেহে আঘাত করেছে, তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। একথাটিই বুঝানো হয়েছে চিবানো ঘাস-বিচালির উচ্ছিষ্টের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে, যা গবাদিপশু গোবর আকারে বা অন্যভাবে ফেলে দেয় (*কুরতুবী*)।

ইবনু কাছীর বলেন, এর অর্থ হ'ল এই যে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস ও নির্মূল করে দেন। তাদের সমস্ত চক্রান্ত ভণ্ডুল করে দেন। তাদের প্রায় সকলেই ধ্বংস হয়। যারা ফিরেছিল, তারাও আহত অবস্থায় ফিরেছিল। যেমন তাদের নেতা আবরাহা কিছু সাথীসহ রাজধানী ছান'আতে পৌঁছেন। কিন্তু তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে পড়ছিল। অবশেষে তার বুক ফেটে কলিজা বেরিয়ে যায় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তবে তার আগে তিনি লোকদের কাছে আল্লাহ্র গযবের কাহিনী বর্ণনা করে যান (*ইবনু কাছীর*)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকসূম (يكسوم) শাসক হন। তার পরে তার ভাই মাসরূক (مسروق) ক্ষমতাসীন হন। এ সময় সাবেক হিমইয়ারী

---

৪৯৩. ছেহাহ ফিল লুগাহ ১/৩০৪।

শাসক সম্প্রদায়ের সায়েফ বিন যী-ইয়াযান (سيف بن ذى يَزَن) বিদ্রোহ করেন এবং পারস্য সম্রাট কিসরার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে কিসরার সৈন্যদের সহায়তায় তিনি হাবশী শাসকদের পরাজিত করে ৭২ বছর পর নিজ বংশের হৃত শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন।[৪৯৪]

কুরতুবী বলেন, আমাদের বিদ্বানগণ বলেছেন যে, হস্তীওয়ালাদের এই কাহিনী আমাদের নবীর জন্য অন্যতম মু'জেযা স্বরূপ ছিল। কেননা তিনি স্বচক্ষে ঘটনা দেখেননি। অথচ যখন তিনি এই সূরা পাঠ করে শুনান, তখন মক্কায় এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বহুলোক বেঁচেছিলেন। তারা সবাই এ সূরার বক্তব্যের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। এমনকি হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐ সময় বাল্য বয়সের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তিনি বর্ণনা করেন যে, لَقَدْ رَأَيْتُ قَائِدَ الْفِيْلِ وَسَائِقَهُ أَعْمَيَيْنِ يَسْتَطْعِمَانِ النَّاسَ- 'আমি হাতির চালক ও সহিসকে অন্ধ অবস্থায় মানুষের কাছে খাদ্য চাইতে দেখেছি'।[৪৯৫] একই বর্ণনা তাঁর বোন হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) থেকেও এসেছে *(ইবনু কাছীর)*।

উল্লেখ্য যে, মক্কা বিজয়ের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হস্তীবাহিনী ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে বলেন, إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মক্কা থেকে হস্তীবাহিনীকে প্রতিরোধ করেছেন এবং তার উপর তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে বিজয়ী করেছেন। আর এর পবিত্রতা পুনরায় আজ ফিরে এসেছে, যেমন পবিত্র ছিল গতকাল। অতএব হে জনগণ! উপস্থিতগণ অনুপস্থিতগণের নিকট পৌঁছে দাও'।[৪৯৬]

সংশয় নিরসন :

সূরা ফীল এবং সূরা আনকাবূত ৬৭ আয়াত প্রমাণ করে যে, কা'বাগৃহ ও হারাম এলাকা চিরকাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইবনু আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছদ্বয়[৪৯৭] প্রমাণ করে যে, কা'বাগৃহ এক সময় ধ্বংস হবে। এর জওয়াবে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এটি ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে সংঘটিত হবে, যখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ' বলার মত কোন তাওহীদবাদী মানুষ আর থাকবেনা।[৪৯৮] যা আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায়[৪৯৯] পূর্ণাঙ্গভাবে এসেছে। যেখানে বলা হয়েছে, ثُمَّ تَأْتِى الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَاباً لاَ يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَداً 'অতঃপর হাবশীরা আসবে। তারা বায়তুল্লাহকে

৪৯৪. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬৮; তাফসীরে ইবনু কাছীর।
৪৯৫. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৫৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৫৭০৪ হাদীছ ছহীহ।
৪৯৬. বুখারী হা/৬৮৮০, মুসলিম হা/১৩৫৫।
৪৯৭. বুখারী হা/১৫৯৫-৯৬ 'হজ্জ' অধ্যায়, 'কা'বা ধ্বংস' অনুচ্ছেদ-৪৯; মিশকাত হা/২৭২১।
৪৯৮. মুসলিম হা/১৪৮; মিশকাত হা/৫৫১৬।
৪৯৯. মুসনাদে আহমাদ হা/৭৮৯৭; ছহীহাহ হা/৫৭৯।

এমনভাবে ধ্বংস করবে যে, তা পরে আর কখনো আবাদ হবে না'। প্রশ্ন হ'ল, প্রথমবার কা'বা ধ্বংস করতে আসা হাবশী নেতা আবরাহার বাহিনীকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন, কিন্তু শেষ যামানায় আসা হাবশীদের আল্লাহ ধ্বংস করবেন না কেন? জবাব এই যে, প্রথমবারে সেখানে কোন মুসলমান ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ সেটা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মবর্ষ। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় গৃহের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। সেকারণ তিনি সাথে সাথে বাধা দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে আখেরী যামানায় ধ্বংসকারীরা হবে নামধারী মুসলমান। যা উক্ত হাদীছেই বলা হয়েছে যে, وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ 'এই গৃহকে হালাল করবে না তার অধিবাসীরা ব্যতীত'। অর্থাৎ পথভ্রষ্ট মুসলমানরাই একে বিনষ্ট করবে। যেমন ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার শাসনকালে *(৬০-৬৪ হি:/৬৮০-৮৩ খৃ:)* ৬৪ হিজরীতে এবং আব্বাসীয় শাসনামলে ক্বারামতীদের হাতে ৩১৭ হিজরীতে কা'বা গৃহ বিধ্বস্ত ও অসম্মানিত হয়েছিল।[৫০০] কিন্তু আল্লাহ বাধা দেননি। কেননা তারা প্রকাশ্যে মুসলমান ছিল। তাদের শাস্তি আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে দিবেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 'যে ব্যক্তি এখানে (মসজিদুল হারামে) সীমালংঘনের মাধ্যমে পাপকার্যের সংকল্প করে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো' *(হজ্জ ২২/২৫)*। অতএব অত্র হাদীছের ভবিষ্যদ্বাণী বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতের অন্যতম নিদর্শন এবং অত্র হাদীছ উক্ত আয়াতের বিরোধী নয়। যেখানে বলা হয়েছে, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 'তারা কি দেখেনা যে, আমরা হারামকে নিরাপদ করেছি। অথচ তাদের চতুষ্পার্শ্বে যারা আছে তারা উৎখাত হয়' *(আনকাবূত ২৯/৬৭)*। কেননা অত্র আয়াতে এমন কথা বলা হয়নি যে, তারা সর্বদা নিরাপদ থাকবে'।[৫০১]

সারকথা :

বায়তুল্লাহ্‌র হেফাযত ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত পৃথিবীর কোন শক্তি একে ধ্বংস করতে পারবে না।

---

৫০০. আব্বাসীয় খলীফা মুক্বতাদির বিল্লাহ্‌র শাসনামলে (২৯৫-৩২০/৯০৮-৯৩২ খৃ:) বিদ্রোহী ক্বারামতী দলের নেতা আবু তাহের ক্বারমাত্বী ৩১৭ হিজরীর ৮ই যিলহাজ্জ তারিখে মক্কায় হামলা চালায়। তারা ঐ সময় কা'বাগৃহের দরজা খুলে নেয়। হাজরে আসওয়াদ ভেঙ্গে উপড়িয়ে ফেলে এবং ১১ দিনে ১০ হাযার হাজী ও মক্কাবাসীকে হত্যা করে। তারা হাজরে আসওয়াদ বহন করে তাদের কেন্দ্র হিজরে (هجر) নিয়ে যায়। যা বর্তমানে সঊদী আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ আহসা ও বাহরায়েন এলাকায় অবস্থিত ছিল। ২২ বছর পর ৩৩৯ হিজরীতে খলীফা মুতী' বিন মুক্বতাদির (৩৩৪-৬৩/৯৪৬-৭৪ খৃ:) ৫০ হাযার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে ওটা উদ্ধার করেন। অতঃপর তাদের নেতা সাম্বার বিন হাসান সেটিকে নিয়ে ১০ই যিলহাজ্জ কুরবানীর দিন কা'বাগৃহে যথাস্থানে বসিয়ে দেন ও তাওয়াফ করেন।

৫০১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/১৭৩; ফাৎহুল বারী হা/১৫৯৫-৯৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ৩/৫৩৯-৪০ পৃঃ।

সূরা কুরায়েশ (কুরায়েশ বংশ)

সূরা তীন-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০৬, আয়াত ৪, শব্দ ১৭, বর্ণ ৭৩।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

(১) কুরায়েশদের অনুরাগের কারণে	لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍۙ﴿۱﴾
(২) তাদের অনুরাগের কারণে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি	اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيۡفِۚ﴿۲﴾
(৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের	فَلۡيَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَيۡتِۙ﴿۳﴾
(৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দান করেছেন এবং ভীতি হ'তে নিরাপদ করেছেন।	الَّذِىۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ﴿۴﴾

বিষয়বস্তু :

(১) কুরায়েশদের নিকট বায়তুল্লাহ্র গুরুত্ব তুলে ধরা *(১-২ আয়াত)*। (২) তাদেরকে একনিষ্ঠভাবে কা'বার মালিকের ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা *(৩-৪ আয়াত)*।

গুরুত্ব :

উম্মে হানী বিনতে আবু ত্বালেব হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

فَضَّلَ اللهُ قُرَيْشاً بِسَبْعِ خِلاَلٍ : أَنِّيْ مِنْهُمْ وَأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيْهِمْ وَأَنَّ الْحِجَابَةَ وَالسِّقَايَةَ فِيْهِمْ وَأَنَّ اللهَ نَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيْلِ وَأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللهَ عَشْرَ سِنِيْنَ لاَ يَعْبُدُهُ غَيْرُهُ وَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِمْ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَلاَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ- لِإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ، إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ- أخرجه الحاكم-

'আল্লাহ কুরায়েশদের সাতটি বিষয়ে মর্যাদা দান করেছেন। ১- আমি তাদের মধ্যকার ২- নবুঅত তাদের মধ্যে এসেছে ৩- কা'বাগৃহের তত্ত্বাবধান ৪- হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন ৫-আল্লাহ তাদেরকে হস্তীওয়ালাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন ৬- উক্ত ঘটনার পর কুরায়েশরা দশ বছর যাবৎ আল্লাহ ব্যতীত কারু ইবাদত করেনি ৭-

আল্লাহ তাদের বিষয়ে কুরআনে পৃথক একটি সূরা নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি অত্র সূরাটি তেলাওয়াত করেন বিসমিল্লাহ সহ।[৫০২]

তাফসীর :

(১) لِإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ 'কুরায়েশদের অনুরাগের কারণে'।

الإِلْفُ وَالأُلْفَةُ অর্থ 'ভালোবাসা'। آلفه إلافًا ومؤالفة وإيلافًا 'পরস্পরে ভালোবাসা'। সেখান থেকে لِإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ অর্থ 'কুরায়েশদের প্রতি অনুরাগের কারণে'।

আয়াতটিসহ সূরাটি পূর্ববর্তী সূরা ফীল-এর সাথে সম্পৃক্ত নাকি পৃথক- এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যদি পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পৃক্ত ধরা হয়, তাহ'লে অর্থ দাঁড়াবে أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف قريش لكى تأمن رحلتيها– 'আমরা হস্তীওয়ালাদের পর্যুদস্ত করেছি কুরায়েশদের প্রতি আমাদের অনুরাগের কারণে, যাতে তারা তাদের দু'টি ব্যবসায়িক সফরে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে'। আর যদি সূরাটিকে পৃথক ধরা হয়, কেননা উভয় সূরার মাঝখানে 'বিসমিল্লাহ' রয়েছে, যা পৃথক হওয়ার বড় প্রমাণ, তাহ'লে অর্থ হবে, فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف 'তাদের উচিত এই গৃহের মালিকের ইবাদত করা শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি তাদের আসক্তির কারণে'। لِإِيْلاَفِ এর لام তখন متعلق হবে فَلْيَعْبُدُوا-এর এবং فا অব্যয়টি অতিরিক্ত হবে, সংযোগকারী (عاطفة) অব্যয় নয়। যেমন বলা হয়, زيدًا فَاضْرِبْ 'যায়েদকে মারো' (*কুরতুবী*)। তবে এটাই প্রসিদ্ধ ও সর্ববাদীসম্মত যে, দু'টিই পৃথক ও প্রতিষ্ঠিত সূরা *(ইবনু কাছীর)*। ইবনু জারীর বলেন, وفى إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان، كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى 'সকল মুসলমানের ঐক্যমত এই যে, এ দু'টি পূর্ণাঙ্গ সূরা এবং প্রত্যেকটিই একে অপর থেকে পৃথক'।[৫০৩]

قريش-কে 'কুরায়েশ' কেন বলা হয় এ বিষয়ে একবার মু'আবিয়া (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, لدابة في البحر من أقوى دوابه يقال لها القِرْشُ، تأكل ولا تؤكل، تَعْلو ولا تُعْلَى. 'একটি সামুদ্রিক প্রাণীর কারণে, যা সমুদ্রের সকল প্রাণীর চাইতে অধিক শক্তিশালী, যাকে 'ক্বিরশ' বলা হয়। যে অন্যকে

৫০২. বায়হাক্বী, আল-খিলাফিয়াত (الخلافيات); হাকেম আল-মুস্তাদরাক ২/৫৩৬, হা/৩৯৭৫; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৪২০৯।

৫০৩. তাফসীর ইবনে জারীর, সূরা কুরায়েশ, (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ ১৪০৭/১৯৭৮) ৩০/১৯৮ পৃঃ।

ধরে খায়। কিন্তু তাকে কেউ খেতে পারে না। সে বিজয়ী হয়। কিন্তু পরাজিত হয় না' (*কুরতুবী*)।

উপমহাদেশের খ্যাতনামা জীবনীকার ও রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনচরিত 'রহমাতুল্লিল আলামীন'-এর স্বনামধন্য লেখক ক্বাযী সুলায়মান বিন সালমান মানছূরপুরী (মৃঃ ১৩৪৯/১৯৩০ খৃ:) বলেন, 'কুরায়েশ' অর্থ সাগরের তিমি মাছ। ইয়ামনের বাদশাহ হাসসান একবার মক্কা আক্রমণ করে কা'বাগৃহ উঠিয়ে নিজ দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ পিতামহ ফিহ্র বিন মালেক তাকে যুদ্ধে হারিয়ে তিন বছর বন্দী করে রাখেন। অতঃপর মুক্তি দেন। হাসসান ইয়ামনে ফেরার পথে রাস্তায় মারা যায়। এই বীরত্বপূর্ণ ঘটনার পর থেকে ফিহ্র قُرَيْشُ الْعَرَبِ বা 'আরবের কুরায়েশ' বলে খ্যাতি লাভ করেন'।[৫০৪]

ক্বিরশ-কে تصغير করে 'কুরায়েশ' বলা হয় সম্মানের কারণে (*ইবনু জারীর, তানতাভী*)।

প্রচলিত অর্থে নাযার বিন কিনানাহ (نضر بن كنانة)-এর বংশধরগণকে 'কুরায়শী' বলা হয়। নাযার ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর ঊর্ধ্বতন চৌদ্দতম পিতামহ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ 'আল্লাহ ইসমাঈলের সন্তানগণের মধ্য হ'তে বনু কিনানাহকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর বনু কিনানাহ থেকে কুরায়েশকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর কুরায়েশ থেকে বনু হাশেমকে বেছে নিয়েছেন এবং আমাকে বেছে নিয়েছেন বনু হাশেম থেকে'।[৫০৫]

(২) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ 'তাদের অনুরাগের কারণে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি'।

কুরায়েশরা ব্যবসার জন্য শীতকালে ইয়ামন যেত। কেননা ইয়ামন ছিল গরমের দেশ এবং গ্রীষ্মকালে শাম বা সিরিয়া যেত। কেননা সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডার দেশ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা গরমে ত্বায়েফও যেত সেখানকার মৃদুমন্দ মৌসুমী আবহাওয়ার জন্য। ফলে মক্কার লোকদের জন্য এটা আল্লাহ্র একটা বিরাট অনুগ্রহ ছিল যে, মক্কার একদিকে যখন গরম, অন্য দিকে তখন ঠাণ্ডা। আবার একদিকে যখন ঠাণ্ডা, অন্যদিকে তখন গরম (*কুরতুবী*)। ইয়ামন থেকে তারা সেখানকার গ্রীষ্মকালীন উৎপন্ন শস্যাদি নিয়ে আসত এবং সিরিয়া থেকে তারা সেখানকার শীতকালীন ফল-ফলাদি নিয়ে আসত।

---

৫০৪. সুলায়মান মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন (দিল্লী : ১ম সংস্করণ, ১৯৮০ খৃ:), ২/৫৯ পৃঃ।
৫০৫. মুসলিম হা/২২৭৬, মিশকাত হা/৫৭৪০ ওয়াছেলা ইবনুল আসক্বা' হ'তে।

আল্লাহ্র ঘরের অধিবাসী হিসাবে তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা সর্বত্র সম্মানিত হ'ত। তাদেরকে حُمْس 'কঠোর ধার্মিক' বা اَهْلُ الله 'আল্লাহওয়ালা' বা اهلُ بيتِ الله 'আল্লাহ্র ঘরের বাসিন্দা' বলা হ'ত। কখনোই তাদের কাফেলা অন্যদের দ্বারা লুট হতো না। বরং রাস্তাঘাটে যেকোন বিপদাপদে লোকেরা সর্বদা তাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকত। যদি তাদের এই দু'টি ব্যবসায়িক সফর নিয়মিতভাবে অব্যাহত না থাকত, তাহ'লে তাদের জীবনে সচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি কিছুই থাকত না। সেকারণ দু'টি ব্যবসায়িক সফরের প্রতি তাদের অনুরাগ ও আসক্তি ছিল স্বাভাবিকভাবেই প্রবল ও প্রশ্নাতীত।

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ যবরযুক্ত হয়েছে 'মাছদার' হওয়ার কারণে। অর্থাৎ ارتحالهم رحلةً 'তাদের সফরের জন্য, অথবা ظرف হওয়ার কারণে (*কুরতুবী*)।

(৩) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 'অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের'।

অর্থাৎ কুরায়েশদের উচিত কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই গৃহের মালিকের ইবাদত করা শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি তাদের আসক্তির কারণে। এ সময় فا অব্যয়টি (سببية وزائدة) কারণসূচক ও অতিরিক্ত হবে। অথবা আল্লাহ তাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা একনিষ্ঠভাবে কেবল এই গৃহের মালিকের ইবাদত করে। অন্য কোন নে'মতের কারণে না হ'লেও অন্ততঃ বছরে দু'টি নিরাপদ ব্যবসায়িক সফরের প্রতি তাদের বিশেষ আসক্তির কারণে। فا অব্যয়টি এ সময় শর্তের (شرطية) অর্থ প্রকাশ করবে।

এক্ষণে 'ইবাদত' অর্থ কি? ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 'ইবাদত হ'ল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কর্ম সমূহের সামগ্রিক নাম, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও যা তাঁকে খুশী করে'। অতএব কুরায়েশদের ও সকল মানুষের উচিত অনুরূপ কাজ করা যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 'এই গৃহের মালিক' অর্থ 'কা'বাগৃহের মালিক'। এটা বলার কারণ দু'টি হ'তে পারে। এক- কা'বাগৃহে তারা যেসব মূর্তি স্থাপন করেছে, আল্লাহ সেসব থেকে নিজের মুক্তি ও বৈরিতা ঘোষণা করেছেন। দুই- কুরায়েশদের যাবতীয় সম্মান ও সচ্ছলতার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল কা'বাগৃহ, সেকথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে (*কুরতুবী*)। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও আল্লাহ একই নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে, إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا... 'আমিতো আদিষ্ট হয়েছি এই (মক্কা) নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে। যিনি একে সম্মানিত করেছেন ...' (*নমল ২৭/৯১*)।

(৪) اَلَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ 'যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দান করেছেন এবং ভীতি হ'তে নিরাপদ করেছেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে হাযারো নে'মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু'টি নে'মত দান করেছেন, ক্ষুধায় অন্নদান অর্থাৎ আর্থিক সচ্ছলতা এবং বহিঃশত্রুর হামলা হ'তে নিরাপত্তা। এ দু'টি সেরা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে ইবাদতের আহ্বান জানিয়েছেন।

এখানে مِنْ جُوْعٍ অর্থ بعد جوع 'ক্ষুধার পরে'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ দু'টি নে'মত ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর ফসল। কেননা তিনি দো'আ করেছিলেন, رَبِّ اجْعَلْ هَـــَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ 'হে প্রভু! এ স্থানকে তুমি নিরাপদ শহরে পরিণত কর এবং এর অধিবাসীদের তুমি ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী প্রদান কর' (*বাক্বারাহ ২/১২৬, ইবরাহীম ১৪/৩৫)*।

কা'বাগৃহে মূর্তি কেন?

প্রশ্ন হ'তে পারে, পরবর্তীতে যে ইবরাহীমী কা'বা মূর্তিপূজার কেন্দ্রে পরিণত হ'ল, সেটাও কি তাঁর দো'আর ফসল? জবাব এই যে, (১) আল্লাহ কোন বাতিলপন্থীকে সরাসরি বাধা দেন না। কেননা এতে তার পরীক্ষা বিঘ্নিত হয়। (২) এটি আদৌ ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর ফসল নয়। কেননা এ ব্যাপারে ইবরাহীমের দো'আ ছিল নিম্নরূপ : আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (স্মরণ কর সেকথা) যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে (মক্কাকে) নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা হ'তে দূরে রাখো! 'হে আমার প্রতিপালক! এসব মূর্তি বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্যতা করবে, (তার ব্যাপারে) তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৬)*। এখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)-এর দলভুক্ত। কিন্তু আবু জাহলরা দাবী করলেও তাঁর দলভুক্ত নয়। কা'বা গৃহে মূর্তিপূজা করলেও আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেননি। কারণ হয়তবা এটা হ'তে পারে যে, তারা কা'বা গৃহের তত্ত্বাবধান করত। হাজীদের সেবা করত। সর্বোপরি তাদের বংশেই শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে, সেটার কারণে। এছাড়াও আল্লাহ্র দূরদর্শী পরিকল্পনার খবর বান্দা কিভাবে জানবে?

অত্র সূরা ও পূর্ববর্তী সূরা ফীল-এর মধ্যে আল্লাহ হারাম শরীফের ন্যায় মহান নে'মত সম্পর্কে কুরায়েশদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কেননা হারামের কারণেই তারা নিরাপত্তা ও রিযিক লাভ করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

'আমরা কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ 'হারাম' প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সকল প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমাদের দেওয়া রিযিক স্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানেনা' (*ক্বাছাছ ২৮/৫৭*)। দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল ও তার মাকে মক্কার বিরাণভূমিতে রেখে আসার সময় ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেছিলেন,

رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ-

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার সম্মানিত গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি, প্রভু হে! যাতে তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি রুজূ করে দাও এবং ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রূযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' (*ইবরাহীম ১৪/৩৭*)।

তখন থেকে মক্কা প্রথম আবাদ হয় এবং মা হাজেরার অনুমতিক্রমে ইয়ামনের বনু জুরহুম গোত্রের লোকেরা যমযম কূয়াকে কেন্দ্র করে বসতি স্থাপন করে। অতঃপর মক্কা মোকাররমায় কখনো খাদ্যাভাব হয়নি। যদিও সেখানে চাষাবাদের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। তথাপি সারা বিশ্বের ফল-ফলাদি সারা বছর সর্বদা সমভাবে সেখানে পাওয়া যায়। কেবল রূযীর প্রাচুর্য নয়, বরং মক্কা সর্বদা শত্রুর আক্রমণ হ'তে নিরাপদ থেকেছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

أَوَلَمْ يرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُوْنَ-

'তারা কি দেখে না যে, আমরা হারামকে নিরাপদ করেছি। অথচ তাদের চতুষ্পার্শ্বে যারা আছে, তারা উৎখাত হয়। তাহ'লে তারা কি বাতিলের উপরে ঈমান আনবে আর আল্লাহ্র নে'মতকে অস্বীকার করবে?' (*আনকাবূত ২৯/৬৭*)।

এভাবে সূরাটিতে কুরায়েশদের প্রতি উপদেশ এবং তাদেরকে দেওয়া আল্লাহ্র মহান গৃহের মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তার অমূল্য নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার শুকরিয়া আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয় :

বান্দার প্রতি আল্লাহ কত বেশী দয়ালু, তার একটি বড় প্রমাণ হ'ল এই সূরাটি। খোদ আল্লাহ্র গৃহে আল্লাহ্র সাথে মূর্তিপূজার মত জঘন্যতম শিরক করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে গযবে ধ্বংস না করে বরং তাদের রক্ষা করেছেন। রূযীতে সচ্ছলতা দান করেছেন। তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। সবশেষে তাদেরকে তাঁর দেওয়া শ্রেষ্ঠ নে'মত-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ ইবাদতের আহ্বান জানাচ্ছেন। এরপরে আল্লাহ কুরায়েশদের ঘরে তাঁর সেরা বান্দা ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করে কুরায়েশদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করলেন। এতকিছু অনুগ্রহ করার পরেও আবু জাহ্ল, আবু লাহাবরা শিরক বর্জন করেনি। মুখে আল্লাহ ও আখেরাতকে স্বীকার করলেও এবং কা'বাগৃহকে সম্মান করলেও আল্লাহ্র আদেশ তারা মানেনি। ফলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্র গযবপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক গযব পাঠিয়ে সবাইকে আল্লাহ ধ্বংস করেননি। কেননা আল্লাহ তাদের মধ্য থেকেই বের করে এনেছেন আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলীর মত বিশ্বসেরা মানুষগুলিকে। যাঁরা তাঁদের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে ব্যাপক গযবে ধ্বংস করবেন না। তাদের মধ্য থেকেই শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে বের করে এনে তাঁর দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখবেন। যারা চিরদিন বিশ্বকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে যাবেন।

সকল মানুষকে রূযী ও নিরাপত্তা দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ এখানে নির্দিষ্টভাবে কা'বা ও কুরায়েশদের কথা বর্ণনা করেছেন। কেননা এ দুইয়ের মর্যাদা পৃথিবীর মধ্যে সেরা। তাই অন্যত্র পাপাচারের চাইতে এখানে পাপাচারের গোনাহ সবচেয়ে বেশী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ 'যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে কোন ধর্মদ্রোহী কাজের সংকল্প করে, আমরা তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো' *(হজ্জ ২২/২৫)*।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, সকল মানুষ কুরায়েশ নয় এবং সকল গৃহ কা'বাগৃহ নয়। অথচ প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ আশ্রয় ও রূযী দান করেছেন। অতএব প্রত্যেক জ্ঞানী মানুষকে মহান আল্লাহ্র দেওয়া নে'মতরাজির শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত, যিনি অলক্ষ্যে থেকে আমাদের জন্য খাদ্য-বস্ত্র, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কোন অবস্থায় যেন আমরা আবু জাহল, আবু লাহাবদের মত অবাধ্য ও অহংকারী না হই। বরং আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) প্রমুখদের মত আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেই। *আল্লাহুম্মা আমীন!*

সারকথা :

রূযী ও নিরাপত্তা দানের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। অতএব সর্বাবস্থায় কেবল তাঁরই ইবাদত করতে হবে ও তাঁরই শরণাপন্ন হ'তে হবে।

সূরা মা'ঊন

(নিত্যব্যবহার্য বস্তু)

সূরা তাকাছুর-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০৭, আয়াত ৭, শব্দ ২৫, বর্ণ ১১২।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

(১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে?	اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۟ؕ
(২) সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়	فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۟ۙ
(৩) এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۟ؕ
(৪) অতঃপর দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۟ۙ
(৫) যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন	الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۟ۙ
(৬) যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে	الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۟ۙ
(৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে।	وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۟ع

বিষয়বস্তু :

সূরাটিতে দু'টি বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। এক- বিচার দিবসে অবিশ্বাসী ব্যক্তির দু'টি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য *(১-৩ আয়াত)*। দুই- পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত মুছল্লীর তিনটি বৈশিষ্ট্য *(৪-৭ আয়াত)*।

তাফসীর :

(১) أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে'? এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'লেও উদ্দেশ্য হ'ল সকল যুগের অবিশ্বাসী মানুষ।

أَرَأَيْتَ তুমি কি দেখছ? অর্থ أَلَمْ تَعْلَمْ তুমি কি জানো? এখানে الرؤية বা 'দেখা' অর্থ العلم 'জানা'। কেননা শ্রোতার পক্ষে ঐব্যক্তিকে দেখা সম্ভব নয়। প্রশ্নবোধক বাক্য প্রয়োগের উদ্দেশ্য হ'ল বক্তব্যের প্রতি শ্রোতাকে দ্রুত আকৃষ্ট করা ও তাকে উৎসাহিত করা। كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا وَكِذْبًا অর্থ 'মিথ্যা বলা'। كَذَّبَ يُكَذِّبُ تَكْذِيْبًا অর্থ 'মিথ্যারোপ করা'।

'সত্যকে মিথ্যা বানানো'। কাফেররা ক্বিয়ামতের সত্য বিষয়কে মিথ্যা বানাতে চায়। এখানে الدِّيْنِ অর্থ বিচার দিবস, হিসাব ও প্রতিফল দিবস (*ইবনু কাছীর*)।

কুরায়েশ নেতাদের উক্ত দাবী যে মিথ্যা, তার প্রমাণস্বরূপ অতঃপর আল্লাহ তাদের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছেন।-

(২) فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ 'সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ 'কখনোই না। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না' (*ফজর ৮৯/১৭*)।

ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসীদের বাহ্যিক দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হওয়া এবং তাদের প্রতি দয়াশীল হ'তে অন্যকে নিরুৎসাহিত করা। অত্র আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু জুরায়েজ বলেন, আবু সুফিয়ান প্রতি সপ্তাহে অনেকগুলি উট যবহ করত। একদিন একটা ইয়াতীম শিশু তার কাছে কিছু গোশত চায়। কৃপণ আবু সুফিয়ান তাকে গোশত না দিয়ে লাঠি দিয়ে মারে (فقرعه بعصاه)। এর প্রতিবাদে এটি নাযিল হয় (*কুরতুবী*)। তানতাভী আবু জাহল সম্পর্কেও অনুরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, আবূ জাহল একটি ইয়াতীমের অভিভাবক (وصى) ছিল। একদিন ইয়াতীমটি নগ্ন অবস্থায় তার কাছে এসে তার সকল মাল দাবী করে। তাতে আবূ জাহল তাকে ধাক্কিয়ে তাড়িয়ে দেয় (*তানতাভী ২৫/২৭৪*)।

فَذَلِكَ-এর فاء উহ্য শর্তের জওয়াব হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ যদি তুমি বিচার দিবসে অবিশ্বাসীকে না দেখে থাক, তবে তার বাহ্যিক নিদর্শন দেখ। ذَلِكَ হ'ল مبتدأ এবং পরবর্তী বাক্য (موصول) হ'ল خبر।

دَعَّ يَدُعُّ دَعًّا অর্থ 'ধাক্কানো'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا 'যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে' (*তূর ৫২/১৩*)। এখানে 'গলাধাক্কা' কথাটি আনা হয়েছে ইয়াতীমের প্রতি নিকৃষ্টতম আচরণের নমুনা হিসাবে। এতে অন্যান্য যুলুমের নিষেধাজ্ঞার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন ইয়াতীমের হক নষ্ট করা, তার প্রতি সদ্ব্যবহার না করা ইত্যাদি। মালেক বিন হারেছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ ضَمَّ يَتِيْماً بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ

وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ– 'যে ব্যক্তি একজন মুসলিম ইয়াতীমকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিল এবং সে অভাবমুক্ত হ'ল, তার জন্য জান্নাত অবশ্যই ওয়াজিব হয়ে গেল।[৫০৬]

সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক, তার নিজের বা অপরের, জান্নাতে পাশাপাশি এভাবে অবস্থান করব। এ বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করেন'।[৫০৭]

(৩) وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 'এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না'। অত্র আয়াতে ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে।

حَضَّ يَحُضُّ حَضًّا 'উৎসাহিত করা'। অর্থাৎ لا يَحُثُّ غيرَه على إطعام المحتاجين 'তারা অন্যকে অভাবীদের খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না'। এটা হ'ল ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন জাহান্নামে নিক্ষিপ্তদের বিষয়ে আল্লাহ বলবেন, وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 'তারা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করতো না' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩৪)*। এটা যারা কৃপণতাবশে করে, তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। কেননা অপারগ অবস্থায় যারা করে, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْراً– 'তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো' *(ইসরা ১৭/২৮)*। তবে নিজে খাদ্য দিতে না পারলেও অন্যকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করা সর্বাবস্থায় সম্ভব। কিন্তু কৃপণরা সেটাও করে না। তাই তাদের ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, وَلاَ تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 'তারা মিসকীনকে খাদ্য দানের ব্যাপারে (অন্যকে) উৎসাহিত করেনা' *(ফজর ৮৯/১৮)*। অন্যত্র কাফেরদের বদস্বভাব বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ 'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রূযী দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফেররা মুমিনদের বলে, ইচ্ছা করলে আল্লাহ যাকে খাওয়াতে পারেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াতে যাব'?

৫০৬. আহমাদ হা/১৯০৪৭; ত্বাবারাণী হা/৬৬৯; আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/১৮৯৫।
৫০৭. বুখারী হা/৬০০৫, মিশকাত হা/৪৯৫২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-২৫, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া' অনুচ্ছেদ-১৫।

(*ইয়াসীন ৩৬/৪৭*)। এর দ্বারা তাদের পাথরের ন্যায় শক্ত ও নিষ্ঠুর হৃদয়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

বস্তুতঃ যুগে যুগে বস্তুবাদী মুশরিক, ফাসেক ও মুনাফিকদের চরিত্র একই। ফাসেক-মুনাফিকরা মুখে আল্লাহ ও আখেরাতের কথা বললেও অন্তরে বিশ্বাস করে না এবং আখেরাতে জবাবদিহিতাকে ভয় পায় না। অথচ ধনীর মালে গরীবের হক রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ 'আর তাদের মাল-সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে'। 'প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য' (*মা'আরিজ ৭০/২৪-২৫*)। আর এটা তাদের করুণা নয়। কেননা ধনীরা তাদের মালের প্রকৃত মালিক নয়। বরং সমস্ত মালিকানা কেবলমাত্র আল্লাহ্র। তিনি ধনীর মাল দিয়ে তার মাধ্যমে গরীবকে সাহায্য করেন। আর এতেই রয়েছে ধনীদের জন্য পরীক্ষা। দানশীলরা জান্নাত পায়। কৃপণরা জাহান্নামী হয়।

(৪) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ 'অতঃপর দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য'।

وَيْلٌ ধমকি সূচক শব্দ (كلمة وعيد)। যার অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। কুরআনের বহু স্থানে শব্দটি এসেছে অবিশ্বাসীদের ধমক দেওয়ার ও দুঃসংবাদ শুনানোর জন্য।

এখানে 'দুর্ভোগ' অর্থ জাহান্নামের আযাব (*কুরতুবী*)। فَ অব্যয় আনা হয়েছে পূর্বের বাক্য থেকে পৃথক বিষয়বস্তু বুঝানোর জন্য। কেননা পূর্বের বক্তব্যগুলি ছিল বিচার দিবসে অবিশ্বাসীদের জন্য। এবারের বক্তব্যগুলি আসছে অলস বা লোক দেখানো মুছল্লীদের জন্য।

(৫) اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ 'যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন'।

سَاهُوْنَ অর্থ غافلون 'উদাসীন', 'অসতর্ক'। যারা لاهون عن الصلوة ويتغافلون عنها 'ছালাত থেকে উদাসীন ও খেল-তামাশায় ব্যস্ত'। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আউয়াল ওয়াক্ত ছেড়ে যঈফ ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে। যারা জানা সত্ত্বেও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করে না। রুকূ-সিজদা, উঠা-বসা যথাযথভাবে করে না। ক্বিরাআত ও দো'আ-দরূদ ঠিকমত পাঠ করে না। কোন কিছুর অর্থ বুঝে না বা বুঝবার চেষ্টাও করে না। আযান শোনার পরেও যারা অলসতাবশে ছালাতে দেরী করে বা জামা'আতে হাযির হওয়া থেকে বিরত থাকে। ছালাতে দাঁড়াবার সময় বা ছালাতে দাঁড়িয়েও অমনোযোগী থাকে ইত্যাদি।

হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, এর অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الَّذِيْنَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، تَهَاوُنًا بِهَا– 'যারা অবহেলা বশে সঠিক সময় থেকে দেরীতে ছালাত আদায় করে'।[৫০৮]

চার প্রকার মানুষ :

সমাজে সর্বদা চার ধরনের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী, শিথিল বিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। এদের মধ্যে শেষের তিন ধরনের মানুষ তওবা না করলে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী। অত্র আয়াতে ২য় ও ৩য় ধরনের ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের মুছল্লীরাই ইসলামের বড় শত্রু। শুধু ছালাত নয়, যাকাত, ছিয়াম, জুম'আ, ঈদায়েন, হজ্জ-ওমরাহ প্রভৃতি ইবাদত অনুষ্ঠানসমূহ পালনের মাধ্যমে এরা জনগণের কাছে নিজেদের ধার্মিকতা যাহির করে। অন্যদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী বিধান অগ্রাহ্য করে নিজেদের মনগড়া আইন জারি করে এবং জনগণকে তাদের দাসত্বে পিষ্ট করে। ফলে এদের কারণেই দেশে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে ও জাতি ধ্বংস হয়। সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ ছালাত বিনষ্ট করাকেই বিগত উম্মতগুলির ধ্বংসের প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا– (ইবরাহীম ও ইসরাঈলের নেককার বংশধরগণের) পরে এল অপদার্থ উত্তরসূরীরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হ'ল। সুতরাং অচিরেই তারা ধ্বংসে (জাহান্নামের গর্তে) পতিত হবে' (*মারিয়াম* ১৯/৫৯)।

এতে বুঝা যায় যে, ছালাত মানুষকে আখেরাতমুখী করে রাখে এবং ছালাতে অবহেলা করলে মানুষ পুরোপুরি দুনিয়ামুখী হয়ে পড়ে। তখন বস্তুপূজাই তার একমাত্র কাম্য হয়। যা তাকে অচিরেই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখর থেকে পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেয়। ফলে সে নিজে ধ্বংস হয় এবং অন্যকেও ধ্বংস করে। আর যদি সে ধর্মনেতা বা সমাজনেতা হয়, তাহ'লে হাদীছের ভাষায় فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا 'তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করে'।[৫০৯] নেতাদের পথভ্রষ্টতায় যে সমাজ ধ্বংস হয়, সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا 'যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন সেখানকার দুষ্টু নেতাদের নির্দেশ দেই। অতঃপর তারা সেখানে পাপাচার করে। ফলে

৫০৮. কুরতুবী হা/৬৪৮৩; বাযযার, ত্বাবারী, বায়হাক্বী। তবে বায়হাক্বী সা'দ থেকে 'মওকূফ' সূত্রে বর্ণনা করার পর সেটাকেই 'সঠিক' বলেছেন (২/২১৪-১৫)। হায়ছামী একে 'হাসান' বলেছেন (১/৩২৫)। টীকাকার বলেন, মওকূফ ছহীহ وهو الراجح 'এবং এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য'। মরফূ বর্ণনা সঠিক নয়।

৫০৯. বুখারী হা/১০০, মুসলিম হা/২৬৭৩, মিশকাত হা/২০৬।

তাদের উপর আমার আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা উক্ত জনপদকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি' *(ইসরা ১৭/১৬)*। এখানে 'নির্দেশ দানের' অর্থ অনুমতি দেওয়া এবং বাধা না দেওয়া। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوا فِيْهَا وَمَا يَمْكُرُوْنَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ 'এভাবে আমরা প্রত্যেক জনপদের শীর্ষ পাপীদের অনুমতি দেই, যাতে তারা সেখানে প্রতারণা করে। বস্তুতঃ তারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রতারিত করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না' *(আন'আম ৬/১২৩)*। নেতারা ও কর্মকর্তারা সাধারণতঃ অন্যদেরকে ছালাতে বিরত রাখে অথবা বাধা সৃষ্টি করে। এদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা দেয় ও তা ধ্বংসের পাঁয়তারা চালায়? *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*।

ছালাত হ'ল ইসলামের প্রধান খুঁটি। এই খুঁটি ভাঙতে পারলেই ইসলামকে ধ্বংস করা সহজ হয়। সেকারণ সেদিন যেমন আবু জাহল ও তার সাথীরা রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের ছালাত আদায়ে বাধা দিত, এ যুগের বস্তুবাদী আবু জাহলরাও তেমনি প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে সর্বদা ছালাত আদায়ে বাধা দিয়ে থাকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদারগণ সর্বদা যথাসময়ে ও আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ে সচেষ্ট থাকেন এবং এর মাধ্যমে তারা স্রেফ আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি কামনা করেন।

মুনাফিক ও অলস মুছল্লীরা তার বিপরীত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً- 'নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, আর তিনিও তাদের ধোঁকায় ফেলেন। যখন ওরা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে' (*নিসা ৪/১৪২*)। ইমাম সুয়ূতী বলেন, মুনাফিকদের ধোঁকা হ'ল লোক দেখানো ছালাত আদায় করা। এভাবে তারা যেন আল্লাহকে ধোঁকা দেয় যে, তারা ছালাত আদায় করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাদের অন্তরের খবর রাখেন। আর আল্লাহ তাদের ধোঁকায় ফেলেন অর্থ ওদের লোক দেখানো ছালাত জানা সত্ত্বেও তিনি তাদের দুনিয়াতে জান-মালের নিরাপত্তা দান করেন। অথচ আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান নির্ধারণ করেন (*নিসা ৪/১৪৫*)।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি এখানে في صلاتهم (ছালাতের মধ্যে) হ'ত, তাহ'লে মুমিনদের বিষয়ে হ'ত। আত্বা ইবনু দীনার বলেন, 'আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা যে, তিনি এখানে عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ বলেছেন, في صلوتهم বলেননি' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

কেননা তাহ'লে কোন মুসলমানই বাদ যেত না। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এরও ছালাতের মধ্যে অনেকবার ভুল হয়েছে। যার জন্য হাদীছে 'সহো সিজদা'র বিধান রাখা হয়েছে। কেননা عَنْ صَلَاتِهِمْ অর্থ 'ছালাত থেকে উদাসীন'। আর فِيْ صَلَاتِهِمْ অর্থ 'ছালাতের মধ্যে ভুলকারী'। যেটা স্বাভাবিক।

ইবনু কাছীর বলেন, عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُوْنَ 'তারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন' অর্থ হ'ল, তারা নিয়মিতভাবে বা অধিকাংশ সময়ে আউয়াল ওয়াক্তের বদলে আখেরী ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে *(ইবনু কাছীর)*।[৫১০] তারা ছালাতের আরকান ও শর্তাবলী সঠিকভাবে আদায় করে না বা ছালাতের মধ্যে একাগ্রতা এবং ক্বিরাআত ও দো'আ-দরূদের অর্থ ও মর্ম বুঝা হ'তে উদাসীন থাকে। যদি কারু মধ্যে উক্ত দোষগুলির সবটা পূর্ণভাবে থাকে, তাহ'লে তার 'কর্মগত মুনাফেকী' (كَمُلَ لَهُ النِّفَاقُ الْعَمَلِيُّ) পূর্ণতা পাবে *(ইবনু কাছীর)*। যেমন বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً- 'এটা মুনাফিকের ছালাত, যে বসে সূর্য ডোবার অপেক্ষা করে। তারপর যখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে আসে, (অর্থাৎ ডোবার উপক্রম হয়), তখন দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে (অর্থাৎ আছরের চার রাক'আত ছালাত দ্রুত পড়ে নেয়)। সেখানে সে আল্লাহকে অতি অল্পই স্মরণ করে'।[৫১১] বস্তুতঃ আখেরাতে অবিশ্বাসীদের বাহ্যিক নিদর্শনের মধ্যে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

(৬) اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآؤُوْنَ 'যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে'।

رَاءَاهُ مُرَاءَاةً وَ رِيَاءً 'আসলের বিপরীত দেখানো'। সেখান থেকে يُرَآؤُوْنَ 'তারা লোকদের দেখায়'। অর্থাৎ তারা ছালাত আদায় করে মানুষকে খুশী করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে নয়। সালামাহ বিন কুহায়েল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ 'যে ব্যক্তি লোককে শুনানোর জন্য কাজ করে, আল্লাহ তাকে দিয়েই তা শুনিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাজ করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তা দেখিয়ে দেন'।[৫১২] অর্থাৎ আল্লাহ তাকে লজ্জিত করেন এবং স্পষ্ট করে দেন যে সে আদৌ মোখলেছ নয়। বস্তুতঃ পূর্ণ

---

৫১০. যেমন স্রেফ মাযহাবের দোহাই দিয়ে বা রেওয়াজের দোহাই দিয়ে এদেশের বিরাট সংখ্যক মুসলমান ফজর, যোহর ও আছরের ছালাত অনেক দেরীতে পড়েন, অন্যদিকে এশার ছালাত আগে-ভাগে পড়েন, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের ঘোর বিরোধী এবং যা স্রেফ অলসতা ও ছালাত থেকে উদাসীনতা বৈ কিছুই নয়।

৫১১. মুসলিম হা/৬২২; মিশকাত হা/৫৯৩।

৫১২. বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬ 'শুনানো ও দেখানো' অনুচ্ছেদ।

আল্লাহভীতি এবং খুশূ-খুযূ ও একাগ্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তা না পারলে এমন বিশ্বাস নিয়ে ইবাদত কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৫১৩] পক্ষান্তরে রিয়াকে হাদীছে 'গোপন শিরক' (الشرك الخفى) এবং 'ছোট শিরক' (الشرك الأصغر) বলা হয়েছে।[৫১৪] অতএব এই শিরক থাকলে কেবল ছালাত নয়, কোন নেক আমলই আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً– 'অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার প্রভুর দীদার কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' (*কাহফ ১৮/১১০*)। এখানে ইবাদতে শিরক বলতে রিয়া বা গোপন শিরক বুঝানো হয়েছে, যা যেকোন কবীরা গোনাহের চাইতে বড়। খালেছ অন্তরে তওবা করা ব্যতীত যা মাফ হয় না। অতএব ধ্বংস ঐ সব মুছল্লীর জন্য যারা লোক দেখানো ছালাত আদায় করে। শুধু ছালাত নয়, যেকোন সৎকর্ম যদি তা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা লোকদের শুনানোর উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না।

আলোচ্য আয়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে লোক দেখানোর বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যাতে লোক দেখানোর ইচ্ছা থাকেনা। অথচ লোকে দেখলে বা প্রশংসা করলে মন খুশী হয়- এটি প্রকৃতিগত বিষয়, যা রিয়া ও সুম'আর মধ্যে পড়বে না। যেমন আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ 'ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার রায় কি, যে ব্যক্তি কোন নেক আমল করে, আর লোকেরা তার প্রশংসা করে বা সেজন্য তারা তাকে ভালবাসে'? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ 'এটি হ'ল মুমিনের নগদ সুসংবাদ' (আখেরাতের সুসংবাদ আল্লাহ্র নিকট পাওনা রইল)।[৫১৫]

(৭) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ 'এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে'।

ক্ষতিগ্রস্ত মুছল্লীর তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, সে হবে অত্যন্ত নীচু স্বভাবের। সে এত কৃপণ ও নীচুমনা হবে যে, তার প্রতিবেশীকে নিত্যব্যবহার্য হাড়ি-পাতিল, দা-কোদাল, তৈল-লবণ, পানি বা আগুন পর্যন্ত দিতে চায় না। অনেকে বলেছেন مَاعُون অর্থ যাকাত। সেটাও কমের মধ্যে। কেননা তা হ'ল সঞ্চিত ধনের ৪০ ভাগের একভাগ। সে

---

৫১৩. বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২।
৫১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪, আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩৩৩-৩৪; সনদ জাইয়িদ; ছহীহাহ হা/৯৫১।
৫১৫. মুসলিম হা/২৬৪২; মিশকাত হা/৫৩১৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-২৬, লোক দেখানো ও শুনানো' অনুচ্ছেদ-৫।

এটাও দিতে লোককে নিষেধ করে। অর্থাৎ মুনাফিক ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করে লোক দেখানো। মানুষের সাথে আচরণও করে লোক দেখানো। উভয় ক্ষেত্রেই সে ব্যর্থ।

কুত্বরুব (قطرب) বলেন, أصل الماعون من القلة، والمعن: الشيئ القليل মাঊন-এর আসল অর্থ 'কম'। المعن অর্থ কম বস্তু। আরবরা বলে থাকে مَالُهُ سَعْنَةٌ وَلاَ مَعْنَةٌ 'তার মাল অনেক বেশী, কম নয়'। সেখান থেকে আল্লাহ যাকাত, ছাদাক্বা বা অনুরূপ ছোট-খাট সকল নেকীর বস্তুকে 'মা'ঊন' বলে অভিহিত করেছেন। কেননা তা বেশীর তুলনায় অনেক কম (*কুরতুবী*)। অথচ গাফেল মুছল্লীরা এইসব ছোট-খাট নেকীর কাজও করেনা। বরং পরিবার ও প্রতিবেশীকে তা করতে বাধা দেয়। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক সৎকর্মই ছাদাক্বা'[৫১৬] চাই তা ছোট হৌক বা বড় হৌক।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে মুসলিম রমণীগণ! তোমাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশিনী যেন আপন প্রতিবেশিনীকে বকরীর ক্ষুরের মাঝের গোশত দান করাকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করে (অর্থাৎ যত তুচ্ছ হৌক যেন দান করে)।[৫১৭] আলী ইবনু হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ 'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হ'লেও। যদি তা না পাও, তাহ'লে সুন্দর কথা দিয়ে'।[৫১৮] রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর বোন আসমা (রাঃ)-কে বলেন, আল্লাহ্র পথে খরচ কর। গণনা করো না। তাহ'লে আল্লাহ তোমার উপর গণনা করবেন' (অর্থাৎ রহমতে হিসাব করবেন)।[৫১৯] তিনি বলেন, ছাদাক্বা পাপকে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।[৫২০] আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আল্লাহ্র পথে খরচ কর। আমি তোমার উপর খরচ করব (অর্থাৎ অনুগ্রহ করব)।[৫২১]

উল্লেখ্য যে, 'নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকা'-র বিষয়টি দু'ধরনের। এক প্রকার, যাতে মানুষ গোনাহগার হয়। অন্য প্রকার, যাতে গোনাহগার হয় না। কিন্তু নেকী থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি চাইল। যা না পেলে সে মারা যাবে। যদি তাকে না দেওয়া হয় এবং সে মারা যায়, তাহ'লে অনেক বিদ্বানের মতে ঐ ব্যক্তি খুনের দায়ে

---

৫১৬. বুখারী হা/৬০২১; মুসলিম হা/২৩৭৫, মিশকাত হা/১৮৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়।
৫১৭. বুখারী হা/২৫৬৬, মুসলিম হা/১০৩০, মিশকাত হা/১৮৯২ 'যাকাত' অধ্যায়-৬, 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ-৬।
৫১৮. বুখারী হা/৩৫৯৫, মিশকাত হা/৫৮৫৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'নবুঅতের নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ-৫।
৫১৯. বুখারী হা/২৫৯১, মুসলিম হা/১০২৯, মিশকাত হা/১৮৬১।
৫২০. আহমাদ, তিরমিযী হা/৬১৪, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৯; ছহীহাহ হা/১১২২।
৫২১. বুখারী হা/৫৩৫২, মুসলিম হা/৯৯৩, মিশকাত হা/১৮৬২ 'যাকাত' অধ্যায়-৬, 'আল্লাহ্র পথে ব্যয়' অনুচ্ছেদ-৫।

দোষী সাব্যস্ত হবে এবং 'দিয়াত' (রক্তমূল্য) পাওয়ার হকদার হবে। অন্য ব্যক্তি সাধারণভাবে কোন বস্তু চাইল। কিন্তু দিল না। তাতে গোনাহগার না হ'লেও সে নেকী থেকে বঞ্চিত হবে। একইভাবে মরণোন্মুখ বা এক্সিডেন্টের কোন রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া ও তাকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া অত্যন্ত নেকীর কাজ। গাফলতি করলে দায়ী হ'তে হবে।

ছালাত সম্পর্কে উদাসীন মুছল্লীদের তিনটি প্রধান দোষের কথা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যথা : ছালাতে অবহেলা, লোক দেখানো ছালাত ও কৃপণতা। এ তিনটি বিষয় মুনাফিকদের আলামত হিসাবে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে এভাবে, وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً– 'যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে' (*নিসা ৪/১৪২*)। وَلاَ يُنْفِقُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ 'এবং তারা ব্যয় করে অনিচ্ছুকভাবে' (*তওবা ৯/৫৪*)।

অতএব মানুষের ভেবে দেখা উচিৎ, তার মধ্যে উপরোক্ত দোষগুলি আছে কি-না। যদি থাকে, তবে তওবা করে ফিরে আসবে। আর যদি তওবা না করে, তাহ'লে তার জন্য দুর্ভোগ ও ধ্বংসের দুঃসংবাদ রইল। কেননা إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ মুত্তাক্বীদের আমলই মাত্র কবুল করে থাকেন' (*মায়েদাহ ৫/২৭*)।

৪ হ'তে ৭ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের মন্দ স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। অথচ মক্কায় যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাদের মধ্যে যতদূর জানা যায় কেউ মুনাফিক ছিলেন না। সেকারণ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর একটি মতে এবং ক্বাতাদাহ্র মতে এ চারটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ। তবে অন্যেরা মাক্কী বলেন সম্ভবতঃ একারণে যে, এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য আগাম সতর্কবাণী করা হয়েছে।

সারকথা :

পরকালীন জওয়াবদিহিতায় অবিশ্বাস কিংবা দুর্বল বিশ্বাস মানুষকে বড়-ছোট নানা ধরনের অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে। প্রকৃত মুমিনকে এই দুর্বলতা থেকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে এবং আল্লাহ ও পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসী হ'তে হবে।

সূরা কাওছার (হাউয কাওছার)

সূরা তাকাছুর-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০৮, আয়াত ৩, শব্দ ১০, বর্ণ ৪২।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে 'কাওছার' দান করেছি — اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ ؕ﴿۱﴾

(২) অতএব তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর ও কুরবানী কর। — فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انۡحَرۡ ؕ﴿۲﴾

(৩) নিশ্চয়ই তোমার শত্রুই নির্বংশ। — اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ﴿۳﴾

বিষয়বস্তু :

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে যে অফুরন্ত নে'মত দান করেছেন এবং তাঁর শত্রুরাই যে নির্বংশ সেকথাগুলিই বলা হয়েছে অত্র সূরাতে।

শানে নুযূল :

কুরায়েশ নেতা 'আছ বিন ওয়ায়েল একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দাঁড়িয়ে কোন বিষয়ে কথা বলছিলেন। তখন অন্য নেতারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কার সাথে কথা বলছিলেন?' 'আছ বিন ওয়ায়েল জওয়াবে বলেন, مع ذلك الأبتر 'নির্বংশ ঐ লোকটার সাথে'। আবু লাহাব, আবু জাহ্ল, ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব প্রমুখ নেতাদের সম্পর্কেও প্রায় একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। এই ঘটনার পূর্বে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভজাত রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বিতীয় ও সর্বশেষ পুত্র আব্দুল্লাহ শিশু অবস্থায় মারা যান। তাঁর প্রথম সন্তান ক্বাসেম আগেই মারা গিয়েছিলেন। অথচ চার মেয়ের সবাই বেঁচেছিলেন। কিন্তু মক্কায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম ও শেষ পুত্রসন্তানের কেউ বেঁচে না থাকায় শত্রুরা সুযোগ নেয় এবং তাদের প্রথানুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-কে 'আবতার' বা লেজকাটা বলে তাচ্ছিল্য করতে থাকে। কারণ তাদের ধারণায় মুহাম্মাদ-এর মৃত্যুর পরে তার নাম নেওয়ার লোক কেউ থাকবে না এবং তার দাওয়াতও শেষ হয়ে যাবে। আমরাও এর হাত থেকে বেঁচে যাব। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বভাবতই মনে কষ্ট পান। তখন এই সূরাটি নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। পরবর্তীতে ৮ম হিজরী সনে মদীনায় জন্মগ্রহণকারী মারিয়া ক্বিবতিয়ার গর্ভজাত সর্বশেষ ও তৃতীয় পুত্র ইবরাহীম ১০ম হিজরীর ২৯ শাওয়ালে মারা

গেলে কুরায়েশরা বলতে থাকে, بُتِرَ مُحَمَّدٌ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ 'মুহাম্মাদ নির্বংশ হয়ে গেল। এখন আর কেউ রইল না যে তার পরে তার কাজ চালিয়ে যাবে' *(কুরতুবী)*।

উল্লেখ্য যে, 'আবতার'-এর আলোচনায় তাফসীরে কুরতুবীতে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে রাসূলপুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর পর কুরায়েশদের উক্ত কুট মন্তব্য সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তা ছহীহ নয় এবং ইতিহাসগতভাবে তা অগ্রহণযোগ্য। কেননা মন্তব্যকারী কুরায়েশনেতারা প্রায় সবাই ২য় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে ও তার পরে নিহত বা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাছাড়া ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর কুরায়েশরা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তখন রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দেবার মত কোন নেতা সেখানে অবশিষ্ট ছিলেন না। বরং এসব ছিল হিজরতের অনেক পূর্বে ইসলামের প্রথম দিকের ঘটনা। আর জমহূর মুফাসসিরগণের নিকট এটি মাক্কী সূরা।

তাফসীর :

(১) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে 'কাওছার' দান করেছি' । 'কাওছার' (الكوثر) অর্থ الخير الكثير অজস্র কল্যাণ। মাদ্দাহ হ'ল الكثرة আধিক্য। الكثرة থেকে الكوثر যেমন الجهر থেকে الجوهر। আরবরা সংখ্যা, পরিমাণ ও ভীতির আধিক্য প্রকাশ করার জন্য 'কাওছার' শব্দ ব্যবহার করে থাকে। যেমন ব্যবসা বা সফর থেকে ফিরে আসা ছেলের মাকে জিজ্ঞেস করা হ'লে মা বলেন, رجع بكوثر অর্থ رجع بمال كثير 'বহু মাল নিয়ে ফিরে এসেছে'। অনুরূপভাবে الكوثر من الرجال অর্থ السيد الكثير الخير 'বহু কল্যাণময় নেতা'। الكوثر من العدد অর্থ العدد الكثير من الأصحاب والأشياع 'সাথী ও সম্প্রদায়ের অগণিত লোক' (*কুরতুবী*)। এখানে অর্থ 'হাউয কাওছার' যা জান্নাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে দান করা হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوْتِ وَالدُّرِّ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ– 'আল-কাওছার' হ'ল জান্নাতের একটি নদী। যার দুই তীর স্বর্ণের, গতিপথ মণি-মুক্তার, মাটি মিশকের চাইতে সুগন্ধিময় এবং পানি মধুর চাইতে মিষ্ট ও বরফের চাইতে স্বচ্ছ'।[৫২২]

---

৫২২. বুখারী হা/৪৯৬৬; তিরমিযী হা/৩৩৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৩৪, হাদীছ ছহীহ।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি তন্দ্রালু হয়ে পড়লেন। তারপর মাথা উঁচু করে মুচকি হাসলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ বস্তু আপনাকে হাসালো? তিনি বললেন, এখুনি আমার উপরে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। বলেই তিনি বিসমিল্লাহ সহ সূরা কাওছার পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জানো 'কাওছার' কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটি সেই নদী, যার ওয়াদা আল্লাহ আমাকে করেছেন। যাতে অসংখ্য নে'মত রয়েছে। এটি হ'ল সেই 'হাউয' যেখানে ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মত অবতরণ করবে। যার পাত্ররাজির সংখ্যা হবে নক্ষত্ররাজির ন্যায় অগণিত। অতঃপর কিছু লোককে সেখান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তখন আমি বলব, يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِىْ সাহল বিন সা'দের বর্ণনায় এসেছে, إِنَّهُمْ مِنِّى হে প্রভু! এরা তো আমার উম্মত! তখন বলা হবে, إِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ 'তুমি জানো না তোমার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে কত কিছু নতুন সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি বলব, سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِى 'দূর হও দূর হও! যে আমার পরে আমার দ্বীনে পরিবর্তন করেছে'।[৫২৩] আনাস (রাঃ) হ'তে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ 'আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ একটি নদী পেলাম। যার দুই তীর মণি-মুক্তা দিয়ে গড়া। আমি তখন ঐ নদীর পানিতে হাত দিলাম। দেখলাম তা 'আযফার মিশক' (فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ)। বললাম, জিব্রীল এটা কি? তিনি বললেন, هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ أَعْطَاكَهُ اللهُ– 'এটা হ'ল 'কাওছার' যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন'।[৫২৪] এ হাদীছ থেকে অনেক বিদ্বান দলীল নিয়েছেন যে, সূরাটি মাদানী *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। তবে মক্কায় নাযিল হওয়া সূরাটি পুনরায় মদীনায় শুনানোটা মোটেই বিচিত্র নয়।

ইমাম বুখারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 'কাওছার'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, اَلْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ 'কাওছার' অর্থ 'অজস্র কল্যাণ'। তিনি বলেন, هُوَ الْخَيْرُ الَّذِىْ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ 'এটি সেই কল্যাণ, যা কেবল তাঁকেই (অর্থাৎ রাসূলকে) আল্লাহ দান করেছেন। রাবী আবু বিশ্র (أبو بشر) বলেন, আমি (আমার ঊর্ধ্বতন রাবী)

৫২৩. বুখারী হা/৪৯৬৪; মুসলিম হা/৪০০; মিশকাত হা/৫৫৭১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।

৫২৪. তিরমিযী হা/৩৩৫৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৪৭৩; আহমাদ হা/১২০২৭; হাকেম হা/২৬৬; ছহীহ বুখারী তাফসীর অধ্যায় হা/৪৯৬৬ আনাস (রাঃ) থেকে প্রায় একই শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

সাঈদ ইবনু জুবায়েরকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা ধারণা করে যে, এটা কেবল জান্নাতের একটি নদী? তখন সাঈদ বিন জুবায়ের বললেন, اَلنَّهَرُ الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِىْ أَعْطَاهُا اللهُ إِيَّاهُ 'জান্নাতের উক্ত নদী ঐসব কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন'। ইবনু আব্বাসও একই কথা বলেছেন।[৫২৫]

মুজাহিদ বলেন, هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة 'কাওছার হ'ল দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ কল্যাণ সমূহ' *(ইবনু কাছীর)*। যার মধ্যে রয়েছে তাঁকে দেওয়া বিশ্বব্যাপী নবুঅত ও রিসালাত, কিতাব ও সুন্নাত, ইলম ও শাফা'আত, হাউযে কাওছার, মাক্বামে মাহমূদ, সর্বাধিক সংখ্যক উম্মত, সকল দ্বীনের উপরে ইসলামের বিজয়, শত্রুদের উপরে জয়লাভ, অসংখ্য বিজয়াভিযান এবং ইসলামী খেলাফতের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

কুরতুবী কাওছারের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের ১৬টি মতামত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হ'ল 'হাউয কাওছার'। যেবিষয়ে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছসমূহ এসেছে *(কুরতুবী)*।

(২) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'অতএব তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর ও কুরবানী কর'।

অর্থাৎ অন্যেরা যখন আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা করছে এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের নামে পশু যবেহ করছে, তখন তুমি তাদের বিপরীতে কেবল এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং স্রেফ আল্লাহ্র রেযামন্দীর উদ্দেশ্যে কুরবানী কর। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'তুমি বল আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ কেবলমাত্র বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত' (*আন'আম* ৬/১৬২)। ইবনুল 'আরাবী বলেন, আমি মনে করি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন, أعبد ربك وانحر له فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر– 'তুমি তোমার রবের ইবাদত কর এবং তাঁর জন্য কুরবানী কর। তোমার আমল যেন হয় কেবলমাত্র সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তোমাকে 'কাওছার' দানের জন্য খাছ করেছেন' (*কুরতুবী*)।

نحر অর্থ সীনার উপরের অংশ। উট দাঁড়ানো অবস্থায় তার কণ্ঠনালীর গোড়ায় অস্ত্রাঘাত করে রক্ত বের করে দিয়ে কুরবানী করা হয় বিধায় একে 'নহর' করা বলা হয়। অন্য সকল গবাদিপশু দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বাম কাতে মাটিতে ফেলে ক্বিবলামুখী হয়ে যবহ করা হয়।

---

৫২৫. বুখারী হা/৪৯৬৬ 'তাফসীর' অধ্যায়; নাসাঈ কুবরা হা/১১৭০৪ 'তাফসীর' অধ্যায়।

বস্তুতঃ ছালাত ও কুরবানীর আদেশ কেবল নবীর জন্য খাছ নয়। বরং তাঁর উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য। কেননা কেবলমাত্র তাঁর উম্মতই পৃথিবীর সেরা উম্মত। যারা শেষনবী (ছাঃ)-এর অনুসারী হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ লাভে ধন্য হয়েছে। পরকালে সর্বাধিক জান্নাতী হবার সৌভাগ্য কেবল তাদেরই হবে। অতএব কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদেরই কর্তব্য ছালাত ও কুরবানী করা। এখানে ‘ছালাত’ বলতে ফরয-নফল সকল ছালাত বুঝানো হয়েছে এবং ‘নহর’ বলতে উট ও গরু-ছাগল সব কুরবানীকে বুঝানো হয়েছে।

(৩) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ‘নিশ্চয়ই তোমার শত্রুই নির্বংশ’।

شَنَأَ يَشْنَأُ او شَنِئَ يَشْنَئُ شَنْأً و شَنْأَةً অর্থ বিদ্বেষ পোষণ করা, দুশমনী করা। সেখান থেকে اسم فاعل (কর্তৃকারক) شَانِئٌ অর্থ عَدُوٌّ او مُبْغِضٌ ‘বিদ্বেষী’ বা ‘শত্রু’। بَتَرَ يَبْتُرُ بَتْرًا অর্থ قَطَعَ ‘কর্তন করা’। সেখান থেকে اسم تفضيل হয়েছে الْأَبْتَرُ অর্থ الأقطع যা المقطوع ذكره من كل خير من الدنيا والآخرة ‘দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণময় স্মৃতি হ’তে বিচ্যুত’। আরবদের পরিভাষায় পশুদের মধ্যে ‘আবতার’ (الأبتر) ঐ পশুকে বলা হয়, যার লেজকাটা এবং মানুষের মধ্যে ঐ পুরুষকে বলা হয়, যার কোন পুত্রসন্তান বেঁচে থাকেনা *(কুরতুবী)*। কাফেররা তাঁকে ‘আবতার’ বলত এই ধারণায় যে তাঁর ও তাঁর অনুসরণের মধ্যে কোন কল্যাণ ও বরকত নেই। কারণ তাঁর তাওহীদের দাওয়াত ছিল প্রচলিত শিরকী প্রথার বিরোধী। যা ধনিক শ্রেণী ও সমাজনেতারা কবুল করেননি। অতএব তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে উক্ত দাওয়াত আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়ের, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, ‘অত্র আয়াতে ‘তোমার শত্রু’ বলতে রাসূল বিদ্বেষী ‘আছ বিন ওয়ায়েলকে বুঝানো হয়েছে’। যে ব্যক্তি প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-কে ‘আবতার’ বলেছিল। তবে যুগে যুগে সকল রাসূল বিদ্বেষীই এর মধ্যে শামিল।

অত্র আয়াতের মাধ্যমে শত্রুদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল পুত্রসন্তানই পিতার বংশরক্ষার একমাত্র মাধ্যম নয়। বরং কন্যা সন্তানের মাধ্যমেও আল্লাহ সে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। যেমন ফাতেমার সন্তান হাসান ও হোসায়েনের মাধ্যমে আল্লাহ সেটা করেছেন। তাছাড়া ঈসা (আঃ) ছিলেন মারিয়ামের সন্তান এবং তাঁর কোন বাপ ছিলনা। অথচ আল্লাহ তাঁকে ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন *(আন‘আম ৬/৮৪)*। দ্বিতীয়তঃ পুত্রসন্তান না থাকলে কি হবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রয়েছে এবং থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত লাখো-কোটি অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদী, যারা তাঁর আদর্শিক সন্তান। যারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করবে, তাঁকে ভালোবাসবে এবং তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীনে ইসলামের অনুসরণ করবে। অতএব পুত্র-সন্তান না থাকায়

তিনি নির্বংশ নন, বরং তোমরা যারা পুত্রসন্তান রেখে যাচ্ছ অথচ তারা বেদ্বীন, তারা তোমাদের ইহকালে ও পরকালে কোন কাজে লাগবে না। তোমাদের সুনাম করার মত কেউ থাকবে না। ফলে তোমাদের নাম একদিন স্মৃতির পাতা থেকে মুছে যাবে এবং তোমরাই কার্যতঃ নির্বংশ হবে। কিন্তু পুত্রসন্তান না থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম পৃথিবীর দিকে দিকে দরূদসহ সর্বদা শ্রদ্ধাভরে পঠিত, লিখিত, উচ্চারিত ও গুঞ্জরিত হবে। অতএব হে নবী! তুমি নির্বংশ নও, বরং তোমার শত্রুরাই প্রকৃত অর্থে নির্বংশ ও লেজকাটা।

অত্র সূরায় রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অজস্র কল্যাণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে এবং তজ্জন্য তাঁকে ছালাত ও কুরবানীর মাধ্যমে ইখলাছের সাথে আল্লাহ্র ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর আনীত ইসলামী শরী'আতের বিরোধী ও বিদ্বেষী, তারাই প্রকৃত অর্থে 'আবতার'। তাদের মধ্যে ও তাদের রচিত বিধানের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, কোন বরকত নেই। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন-আমীন!

সারকথা :

কল্যাণধর্মী জ্ঞান ও মঙ্গলময় স্মৃতিই মানুষকে অমর করে রাখে।

সূরা কাফেরূন

(ইসলামে অবিশ্বাসীগণ)

সূরা মা'ঊন-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০৯, আয়াত ৬, শব্দ ২৭, বর্ণ ৯৫।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তুমি বল! হে অবিশ্বাসীগণ!	قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ۙ﴿۱﴾
(২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত কর	لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۙ﴿۲﴾
(৩) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি	وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ﴿۳﴾
(৪) আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যাদের ইবাদত কর	وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ﴿۴﴾
(৫) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি	وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ﴿۵﴾
(৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।	لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِيَ دِيۡنِ ﴿۶﴾

বিষয়বস্তু :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে কাফের সম্প্রদায়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না (১-৫ *আয়াত*)। সর্বশেষ ৬ আয়াতে শিরকের সাথে পরিষ্কারভাবে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।

গুরুত্ব :

ইবনু কাছীর বলেন, هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه، 'এ সূরাটি হ'ল মুশরিকরা যে সকল কাজ করে তা থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণাকারী এবং আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠতার আদেশ দানকারী সূরা' *(ইবনু কাছীর)*।

সূরাটির অন্য নাম হ'ল 'মুনাবিযাহ' (المنابذة) 'শিরক নিক্ষেপকারী'। 'মুক্বাশক্বিশাহ' (المقشقشة) 'ময়লা ছাফকারী'। 'ইখলাছ' (الإخلاص) 'বিশুদ্ধ করা'। যে ব্যক্তি এই সূরা

পাঠ করে, সে যেন এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠ করে। বিদ্বানগণ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, কুরআনের মধ্যে আদেশ ও নিষেধসমূহ (مأمورات ومنهيات) রয়েছে। প্রত্যেকটিই হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত (يتعلق بالقلب والجوارح)। বর্তমান সূরাটি 'হৃদয়' অর্থাৎ তৃতীয় প্রকারের সাথে জড়িত। যার উপরে ইবাদত ভিত্তিশীল। যার জন্যই জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে সূরাটি কুরআনের এক চতুর্থাংশের গুরুত্ব বহন করে *(তাফসীর ইবনু জারীর-হাশিয়া)*।

(১) আনাস ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধাংশের, সূরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের ও সূরা কাফেরূন কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান'।[৫২৬]

(২) জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ত্বাওয়াফের দু'রাক'আতে সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ পাঠ করেন'।[৫২৭] সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাছ হ'ল শিরক মুক্তির সূরা। সূরা দু'টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূল (ছাঃ) এ দু'টি সূরা প্রায় সর্বদা ফজর ও মাগরিবের এবং ত্বাওয়াফের দু'রাক'আত সুন্নাতে পাঠ করতেন।

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের দু'রাক'আতে সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ পাঠ করেন।[৫২৮]

(৪) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতরের ১ম রাক'আতে সূরা আ'লা, ২য় রাক'আতে সূরা কাফেরূন ও ৩য় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। ঐসাথে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করতেন'।[৫২৯]

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِـــ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)- 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ফজরের পূর্বে দু'রাক'আতে এবং মাগরিবের পরের দু'রাক'আতে সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ ২৪ দিন বা ২৫ দিন যাবত পাঠ করতে দেখেছি'।[৫৩০]

(৬) ফারওয়া বিন নওফেল স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, নিদ্রাকালে কি বলব তা আমাকে শিক্ষা দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি নিদ্রাকালে সূরা

---

৫২৬. তিরমিযী হা/২৮৯৪, মিশকাত হা/২১৫৬; ছহীহাহ হা/৫৮৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৬।
৫২৭. মুসলিম হা/১২১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়, 'নবী (ছাঃ)-এর হজ্জ' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/২৫৫৫।
৫২৮. মুসলিম হা/৭২৬, মিশকাত হা/৮৪২ 'ছালাত' অধ্যায়, ১২ অনুচ্ছেদ।
৫২৯. হাকেম ১/৩০৫, আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২ 'বিতর' অনুচ্ছেদ।
৫৩০. আহমাদ হা/৫৬৯৯, সনদ ছহীহ।

কাফেরূন পাঠ কর। কেননা এটি হ’ল শিরক হ’তে মুক্তি ঘোষণার সূরা (براءة من الشرك)।[৫৩১]

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراءة من الشرك– ‘কুরআনে এই সূরাটির চাইতে ইবলীসের জন্য অধিক ক্রোধ উদ্দীপক সূরা আর নেই। কেননা এটি তাওহীদের এবং শিরক মুক্তির সূরা’ (*কুরতুবী*)।

(৮) আছমা‘ঈ বলেন, সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ হ’ল শুকনা ঘায়ের খোসা ছাফকারী (المقشقشتان)। কেননা এ দু’টি সূরা (لأنهما تبرئان من النفاق) তার পাঠককে কপটতা হ’তে মুক্ত করে’ (*কুরতুবী*)।

ফায়েদা :

এদেশে এই সূরাগুলি বিদ‘আতী কাজে ব্যবহার করা হয়, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন মাইয়েতের দাফনের সময় সূরা ফাতিহা, ক্বদর, কাফিরূন, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা বিশেষভাবে পাঠ করা; সূরা কাফিরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই চারটি ‘কুল’ সূরার প্রতিটি ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেওয়া। যাকে এদেশে ‘কুলখানী’ বলা হয়। এগুলি ধর্মের নামে চালু হয়েছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

শানে নুযূল :

(১) ইবনু ইসহাক ও অন্যান্যগণ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন যে, অলীদ বিন মুগীরাহ, ‘আছ বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন আবদুল মুত্ত্বালিব, উমাইয়া বিন খালাফ প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আপোষ প্রস্তাব দিয়ে বলেন, هلم فلنعبدْ ما تعبد، وتعبدْ ما نعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله– ‘এসো আমরা ইবাদত করি যার তুমি ইবাদত কর এবং তুমি ইবাদত কর যাকে আমরা ইবাদত করি। আমরা এবং তুমি আমাদের সকল কাজে পরস্পরে শরীক হই’।[৫৩২] তুমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছ, তা যদি আমাদের দ্বীনের চাইতে উত্তম হয়, তাহ’লে আমরা সবাই তোমার সাথে তাতে শরীক হব। আর যদি আমাদেরটা উত্তম হয়, তাহ’লে তুমি আমাদের সাথে শরীক হবে। তখন অত্র সূরাটি নাযিল হয় (*ইবনু জারীর, কুরতুবী*)।

---

৫৩১. তিরমিযী হা/৩৪০৩; আবুদাঊদ হা/৫০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৫৮; মিশকাত হা/২১৬১।
৫৩২. ইবনু জারীর, কুরতুবী; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৬২ ‘সূরা কাফেরূন নাযিলের কারণ’ অনুচ্ছেদ।

(২) অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা বলেছিল যে, যদি তুমি আমাদের কোন একটি মূর্তিকে চুমু দাও, তাতেই আমরা তোমাকে সত্য বলে মেনে নিব। তখন জিব্রীল অত্র সূরা নিয়ে আগমন করেন এবং তারা নিরাশ হয়ে যায়।[৫৩৩]

(৩) তারা একথাও বলেছিল যে, তুমি চাইলে আমরা তোমাকে এত মাল দেব যে, তুমি সেরা ধনী হবে। তুমি যাকে চাও, তার সাথে তোমাকে বিয়ে দেব। আর আমরা সবাই তোমার অনুসারী হব। কেবল তুমি আমাদের দেব-দেবীদের গালি দেওয়া বন্ধ কর। যদি তাতেও তুমি রাযী না হও, তাহ'লে একটি প্রস্তাবে তুমি রাযী হও, যাতে আমাদের ও তোমার মঙ্গল রয়েছে। আর তা হ'ল, তুমি আমাদের উপাস্য লাত, উযযার এক বছর পূজা কর এবং আমরা তোমার উপাস্যের এক বছর পূজা করব। এইভাবে এক বছর এক বছর করে সর্বদা চলবে'। তখন এই সূরা নাযিল হয় *(ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

তাফসীর :

(১) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ 'তুমি বল! হে অবিশ্বাসীগণ!'

অর্থাৎ তুমি কাফেরদের বল! হে কাফেরগণ!' এখানে কুরায়েশ কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলা হ'লেও এর দ্বারা যুগে যুগে বিশ্বের সকল কাফের ও অবিশ্বাসী সমাজকে বুঝানো হয়েছে। চাই সে ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক-কম্যুনিষ্ট, ধর্মনিরপেক্ষ বা নামধারী ও কপট মুসলিম যেই-ই হৌক না কেন। كَفَرَ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكَافِرٌ অর্থ 'গোপন করা'। বীজ বপন করার পর তা মাটিতে ঢেকে দেওয়া হয় বিধায় কৃষককে আরবীতে আভিধানিক অর্থে 'কাফের' বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا– 'তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও সন্তানের আধিক্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই নয়। যেমন বৃষ্টির অবস্থা, (যার ফলে উদ্গাত) সবুজ ফসল কৃষকদের চমৎকৃত করে। এরপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও..' (*হাদীদ ৫৭/২০*)। এখানে الْكُفَّارَ (কৃষকদের) কথাটি আভিধানিক অর্থে এসেছে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ 'হে নবী! তুমি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান'

৫৩৩. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৬২; কুরতুবী।

(*তাহরীম* ৬৬/৯)। এ আয়াতে اَلْكُفَّارَ (কাফেরদের) কথাটি পারিভাষিক অর্থে এসেছে। উল্লেখ্য যে, এখানে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' অর্থ মৌখিক জিহাদ। সশস্ত্র জিহাদ নয়। কেননা তারা প্রকাশ্যে মুসলমান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করেননি।

(২-৫) لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ، وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ، وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ- 'আমি ইবাদত করিনা তোমরা যাদের ইবাদত কর' (২)। 'এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি' (৩)। 'আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যাদের ইবাদত কর' (৪) 'এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি' (৫)।

আয়াতে مَا أَعْبُدُ-এর مَا অর্থ مَنْ 'যাকে'। অর্থাৎ আল্লাহকে। কেননা مَا (اسم موصول) যখন আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তখন তার অর্থ হয় مَنْ। সাধারণতঃ مَا আসে প্রাণহীন বস্তুর জন্য। পক্ষান্তরে مَنْ আসে প্রাণী ও জ্ঞানবান সত্তার জন্য। এক্ষণে আয়াতের অর্থ হবে لا أعبد الآن ما تعبدون 'আমি এখন ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত কর'। ولا أنتم عابدون فى المستقبل ما اعبد الآن 'তোমরা ভবিষ্যতে ইবাদতকারী নও এখন আমি যার ইবাদত করি'। ولا انا عابد فى المستقبل ما عبدتم فى الماضى 'আর আমি ভবিষ্যতে ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা পূর্ব থেকে করে আসছ'। ولا أنتم عابدون فى المستقبل ما اعبد الآن 'এবং তোমরা ভবিষ্যতে ইবাদতকারী নও এখন আমি যার ইবাদত করি' *(ইবনু জারীর)*। কেননা فعل مضارع বর্তমান কালের অর্থ দেয় এবং اسم فاعل ভবিষ্যৎ কালের অর্থ দেয়।

এর মধ্যে কাফের নেতাদের ইসলাম কবুলের প্রতি রাসূল (ছাঃ)-কে অধিক আগ্রহী না হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আপোষ প্রস্তাবকারীরা যে ভবিষ্যতে কখনো ইসলাম কবুল করবে না, সেকথাও বলে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে সেটাই হয়েছিল। তাদের অধিকাংশ নেতা বদরের যুদ্ধে নিহত হয় এবং বাকী প্রায় সবাই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে *(ইবনু জারীর)*। বস্তুতঃ এর মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সত্যনবী হওয়ার দলীল রয়েছে। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُوْنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ ... بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ- 'তুমি বল, হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ'? ... 'বরং আল্লাহকেই তুমি ইবাদত কর ও কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(যুমার ৩৯/৬৪, ৬৬)*।

আলোচ্য সূরায় ২-৩ আয়াতে বর্ণিত কথাটি পুনরায় ৪-৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হ'ল তাকীদ করা *(ইবনু জারীর)* এবং মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি জোরালোভাবে ব্যক্ত করা। অর্থাৎ তোমরা ইবাদতের নামে যেসব মনগড়া দেব-দেবী ও পন্থা-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছ, ঐসব মাধ্যম ও পদ্ধতি আমি অনুসরণ করি না। আমি কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং কেবল সেই পদ্ধতিতে ইবাদত করি, যে পদ্ধতি আল্লাহ আমাকে বাৎলে দিয়েছেন এবং যে ইবাদত তিনি ভালবাসেন ও যাতে তিনি খুশী হন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَّبِّهِمُ الْهُدَى– 'তারা অনুমান ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে মাত্র। অথচ তাদের নিকটে তাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে পথনির্দেশ এসেছে' *(নাজম ৫৩/২৩)*। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করে থাকেন। অর্থাৎ– لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم– 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং যে শরী'আত নিয়ে রাসূল (ছাঃ) আগমন করেছেন, তার অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছবার কোন পথ নেই'। অথচ মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং নিজেদের মনগড়া ধর্মীয় পদ্ধতির অনুসরণ করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। আর সেকারণেই এগুলির বিরুদ্ধে তাকীদের জন্য বারবার বলা হয়েছে, وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 'আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর'। 'এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি'।

এরূপ পুনরুক্তি বা তাকীদের দৃষ্টান্ত কুরআনের অন্যান্য স্থানেও রয়েছে। আর এটা আরবদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাকরীতি। যেমন সূরা রহমানে– فَبِأَيِّ آلآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ৩১ বার, সূরা মুরসালাতে وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ১০ বার, সূরা নাবা-তে كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ، ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ ২ বার, সূরা শারহতে فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ২ বার, সূরা তাকাছুরে كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ، ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ২ বার, অতঃপর لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ২ বার, সূরা ইনশিক্বাক্বে وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ২ বার, সূরা নিসাতে ৪৮ ও ১১৬ আয়াতে إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ২ বার এবং একই মর্মে সূরা মায়েদাহ ৭২ আয়াতে إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ– এসেছে। অনুরূপভাবে إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى আয়াতটি সূরা নমল ৮০ ও রূম ৫২ তে ২ বার এসেছে।

তবে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, 'অতীতে তোমরা যাদের ইবাদত করেছ, আমি তাদের ইবাদত করিনি এবং ভবিষ্যতে তোমরা যাদের ইবাদত করবে, আমি তাদেরও ইবাদতকারী নই' (*ইবনু কাছীর*)। অর্থাৎ অতীতে ও ভবিষ্যতে সর্বকালে আমি তোমাদের ইবাদতের সাথে আপোষকারী নই।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ দ্বারা 'ইবাদত না করা' (نفى الفعل) বুঝানো হয়েছে এবং وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ দ্বারা 'একেবারেই কবুল না করা' (نفى القبول بالكلية) বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শিরকী পদ্ধতির ইবাদতের বাস্তবায়ন এবং উক্ত আক্বীদা কবুল করার সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করা হয়েছে। হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, وهو قول حسن 'এটাই উত্তম কথা' (*ইবনু কাছীর*)। অথবা এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, ليست عبادتى كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتى 'আমার ইবাদত তোমাদের ইবাদতের মত নয় এবং তোমাদের ইবাদত আমার ইবাদতের মত নয়'। এর মাধ্যমে তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করা হচ্ছে, মা'বূদকে নয়। কেননা তাদের ইবাদত শিরক মিশ্রিত এবং আমার ইবাদত শিরক বিমুক্ত, যা খালেছভাবে কেবল আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত।

আরবরা আল্লাহকে বিশ্বাস করত এবং নবী ইবরাহীমকে মানত। কিন্তু তারা বিগত নেককার লোকদের মূর্তিপূজা করত এবং তাকে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম গণ্য করত। অথচ তাওহীদ বিশ্বাস হ'তে হবে খালেছ ও অবিমিশ্র। যেমন আল্লাহ বলেন, أَلاَ لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ 'জেনে রাখ, খালেছ আনুগত্য কেবল আল্লাহ্রই প্রাপ্য। অথচ যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল করে দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফায়ছালা করে দিবেন তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সুপথ প্রদর্শন করেন না' (*যুমার ৩৯/৩*)। তারা আরও বলত, هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ 'ওরা আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুফারিশকারী' (*ইউনুস ১০/১৮*)। আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃতকে এবং শুনাতে পারো না কোন বধিরকে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়' (*নমল ২৭/৮০; রূম ৩০/৫২*)। তিনি আরও বলেন, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 'তুমি কোন

কবরবাসীকে শুনাতে সক্ষম হবে না' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। ছবি-মূর্তি, ভাষ্কর্য, বেদী-মিনার-সৌধ ও কবরপূজারীরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন কি?

কুরতুবী বলেন, এটা মুশরিকদের কথার পাল্টা কথা হ'তে পারে। যেমন তারা বলেছিল, تعبد آلهتنا ونعبد إلهك ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك 'তুমি ইবাদত কর আমাদের উপাস্যদের এবং আমরা ইবাদত করব তোমার উপাস্যের। অতঃপর তুমি ইবাদত করবে আমাদের উপাস্যদের এবং আমরা ইবাদত করব তোমার উপাস্যের'। একথার জওয়াবে আল্লাহ নাযিল করলেন لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ، وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ 'আমি ইবাদত করিনা তোমরা যার ইবাদত কর'। 'এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি' *(কুরতুবী)*।

এক্ষণে বর্ণিত পাঁচটি আয়াতের বক্তব্য একত্রে দাঁড়াচ্ছে এই যে, قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونها ولا أنتم عابدون الله عزوجل الذى أعبده لإشراككم به، ولا أعبد كعبادتكم، فأنتم كاذبون فى دعوى عبادتكم لله– 'তুমি বল, হে কাফের সমাজ! আমি মূর্তিপূজা করি না, যা তোমরা করে থাক এবং তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো না, যার ইবাদত আমি করে থাকি। কেননা তোমরা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে থাক। আর আমি ইবাদত করি না তোমাদের ইবাদতের ন্যায়। অতএব তোমরা আল্লাহ্র ইবাদতের দাবীতে মিথ্যাবাদী'।

বাক্যে ما অব্যয়টি مصدرية হ'তে পারে। অর্থাৎ ولا أنتم عابدون مثل عبادتى 'তোমরা ইবাদতকারী নও আমার ইবাদতের ন্যায়' *(কুরতুবী)*। যা হ'ল শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস। পক্ষান্তরে তোমাদের ইবাদত হ'ল শিরক মিশ্রিত ভেজাল বিশ্বাস। দু'টি বিশ্বাস ও ইবাদতের পন্থা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক। যেখানে আপোষের ক্ষীণতম কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ 'আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' (*নাহ্ল* ১৬/৩৬)। এখানে আল্লাহ ও ত্বাগূতকে পরস্পরের বিপরীত হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, إِنَّ الْعِبَادَةَ لاَ تَحْصُلُ اِلاَّ بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوْتِ 'ত্বাগূতের সাথে কুফরী করা ব্যতীত আল্লাহ্র ইবাদত হাছিল হয় না'। কেবল 'ইল্লাল্লাহ' বললে তাওহীদের স্বীকৃতি বুঝায় না 'লা ইলাহা' ব্যতীত। কেননা 'ত্বাগূত' হ'ল, كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ 'আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্য'। সেটা কোন জীবিত বা মৃত মানুষ হ'তে পারে, কোন মূর্তি-প্রতিমা, প্রতিকৃতি, জিন-ফেরেশতা, সূর্য-চন্দ্র, পাহাড়-বৃক্ষ বা যে কোন উপাস্য বস্তু হ'তে পারে।

মক্কার মুশরিকরা আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল। অথচ বিভিন্ন মৃত মানুষের মূর্তি গড়ে তার অসীলায় তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করত *(যুমার ৩৯/৩)*। এযুগের পৌত্তলিকরাও এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলে। অথচ নিজেদের মনগড়া মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করে।

বস্তুতঃ এটাই হ'ল বড় শিরক। কেননা এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির চাইতে অসীলার সন্তুষ্টি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। যাবতীয় নযর-নেয়ায, ভেট-তোহফা, ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি কথিত অসীলার কবরে, মূর্তিতে, ছবি ও প্রতিকৃতিতে, মিনারে ও বেদীতে নিবেদিত হয়। অথচ যাকে অসীলা ভেবে পূজা করা হচ্ছে, শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হচ্ছে, যার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে নীরবতা পালন করা হচ্ছে, সে কিছুই দেখছে না, শুনছে না বা জানছে না। বাস্তব কথা এই যে, জাহেলী আরবের এই শিরকী প্রথা বিভিন্ন নামে আধুনিক যুগের উচ্চ শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা পালন করে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে দ্বিধাহীন চিত্তে। সেদিন যেমন কুরায়েশ মুশরিকরা দাবী করত আমরা ইবরাহীমী দ্বীনের খাঁটি অনুসারী 'হানীফ'। আজও তেমনি আমরা মুখে ও কলমে দাবী করছি আমরা 'মুসলমান'। অথচ কাজ করছি মুশরিকের। এর চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি হ'তে পারে? এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*।

(৬) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন'।

دِيْنِ অর্থ الملة والحساب والعادة والحال والسيرة والورع والاعتقاد والاسلام والقضاء والحكم والسلطان والتدبير واسم لجميع ما يعبد به الله 'দল, হিসাব, অভ্যাস, অবস্থা, চরিত, পরহেযগারী, তাওহীদ বিশ্বাস, ইসলাম, ফায়ছালা, নির্দেশ, রাজত্ব, ব্যবস্থাপনা এবং আল্লাহ্র দাসত্বপূর্ণ সকল কাজ' *(আল-মু'জাম)*। এতদ্ব্যতীত এর অর্থ বদলা, আনুগত্য, যবরদস্তি, বাধ্যতা, অবাধ্যতা, মাযহাব, পাপ, গ্লানি ইত্যাদি *(মিছবাহুল লুগাত)*।

কুরতুবী বলেন, 'দ্বীন' অর্থ 'কর্মফল' হ'তে পারে। অর্থাৎ لكم جزاءكم ولى جزائى 'তোমাদের কর্মফল তোমাদের এবং আমার কর্মফল আমার' *(কুরতুবী)*। তানতাভী বলেন, فلكم شرككم ولى توحيدى 'তোমাদের জন্য তোমাদের শিরক এবং আমার জন্য আমার তাওহীদ'। তিনি বলেন, দ্বীন অর্থ হিসাব, কর্মফল, দো'আ, ইবাদত ইত্যাদি হয়ে থাকে' *(তানতাভী)*।

অত্র আয়াতে কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে ধমকি রয়েছে। অর্থাৎ إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا 'যদি তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, তবে আমিও আমার দ্বীন

নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি' (*কুরতুবী*)। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ 'আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম' (*ক্বাছাছ ২৮/৫৫*)। আরও এসেছে, وَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ- 'আর যদি ওরা তোমাকে মিথ্যারোপ করে তাহ'লে তুমি বল, আমার কর্ম আমার এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমি যা করি, তা থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত' (*ইউনুস ১০/৪১*)।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এখানে 'তোমাদের দ্বীন' বলতে ওদের 'কুফরী'কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ওটা হ'ল دين الطاغوت 'ত্বাগুতের দ্বীন'। আর 'আমাদের দ্বীন' বলতে 'ইসলাম'-কে বুঝানো হয়েছে' (*ইবনু কাছীর*)। 'দ্বীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এজন্য যে, তারা তাদের কুফরীকেই দ্বীন বলে মনে করত (*কুরতুবী*)।

এখানে دِيْنِ আসলে ছিল دِيْنِی কিন্তু ی বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং তার নিদর্শন স্বরূপ শেষে যেরযুক্ত নূন হয়েছে। এটা করা হয়েছে আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ বা বিরতির কারণে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ، وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ، وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ- '(ইবরাহীম তাঁর কওমের নিকটে আল্লাহ্র পরিচয় তুলে ধরে বলেন,) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সুপথ প্রদর্শন করেছেন'। 'যিনি আমাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেন'। 'যখন আমি পীড়িত হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন'। 'এবং যিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন, অতঃপর জীবিত করবেন' (*শো'আরা ২৬/৭৮-৮১*)।

হাফেয ইবনু কাছীর বলেন যে, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফেঈ (রহঃ) এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, اَلْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ 'কাফেরকুল সবাই এক দলভুক্ত' (*ইবনু কাছীর*)।

ইসলামই মানবজাতির জন্য একমাত্র দ্বীন :

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম' (*আলে ইমরান ৩/১৯*)। তিনি বলেন, وَمَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْناً فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ- 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, কখনোই তা কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (*আলে ইমরান ৩/৮৫*)। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন নিহিত তাঁর কসম করে বলছি, ইহুদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামী হবে'।[৫৩৪]

কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, অত্র সূরাটি জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে বিধায় এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে *(কুরতুবী)*। কাফিররা মুসলিম দেশে জিযিয়া কর দিয়ে বসবাস করবে। তবে সঠিক কথা এই যে, আমরা আমাদের ইবাদত করব, তারা তাদের ইবাদত করবে। কোন অবস্থাতেই মুসলমান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত করবে না, অন্য কারু বিধান মানবে না, অন্যদের ইবাদতের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না। বরং সর্বাবস্থায় শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী থাকবে।

অত্র আয়াতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জন্য কোন সান্ত্বনা নেই। কেননা শিরক ও কুফর কোন দ্বীন নয়। এটা শয়তানী ফাঁদ মাত্র। ওটার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। জান্নাতপিয়াসী মুমিন অবশ্যই সর্বাবস্থায় আল্লাহ প্রেরিত ইসলামের অনুসারী হবে। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রথমে মুমিনকে ঈমানের গণ্ডীমুক্ত করে। অতঃপর গণতন্ত্র মানুষকে মানুষের দাসত্বে বন্দী করে। অতঃপর তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে। যা তাকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। তাই তাওহীদের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আপোষের কোনই সুযোগ নেই।

সারকথা :

তাওহীদের আক্বীদা মানুষের সার্বিক জীবনকে আল্লাহ্র দাসত্বে গড়ে তোলে। পক্ষান্তরে শিরকের আক্বীদা মানুষকে আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে শয়তানের গোলামীতে আবদ্ধ করে। দু'টির জীবন ও কর্মধারা হয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিপরীতধর্মী। তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করতে হবে এবং উভয়ের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ পৃথক।

---

৫৩৪. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।

সূরা নছর (সাহায্য)

সূরা তওবাহ্র পরে মদীনায় অবতীর্ণ

কুরআনের সর্বশেষ সূরা।

সূরা **১১০**, আয়াত ৩, শব্দ ১৯, বর্ণ ৭৯।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) যখন এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও (মক্কা) বিজয়

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ①

(২) এবং তুমি মানুষকে দেখছ তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করছে

وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ②

(৩) তখন তুমি তোমার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী।

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ③

বিষয়বস্তু :

মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোত্রীয় প্রতিনিধিদল মদীনায় আসতে থাকে এবং দলে দলে মানুষ মুসলমান হতে থাকে, সেকথা বলা হয়েছে প্রথম দু'টি আয়াতে। অতঃপর উক্ত অনুগ্রহ লাভের শুকরিয়া স্বরূপ রাসূলের উচিত আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করা, একথাগুলি বলা হয়েছে তৃতীয় অর্থাৎ শেষ আয়াতে।

গুরুত্ব :

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) একবার ওবায়দুল্লাহ বিন ওৎবা (রাঃ)-কে বলেন, কুরআনের কোন সূরাটি সবশেষে নাযিল হয়েছে জানো কি? ওবায়দুল্লাহ বললেন, জানি, সূরা নছর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ'।[৫৩৫]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, সূরাটি বিদায় হজ্জে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী সময়ে মিনায় নাযিল হয়। অতঃপর তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষণটি প্রদান করেন' (*বায়হাক্বী ৫/১৫২, হা/৯৪৬৪*)।

---

৫৩৫. মুসলিম হা/৩০২৪ 'তাফসীর' অধ্যায়।

(৩) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় মিনাতে অত্র সূরাটি নাযিল হয়। অতঃপর একই সময়ে নাযিল হয় ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার সেই বিখ্যাত আয়াতটি اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْناً، 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য আমি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' (*মায়েদাহ ৫/৩*)। এটা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৮০ দিন পূর্বের ঘটনা। অতঃপর মৃত্যুর ৫০দিন পূর্বে নাযিল হয় কালালাহ্র বিখ্যাত আয়াতটি (*নিসা ৪/১৭৬*)। অতঃপর মৃত্যুর ৩৫ দিন পূর্বে নাযিল হয় সূরা তওবাহ্র সর্বশেষ দু'টি আয়াত-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ، فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-

'নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট যার উপরে কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু'। 'এসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও যে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি' (*তওবাহ ৯/১২৮-১২৯*)। অতঃপর মৃত্যুর ২১ দিন মতান্তরে ৭ দিন পূর্বে নাযিল হয় সূরা বাক্বারাহ্র ২৮১ আয়াতটি-

وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ-

'আর তোমরা ভয় কর ঐ দিনকে, যেদিন তোমরা ফিরে যাবে আল্লাহ্র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মফল পুরোপুরি পাবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' (*বাক্বারাহ ২/২৮১; কুরতুবী, সূরা নছর)*।

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সূরা নছর কুরআনের সর্বশেষ পূর্ণাংগ সূরা হিসাবে বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়েছে। এরপরে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আয়াত নাযিল হলেও কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন ওমর (রাঃ) জ্যেষ্ঠ বদরী ছাহাবীদের মজলিসে আমাকে ডেকে বসালেন। এতে অনেকে সংকোচ বোধ করেন। প্রবীণতম ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) বলেন, أتسأله ولنا بنون مثله 'আপনি ওকে জিজ্ঞেস করবেন? অথচ ওর বয়সের ছেলেরা আমাদের ঘরে রয়েছে'। ওমর (রাঃ) বললেন, সত্বর জানতে পারবেন'। অতঃপর তিনি সবাইকে সূরা নছরের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলেন। তখন সকলে প্রায় একই জওয়াব দিলেন যে, 'এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন বিজয় লাভ হবে, তখন যেন তিনি তওবা-ইস্তেগফার করেন'।

এবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, إِنَّمَا هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ– ‘এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসার খবর দিয়েছেন’। অতঃপর বললাম, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ‘যখন এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়’ অর্থ فذلك علامة موتك ‘এটাতে আপনার মৃত্যুর আলামত এসে গেছে’। অতঃপর فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ‘এক্ষণে তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর ও তওবা-ইস্তেগফার কর’।

এ ব্যাখ্যা শোনার পর ওমর (রাঃ) বললেন, تَلُوْمُوْنِىْ عَلَيْهِ؟ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ– ‘আপনারা আমাকে এই ছেলের ব্যাপারে তিরষ্কার করছিলেন? আল্লাহ্র কসম! হে ইবনে আব্বাস! তুমি যা বলেছ, এর বাইরে আমি এর অর্থ অন্য কিছুই জানিনা’।[৫৩৬] এজন্য এ সূরাকে সূরা তাওদী‘ (التوديع) বা ‘বিদায় দানকারী’ সূরা বলা হয় *(কুরতুবী)*। কেননা এ সূরার মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর চির বিদায়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

তাফসীর :

(১) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ‘যখন এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও (মক্কা) বিজয়’। ‘আল্লাহ্র সাহায্য’ বলতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে আল্লাহ্র সাহায্য। যেমন বদর, ওহোদ, খন্দক, খায়বার প্রভৃতি যুদ্ধে। অতঃপর ‘বিজয়’ অর্থ ‘মক্কা বিজয়’ যা ৮ম হিজরীর **১৭ই** রামাযান মঙ্গলবার সকালে সংঘটিত হয়েছিল। এখানে عطف الخاص على العام হয়েছে। অর্থাৎ সকল সাহায্য, বিশেষ করে মক্কা বিজয়। যেমন বলা হয়েছে, تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَا ‘(ক্বদরের রাত্রিতে) নাযিল হয় ফেরেশতামণ্ডলী ও জিব্রীল’ *(ক্বদর ৯৭/৪)*। এর মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, এখানে إِذَا অর্থ قَدْ অর্থাৎ قَدْ جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ‘অবশ্যই এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়’ *(কুরতুবী)*। কেননা সূরা নছর নাযিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের প্রায় সোয়া দু’বছর পরে **১০**ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের সম্ভবত **১২** তারিখে মিনায় আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী সময়ে। সেকারণ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ‘যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়’ এরূপ অর্থ করা ঠিক হবে না।[৫৩৭] তাছাড়া إِذَا হ’ল

৫৩৬. বুখারী হা/৩৬২৭; তিরমিযী হা/৩৩৬২; কুরতুবী হা/৬৫০৯; ইবনু কাছীর।

৫৩৭. যেমন করেছেন মাওলানা মহিউদ্দীন খান, ড. মুজীবুর রহমান, মাওলানা মওদূদী (উর্দু), মাওলানা ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (উর্দু ও তার বঙ্গানুবাদ) ও ইফাবা, ঢাকা। তবে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী স্বীয় ইংরেজী

تحقيق বা নিশ্চয়তাবোধক অব্যয়, যা إِنْ-এর বিপরীত। কেননা إِنْ হ'ল সন্দেহ বা অনিশ্চয়তাবোধক অব্যয় (*তানতাভী*)।

إِذَا সাধারণত শর্তের অর্থ দেয়, যা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ 'যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাও'।[৫৩৮] কিন্তু إِذَا 'নিশ্চয়তা' অর্থেও আসে, যা নিশ্চিতভাবে ঘটে গেছে ও ঘটছে। যেমন মসজিদে নববীতে জুম'আর খুৎবারত অবস্থায় দেহিইয়াহ বিন খলীফা (তখন অমুসলিম ছিলেন) তবলা বাজাতে বাজাতে তার ব্যবসায়িক মালামাল নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন। তাতে আব্বাস ও ওমর (রাঃ) সহ মাত্র ১২ জন বাদে সব মুছল্লী দ্রুত বেরিয়ে যান। সে উপলক্ষে আয়াত নাযিল হয়, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا 'আর যখন তারা ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখল, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল'।[৫৩৯] এখানে إِذَا ভবিষ্যৎ অর্থে নয় বরং বর্তমান ও নিশ্চিত অর্থে এসেছে।

(২) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجاً 'এবং তুমি মানুষকে দেখছ তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করছে'।

মক্কা বিজয়ের পরের বছর অর্থাৎ ৯ম ও ১০ম হিজরীকে ইতিহাসে عام الوفود 'প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বছর' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ সময় আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা দলে দলে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করছিল। আব্দুল ক্বায়েস গোত্র, ছাক্বীফ গোত্র, ইয়ামন, হামাদান, নাজরান, তাঈ, আশ'আরী ও সর্বশেষ নাখ্ঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল সহ জীবনীকারগণ ৭০-এর অধিক প্রতিনিধিদলের বর্ণনা দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পরে দলে দলে ইসলাম কবুলের অন্যতম কারণ ছিল বিশ্বাসগত। কারণ লোকেরা তখন বলতে থাকলো, যে হারাম শরীফকে আল্লাহ্ হস্তীওয়ালাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই হারামের তত্ত্বাবধায়ক তার কওমের উপর যখন মুহাম্মাদ জয়লাভ করেছেন, তখন তিনি অবশ্যই সত্য নবী (إِنْ ظَهَرَ عَلَي قَوْمِهِ فَهُوَ نَبِىٌّ صَادِقٌ)।[৫৪০]

তাফসীরে যথার্থ অনুবাদ করেছেন When comes the help of God. যদিও God না বলে Allah বলা উচিৎ ছিল।

৫৩৮. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৫১৬, মিশকাত হা/৫৩০২।

৫৩৯. জুম'আ ৬২/১১; বুখারী হা/৪৮৯৯, মুসলিম, তিরমিযী হা/৩৩১১ প্রভৃতি।

৫৪০. বুখারী হা/৪৩০২; 'মাগাযী' অধ্যায়; মিশকাত হা/১১২৬ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ইমামত' অনুচ্ছেদ-২৬।

ইকরিমা ও মুক্বাতিল বলেন, وَرَأَيْتَ النَّاسَ বলতে ইয়ামনী প্রতিনিধিদলের দিকে (বিশেষভাবে) ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা এদের প্রায় সাতশো লোক মুসলমান হয়ে কেউ আযান দিতে দিতে, কেউ কুরআন পাঠ করতে করতে, কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে বলতে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। যাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুবই খুশী হন। কিন্তু ওমর ও আব্বাস (রাঃ) কাঁদতে থাকেন।[৫৪১] ইকরিমা ইবনু আব্বাস হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ খুশী হয়ে বলেন, أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوْبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ– 'ইয়ামনবাসীরা তোমাদের কাছে এসে গেছে। এদের অন্তর বড়ই দুর্বল, হৃদয় খুবই নরম। বুঝশক্তি ইয়ামনীদের এবং দূরদর্শিতা ইয়ামনীদের'।[৫৪২]

অধিকাংশ প্রতিনিধিদলই খুশী মনে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে ইসলাম কবুল করতেন, কেউবা আগেই ইসলাম কবুল করে মদীনায় আসতেন, যাদের দেখে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত আনন্দিত হ'তেন। কিন্তু দূরদর্শী ছাহাবীগণ কেঁদে বুক ভাসাতেন, যেকোন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর আশংকায়।

(৩) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا 'তখন তুমি তোমার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী'।

অর্থাৎ سَبِّحْهُ تسبيحًا مقرونًا بالحمد 'তুমি তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর'। 'তাসবীহ' অর্থ تنزيه الله تعالى عما لا يليق بشأنه 'আল্লাহ্র মর্যাদার উপযুক্ত নয়, এমন সব কিছু থেকে তাঁকে পবিত্র করা'। 'হামদ' অর্থ الثناء على الله بالكمال مع المحبة والتعظيم 'ভালবাসা ও সম্মান সহকারে পূর্ণভাবে আল্লাহ্র প্রশংসা করা'। অত্র আয়াতে পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনাকে একত্রিত করা হয়েছে। এটি হ'ল আল্লাহ্র প্রথম নির্দেশ। অতঃপর দ্বিতীয় নির্দেশটি হ'ল, ইস্তিগফার কর। 'ইস্তিগফার' অর্থ طلب المغفرة ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর 'মাগফিরাত' অর্থ ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع مَحْوِهَا والتجاوز عنها 'পাপ দূরীকরণ ও ক্ষমার মাধ্যমে বান্দার পাপসমূহের উপর আল্লাহ্র পর্দা আরোপ করা'। বস্তুতঃ বান্দার এটাই সবচেয়ে বড় চাওয়া। কেননা বান্দা সর্বদা ভুলকারী। আল্লাহ যদি তাকে দয়া না করেন, তাহ'লে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন রাসূল (ছাঃ)

---

৫৪১. কুরতুবী 'ইবনু আব্বাস' এবং তানতাভী 'আব্বাস' বলেছেন। সম্ভবত আব্বাসই সঠিক।
৫৪২. বুখারী হা/৪৩৯০, মুসলিম হা/৫২; মিশকাত হা/৬২৫৮; কুরতুবী হা/৬৫০৩।

বলেন, لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ. قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِه 'তোমাদের কেউ তার আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ছাহাবীগণ বললেন, আপনিও নন হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন, না। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা আবৃত করেন'।[৫৪৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ فصل حامدا له على ما آتاك من الظفر والفتح وسل الله الغفران 'আল্লাহ তোমাকে যে সফলতা ও বিজয় দান করেছেন, সেজন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর (*কুরতুবী*)। অর্থাৎ দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। এখন তোমার গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নেই। অতএব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ কর ও ইস্তিগফার কর। এখানে মক্কা বিজয়কে অধিক গুরুত্ব দেবার কারণ, এটা হ'ল আল্লাহ্‌র ঘর। যা ছিল তাওহীদের কেন্দ্রবিন্দু এবং যা ছিল ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর হাতে নির্মিত আল্লাহ্‌র ইবাদতগৃহ। অথচ সেটি শিরকের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ আরবরা ভাবত, বায়তুল্লাহ্‌র অধিকারীরাই أهل الله বা আল্লাহওয়ালা। যাদেরকে আল্লাহ আবরাহা বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব কা'বাকে শিরকমুক্ত করা এবং মানুষের ভুল বিশ্বাস ভেঙ্গে দেবার স্বার্থে মক্কা বিজয় খুবই যরূরী ছিল।

تَوَّابٌ-এর ওযন فَعَّالٌ যা اسم فاعل مبالغة যার দ্বারা কর্তার কর্মে আধিক্য বুঝানো হয়। এটি আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বান্দার ক্ষেত্রে হ'লে অর্থ হবে 'আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক তওবাকারী (التائب إلى الله)' এবং আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে হ'লে অর্থ হবে 'বান্দার তওবা অধিক কবুলকারী (التائب على العبد)'। এক্ষণে إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً অর্থ لم يزل الله عز وجل تواباً على عبده، إذا استغفره 'আল্লাহ সর্বদা বান্দার তওবা কবুলকারী, যখনই সে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে'।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, সূরা নছর নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন কোন ছালাত আদায় করেননি, যেখানে রুকূ ও সিজদায় নিম্নের দো'আটি পাঠ করেননি, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ 'সকল পবিত্রতা তোমার হে আল্লাহ, তুমি আমাদের পালনকর্তা, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর'।[৫৪৪]

---

৫৪৩. বুখারী হা/৬৪৬৩; মুসলিম হা/২৮১৬; মিশকাত হা/২৩৭১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ।
৫৪৪. বুখারী হা/৭৯৪, মুসলিম/৪৮৪; মিশকাত হা/৮৭১; কুরতুবী হা/৬৫০৭।

এতদ্ব্যতীত বুখারী, মুসলিম, আহমাদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বহু দো'আ বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্র নিকটে নিজের দীনতা প্রকাশ করতেন এবং তাঁকে যে পুরস্কার আল্লাহ দান করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করতেন।

প্রশ্ন হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর তো আগে-পিছে সব গোনাহ মাফ, এমতাবস্থায় তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার হুকুম দেওয়ার অর্থ কি? এরূপ প্রশ্ন একবার আয়েশা (রাঃ) করলে তার জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ؟ 'আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না'?[৫৪৫]

ইমাম কুরতুবী বলেন, الاستغفار تعبُّد يجب إتيانه، لا للمغفرة، بل تعبُّدا 'ক্ষমা প্রার্থনা হ'ল দাসত্ব প্রকাশ করা, যা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা ওয়াজিব। ক্ষমার জন্য নয় বরং দাসত্ব প্রকাশের জন্য' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ আল্লাহ্র প্রতি অধিকহারে বিনয় ও দাসত্ব পেশ করা।

তিনি বলেন, এর মধ্যে তাঁর উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যেন তারা শংকাহীন না হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে না দেয়। তিনি বলেন, নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন অন্যদের কেমন করা উচিত? (*কুরতুবী*)।

অন্য হাদীছে এসেছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দৈনিক একশো বার তওবা- ইস্তেগফার করতেন ও নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে' (আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)।[৫৪৬]

সারকথা :

আল্লাহ্র রহমত লাভের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করলে তাঁর প্রতি অধিকতর অনুগত ও ক্ষমাপ্রার্থী হ'তে হবে।

---

৫৪৫. বুখারী হা/১১৩০, মুসলিম হা/২৮১৯-২০; মিশকাত হা/১২২০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ-৩৩।

৫৪৬. তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/১৫১৭, মিশকাত হা/২৩৫৩, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৪; ছহীহাহ হা/২৭২৭।

সূরা লাহাব (স্ফুলিঙ্গ)

সূরা ফাতেহার পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা **১১১**, আয়াত ৫, শব্দ ২৯, বর্ণ ৮১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) ধ্বংস হৌক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে। — تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١

(২) তার কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে। — مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢

(৩) সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। — سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣

(৪) এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী। — وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤

(৫) তার গলদেশে খর্জুরপত্রের পাকানো রশি। — فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

[আবু লাহাব ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা ও নিকটতম শত্রু প্রতিবেশী। তার স্ত্রী ছিলেন আবু সুফিয়ানের বোন 'আওরা বিনতে হারব উম্মে জামীল।]

বিষয়বস্তু :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ধ্বংস কামনা করে চাচা আবু লাহাব যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তার জওয়াব *(১-৩ আয়াত)*। (২) আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের নিকৃষ্টতম শত্রুতার মন্দ পরিণতি বর্ণনা *(৪ -৫ আয়াত)*।

শানে নুযূল :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর আয়াত নাযিল হ'ল, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'আর তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়-পরিজনকে সতর্ক কর' *(শো'আরা ২৬/২১৪)*, তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী একদিন সকালে ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সকলের উদ্দেশ্যে বিপদসংকেতমূলক ভাষায় ডাক দিয়ে বলেন, يا صَباحاه (প্রত্যুষে সকলে সমবেত হও!)। এভাবে রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকলেন। অতঃপর সবাই হাযির হ'লে তিনি বলেন, أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِى؟ قَالُوا بَلَى– আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শত্রুসেনা তোমাদের উপরে

সকালে বা সন্ধ্যায় হামলার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহ'লে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না? সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, অবশ্যই করব। কেননা, مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا 'আমরা এযাবত তোমার কাছ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই পাইনি'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ 'আমি ক্বিয়ামতের কঠিন আযাবের প্রাক্কালে তোমাদের নিকটে সতর্ককারী রূপে আগমন করেছি'। অতঃপর তিনি আবেগময় কণ্ঠে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন,

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ هَاشِمٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّىْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا -

'হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা'ব বিন লুআই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব! আমি আল্লাহ্র আযাব থেকে তোমার কোনই কাজে আসব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহ্র পাকড়াও হ'তে রক্ষা করতে পারব না'। তবে তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ وَلاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا 'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী নাও। কিন্তু আল্লাহ্র পাকড়াও হ'তে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না'।[৫৪৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إلا ان تقولوا لآ اله الا الله 'তবে যদি তোমরা বল *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*' (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)।[৫৪৮]

---

৫৪৭. বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৪, ২০৬; আহমাদ হা/৮৭১১; মিশকাত হা/৫৩৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-২৬, 'সতর্ক করা ও ভয় প্রদর্শন করা' অনুচ্ছেদ-৮।

৫৪৮. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ১/৬৪।

রাসূল (ছাঃ)-এর এই মর্মস্পর্শী আবেদন গর্বোদ্ধত চাচা আবু লাহাবের অন্তরে দাগ কাটেনি। তিনি চিৎকার দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের উপর বলে দিলেন تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ 'সকল দিনে তোমার উপর ধ্বংস আপতিত হৌক! এজন্য তুমি আমাদের জমা করেছ'? বলেই তিনি উঠে যান। অতঃপর অত্র সূরাটি নাযিল হয়।[৫৪৯] কথিত আছে যে, এই সময় আবু লাহাব রাসূল (ছাঃ)-কে পাথর মারতে উদ্যত হন। কিন্তু আল্লাহ তাকে প্রতিরোধ করেন' *(কুরতুবী; আর-রাহীক্ব ৮৬ পৃ:)*।

আবু লাহাব কথাটি তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন। কেননা আখেরাতে জবাবদিহিতার কথা তাদের আগেই জানা ছিল। কিন্তু এটি তাদের কাছে অতীব তুচ্ছ বিষয় ছিল। দুনিয়া তাদেরকে গ্রাস করেছিল ও আখেরাত থেকে বেপরওয়া করেছিল।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আপন চাচাদের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ ছিলেন। ১. যারা তাঁর উপরে ঈমান এনেছিলেন ও তাঁর সাথে জিহাদ করেছিলেন। যেমন হামযাহ ও আব্বাস (রাঃ)। ২. যারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করেন। যেমন আবু তালিব। ৩. যারা শুরু থেকে মৃত্যু অবধি শত্রুতা করেন। যেমন আবু লাহাব।

আবু লাহাবের পরিচয় :

আবু লাহাব ছিলেন কুরায়েশ নেতা আব্দুল মুত্ত্বালিবের দশজন পুত্রের অন্যতম। নাম আব্দুল ওযযা। অর্থ, ওযযা দেবীর গোলাম। লালিমাযুক্ত গৌরবর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ায় তাকে 'আবু লাহাব' বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গওয়ালা বলা হ'ত। তার আসল নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। কেননা তা ছিল তাওহীদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আল্লাহ তার আবু লাহাব উপনামটি কুরআনে উল্লেখ করেছেন। কেননা এর মধ্যে তার চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবার দুঃসংবাদটাও লুকিয়ে রয়েছে।

আবু লাহাব ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর সেই প্রিয় চাচা যিনি (১) তাঁর জন্মের খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সর্বত্র দৌড়ে গিয়ে লোকদের নিকট খবরটি পৌঁছে দেন যে, তার মৃত ছোট ভাই আব্দুল্লাহ্‌র বংশ রক্ষা হয়েছে। আর এই সুখবরটি প্রথম তাকে শুনানোর জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করে দেন।[৫৫০] (২) তিনি ছিলেন মক্কায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটতম প্রতিবেশী (৩) তার দুই ছেলে উৎবা ও উতাইবার সাথে নবুঅতপূর্বকালে রাসূল (ছাঃ)-এর দুই মেয়ে রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়।[৫৫১]

---

৫৪৯. বুখারী হা/৪৭৭০, ৪৯৭১; মুসলিম হা/২০৮; তিরমিযী হা/৩৩৬৩; কুরতুবী হা/৬৫১২; মিশকাত আলবানী হা/৫৩৭২।

৫৫০. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২৭৩; আলবানী, ছহীহ সীরাতুন নববিইয়াহ পৃ: ১৫।

৫৫১. আর-রাহীক্বুল মাখতূম পৃ: ৮৬।

এত আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সবকিছু তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়ে যায় রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের পর। আবু লাহাব কখনোই তার ভাতিজার সুনাম-সুখ্যাতি ও নবুঅত লাভের মত উচ্চ মর্যাদা অর্জনের বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। যেমন মেনে নিতে পারেননি অন্যতম বংশীয় চাচা আবু জাহল ও তার সাথীরা। ফলে শুরু হয় শত্রুতা। তার পক্ষে সম্ভব কোনরূপ শত্রুতাই তিনি বাকী রাখেননি। যেমন, (১) আবু লাহাব তার দু'ছেলেকে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করেন। এই দু'মেয়েই পরবর্তীতে একের পর এক হযরত ওছমান (রাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। (২) রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ, যার লকব ছিল ত্বাইয়েব ও ত্বাহের, মারা গেলে আবু লাহাব খুশীতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলেন মুহাম্মাদ এখন 'আবতার' অর্থাৎ লেজকাটা ও নির্বংশ হয়ে গেল। সেযুগে কারু পুত্রসন্তান না থাকলে এরূপই বলা হ'ত। একথারই প্রতিবাদে সূরা কাওছার নাযিল হয় এবং আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 'নিশ্চয়ই তোমার শত্রুই নির্বংশ'। (৩) হজ্জের নিরাপদ মওসুমে রাসূল (ছাঃ) বহিরাগত হাজীদের তাঁবুতে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। তখন আবু লাহাব তাঁর পিছু নিতেন এবং লোকদের ভাগিয়ে দিতেন এই বলে যে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تُطِيْعُوْهُ فَإِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ 'হে লোকসকল! তোমরা এর আনুগত্য করো না। কেননা সে ধর্মত্যাগী, মহা মিথ্যুক'। এমনকি যুল-মাজায (ذو المجاز) নামক বাজারে যখন তিনি লোকদের বলছিলেন, قُوْلُوْا لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا 'তোমরা বলো *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' তখন আবু লাহাব পিছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছিলেন। যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যায়।[৫৫২]

আবু লাহাবের স্ত্রী :

নাম : 'আওরা (العوراء) অথবা আরওয়া (أروى) বিনতে হারব ইবনে উমাইয়া। উপনাম : উম্মে জামীল। কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের বোন। ট্যারাচক্ষু হওয়ার কারণে তাকে 'আওরা' (عوراء) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবনুল 'আরাবী তাকে عوراء أم قبيح বা 'ট্যারাচক্ষু সকল নষ্টের মূল' বলেন *(কুরতুবী)*। কুরায়েশদের নেতৃস্থানীয় মহিলাদের অন্যতম এই মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে সকল প্রকার চক্রান্তে ও দুষ্কর্মে তার স্বামীর পূর্ণ সহযোগী ছিলেন *(ইবনু কাছীর)*। সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে গীবত, তোহমত ও চোগলখুরীতে লিপ্ত থাকতেন। কবি হওয়ার সুবাদে ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে তার নোংরা প্রচারণা অন্যদের চাইতে বেশী ছিল। চোগলখুরীর মাধ্যমে সংসারে ভাঙ্গন ধরানো ও সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালানো দু'মুখো ব্যক্তিকে আরবরা حَمَّالَةُ الْحَطَبِ

৫৫২. আহমাদ হা/১৬০৬৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৫৬২; দারাকুৎনী হা/২৯৫৭ সনদ ছহীহ, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; কুরতুবী হা/৬৫১৩; তাফসীর ইবনু কাছীর; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৮২।

ইন্ধন বহনকারী বা খড়িবাহক বলত। সে হিসাবে এই মহিলাকে কুরআনে উক্ত নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগে উক্ত মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর যাতায়াতের পথে বা তাঁর বাড়ীর দরজার মুখে কাঁটা ছড়িয়ে বা পুঁতে রাখতেন। যাতে রাসূল (ছাঃ) কষ্ট পান।

সূরা লাহাব নাযিল হ'লে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মহিলা হাতে প্রস্তরখণ্ড নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে মারার উদ্দেশ্যে কা'বা চত্বরে গমন করেন। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় রাসূল (ছাঃ) সামনে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে দেখতে পাননি। অবশেষে রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে দাঁড়ানো আবুবকরের কাছে তার মনের ঝাল মিটিয়ে বলেন, আবুবকর! তোমার সাথী নাকি আমাকে ব্যঙ্গ করেছে? আল্লাহ্র কসম, যদি আমি তাকে পেতাম, তাহ'লে এই পাথর দিয়ে তার মুখে মারতাম। আল্লাহ্র কসম! আমি একজন কবি। বলেই তিনি রাগতঃস্বরে কবিতা পাঠ করেন-

مُذَمَّمًا عَصَيْنَا + وأَمْرَهُ أَبَيْنَا + ودِينَهُ قَلَيْنَا

'নিন্দিতের আমরা নাফরমানী করি'। 'তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি'। 'তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি'। উল্লেখ্য যে, কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত)-এর বদলে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) নামে আখ্যায়িত করেছিল এবং ঐ নামে তারা তাঁকে গালি দিত।[৫৫৩]

আবু লাহাবের পরিণতি :

বদর যুদ্ধে পরাজয়ের দুঃসংবাদ মক্কায় পৌঁছবার সপ্তাহকাল পরে আবু লাহাবের গলায় গুটিবসন্ত দেখা দেয় এবং তাতেই সে মারা পড়ে। সংক্রমণের ভয়ে তার ছেলেরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। কুরায়েশরা এই ব্যাধিকে মহামারী হিসাবে দারুণ ভয় পেত। তিনদিন পরে লাশে পচন ধরলে কুরায়েশ-এর এক ব্যক্তির সহায়তায় আবু লাহাবের দুই ছেলে লাশটি মক্কার উচ্চভূমিতে নিয়ে যায় এবং সেখানেই একটি গর্তে লাঠি দিয়ে ফেলে পাথর চাপা দেয়।[৫৫৪] অহংকারী যালেমের পতন এভাবেই হয়। কুরআনের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। তার মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসেনি।

তাফসীর :

(১) تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ' ধ্বংস হৌক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে'।

تَبَّ تَبَابًا অর্থ خسر، خاب، هلك 'ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, নিরাশ হওয়া, ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি।

التباب অর্থ الخسار 'ধ্বংস হওয়া'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ 'আর ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল পুরোপুরি' *(গাফের/মুমিন ৪০/৩৭)*।

৫৫৩. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৫৫-৫৬; ফাৎহুল বারী ৮/৬১০ প্রভৃতি; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।
৫৫৪. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬৪৬; বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুঅত ৩/১৪৫-১৪৬; আল-বিদায়াহ ৩/৩০৯; আর-রাহীক্ব পৃঃ ২২৫-২৬; কুরতুবী।

আবু লাহাব যে ভাষায় আল্লাহ্র রাসূলের ধ্বংস কামনা করেছিল, ঠিক সেই ভাষায় অত্র আয়াতে তার ধ্বংস কামনা করা হয়েছে। আবু লাহাব রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিল تَبًّا لَكَ 'তোমার ধ্বংস হৌক'। একইভাবে তাকে বলা হয়েছে تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ 'আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হৌক এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে'। এখানে দু'হাত বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ মূলতঃ দু'হাত দিয়েই সব কাজ করে থাকে। তাছাড়া আরবদের পরিভাষায় বস্তুর একটি অংশকে পূর্ণ বস্তু হিসাবে বুঝানো হয় এবং ব্যক্তির দু'হাত দ্বারা মূল 'ব্যক্তি'কে বুঝানো হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ 'এটা তোমার দু'হাতের কর্মফল। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না' *(হজ্জ ২২/১০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا- 'যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা তার দু'হাত অগ্রিম প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি মাটি হ'তাম'! *(নাবা ৭৮/৪০)*। উভয় আয়াতেই দু'হাতকে 'ব্যক্তি' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতেও 'আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হৌক' অর্থ আবু লাহাব ধ্বংস হৌক!

(২) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ 'কোন কাজে আসেনি তার মাল-সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে'। অর্থাৎ যেসব ধন-সম্পদ সে তার পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এবং যা সে নিজে উপার্জন করেছে, কোন কিছুই তার কাজে আসেনি এবং তার ধ্বংস সে ঠেকাতে পারেনি।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, وَمَا كَسَبَ অর্থ তার সন্তানাদি। যেমন মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ- 'মানুষ যা নিজে উপার্জন করে সেটাই তার সর্বাধিক পবিত্র খাদ্য। আর তার সন্তান তার উপার্জনের অংশ'।[৫৫৫] অর্থাৎ আবু লাহাবের মাল ও সন্তানাদি তার কোন কাজে আসেনি। শুধু তাই নয়, তার সম্মান ও পদমর্যাদা এবং শক্তি ও ক্ষমতা কোনটাই কোন কাজে লাগেনি। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন স্বীয় কওমকে ঈমানের দাওয়াত দেন ও আখেরাতে আযাবের ভয় দেখান, তখন আবু লাহাব তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিল, إذا كان ما يقول ابن أخي حقا، فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي- 'আমার ভাতিজার কথা যদি সঠিক হয়, তাহ'লে আমি ক্বিয়ামতের দিন আমার ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নেব'। অত্র আয়াতে তার জওয়াব এসেছে *(ইবনু কাছীর)*। উল্লেখ্য যে, মক্কায়

---

৫৫৫. আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯০; মিশকাত হা/২৭৭০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।

গোপন দাওয়াতের তিন বছরে যে ৪০-এর অধিক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেন, ইবনু মাসঊদ ছিলেন তাদের অন্যতম। অতঃপর নবুঅতের চতুর্থ বর্ষে ছাফা পাহাড়ে অত্র দাওয়াতের ঘটনা ঘটে। আবু লাহাবের সন্তানদের ইবনু আব্বাস (রাঃ) الكسب الخبيث বা 'নষ্ট উপার্জন' বলে অভিহিত করেন *(কুরতুবী)*।

(৩) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ 'সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে'।

অর্থাৎ ভয়ংকর দাহিকাশক্তিসম্পন্ন ও চূড়ান্তভাবে উত্তপ্ত জাহান্নামে সে প্রবেশ করবে। صَلَى يَصْلَى صَلْيًا 'প্রবেশ করা'। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ- 'অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (*মুত্বাফফেফীন* ৮৩/১৬)। إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ 'কেবল তাদের ব্যতীত যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (*ছাফফাত* ৩৭/১৬৩)। ذَاتَ لَهَبٍ অর্থ ذات اشتعال وتلهّب وإحراق شديد 'জোশ ও স্ফুলিঙ্গওয়ালা এবং প্রচণ্ড দাহিকাশক্তি সম্পন্ন' (*কুরতুবী, ইবনু কাছীর*)। আয়াতে سَيَصْلَى 'সত্বর সে প্রবেশ করবে' বলা হয়েছে। অথচ তা ক্বিয়ামতের পরে ঘটবে। এখানে س এসে تحقيق বা 'নিশ্চয়তা' অর্থে। অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই সে প্রবেশ করবে'। দুনিয়ার হিসাবে ক্বিয়ামত দূরের হলেও আখেরাতের হিসাবে তা খুবই নিকটবর্তী। ঘুমন্ত মানুষ সারারাত ঘুমিয়ে উঠে যেমন বলে এইমাত্র ঘুমালাম। পুনরুত্থান দিবসে মানুষের ভাবনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا 'সেদিন যখন তারা এটা দেখবে, তখন তাদের মনে হবে, তারা (দুনিয়াতে) একটি রাত্রি বা একটি দিনের অধিক অবস্থান করেনি' *(নাযে'আত ৭৯/৪৬)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا- وَنَرَاهُ قَرِيْبًا- 'তারা ঐ দিনকে (ক্বিয়ামতকে) অনেক দূরে মনে করে'। 'কিন্তু আমরা তা দেখছি নিকটে' *(মা'আরিজ ৭০/৬-৭)*।

বিদ'আতীরা তাদের আবিষ্কৃত মীলাদুন্নবীর মজলিসে জাল হাদীছ বলে থাকে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মগ্রহণে খুশী হওয়ার কারণে প্রতি সোমবার আবু লাহাবের উপর জাহান্নামের শাস্তি মওকূফ করা হয়। তাছাড়া অন্যদিন জাহান্নামে আযাব হ'লেও তার শাহাদাত অঙ্গুলিটি আযাবমুক্ত থাকে। কেননা সে রাসূল জন্মের খবরে খুশী হয়ে ঐ আঙ্গুলটি উঁচু করে দৌড়ে সবাইকে সুসংবাদটি পৌঁছে দিয়েছিল'। নিঃসন্দেহে এগুলি বিদ'আতীদের উদ্ভট কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। এবিষয়ে কুফরী অবস্থায় চাচা আব্বাস-এর একটি স্বপ্নের কথা বলা হয়, যার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

ইবনু কাছীর বলেন, বিদ্বানগণ বলেন যে, সূরাটি রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅতের অন্যতম দলীল। কেননা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী প্রকাশ্যে বা গোপনে মৃত্যু অবধি কখনো ঈমান

আনেনি। বরং কাফের অবস্থাতেই উভয়ের মৃত্যু হয়েছে। অত্র আয়াতে যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সূরাটি আবু লাহাবের মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে নাযিল হয়।

শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরায়েশ নেতাদের নির্যাতিত হাবশী গোলাম বেলাল ইসলামের বরকতে মহা সম্মানিত হ'ল। আর ইসলাম গ্রহণ না করায় সম্মানিত কুরায়েশনেতা আবু লাহাব অসম্মানিত ও জাহান্নামী হ'ল। ফরয ও নফল ছালাতসমূহে মুসলমান যতবার এই সূরা পাঠ করে, ততবার প্রতি হরফে দশটি করে নেকী পায়। অথচ তাতে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ ও ধ্বংসের কথা বলা হয়। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা মর্যাদামণ্ডিত করুন-আমীন!

(৪) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ 'এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী'।

অর্থাৎ আবু লাহাবের স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে একইভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। حَمَّالَةُ الْحَطَبِ অর্থ 'ইন্ধন বহনকারী'। আগুন জ্বালানোর ইন্ধন হিসাবে যেসব খড়িকাঠ জমা করা হয়। আরবরা দু'মুখো, চোগলখোর ও গীবতকারীদের এই নামে আখ্যায়িত করত। কেননা এর দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে দ্রুত অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখ বলেন যে, আবু লাহাবের স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে নিন্দা ও চোগলখুরী করে এই আগুন জ্বালানোর কাজটিই করত' (*কুরতুবী*)। উক্ত মহিলা 'উম্মে জামীল' উপনামে পরিচিত ছিল। যার অর্থ 'সুন্দরের মা'। অথচ প্রকৃত অর্থে সে ছিল أم قبيح অর্থাৎ 'নষ্টের মূল'। তাই কুরআন তার উপনাম বাদ দিয়ে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ 'খড়ি বহনকারিণী' বলে তার চোগলখুরীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে।

ক্বাতাদাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, সে সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর দরিদ্রতাকে তাচ্ছিল্য করত। অথচ প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সীমাহীন কৃপণতার কারণে সে নিজে কাঠ বহন করত। ফলে কৃপণ হিসাবে লোকেরা তাকে তাচ্ছিল্য করত। এত ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে কাঁটাযুক্ত ঘাস ও লতাগুল্ম বহন করে এনে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত (*কুরতুবী*)। ইবনু জারীর এ বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন (*ইবনু কাছীর*)।

(৫) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ 'তার গলদেশে খর্জুরপত্রের পাকানো রশি'। অর্থাৎ খেজুরপাতা দিয়ে পাকানো রশি দিয়ে কাঁটাযুক্ত লতাগুল্ম বেঁধে ঘাড়ে করে বা গলায় ঝুলিয়ে সে বহন করে আনত। হাসান বাছরী বলেন, 'মাসাদ' হ'ল ইয়ামনে উৎপন্ন এক প্রকার গাছের পাকানো রশি। আবু ওবায়দা বলেন, পশমের রশি (*কুরতুবী*)। তানতাভী বলেন, কঠিনভাবে পাকানো রশি, যা গাছের ছালপাতা দিয়ে বা চামড়া দিয়ে বা অন্যকিছু দিয়ে তৈরী হ'তে পারে (*তানতাভী*)। যাহহাক ও অন্যান্যগণ বলেন, 'ঐ রশিই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের রশি হবে'। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রীর মণিমুক্তাখচিত বহু মূল্যবান একটি কণ্ঠহার ছিল। যেটা দেখিয়ে সে লোকদের বলত,

وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى لَأُنْفِقَنَّهَا فِي عَدَاوَةِ مُحَمَّدٍ– 'লাত ও ওযযার কসম! এটা আমি অবশ্যই ব্যয় করব মুহাম্মাদের শত্রুতার পিছনে'। এ কণ্ঠহারই তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আযাবের কণ্ঠহার হবে' (*কুরতুবী*)।

কুরায়েশ বংশের একজন সম্মানিত ও ধনশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম আচরণ করায় আল্লাহ আবু লাহাবের স্ত্রীকে নিম্নশ্রেণীর 'কাঠ কুড়ানী' মহিলাদের সাথে তুলনা করেছেন' (*তানতাভী*)।

আবু লাহাবের স্ত্রীর পরিণতি :

মুররাহ আল-হামদানী বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটাযুক্ত ঝোপের বোঝা এনে মুসলমানদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে রাতের বেলা একাজ করত। একদিন সে বোঝা বহনে অপারগ হয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়ে। তখন ফেরেশতা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরে এবং সেখানেই তাকে শেষ করে দেয়' (*কুরতুবী*)।

বস্তুতঃ আবু লাহাব ও উম্মে জামীলের মত ধনশালী পুঁজিপতি দুশমনরা সে যুগেও যেমন ইসলামের শত্রুতায় তাদের যথাসর্বস্ব ব্যয় করেছে, এ যুগেও তেমনি তারা তা করে যাচ্ছে। সেদিন যেমন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী গীবত-তোহমত ও অপপ্রচারের মাধ্যমে শত্রুতা করেছিল, আজও তেমনি ইসলামের প্রকৃত খাদেমদের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিশ্বব্যাপী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় অপপ্রচার চালাচ্ছে। আধুনিক জাহেলী মতবাদসমূহের সাথে আপোষকারী শৈথিল্যবাদী মুসলিম নেতাদের তারা 'মডারেট' বা উদার বলে প্রশংসা করছে। পক্ষান্তরে ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের তারা 'ফাণ্ডামেন্টালিস্ট' বা মৌলবাদী বলে গালি দিচ্ছে ও তাদের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে। সেই সাথে দুর্বল ও নতজানু সরকারগুলোকে দিয়ে দেশে দেশে দ্বীনদার মুসলমানদের উপরে মিথ্যা মামলা ও জেল-যুলুমসহ নানাবিধ নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

সেযুগে যেমন আল্লাহ্র ইচ্ছায় আবু লাহাবদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল, এযুগেও তেমনি ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের বিরুদ্ধে যাবতীয় চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ব্যর্থকাম হবে ইনশাআল্লাহ। অতএব হে মানুষ! ফিরে এসো প্রকৃত ইসলামের পথে। দীপ্ত শপথ নিয়ে, নির্ভীকচিত্তে। এগিয়ে চল জান্নাতের পানে।

সারকথা :

ইসলামের অভ্রান্ত সত্যকে প্রকাশ করার জন্য যুগোপযোগী মাধ্যম সমূহকে কাজে লাগাতে হবে। যেভাবে রাসূল (ছাঃ) সেযুগের নিয়ম অনুযায়ী ছাফা পাহাড়ে উঠে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সেদিনের আবু লাহাবের ও উম্মে জামীলের ন্যায় ইসলামের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত্রু চিরকাল থাকবে এবং তারা অবশ্যই জাহান্নামী হবে। কিন্তু আল্লাহ্র নিকটে মযলূম মুমিনরাই প্রকৃত বিজয়ী এবং যালেমরা সর্বদা পরাজিত।

সূরা ইখলাছ (বিশুদ্ধ করণ)

মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১১২, আয়াত ৪, শব্দ ১৫, বর্ণ ৪৭।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) বল, তিনি আল্লাহ এক	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾
(২) আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন	اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾
(৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন	لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾
(৪) তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿۴﴾

বিষয়বস্তু :

আল্লাহ স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে একক ও অনন্য এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই- সেকথাই আলোচিত হয়েছে পুরা সূরাটিতে।

শানে নুযূল :

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, মুশরিকরা বলেছিল, اُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ فَأَنْزَلَ اللهُ 'আমাদেরকে তোমার রব-এর বংশধারা বল। তখন অত্র সূরাটি নাযিল হয়'।[৫৫৬] ইকরিমা বলেন, ইহুদীরা বলত, আমরা ইবাদত করি আল্লাহ্র বেটা ওযায়েরকে। নাছারারা বলত, আমরা ইবাদত করি আল্লাহ্র পুত্র মসীহ ঈসাকে। মজূসীরা বলত, আমরা ইবাদত করি সূর্য ও চন্দ্রের। মুশরিকরা বলত, আমরা ইবাদত করি মূর্তি-প্রতিমার। তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর অত্র সূরা নাযিল করেন *(ইবনু কাছীর)*। রাবী মাদানী হ'লেও মক্কার ঘটনা বলায় কোন সমস্যা নেই। তিনি মাক্কী ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখদের কাছ থেকে ঘটনা শুনে বলতে পারেন। রিজালশাস্ত্রের পরিভাষায় একে 'মুরসাল ছাহাবী' বলা হয়, যা সর্বজনগ্রাহ্য।

ফযীলত :

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বললেন, তোমরা সকলে জমা হও। আমি তোমাদের নিকট এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করব। তখন

---

৫৫৬. তিরমিযী হা/৩৩৬৪ 'তাফসীর' অধ্যায়, সনদ হাসান; হাকেম ২/৫৪০ পৃ:।

সবাই জমা হ'ল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে এসে সূরা ইখলাছ পাঠ করলেন। তারপর ভিতরে গেলেন। তখন আমরা একে অপরকে বলতে লাগলাম, إِنِّي أَرَى هَذَا خَبَرًا جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ 'আমি মনে করি এটি এমন একটি খবর, যা তাঁর নিকট আসমান থেকে এসেছে'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এক তৃতীয়াংশ কুরআন শুনাব। শুনো! إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ 'এ সূরাটিই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান'।[৫৫৭] অর্থাৎ গুরুত্ব ও নেকীতে এক তৃতীয়াংশের সমান। এটি তিনবার পড়লে পুরা কুরআন পাঠ করার সমতুল্য হবে না। যেমন ছালাতে তিনবার পড়লে তা সূরা ফাতেহা পাঠের জন্য যথেষ্ট হবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন, কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, 'সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান মূলতঃ 'ছামাদ' নামটির কারণে। কেননা এ নামটি কুরআনের অন্য কোথাও নেই। অনুরূপভাবে 'আহাদ' নামটিও'।

আরও বলা হয়েছে যে, কুরআন তিনভাগে নাযিল হয়েছে। একভাগে 'আহকাম' (الأحكام) তথা আদেশ-নিষেধসমূহ। একভাগে জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের দুঃসংবাদসমূহ(الوعد والوعيد) এবং অন্যভাগে আল্লাহ্র নাম ও গুণসমূহ (الأسماء والصفات)। শেষোক্ত ভাগটি একত্রিত হয়েছে অত্র সূরাতে'। ইমাম কুরতুবী বলেন, এ ব্যাখ্যাটি সমর্থিত হয় ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত অপর একটি হাদীছ দ্বারা। যেমন-

(২) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ – 'আল্লাহ কুরআনকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। অতঃপর এ সূরাটিকে একটি ভাগে পরিণত করেছেন'।[৫৫৮]

(৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাছ বারবার পড়তে দেখল। তখন ঐ ব্যক্তি পরদিন সকালে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বিষয়টি পেশ করল। যেন লোকটি সূরাটি পাঠ করাকে খুব কম মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জবাবে তাকে বললেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ– 'যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই এটি এক-তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান'।[৫৫৯]

---

৫৫৭. বুখারী হা/৫০১৫; মুসলিম হা/৮১২; ছহীহুল জামে' হা/১৯৭; কুরতুবী হা/৬৫২৪।
৫৫৮. মুসলিম হা/৮১১; আহমাদ হা/২৭৫৩৮।
৫৫৯. বুখারী হা/ ৫০১৩, ৬৬৪৩, ৭৩৭৪; আবুদাঊদ হা/১৪৬১; নাসাঈ হা/১০০৩।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রমুখাৎ অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের বলেন, তোমরা কি এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করতে পার? তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন শক্তি কার আছে হে আল্লাহ্র রাসূল? তখন তিনি বললেন, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ'।[৫৬০]

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে সেনাপতি করে কোথাও একটি ছোট সেনাদল পাঠান। তিনি সেখানে ছালাতের ইমামতিতে প্রতি ক্বিরাআতের শেষে সূরা ইখলাছ পাঠ করেন। সেনাদল ফিরে এলে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের বলেন, শুনে দেখো সে কেন এটা করেছিল? তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে উক্ত ছাহাবী বলেন, لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا 'কেননা এটি আল্লাহ্র গুণাবলী সম্বলিত সূরা। তাই আমি এটা পড়তে ভালবাসি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ 'ওকে খবর দাও যে, আল্লাহ ওকে ভালবেসেছেন'।[৫৬১]

(৫) প্রায় একই মর্মে আনাস (রাঃ) প্রমুখাৎ তিরমিযী বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে এসেছে যে, আনছারদের জনৈক ব্যক্তি ক্বোবা মসজিদে ইমামতি করতেন এবং তিনি প্রতি রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। এতে মুছল্লীরা আপত্তি করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! إِنِّىْ أُحِبُّهَا 'আমি একে ভালবাসি'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ 'নিশ্চয় এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে'।[৫৬২]

ইবনুল 'আরাবী বলেন, এটি হ'ল একই সূরা প্রতি রাক'আতে পাঠ করার দলীল। তিনি বলেন, আমি ২৮ জন ইমামকে দেখেছি যারা রামাযান মাসে তারাবীহতে স্রেফ সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ দিয়ে তারাবীহ শেষ করেছেন মুছল্লীদের উপর হালকা করার জন্য এবং এই সূরার ফযীলতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য। কেননা রামাযানে তারাবীহতে কুরআন খতম করা সুন্নাত নয়' (*কুরতুবী*)।

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি একজনকে সূরা ইখলাছ পাঠ করতে শুনে বললেন, وَجَبَتْ 'ওয়াজিব

---

৫৬০. বুখারী হা/৫০১৫; কুরতুবী হা/৬৫২৩।
৫৬১. বুখারী হা/৭৩৭৫, মুসলিম হা/৮১৩; মিশকাত হা/২১২৯; কুরতুবী হা/ ৬৫২৬।
৫৬২. তিরমিযী হা/২৯০১, বুখারী তা'লীক্ব হা/৭৭৪; আলবানী বলেন, হাসান ছহীহ।

হয়ে গেল'। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কি ওয়াজিব হ'ল? তিনি বললেন, 'জান্নাত'।[৫৬৩]

গুরুত্ব :

পবিত্র কুরআন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিভক্ত। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহত। সূরা ইখলাছে 'তাওহীদ' পূর্ণভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, সূরাটি তিনবার পাঠ করলেই পুরা কুরআন পাঠ করা হয়ে গেল বা তার সমান নেকী পাওয়া গেল। এই সূরা যে ব্যক্তি বুঝে পাঠ করে, তার হৃদয় আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী বিষয়ে শিরকী চিন্তাধারা থেকে খালেছ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ কারণেই এ সূরার নাম 'ইখলাছ' বা শুদ্ধিকরণ রাখা হয়েছে এবং এ কারণে এ সূরার গুরুত্ব সর্বাধিক।

তাফসীর :

(১) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ 'বল, তিনি আল্লাহ এক'।

هُوَ মর্যাদা বোধক সর্বনাম (ضمير الشأن) মুবতাদা, اللهُ **১ম** খবর এবং أَحَدٌ **২য়** খবর। শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আহাদ' শব্দটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা স্বীয় কর্মে ও গুণাবলীতে তিনি পূর্ণ *(ইবনু কাছীর)*।

এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'লেও উদ্দেশ্য বিশ্ববাসী। অর্থাৎ তুমি মুশরিকদের বলে দাও যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর আগে বা পিছে কেউ নেই। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত।

বিশ্বের সকল জ্ঞানী সমাজ ও ধর্মীয় সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, সৃষ্টি জগতের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কিন্তু মতভেদ কেবল এক্ষেত্রে যে, তিনি একাই সবকিছু করেন, না তাঁর কোন শরীক আছে? ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মের লোকেরা আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করেছে। যেমন ইহুদীগণ ওযায়েরকে এবং নাছারাগণ ঈসাকে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলেছে (*তওবা ৯/৩০*)। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী নাছারাগণ আল্লাহকে 'তিন উপাস্যের একজন' বলেছে (*মায়েদাহ ৫/৭৩*)। অন্যদিকে ভারতীয় বহু ঈশ্বরবাদীদের তো ভগবানের সংখ্যাসীমা নেই।

এইসব বে-দলীল ও কাল্পনিক কথার জবাব অত্র আয়াতে আল্লাহ ছোট্ট একটি শব্দে দিয়েছেন- 'আহাদ' তিনি 'এক'। 'ওয়াহেদ' ও 'আহাদ' দু'টি শব্দেরই অর্থ 'এক'। তবে পার্থক্য এই যে, ওয়াহেদ-এর 'ছানী' বা দ্বিতীয় রয়েছে। কিন্তু আহাদ-এর কোন ছানী বা দ্বিতীয় নেই। তিনি লা-ছানী ও লা-শরীক। এ নামে একাধিক সত্তার কোন সম্ভাবনাই নেই। আল্লাহ্র 'আহাদ' নামটি কুরআনের অন্য কোথাও নেই। কেবল এ সূরাতেই

---

৫৬৩. তিরমিযী হা/২৮৯৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২১৬০।

রয়েছে। এতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র একক হুকুমেই সৃষ্টিজগত পরিচালিত হয়। এতে অন্যের কোন অংশীদারিত্ব নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। বান্দাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাই বলেন, - إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য ছালাত কায়েম কর' (*ত্বোয়াহা ২০/১৪*)। তিনি বলেন,

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কিছু নামের উপাসনা করে থাক। যেসব নাম তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এ সবের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। বস্তুতঃ বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কারু নেই আল্লাহ ব্যতীত। তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা কারু ইবাদত করো না তাঁকে ব্যতীত। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা' (*ইউসুফ ১২/৪০*)।

পৃথিবীতে সর্ব প্রাচীন শিরক হ'ল মূর্তিপূজার শিরক, যা হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে শুরু হয়। যুগে যুগে নবীগণ মানুষকে এ থেকে বিরত হয়ে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। সর্বশেষ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই ইসলামের উত্থান ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিভিন্ন নামে সেই পৌত্তলিকতাই আজ মুসলমানের ঘরে-বাইরে জেঁকে বসেছে। কবরপূজা, ছবি-মূর্তি, প্রতিকৃতি-ভাস্কর্য, মিনার-সৌধ এমনকি আগুনপূজাও হচ্ছে এখন নামধারী মুসলমানদের মাধ্যমে। এরপরেও আমরা আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করি কিভাবে? বরং এখনও তাঁর গযবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাইনি এটাই সৌভাগ্য। যেমন ইতিপূর্বে নূহের কওম, আদ, ছামূদ, শু'আয়েব, লূত প্রমুখ নবীর কওম ধ্বংস হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র গযবে।

আয়াতে 'আল্লাহ' ও 'আহাদ' দু'টি নামকে পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ হ'লেন সকল পূর্ণতা গুণের সমষ্টি (مجمع صفات الكمال)। অর্থাৎ বান্দার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হ'লেন আল্লাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কারু কাছে চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই বা তাদের দেওয়ারও কোন ক্ষমতা নেই।

পাশাপাশি 'আহাদ' নামটি উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তিনি হ'লেন সকল পরাক্রম গুণের সমষ্টি (مجمع صفات الجلال)। অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি যত বড় ক্ষমতাধর হৌন না কেন, কেউ একা কিছু করতে পারেন না অন্যের সাহায্য ব্যতীত। পক্ষান্তরে আল্লাহ এমনই এক প্রতাপান্বিত সত্তা, যার কোন পরামর্শদাতা বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন

নেই। তিনি একাই সবকিছু করেন। إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ 'তাঁর কাজ এমনই যে, যখনই তিনি কিছু ইচ্ছা করেন, বলেন হও, তখনি হয়ে যায়' (*ইয়াসীন ৩৬/৮২*)। অতএব 'আল্লাহ' নামটি এনে যেমন তাঁকে বান্দার যাবতীয় চাওয়া-পাওয়ার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল ও সমস্ত পূর্ণতা গুণের সমষ্টি বুঝানো হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি 'আহাদ' নামটি এনে তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় ক্ষমতাধর এবং সকল শক্তি ও প্রতাপ গুণের সমষ্টি বুঝানো হয়েছে।

এর মধ্যে এবিষয়েও পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না। আল্লাহ্র নাযিলকৃত কোন বিধানকে লংঘন, পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে না। যদিও পৃথিবীর প্রায় সকল রাজা-বাদশাহ এবং গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ নিজেদের মেকী সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে সর্বদা একাজটিই করে চলেছেন এবং নিরীহ জনগণকে নিজেদের গোলামীর যিঞ্জীরে আবদ্ধ ও নিষ্পেষিত করে যাচ্ছেন।

(২) اَللهُ الصَّمَدُ 'আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন'।

صَمَدَ يَصْمُدُ صَمْدًا অর্থ قصد 'সংকল্প করা'। সেখান থেকে الصَّمَدُ অর্থ الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ السَّيِّدُ الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَاجَاتِ 'প্রয়োজনে যার মুখাপেক্ষী হ'তে হয়'। অথবা وَالْجَوَائِحِ النَّوَازِلِ 'ঐ নেতা, যাকে কামনা করা হয় বিপদে ও কষ্টে' (*কুরতুবী*)। এখানে অর্থ المستغنى عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد 'যিনি সকলের থেকে মুখাপেক্ষীহীন। অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী' (*ফাৎহুল ক্বাদীর*)। সুদ্দী বলেন, المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب 'যিনি সকল সৎকর্মের উদ্দিষ্ট সত্তা এবং সকল বিপদে সাহায্য প্রার্থনার স্থল' (*কুরতুবী*)।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ছামাদ' অর্থ الَّذِي يُصْمَدُ الْخَلاَئِقُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَمَسَائِلِهِمْ 'সৃষ্টিজগত নিজেদের প্রয়োজনে ও সমস্যায় যার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে' (*ইবনু কাছীর*)। আল্লাহকে 'ছামাদ' বলা হয়েছে। কারণ তিনি স্বীয় গুণাবলীতে পূর্ণ এবং সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর মুখাপেক্ষী। এটি একটি পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

উল্লেখ্য যে, প্রথম আয়াতে বর্ণিত 'আহাদ'-এর ন্যায় অত্র আয়াতে বর্ণিত 'ছামাদ' নামটিও মাত্র এখানেই এসেছে। কুরআনের অন্য কোথাও আনা হয়নি। একারণেই সূরা ইখলাছ আল্লাহ্র অনন্য নাম ও গুণাবলীর একত্র সমাহার। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُوْنَ-

'তোমাদের কাছে যেসব নে'মত রয়েছে, তা আল্লাহ্‌রই পক্ষ হ'তে। অতঃপর যখন তোমরা কষ্টে পতিত হও, তখন তাঁর নিকটেই কান্নাকাটি করে থাক' (*নাহল ১৬/৫৩*)। অর্থাৎ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

(৩) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ 'তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন'।

অর্থ ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة 'তাঁর কোন সন্তান নেই বা পিতা নেই বা কোন স্ত্রী নেই' (*ইবনু কাছীর*)। যেভাবে ইহুদী-নাছারাগণ বলে থাকে। কেননা জন্ম হওয়া ও জন্ম নেওয়ার বিষয়টি কেবল সৃষ্টিকুলের সাথে সংশ্লিষ্ট, যাদের পেট রয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌র সত্তা এসব থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারু উত্তরাধিকারী নন এবং কেউ তাঁর উত্তরাধিকারী নয়। যেমন আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ- 'তিনিই আসমান ও যমীনের প্রথম সৃষ্টিকর্তা। কিভাবে তাঁর পুত্র সন্তান হবে? অথচ তাঁর কোন স্ত্রী নেই। আর তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সকল বিষয়ে অবহিত' (*আন'আম ৬/১০১*)। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে সূরা বনু ইস্রাঈল ১৭/১১১, মারিয়াম ১৯/৮৮-৯২, আম্বিয়া ২১/২৬-২৭, ছাফফাত ৩৭/১৪৯-৫৪, ১৫৮-১৫৯, নাজম ৫৩/২১-২৩ প্রভৃতি আয়াত সমূহে।

بَدَعَ يَبْدَعُ بَدْعًا وَبِدْعًا وبِدْعَةً অর্থ 'কোন কাজ প্রথম সৃষ্টি করা'। 'নমুনা ছাড়াই কোন কাজ সৃষ্টি করা'। 'অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা' ইত্যাদি। আল্লাহ হ'লেন অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী। অতএব তিনি কারু পিতা বা পুত্র হ'তে পারেন না।

لَمْ يَلِدْ (তিনি কাউকে জন্ম দেননি) বলার মধ্যে তিনটি ভ্রান্ত দলের প্রতিবাদ করা হয়েছে। মুশরিক, ইহুদী ও নাছারা। মুশরিকরা ফেরেশতাদের 'আল্লাহ্‌র কন্যা' বলত (*ইসরা ১৭/৪০*)। ইহুদীরা ওযায়ের নবীকে 'আল্লাহ্‌র বেটা' বলত (*তওবা ৯/৩০*)। নাছারারা মসীহ ঈসাকে 'আল্লাহ্‌র পুত্র' বলত (*তওবা ৯/৩০*)। وَلَمْ يُوْلَدْ (এবং তিনি কারু জন্মিত নন) বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনিই আদি সৃষ্টিকর্তা। তাঁর পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ 'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত' (*হাদীদ ৫৭/৩*)।

(৪) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ 'তাঁর সমতুল্য কেউ নেই'।

অর্থাৎ সত্তা ও গুণাবলীতে আল্লাহ্র সাথে তুলনীয় কিছুই নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'তাঁর অনুরূপ কিছুই নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' (*শূরা ৪২/১১*)। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নিজস্ব আকার রয়েছে, যা কারু সাথে তুলনীয় নয়। যেমন ক্যাসেট ও ভিডিও সবকিছু শোনে ও দেখে। তাদের নিজস্ব আকার আছে, যা মানুষের মত নয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্র হাত, পা, চেহারা ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে (*মায়েদাহ ৫/৬৪; ক্বলম ৬৮/৪২; বাক্বারাহ ২/১১৫*)। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয়।

জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'অনেক চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে'। 'তাদের প্রতিপালকের দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা সত্বর তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ, যা দেখায় তোমাদের কোন বাধা হবে না'।[৫৬৪] কিন্তু অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীরা এই দর্শন লাভের মহা সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ 'কখনোই না। অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রভুর দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*।

আল্লাহ সবই শোনেন। কিন্তু তাঁর শ্রবণের বিষয়টি অন্য কারু সাথে তুলনীয় নয়। লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল বিজ্ঞান কলেজের প্রফেসর উইলিয়াম প্রাণীজগতের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কে গবেষণায় ডুব দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, He who planted ears, shall He not hear? 'যিনি কান সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি নিজে শুনতে পান না?' অথচ দেড় হাযার বছর আগেই কুরআন সেকথা বলে দিয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন। তাঁর নিজস্ব সত্তা ও স্বরূপ আছে। যা মহান আল্লাহ্র সত্তার সাথে মানানসই ও তাঁর উপযুক্ত। যা অন্য কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি বান্দার সকল ধারণা ও কল্পনার ঊর্ধ্বে। অতি যুক্তিবাদীরা তাঁর বিষয়ে নানা কথা বলেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন,

---

৫৬৪. বুখারী হা/৫৫৪, মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫-৫৬ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮।

سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ 'তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র' (*ছাফফাত ৩৭/১৫৯*)। অতএব তিনি নিরাকার ও নির্গুণ সত্তা বলে লোকেরা যেসব কথা বলে থাকে, তা থেকে তিনি মুক্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ 'তারা যা কিছু আরোপ করে, তা থেকে তোমার পালনকর্তা পবিত্র, যিনি সকল সম্মানের অধিকারী' (*ছাফফাত ৩৭/১৮০*)। *সুবহান্নাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম*।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্র আদেশ ও বিধানের পরিবর্তনকারী কেউ নেই (*আন'আম ৬/১১৫; রা'দ ১৩/৪১; কাহফ ১৮/২৭*)। তাঁর সত্তার যেমন কোন তুলনা নেই, তাঁর প্রেরিত বিধান তথা ইসলামী শরী'আতেরও কোন তুলনা নেই। ইসলামই আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত ধর্ম (*আলে ইমরান ৩/১৯*)। অন্য কোন সত্তাকে আল্লাহ্র সমতুল্য গণ্য করা যেমন শিরক, তেমনি নিজেদের রচিত আইন ও বিধানকে ইসলামী আইন ও বিধানের সমতুল্য বা তার চাইতে উত্তম গণ্য করাও অনুরূপ শিরক (*নূর ২৪/৬৩*)। একইভাবে মানুষের মনগড়া বিধান বাস্তবায়নের জন্য সমর্থন দান ও চেষ্টা সাধনা করা কবীরা গোনাহ (*নিসা ৪/৮৫; বনু ইসরাঈল ১৭/১৮, হজ্জ ২২/৫১; সাবা ৩৪/৫*)। কেননা ইসলামী বিধান ব্যতীত অন্য কিছুই আল্লাহ্র নিকটে গৃহীত হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْناً فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, কখনোই তা কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (*আলে ইমরান ৩/৮৫*)। মানুষ কেবল মসজিদে আল্লাহ্র দাসত্ব করবে, আর বাইরে এসে মানুষের মনগড়া আইনের দাসত্ব করবে। নিজেদের সুবিধামত কুরআনের কিছু অংশ মানবে ও কিছু অংশ ছাড়বে, এটা পুরোপুরি কুফরীর শামিল (*নিসা ৪/১৫০-১৫১; বাক্বারাহ ২/৮৫*)। আল্লাহ চান সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্বের মাধ্যমে মানবতার সার্বিক মুক্তি (*নাহল ১৬/৩৬; নিসা ৪/৬০*)। মানুষ হ'ল সৃষ্টির সেরা জীব (*বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০*)। তার দাসত্ব পাওয়ার হকদার কেবলমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। যিনি একক ও লা-শারীক (*ত্বোয়াহা ২০/১৪*)। তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী (*বাক্বারাহ ২/১৬৫*)। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। সূরা ইখলাছ একথাই মানুষকে জানিয়ে দেয়।

সারকথা :

স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে আল্লাহ একক ও তুলনাহীন- এই নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসকে যাবতীয় শিরকের কালিমা হ'তে মুক্ত রাখার আহ্বানই হ'ল সূরা ইখলাছের সারকথা।

সূরা ফালাক্ব (প্রভাতকাল)

মদীনায় অবতীর্ণ।

সূরা ১১৩, আয়াত ৫, শব্দ ২৩, বর্ণ ৭১।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) বল! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের প্রতিপালকের	قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾
(২) যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন	مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾
(৩) এবং অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হ'তে, যখন তা সমাগত হয়	وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾
(৪) এবং গ্রন্থিতে ফুঁকদানকারিণীদের অনিষ্ট হ'তে	وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾
(৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে।	وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ٪﴿۵﴾

বিষয়বস্তু :

অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির অনিষ্ট এবং জাদুকরদের ও হিংসুকদের অনিষ্টসহ যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা।

শানে নুযূল :

হযরত আয়েশা (রাঃ), যায়েদ বিন আরক্বাম ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনাগুলির সার-সংক্ষেপ এই যে, ইসলামের বিরুদ্ধে সুগভীর চক্রান্তের অংশ হিসাবে ইহুদীরা রাসূল (ছাঃ)-এর চুলের মাধ্যমে তাঁর মাথায় জাদু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো। কিন্তু আল্লাহ হিংসুকদের সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন।

মা আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মদীনার ইহুদী গোত্র বনু যুরাইক্বের (بنو زريق) মিত্র লাবীদ বিন আ'ছাম (لبيد بن أعصم) নামক জনৈক মুনাফিক তার মেয়েকে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মাথার ছিন্ন চুল ও চিরুনীর ছিন্ন দাঁত চুরি করে এনে তাতে জাদু করে এবং মন্ত্র পাঠ করে চুলে ১১টি গিরা দেয়। এর প্রভাবে রাসূল (ছাঃ) কোন কাজ করলে ভুলে যেতেন ও ভাবতেন যে করেননি। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ৪০ দিন বা ৬ মাস এভাবে থাকে। এক রাতে রাসূল (ছাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, দু'জন লোক এসে একজন তাঁর মাথার কাছে অন্যজন পায়ের কাছে বসে। অতঃপর তারা বলে যে, বনু যুরায়েক্ব-এর খেজুর বাগানে যারওয়ান (ذَرْوَان) কূয়ার তলদেশে পাথরের নীচে চাপা দেওয়া খেজুরের কাঁদির

শুকনো খোসার মধ্যে ঐ জাদু করা চুল ও চিরুনীর দাঁত রয়েছে। ওটা উঠিয়ে এনে গিরা খুলে ফেলতে হবে। সকালে তিনি আলী (রাঃ)-কে সেখানে পাঠান এবং যথারীতি তা উঠিয়ে আনা হয়। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) গিরাগুলি খুলে ফেলেন এবং তিনি সুস্থ হয়ে যান।[৫৬৫]

ছা'লাবী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এ সময় আল্লাহ সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল করেন। যার **১১**টি আয়াতের প্রতিটি পাঠের সাথে সাথে জাদুকৃত চুলের **১১**টি গিরা পরপর খুলে যায় এবং রাসূল (ছাঃ) হালকা বোধ করেন ও সুস্থ হয়ে যান *(ইবনু কাছীর)*। রাসূল (ছাঃ)-কে প্রতিশোধ নিতে বলা হ'লে তিনি বলেন, أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِى اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا– 'আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি এ বিষয়টি অপসন্দ করি যে, লোকদের মধ্যে মন্দ ছড়িয়ে পড়ুক'।[৫৬৬] এমনকি তিনি মৃত্যু অবধি ঐ মুনাফিকের চেহারা দেখেননি (*ইবনু কাছীর, কুরতুবী*)।

উল্লেখ্য যে, জাদুর হাদীছকে পুঁজি করে একদল মানুষ কুরআন ও হাদীছের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি রাসূল (ছাঃ) সত্যনবী কি-না, সে বিষয়েও আপত্তি তুলেছেন। এ ব্যাপারে স্পষ্ট জানা আবশ্যক যে, এই জাদু অহি-র অবতরণে ও সংরক্ষণে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটায়নি এবং তা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ নিজেই অহীর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন *(হিজর ১৫/৯)*। তিনি মানুষের অনিষ্টকারিতা হ'তে রাসূল (ছাঃ)-কে বাঁচানোর ওয়াদা করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। এমনকি জাদুকর বা জাদু যে কখনোই সফল হবে না *(ত্বোয়াহা ২০/৬৯)*, সেকথাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। অতএব অপপ্রচারকারীদের থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক।

গুরুত্ব :

হযরত ওক্ববা বিন আমের আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ : قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إلخ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ الخ– 'আল্লাহ আমার উপরে এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছেন, যার অনুরূপ আর দেখা যায়নি। তা হ'ল *'কুল আঊযু বি-রব্বিল ফালাক্ব'* এবং *'কুল আঊযু বিরব্বিন্নাস'* শেষ পর্যন্ত।[৫৬৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَلَمْ تَرَ آيَات أُنْزِلَت اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ 'তুমি কি জানো আজ রাতে এমন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মত ইতিপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি।[৫৬৮]

৫৬৫. বুখারী হা/৫৭৬৫, ৫৭৬৬ 'চিকিৎসা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২১৮৯; মিশকাত হা/৫৮৯৩।
৫৬৬. বুখারী হা/৬৩৯১।
৫৬৭. মুসলিম হা/৮১৪; নাসাঈ হা/৫৪৪০।
৫৬৮. মুসলিম হা/৮১৪, 'মু'আউবিযাতানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২১৩১।

ফযীলত :

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু'হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দু'হাত বুলাতেন।[৫৬৯]

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের চোখ লাগা হ'তে পানাহ চাইতেন। কিন্তু যখন সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হ'ল, তখন তিনি সব বাদ দিয়ে এ দু'টিই পড়তে থাকেন'।[৫৭০]

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুখে পড়তেন, তখন সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে নিজের দেহে হাত বুলাতেন। কিন্তু যখন ব্যথা-যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে পড়ত, তখন আমি তা পাঠ করে তাঁর উপরে ফুঁক দিতাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতাম বরকতের আশায়'। মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, 'পরিবারের কেউ পীড়িত হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন'।[৫৭১]

(৪) ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রতি ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন'।[৫৭২]

(৫) একদা তিনি ওক্ববাকে বলেন, হে ওক্বায়েব! আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠ দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না? অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক্ব ও নাস শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি ছালাতে ইমামতি করলেন এবং সূরা দু'টি পাঠ করলেন। ছালাত শেষে যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, হে ওক্বায়েব! اقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ 'তুমি এ দু'টি সূরা পাঠ করবে যখন ঘুমাতে যাবে ও যখন (তাহাজ্জুদে) ছালাতে দাঁড়াবে'।[৫৭৩]

(৬) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাবের বিন আব্দুল্লাহকে বলেন, اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا 'এ দু'টি সূরা পাঠ কর। কেননা এ দু'টির তুলনায় তুমি কিছুই পাঠ করতে পার না'।[৫৭৪]

(৭) অনুরূপ কথা তিনি ওক্ববা বিন আমেরকেও বলেন যে, مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلاَ اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَا 'কোন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করতে পারে না এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু'টি সূরার তুলনায়'।[৫৭৫]

---

৫৬৯. বুখারী হা/৫০১৭, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।
৫৭০. তিরমিযী হা/২০৫৮, মিশকাত হা/৪৫৬৩; সনদ ছহীহ।
৫৭১. বুখারী হা/৫০১৬; মুসলিম হা/২১৯২; মিশকাত হা/১৫৩২ 'জানায়েয' অধ্যায়।
৫৭২. তিরমিযী হা/২৯০৩; আহমাদ হা/১৭৪৫৩; আবুদাঊদ হা/১৫২৩; মিশকাত হা/৯৬৯।
৫৭৩. আহমাদ হা/১৭৩৩৫; নাসাঈ হা/৫৪৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৪৮।
৫৭৪. নাসাঈ হা/৫৪৪১ সনদ হাসান ছহীহ।
৫৭৫. নাসাঈ হা/৫৪৩৮; সনদ হাসান ছহীহ।

(৮) ইবনু 'আয়েশ আল-জুহানীকে একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا ابْنَ عَائِشٍ أَلاَ أَدُلُّكَ أَوْ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُوْنَ؟ قَالَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ– 'হে ইবনু 'আয়েশ! আমি কি তোমাকে আশ্রয়প্রার্থীদের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা সম্পর্কে খবর দিব না? আর তা হ'ল ফালাক্ব ও নাস এই সূরা দু'টি'।[৫৭৬]

(৯) ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে জুহফা ও আবওয়া-র মধ্যবর্তী স্থানে ঝড়-বৃষ্টি ও ঘনঘটাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ি। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়তে থাকেন। তিনি আমাকে বললেন, হে ওক্ববা! এ দু'টি সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্র পানাহ চাও। কেননা কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু'টির তুলনায়'।[৫৭৭]

(১০) ওক্ববা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, এসময় তিনি বলেন, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ কর। সব কিছুতেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে (تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ)।[৫৭৮] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত সফরে ফালাক্ব ও নাস দু'টি সূরা দিয়ে ফজরের ছালাতে আমাদের ইমামতি করেন'।[৫৭৯] তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি সূরা হূদ ও সূরা ইউসুফ পাঠ করব? তিনি বললেন, لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ). 'আল্লাহ্র নিকটে সূরা ফালাক্ব ও নাস-এর চাইতে সারগর্ভ তুমি কিছুই পড়তে পারো না'।[৫৮০]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছসমূহ 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের।[৫৮১]

জাদু, ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয-কবচ :

ইসলামে জাদু করা নিষিদ্ধ এবং তা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী পাপ হ'তে বেঁচে থাক। (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (২) জাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে মানুষ

---

৫৭৬. নাসাঈ হা/৫৪৩২; আহমাদ হা/১৭৩৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১০৪।
৫৭৭. আবুদাঊদ হা/১৪৬৩; মিশকাত হা/২১৬২।
৫৭৮. তিরমিযী হা/৩৫৭৫; আবুদাঊদ হা/৫০৮২; নাসাঈ হা/৫৪২৮; মিশকাত হা/২১৬৩।
৫৭৯. আবুদাঊদ হা/১৪৬২, হাদীছ ছহীহ।
৫৮০. নাসাঈ হা/৯৫৩; মিশকাত হা/২১৬৪।
৫৮১. ইবনু কাছীর, উক্ত সূরার তাফসীর; ৮/৫০৪ পৃঃ।

হত্যা করা (৪) সূদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং (৭) নির্দোষ ঈমানদার নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।[৫৮২]

ইসলামে ঝাড়-ফুঁক সিদ্ধ। কিন্তু তাবীয-কবচ নিষিদ্ধ। ঝাড়-ফুঁক স্রেফ আল্লাহ্র নামে হ'তে হবে। ফালাক্ব ও নাস ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত দো'আ সমূহ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। কোনরূপ শিরক মিশ্রিত কালাম ও জাহেলী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না।[৫৮৩] এমনিভাবে তাবীয ঝুলানো, বালা বা তাগা বাঁধা যাবেনা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো, সে ব্যক্তি শিরক করল'।[৫৮৪] তিনি বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায়, তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয়'।[৫৮৫] অর্থাৎ কোন বস্তুর উপরে নয়, স্রেফ আল্লাহ্র কালাম পড়ে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করতে হবে। এটি হ'ল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনোচিকিৎসা। যা দৈহিক চিকিৎসাকে প্রভাবিত করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে জিব্রীল (আঃ) এসে তাঁকে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে ঝাড়িয়ে দেন।- بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ 'আমি আল্লাহ্র নামে তোমাকে ঝেড়ে দিচ্ছি এমন সকল বিষয় হ'তে, যা তোমাকে কষ্ট দেয়। প্রত্যেক হিংসুক ব্যক্তির বা হিংসুক চোখের অনিষ্ট হ'তে আল্লাহ তোমাকে নিরাময় করুন। আল্লাহ্র নামে তোমাকে ঝেড়ে দিচ্ছি'।[৫৮৬] জিব্রীল (আঃ) এখানে শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ বলেছেন এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, আল্লাহ ব্যতীত আরোগ্যদাতা কেউ নেই। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই কোন অসুখে পড়তেন, তখনই জিব্রীল এসে তাঁকে ঝেড়ে দিতেন।[৫৮৭] উল্লেখ্য যে, জিব্রীল পঠিত উপরোক্ত দো'আ পড়ে যেকোন মুমিন বান্দা অন্য মুমিনকে ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান-হোসায়েনকে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করেছেন, أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ 'আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ্র পূর্ণ বাক্য সমূহের আশ্রয়ে নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান হ'তে, বিষাক্ত কীট হ'তে ও প্রত্যেক অনিষ্টকারী চক্ষু হ'তে'।[৫৮৮]

---

৫৮২. বুখারী হা/২৭৬৬, মুসলিম হা/৮৯, মিশকাত হা/৫২।
৫৮৩. মুসলিম হা/২২০০, মিশকাত হা/৪৫৩০ 'চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক' অধ্যায়-২৩।
৫৮৪. আহমাদ হা/১৭৪৫৮; হাকেম; ছহীহাহ হা/৪৯২।
৫৮৫. তিরমিযী হা/২০৭২, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৫৫৬।
৫৮৬. মুসলিম হা/২১৮৬, 'চিকিৎসা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৫৩৪ 'জানায়েয' অধ্যায়, 'রোগী দেখতে যাওয়া ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।
৫৮৭. মুসলিম হা/২১৮৫; মির'আত হা/১৫৪৭-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ৫/২২৫ পৃঃ।
৫৮৮. বুখারী হা/৩৩৭১, মিশকাত হা/১৫৩৫।

তাফসীর :

(১) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 'বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার'।

অর্থাৎ জাদুসহ সকল প্রকার অনিষ্ট হ'তে বাঁচার জন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা ইষ্টানিষ্ট সবকিছুর মূল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। অতএব তাঁর কাছেই বান্দাকে সর্বাবস্থায় আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে। আর কেবলমাত্র তাঁর হুকুমেই অনিষ্ট দূর হওয়া সম্ভব। অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়।

'ফালাক্ব' (الْفَلَقُ) অর্থ 'প্রভাতকাল' (الصُّبْحُ)। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সকল অনিষ্ট হ'ল মূলতঃ অন্ধকার। অনিষ্ট দূর হওয়ার পরে আসে খুশীর প্রভাত। আর মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার একচ্ছত্র মালিক হ'লেন আল্লাহ। যেমন তিনি বলেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِه- 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করান, তবে তা দূর করার কেউ নেই তিনি ব্যতীত। আর যদি তিনি তোমার মঙ্গল চান, তবে তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারু নেই' (*ইউনুস ১০/১০৭*)। অতএব দুঃখের অমানিশা ছিন্ন করে যাতে শান্তির সুপ্রভাতের আগমন ঘটে, সেই কামনা নিয়ে প্রভাতের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে বান্দাকে সর্বদা আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অত্র আয়াতে।

الْفَلْقُ أَىْ الشَّقُّ. فَلَقَ يَفْلِقُ فَلْقًا অর্থ বিদীর্ণ হওয়া, ফেটে বের হওয়া। যেমন মাটি ফুঁড়ে চারা বের হয়। সেখান থেকে فَلَقٌ অর্থ সকাল, প্রত্যেক সৃষ্ট জীব, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নীচু যমীন বা পাহাড়ের ফাটল ইত্যাদি। কুরতুবী বলেন, كل ما انْفَلَقَ عن شئ من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فَلَقٌ 'প্রাণী, সকাল, শস্যদানা, শস্যবীজ বা পানিসহ যেকোন বস্তু যা বিদীর্ণ হয়, তাই-ই 'ফালাক্ব' (*কুরতুবী*)। রাতের অন্ধকার ভেদ করে প্রভাতের আলো বিচ্ছুরিত হয় বলেই এখানে 'ফালাক্ব' অর্থ 'প্রভাতকাল' বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى 'বীজ ও আঁটি থেকে অংকুরোদ্গমকারী' এবং فَالِقُ الْإِصْبَاحِ 'প্রভাত রশ্মির উন্মেষকারী' (*আন'আম ৫/৯৫-৯৬*)। উক্ত মর্মে এখানে 'ফালাক্ব' অর্থ কেবল 'প্রভাতকাল' নয়; বরং সকল মাখলূক্বাত হ'তে পারে। কেননা সকল সৃষ্টিই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে আল্লাহ্র হুকুমে এবং তিনিই সকল মাখলূক্বাতের সৃষ্টিকর্তা ও একক পালনকর্তা। অতএব তিনি 'রাব্বুল ফালাক্ব' এবং তিনিই 'রাব্বুল মাখলূক্বাত'।

(২) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 'যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন'।

অর্থাৎ ইবলীস ও তার সাথীদের প্রতারণা এবং শিরক-কুফর, যুলুম-অত্যাচার, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা ইত্যাদি সৃষ্টিজগতের সকল প্রকারের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনিষ্টকারিতা হ'তে হে আল্লাহ আমি তোমার পানাহ চাই। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভাল ও মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন, তিনি আল্লাহ। এটা নয় যে, ভাল-র স্রষ্টা আল্লাহ, আর মন্দের স্রষ্টা শয়তান। বরং সবকিছুই আল্লাহ্র একচ্ছত্র মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। তিনি উভয়টি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এবং সম্পদে ও বিপদে মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে কি-না তা যাচাই করার জন্য।

(৩) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 'এবং অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হ'তে, যখন তা সমাগত হয়'।

মানুষের অধিকাংশ অনিষ্টকারিতা রাতের অন্ধকারেই হয়ে থাকে। সেজন্য এখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে সকল প্রকারের অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহ্র শরণ নেওয়ার কথা বলার পর এক্ষণে পরপর তিনটি প্রধান অনিষ্টকারিতার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যার প্রথমটি হ'ল অন্ধকার রাত্রির অনিষ্টকারিতা যা সকলের নিকট বোধগম্য।

الغَسَق অর্থ أول ظلمة الليل 'রাত্রির প্রথম অন্ধকার'। غَسَقَ يَغْسِقُ غَسَقًا অর্থ أَظْلَمَ 'অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া' (*কুরতুবী*)। যেমন আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ 'তুমি ছালাত কায়েম কর সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির প্রথম অন্ধকার পর্যন্ত' (*বনু ইস্রাঈল* ১৭/৭৮)। এর মধ্যে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য ঢলার পর থেকে যোহরের ওয়াক্ত এবং সূর্যাস্তের পর প্রথম অন্ধকারের আগমন থেকে এশার ওয়াক্ত শুরু হয়।

وَقَبَ يَقبُ وَقْبًا অর্থ أظلم، دخل، نزل، سكن 'অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া', 'প্রবেশ করা', 'অবতীর্ণ হওয়া', 'স্থিতিশীল হওয়া' প্রভৃতি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে অর্থ হবে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া'। অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার যখন গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়। আর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতেই মানুষের অনিষ্টকারিতা বৃদ্ধি পায়। হাদীছে চন্দ্রকে غَاسِقٌ বলা হয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ)-কে এক রাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيْذِيْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ– 'হে আয়েশা! এর

অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহ্র নিকটে পানাহ চাও। কেননা এটি হ'ল 'গাসেক্ব' বা আচ্ছন্নকারী যখন সে সমাগত হয়'।[৫৮৯]

বলা বাহুল্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি রাতের আকাশেই উদিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রাত্রিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ রয়েছে, যা মানুষের অনিষ্টের কারণ হয়ে থাকে। অতএব রাত্রিই হ'ল মূলকথা। সেকারণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'গাসেক্ব' অর্থ 'অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি', যার অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাইতে বলা হয়েছে।

(৪) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ 'এবং গ্রন্থিতে ফুঁকদানকারিণীদের অনিষ্ট হ'তে'।

এটি হ'ল দ্বিতীয় প্রধান অনিষ্টকারিতা, যা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ইবনু যায়েদ বলেন, মদীনার ইহুদী মেয়েরা রাসূল (ছাঃ)-কে জাদু করেছিল এগারোটি গিরায় এগারোটি ফুঁক দিয়ে। আর এরা ছিল লাবীদ ইবনুল আ'ছামের মেয়ে (*কুরতুবী*)। তবে হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ ছহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে, লাবীদ ছিল মুনাফিক এবং ইহুদীদের মিত্র (*ইবনু কাছীর*)। আয়াতে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করায় এটা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় যে, সে যুগে জাদু বিষয়ে মেয়েরাই ছিল প্রধান সহযোগী। ঐ জাদুর স্বাভাবিক প্রভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে কিছুটা ভাবান্তর দেখা দেয়। যেমন তিনি কোন কিছু করলে ভাবতেন করেননি। তানতাভী বলেন, এটা একটা রোগ। কিন্তু জ্ঞানের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না (*তানতাভী*)।

বস্তুতঃ ইহুদী ও মুনাফিকরা চেয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-কে পাগল বানাতে ও তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাতে। এটা ছিল তাদের শত্রুতার একটি নিকৃষ্টতম রূপ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেফাযত করেছিলেন। অমনিভাবে প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে হেফাযত করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি ঘোষণা করেছেন (*ইউনুস ১০/১০৩; রূম ৩০/৪৭*)।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে জাদুর ক্রিয়া কেন হ'ল? তিনি তো আল্লাহ্র রাসূল। এর জবাব এই যে, আগুন ও পানির ন্যায় জাদুরও একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া আছে। নবীগণ মানুষ ছিলেন। তাই তাঁরাও এসবের প্রতিক্রিয়ার উর্ধ্বে ছিলেন না। তবে সেই প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতি হওয়া না হওয়াটা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন বিষয়। যেমন আল্লাহ্র হুকুমে আগুন ইবরাহীম (আঃ)-এর কোন ক্ষতি করেনি (*আম্বিয়া ২১/৬৯*)। হযরত ইউনুস (আঃ)-কে নদীর পানি ও মাছ কোন ক্ষতি করেনি (*ছাফফাত ৩৭/১৪০-১৪৫*)। তেমনিভাবে আল্লাহ্র হুকুমে জাদু ক্রিয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আত্মিক ও জ্ঞানগত কোন ক্ষতি করতে পারেনি। অহি-র প্রচার ও প্রসারেও কোন ব্যত্যয় ঘটেনি, যেটা শত্রুরা কামনা করেছিল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। নবী ছাড়াও আল্লাহ্র অন্যান্য নেক বান্দাদেরকেও আল্লাহ এমনিভাবে রক্ষা করে থাকেন। ঈমানদারগণের ইতিহাসে এর বহু নযীর রয়েছে।

৫৮৯. তিরমিযী হা/৩৩৬৬; মিশকাত হা/২৪৭৫ সনদ ছহীহ।

উল্লেখ্য যে, আবুবকর আল-আছাম (ابو بكر الأصم) জাদুর এই ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন এবং এগুলিকে কাফেরদের রটনা বলেছেন। জামালুদ্দীন ক্বাসেমীও তা সমর্থন করেছেন এবং এই মর্মে বর্ণিত ছহীহ হাদীছগুলিকে সমালোচনা থেকে মুক্ত নয় (ليس سالمًا من النقد), বলে মন্তব্য করেছেন *(তাফসীর ক্বাসেমী)*। অথচ এর পক্ষে তাঁরা কুরআনের যে দু'টি আয়াত এনেছেন, দু'টি আয়াতই তাঁদের দাবীর বিপক্ষে গেছে। তাঁদের প্রথম দলীল, وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ তোমাকে মানুষের (শত্রু) হাত থেকে বাঁচাবেন' *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। দ্বিতীয় দলীল وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى 'জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৯)*। বস্তুতঃ জাদু করা সত্ত্বেও আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে মানুষরূপী শত্রুদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়েছিলেন এবং তাদের জাদু তাঁর উপরে সফল হয়নি। সেকারণ তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি।

(৫) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে'।

এটি হ'ল তৃতীয় প্রধান অনিষ্টকারিতা। যা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এটি সব শেষে আনা হয়েছে। কারণ হিংসা সকল আদম সন্তানের মধ্যে পরিব্যপ্ত এবং এটি সবচেয়ে কষ্টদায়ক ও সর্বাধিক ক্ষতিকর। কোন নবী-রাসূল হিংসুকদের হামলা থেকে রেহাই পাননি। সৎ ও ঈমানদার ব্যক্তিগণ দুনিয়াতে সর্বদা হিংসুকদের নিকৃষ্ট হামলার শিকার হয়ে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতে إِذَا حَسَدَ অর্থাৎ 'হিংসুক যখন হিংসা করে' বলার কারণ হ'ল এই যে, যতক্ষণ কথায় বা কর্মে হিংসার বাস্তবায়ন না ঘটে, ততক্ষণ তা অন্যের কোন ক্ষতি করে না। যদিও হিংসার আগুনে হিংসুক নিজেই সর্বদা জ্বলতে থাকে। বস্তুতঃ এটাই হ'ল হিংসুকের জন্য নগদ দুনিয়াবী আযাব। আর পরকালের কঠিন আযাব তো আছেই।

হিংসুক কাকে বলে? اَلَّذِى يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ الْمَحْسُوْدِ 'হিংসুক ঐ ব্যক্তি যে হিংসাকৃত ব্যক্তির নে'মত বিদূরিত হওয়ার আকাংখা করে' (*কুরতুবী, তানতাভী*)। যখন সে কর্মের মাধ্যমে তার হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তখন তার অনিষ্ট হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ 'কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না'।[৫৯০] অর্থাৎ একটি অন্তরে হয় ঈমান থাকবে, নয় হিংসা থাকবে। ঈমানদারের অন্তরে

৫৯০. নাসাঈ হা/৩১০৯, সনদ হাসান।

হিংসা থাকবে না, হিংসুকের অন্তরে ঈমান থাকবে না। মুমিন কখনো হিংসুক নয়, হিংসুক কখনো মুমিন নয়। অর্থাৎ পূর্ণ মুমিন নয়।

উল্লেখ্য যে, অন্যের মত নে'মতের অধিকারী হওয়ার কামনা করা বৈধ। কিন্তু অন্যের নে'মতের ধ্বংস কামনা করা অবৈধ। প্রথমটিকে বলা হয় الْغِبْطَةُ أو الْمُنَافَسَةُ ঈর্ষা বা আকাংখা এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় الْحَسَدُ বা হিংসা। হিংসা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত। ঈর্ষা সিদ্ধ ও কাংখিত। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ 'হিংসা নেই দু'টি বিষয়ে ব্যতীত। ১. যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন। সাথে সাথে তাকে হক-এর পথে তা ব্যয় করার শক্তি দান করেছেন। ২. যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন। যা দিয়ে সে কার্য নির্বাহ করে ও যা সে লোকদের শিক্ষা দেয়'।[৫৯১] এখানে 'হিকমত' অর্থ সুন্নাহ। এখানে 'হিংসা' (حسد) দ্বারা 'ঈর্ষা' (الغبطة) বুঝানো হয়েছে। ফুযায়েল ইবনু 'ইয়ায বলেন, الْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ، وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ 'মুমিন ঈর্ষা করে ও মুনাফিক হিংসা করে'।[৫৯২] আল্লাহ মুমিনদেরকে জান্নাতে মিশকের মোহরাংকিত বিশুদ্ধতম শরাব পান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেন, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ 'অতএব প্রতিযোগীরা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করুক' (*মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬*)।

ইমাম কুরতুবী বলেন, হিংসা হ'ল প্রথম পাপ, যা আসমানে করা হয় এবং প্রথম পাপ যা পৃথিবীতে করা হয়। আসমানে ইবলীস আদমকে হিংসা করেছিল। আর পৃথিবীতে ক্বাবীল তার ছোট ভাই হাবীলকে হিংসা করেছিল। অতএব হিংসুক ব্যক্তি অভিশপ্ত, বহিস্কৃত ও বিদ্বিষ্ট' (*কুরতুবী*)।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, হিংসুক ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয় পাঁচভাবে। (১) সে অন্যের উপর আল্লাহ্র দেওয়া নে'মতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। (২) সে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বণ্টনের উপরে ক্রুদ্ধ থাকে। (৩) সে আল্লাহ্র কাজের বিরোধিতাকারী হয়। কেননা আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ যাকে খুশী তাকে দিতে পারেন। কিন্তু হিংসুক তার হিংসাকৃত ব্যক্তির জন্য সেটা চায় না। (৪) সে আল্লাহ্র বন্ধুদের লজ্জিত করে। অথবা লজ্জিত করতে চায় ও উক্ত নে'মতের ধ্বংস কামনা করে। (৫) সে আল্লাহ্র শত্রু ইবলীসকে সাহায্য করে' (*কুরতুবী*)।

---

৫৯১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০২ 'ইল্ম' অধ্যায়।
৫৯২. কুরতুবী, ইসমাঈল 'আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/২৯৫; তাযকেরাতুল মাওযূ'আত ১/১৪।

বাঁচার উপায় :

প্রশ্ন হ'তে পারে, বর্ণিত তিন প্রকার অনিষ্ট হ'তে বাঁচার পথ কি?

উত্তর : এ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হ'ল আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। সব ফায়ছালা তাঁর উপরে ন্যস্ত করা এবং সূরা ফালাক্ব, নাস ও অন্যান্য দো'আ সমূহ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়া। অর্থ বুঝে অন্তর ঢেলে দিয়ে পূর্ণ আস্থাসহ দো'আ করতে হবে। আল্লাহ্র আশ্রয় হ'ল বড় আশ্রয়। যা পৃথিবীর সকল আশ্রয়ের চাইতে বড় ও নিরাপদ। এই আশ্রয় নমরূদের হুতাশন থেকে ইবরাহীমকে বাঁচিয়েছে, ফেরাঊনের হামলা থেকে মূসাকে বাঁচিয়েছে। যুগে যুগে অসংখ্য মুমিন বান্দাকে আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। তিনি বলেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'আমার দায়িত্ব হ'ল মুমিনদের সাহায্য করা' *(রূম ৩০/৪৭)*।

আল্লাহ বলেন, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। অতএব সকল মুমিনগণ তাঁর উপরেই ভরসা করে' *(তওবা ৯/৫১)*। তিনি বলেন, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ- اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ 'যে বিপদই আসুক তা আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া আসেনা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত'। ...'আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব মুমিনগণ যেন আল্লাহ্র উপরেই ভরসা করে' *(তাগাবুন ৬৪/১১, ১৩)*।

হৃদয়কে হিংসামুক্ত রাখার উপায় :

(১) হিংসা হ'ল শয়তানী আমল। শয়তান সর্বদা মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তাই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য শয়তানের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকা এবং তার বিরুদ্ধে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। সেইসাথে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বদা ছালাত শেষে বা ঘুমাতে যাবার সময় বা যেকোন সময় সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়া। (২) এছাড়া নিম্নোক্ত দো'আটি পড়া আবশ্যক। আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে শিখিয়ে দিয়েছেন, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের সেইসব ভাইকে তুমি ক্ষমা কর। যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর তুমি আমাদের অন্তরে মুমিনদের বিরুদ্ধে

কোনরূপ বিদ্বেষ সঞ্চার করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও দয়াবান' *(হাশর ৫৯/১০)*। মনে রাখতে হবে যে, ভালোর প্রতি হিংসা চিরন্তন। আসমানে প্রথম হিংসা করেছে ইবলীস আদম (আঃ)-কে এবং যমীনে প্রথম হিংসা করেছে ক্বাবীল ও তার ভাই হাবীলকে। যুগে যুগে এটাই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। এজন্য প্রবাদ বাক্য হয়ে রয়েছে, هل مَاتَ الْبُخَارِيُّ غَيْرَ مَحْسُوْدٍ ؟ 'ইমাম বুখারী কি হিংসুকের হামলা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে পেরেছেন'?

বস্তুতঃ হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ্র নে'মতের শত্রু। সে আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে যায়। সে মজলিসে কেবল লজ্জা পায়। ফেরেশতাদের কাছে লা'নতপ্রাপ্ত হয়। একাকী সে ক্ষোভের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে এবং আখেরাতে সে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হয়। ফলে হিংসুকের দুনিয়া ও আখেরাত সবই বরবাদ। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন-আমীন!

কবি ইবনুল মু'তায বলেন,

اصْبِرْ عَلَى حَسَدِ الْحَسُو + دِ فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُهْ

فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا + إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهْ

'তুমি হিংসুকের হিংসায় ছবর কর। কেননা তোমার ধৈর্য ধারণ তাকে হত্যা করবে'। 'বস্তুতঃ আগুন তার একাংশকে খেয়ে ফেলে, যখন সে খাওয়ার মত কিছু পায় না'। অতএব الحسد مذموم وصاحبه مغموم 'হিংসা নিন্দনীয় এবং হিংসুক সদা দুঃখিত'।

সারকথা :

সকল বিপদাপদে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং সর্বদা তাঁর শরণ নিতে হবে।

সূরা নাস (মানব জাতি)

সূরা ১১৪, আয়াত ৬, শব্দ ২০, বর্ণ ৮০।

সূরা ফালাক্ব-এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) বল! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার	قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾
(২) মানুষের অধিপতির	مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾
(৩) মানুষের উপাস্যের	اِلٰہِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾
(৪) গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হ'তে	مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾
(৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে	الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾
(৬) জ্বিনের মধ্য হ'তে ও মানুষের মধ্য হ'তে।	مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

বিষয়বস্তু :

প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্র তিনটি ছিফাত বর্ণনা করে পরের তিনটি আয়াতে জ্বিন ও মানবরূপী শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাফসীর :

(১-৩) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ 'বল! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের উপাস্যের'।

উপরে বর্ণিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্র তিনটি ছিফাত বর্ণনা করা হয়েছে।- রুবূবিয়াত, মালেকিয়াত ও উলূহিয়াত তথা লালন-পালন, আধিপত্য ও উপাসনা গুণের একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহ্র। মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এই মর্মে যে, তার সঙ্গে সদা নিযুক্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে যেন উপরোক্ত তিনটি গুণে গুণান্বিত মহান সত্তা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কিছুটা ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

প্রথম গুণ হিসাবে বলা হয়েছে رَبِّ النَّاسِ 'মানুষের পালনকর্তা'। সকল মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানে। কিন্তু পালনকর্তা হিসাবে মানতে অনেকে আপত্তি করে। যেমন ফেরাঊন সরাসরি অস্বীকার করেছিল এবং নিজেকেই أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى 'আমি তোমাদের

বড় পালনকর্তা' বলে দাবী করেছিল (*নাযে'আত* ৭৯/২৪)। পৃথিবীতে ফেরাঊনী স্বভাবের অসংখ্য ধনী, সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতা রয়েছেন, যারা পরোক্ষে অনুরূপ দাবী করতে চান। তাই আল্লাহ এখানে তাঁর 'পালনকর্তা' গুণটিকেই শুরুতে এনেছেন। একইভাবে সূরা ফাতিহার শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসা করা হয়েছে رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা' হিসাবে।

দ্বিতীয় গুণ : مَلِكِ النَّاسِ 'মানুষের অধিপতি'। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ পৃথিবীকে কব্জায় নিবেন আর বলবেন, أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟ 'আমিই বাদশাহ। পৃথিবীর রাজা-বাদশাহরা কোথায়'?[৫৯৩]

পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজ ও রাষ্ট্রনেতা সাধারণতঃ এই অহংকারে বুঁদ হয়ে থাকেন যে, সবার উপরে তারাই সত্য, তাদের উপরে নেই। তারা যা বলেন বা করেন, সেটাই চূড়ান্ত। আইন ও বিধানদাতা তারাই। তাদের বানোয়াট আইনে আদালতগুলিতে বিচার হচ্ছে। আর সে আইনেই নিরীহ মানুষের জেল-ফাঁস হচ্ছে। বাদী-বিবাদী বা তাদের প্রতিনিধিকে আদালতে নির্বাক দাঁড় করিয়ে রেখে উভয় পক্ষের উকিলের আইনী বিতর্কের ফাঁক-ফোকর দিয়ে নিরপরাধ মানুষকে অপরাধী বানানো অথবা অপরাধীকে নিরপরাধ বানানোর প্রহসনকে প্রত্যক্ষ বিচার ব্যবস্থা বলা হচ্ছে। এরপরেও রয়েছে ন্যায়বিচারের নামে দীর্ঘসূত্রিতা। বাদী ও বিবাদীর হায়াত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বিচার শেষ হয় না। এটাই হ'ল আধুনিক যুগের উন্নত বিচার ব্যবস্থার নমুনা। অন্যদিকে হাজতের নামে মেয়াদবিহীনভাবে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে মানুষকে ধুঁকে ধুঁকে মারা হচ্ছে। কথিত আইন ও বিচারের দোহাই দিয়ে এভাবে স্বাধীন মানুষকে ঘানির গরুর মত দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করে তিলে তিলে নিঃশেষ করা হচ্ছে। যদি চূড়ান্ত বিচারে সে বেকসূর খালাস হয়ে যায়, তখন তার জীবনের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি সে আর কখনোই ফিরে পায় না। মানুষের উপরে মানুষের এই মেকী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আল্লাহ তাঁর একাধিপত্য ও একক সার্বভৌমত্বের গুণ প্রকাশ করে বলেছেন مَلِكِ النَّاسِ 'মানুষের অধিপতি'। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের অধিপতি মানুষ নয়, বরং আল্লাহ। আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান।

তৃতীয় গুণ : إِلَهِ النَّاسِ 'মানুষের উপাস্য'। স্রেফ ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয়ে কিছু ব্যক্তি ও বস্তুর উপরে অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করে মানুষ তাদের উপাসনা করে থাকে। তাদের কবর, মূর্তি, ছবি ও প্রতিকৃতিকে পূজা করে। একইভাবে নবী-অলি, ফেরেশতা, সূর্য-চন্দ্র, আগুন-পাহাড়-নদী, গাছ-পাথর এমনকি মাছ-কবুতর ও তুলসী

৫৯৩. বুখারী হা/৬৫১৯, মুসলিম হা/২৭৮৭, মিশকাত হা/৫৫২২।

গাছ পর্যন্ত মানুষের পূজা পাচ্ছে। সৃষ্টির সেরা মানুষ নিজেদের হাতে গড়া বেদী, মিনার, কবর, ভাষ্কর্য ও সৌধের সামনে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। জীবন্ত মানুষ যখন ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় প্রাণ হারাচ্ছে, তখন এইসব নিষ্প্রাণ মূর্তি ও মিনারের পিছনে মানুষ অকাতরে জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করছে। অথচ যাকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে, যাকে পূজা দেওয়া হচ্ছে, সে না দেখতে পায়, না শুনতে পায়। সে না কোন ক্ষতি করতে পারে, না কোন উপকার করতে পারে। এরপরেও মানুষ যাচ্ছে সেখানে দলে দলে মিথ্যা ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয়ে। সেযুগের নমরূদ নিজেকে মানুষের হায়াত-মঊতের মালিক দাবী করে বলেছিল, أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ 'আমি বাঁচাই ও আমি মারি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*। ফেরাঊন নিজেকে জনগণের 'ইলাহ' দাবী করে কওমের নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিল, ...مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي 'আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না' ... *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। সে আরও বলেছিল, مَا أُرِيْكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ 'আমি তোমাদের জন্য যেটা কল্যাণ বুঝি, সেটাই বলি। আর আমি তোমাদের কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন/গাফির ৪০/২৯)*। এযুগের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের অনেকে অঘোষিতভাবে অনুরূপ দাবী করেন। কুরআন-হাদীছের কল্যাণপথ তারা দেখতে পান না। ফলে তাদের জীবদ্দশায় সরাসরি এবং মৃত্যুর পরে তাদের ছবিতে ও কবরে পূজা হয়ে থাকে।

মূলতঃ এসবই শয়তানী ধোঁকা ব্যতীত কিছুই নয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, পূজা-উপাসনা ও ইবাদতের একক হকদার ও হক মা'বূদ মাত্র একজন- তিনি আল্লাহ ও তিনিই মাত্র إِلَهِ النَّاسِ 'মানুষের উপাস্য'। তিনি ব্যতীত আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র 'রব' হিসাবে মানুষ ও সৃষ্টিজগতের লালন-পালন করেন, 'মালেক' বা অধিপতি হিসাবে সৃষ্টি জগতের সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেন এবং 'ইলাহ' হিসাবে অসহায় বান্দার সকল প্রার্থনা শ্রবণ করেন ও তা মনযূর করেন। এভাবে রুবূবিয়াত, মালেকিয়াত ও উলূহিয়াতের একচ্ছত্র অধিকারী হিসাবে আল্লাহ অত্র সূরার শুরুতে নিজের প্রধান তিনটি গুণের পরিচয় পেশ করেছেন।

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ **(৪-৬)**
'গোপন শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্টকারিতা হ'তে'। 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে'। 'জ্বিনের মধ্য হ'তে ও মানুষের মধ্য হ'তে'।

বর্ণিত তিনটি আয়াতে শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্টকারিতা হ'তে বাঁচার জন্য মানুষকে আল্লাহ্র আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে। কেননা শয়তান মানুষের নিত্য সঙ্গী এবং সে কাউকে ভয় পায় না আল্লাহ ব্যতীত। বান্দা যখনই আল্লাহ্র নাম নেয়, তখনই সে পিছিয়ে যায়।

এমনকি আযান শুনলে সে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে দৌড়ে পালায়...।[৫৯৪] শয়তান মানুষের রগ-রেশায় চলাফেরা করে।[৫৯৫] একে আটকানোর ক্ষমতা মানুষের নেই। অথচ এর প্ররোচনাতেই মানুষ সমস্ত পাপ করে। তাই একে দমন করার একমাত্র কৌশল হিসাবে মানুষকে আল্লাহ্র আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে।

الْوَسْوَاسِ মাছদার যা اسم فاعل অর্থে এসেছে الْمُوَسْوِسُ 'কুমন্ত্রণাদাতা' অর্থাৎ শয়তান। কুরতুবী বলেন, আসলে ছিল من شر ذى الوسواس কিন্তু ذى মুযাফকে বিলুপ্ত করে مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ করা হয়েছে। الْوَسْوَسَةُ অর্থ الصوت الخفى 'নীরব খটকা' যা মনের মধ্যে উত্থিত হয় (*তানতাভী*)। অথবা حديث النفس 'মনের মধ্যেকার কল্পকথা' (*কুরতুবী*)।

خَنَسَ يَخْنُسُ خَنْسًا وَخُنُوْسًا وَخِنَاسًا অর্থ পিছে আসা, লুকিয়ে যাওয়া। সেখান থেকে خَنَّاسٌ অর্থ 'গোপন শয়তান'। কেননা আল্লাহ্র নাম শুনলে শয়তান পিছিয়ে যায় ও লুকিয়ে যায়। আবার যেমনি বান্দা বেখেয়াল হয়ে যায়, অমনি সামনে চলে আসে ও কুমন্ত্রণা দেয়। আকাশের মিটিমিটি নক্ষত্রকে এজন্য الْخُنَّس বলা হয়েছে (*তাকভীর ৮১/১৫*)। কেননা এগুলো এই দেখা যায়, এই মিলিয়ে যায়। শয়তান অনুরূপ আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলেই পালায়। আবার আল্লাহকে ভুললেই সামনে চলে আসে। এই লুকোচুরি স্বভাবের জন্য শয়তানকে অত্র আয়াতে 'খান্নাস' বলা হয়েছে। আর এটা হ'ল শয়তানের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

(৫) اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে'- এটা হ'ল শয়তানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ قَالُوْا وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِىْ إِلاَّ بِخَيْرٍ– 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সঙ্গী হিসাবে শয়তানকে নিযুক্ত করা হয়নি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও। তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। সেজন্য সে অনুগত হয়ে গেছে। ফলে সে আমাকে নির্দেশ করে না ভাল ব্যতীত'।[৫৯৬]

---

৫৯৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৫৫ 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।
৫৯৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮; বুখারী হা/২০৩৫; ইবনু মাজাহ হা/১৭১৯।
৫৯৬. মুসলিম হা/২৮১৪ 'ক্বিয়ামতের বর্ণনা' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬৭ 'শয়তানের কুমন্ত্রণা' অনুচ্ছেদ।

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ই'তেকাফে ছিলেন। স্ত্রী ছাফিয়া কোন প্রয়োজনে সেখানে গিয়েছিলেন। অতঃপর কথা শেষ হ'লে তাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) তার সাথে কিছু দূর হেঁটে আসেন। এ সময় দু'জন আনছার ছাহাবী তাঁদের দেখে দ্রুত সরে যান। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের ডেকে বললেন, থামো। ইনি হ'লেন ছাফিয়া বিনতে হুয়াই। তখন দু'জন বিস্ময়ে বলে উঠলো, *সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ* ! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّىْ خَشِيْتُ أَنْ يَّقْذِفَ فِى قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا– 'নিশ্চয় শয়তান বনু আদমের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে যা দিয়ে রক্ত চলাচল করে। আমি ভয় করেছিলাম যে আমাদের দেখে তোমাদের অন্তরে কোন কিছুর উদয় হ'তে পারে'।[৫৯৭]

(৬) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 'জ্বিন ও ইনসানের মধ্য হ'তে'। এখানে শয়তানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জ্বিন শয়তান যা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং মানুষ শয়তান, যা প্রকাশ্যে মানুষকে কু-পরামর্শ দেয় ও পথভ্রষ্ট করে।

আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ 'আর এমনিভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য বহু শয়তানকে শত্রুরূপে নিযুক্ত করেছি মানুষের মধ্য থেকে ও জিনদের মধ্য থেকে। তারা একে অপরকে মনোমুগ্ধকর কথা দিয়ে প্ররোচিত করে থাকে। যাতে তারা ধোঁকায় পতিত হয়। যদি তোমার প্রভু চাইতেন, তাহ'লে তারা এগুলি করতে পারত না। অতএব তুমি এদেরকে ও এদের মিথ্যা রটনাগুলিকে দূরে নিক্ষেপ কর' *(আন'আম ৬/১১২)*। নবীদের যখন এই অবস্থা তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন হবে, তা সহজেই বোধগম্য।

তবে মনের মধ্যে শয়তানী চিন্তা উদয় হ'লেই বান্দা গোনাহগার হিসাবে বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না সে মুখে বলবে বা লিখবে অথবা কাজে পরিণত করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِىْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ– 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমার উম্মতের ঐসব বিষয় ক্ষমা করেছেন, যেসব বিষয় তাদের অন্তরে উদয় হয়। যতক্ষণ না তারা সে অনুযায়ী কাজ করে অথবা কথা বলে'।[৫৯৮]

৫৯৭. বুখারী হা/২০৩৫; ইবনু মাজাহ হা/১৭৭৯।
৫৯৮. বুখারী হা/২৫২৮, মুসলিম হা/১২৭, মিশকাত হা/৬৩ 'ঈমান' অধ্যায়, 'শয়তানের কুমন্ত্রণা' অনুচ্ছেদ।

মনোচিকিৎসা :

সূরা ফালাক্ব ও নাস কুরআনের অন্যতম সেরা মু'জেযা স্বরূপ। এর মধ্যে রয়েছে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অমূল্য উৎস। যা আধুনিক পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ সূরা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের উপরে তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। যা ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন লাবীদ বিন আ'ছাম-এর করা জাদু রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে ক্রিয়া করেছিল মন্দভাবে। পক্ষান্তরে সূরা ফালাক্ব ও নাস তাঁর উপর শুভ প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। যাতে তিনি সুস্থ হয়ে যান। এতে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুগত ঔষধ ছাড়াও মানসিক ঔষধ মানব দেহে অধিকতর দ্রুত কাজ করে। এমনকি অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন রোগের আরোগ্য ৮০ শতাংশ নির্ভর করে রোগীর মানসিক শক্তির উপর। এমনকি ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য ব্যাধিতেও বেদনার উপশম হয় রোগীর জোরালো মানসিক শক্তির উপরে। ইউরোপ-আমেরিকায় এখন রোগীকে মানসিক ঔষধ দেওয়া হচ্ছে এভাবে যে, তুমি বার বার বলো 'আমার কোন অসুখ নেই, আমি সুস্থ'। এভাবে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানসিকভাবে শক্তিশালীগণ দ্রুত আরোগ্য লাভ করে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন।

কুরআন বহু পূর্বেই মনোচিকিৎসার পথ দেখিয়েছে। বরং পুরা কুরআনকেই আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য 'শিফা' ও 'রহমত' তথা 'আরোগ্য' ও 'অনুগ্রহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮২)*। সূরা ফালাক্ব ও নাস তার মধ্যে পরীক্ষিত, সহজপাঠ্য ও সুপরিচিত দু'টি অনন্য সূরা। সূরা দু'টি এদিক দিয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অভ্রান্ত পথ নির্দেশক ও মানব কল্যাণের এক অফুরন্ত উৎস হিসাবে গণ্য হবে। যদি না কি মানুষ আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় ও তাঁর উপরে গভীরভাবে আস্থাশীল হয়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

সারকথা :

শয়তানী ধোঁকা হ'তে বাঁচার একমাত্র পথ হ'ল আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করা।

آخر تفسير سورة الناس، فلله الحمد والمنة وبنعمته تتم الصالحات-

الحمد لله الذى وفق عبده في عمل هذا التفسير لجزء عمَّ من القران الكريم وكان الفراغ منه يوم الإثنين فى السجن فى مدينة بوغرا فى الثالث عشر من جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وألف وأربعمائة الهجرية (١٤٢٩/٥/١٣هـــ الموافق ٢٠٠٨/٥/١٩ الميلادية)- فإن كان الصواب فمن الله عز وجل وله الفضل والمنة وإن كان فيه خطأ فمنا من صنع البشر- فنسأل الله العفو والغفران وإليه المستعان وعليه التكلان، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير-

اللهم وفقنا أن نعتصم بالكتاب والسنة الصحيحة فى نواحى حياتنا الدينية والدنيوية واغفرلنا ولأساتذنا ولإخواننا المخلصة فى حركة أهل الحديث فى بلادنا وفى غيرها من البلدان، واجعل هذا العمل وسيلة لنجاتى ولوالدىّ ولأهل بيتى يوم يقوم الناس لرب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه واجعل أخرتنا خيرًا من الأولى وارحمنا أنت أرحم الراحمين- آمين-

وبهذا تم كتاب (تفسير القرآن لإبن احمد) والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم-

--o--

॥ সমাপ্ত ॥

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে কুরআন ও হাদীছের সটিকা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ।
- দৈনন্দিন মাসায়েল ও ব্যবহারবিধির উপরে খণ্ডাকারে পুস্তিকা প্রকাশ।
- আক্বীদা ও আমল বিষয়ক বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ ও অন্যান্য যরূরী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ